প্রচার।

মাসিক পত্র।

৩য় খণ্ড] শ্রাবণ ১২৯৩। [প্রথম সংখ্যা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

[ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত, গীতার ভাষ্য ও টীকা থাকিতে গীতার অন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। তবে ঐ সকল ভাষ্য ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন অনেক পাঠক আছেন, যে সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক। কিন্তু গীতা এমনই দুরূহ গ্রন্থ যে টীকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এইজন্য গীতার একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রয়োজনীয়।

বাঙ্গালা টীকা দুই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাদি প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টীকার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নূতন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বাবু হিতলাল মিশ্র নিজ কৃত অনুবাদে কখন শঙ্কর ভাষ্যের সারাংশ কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজ কৃত অনুবাদে; অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীতা টীকার মর্ম্মার্থ দিয়াছেন। ইঁহাদিগের নিকট বাঙ্গালী পাঠক তজ্জন্য বিশেষ ঋণী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যুক্ত হইয়াছেন; বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে শঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ থাকিবে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত অনুবাদের সহিত "গীতাসন্দিপনী" নামে একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা সুখের বিষয় যে "গীতা সন্দীপনীতে" গীতার মর্ম্ম পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ বুঝান হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই।

এই সকল অনুবাদ বা টীকা থাকাতেও, মাদৃশ ব্যক্তির অভিনব অনুবাদ ও টীকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা পরিশ্রম বলিয়া গণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার যথার্থ প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। সে প্রয়োজন কি তাহা বুঝাইতেছি।

এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই "শিক্ষিত" সম্প্রদায় ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদিগেরই সচরাচর "শিক্ষিত" বলা হইয়া থাকে; আমি প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়াই তদর্থে "শিক্ষিত" শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কাহারও শিক্ষা বেশী কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউক, বেশী হউক, এখনকার পাঠক অধিকাংশই "শিক্ষিত" সম্প্রদায় ভুক্ত, ইহা আমার জানা আছে। এখন গোলযোগের কথা এই যে, এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা, পাশ্চাত্যদিগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তা-প্রণালী হইতে এত বিভিন্ন, যে ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন, আমাদিগের "শিক্ষিত" সম্প্রদায়, শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর অনুবর্ত্তী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিন্তা-প্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত, কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাব সকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে, পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্যভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া, পাশ্চাত্য-ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম্ম তাঁহাদিগকে বুঝান, আমার এই টীকার উদ্দেশ্য।

ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই, যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাহার মীমাংসা নাই। থাকিবারও সম্ভাবনা নাই, কেন না তাঁহারা যে সকল পাঠকের সাহায্য জন্য ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মনে সে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। এই টীকায়, যতর সাধ্য সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করা গিয়াছে।

অতএব, যে সকল পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন, বা করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগের প্রতিযোগী নহি; যথাসাধ্য তাঁহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই আমার ক্ষুদ্রাভিলাষ। আমিও যতদূর পারিয়াছি, পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের অনুগামী হইয়াছি। আনন্দ-গিরি টীকা সম্বলিত শাঙ্করভাষ্য,

শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা, রামানুজভাষ্য, মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত টীকা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে সে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সর্ব্বত্র তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাঁহারা বিবেচনা করেন, এ দেশীয় পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক, এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।

টীকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টীকা চলে না, এই জন্য মূলও দেওয়া গেল। অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝিতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অনুবাদও দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা করেন, সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর যাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুই এক স্থানে অর্থ ব্যক্তির অনুরোধে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।]

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী সমবেত আমার পক্ষ ও পাণ্ডবেরা কি করিল? ১।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বের অন্তর্গত। ভীষ্ম পর্ব্বের ২৫ অধ্যায় হইতে ৪৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত—এই অংশের নাম ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়; কিন্তু ভগবদ্গীতার আরম্ভ, পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে। তৎপূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সকল পাঠক জানিতে না পারেন, এজন্য তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। কেননা, তাহা না বলিলে, ধৃতরাষ্ট্র কেন এই প্রশ্ন করিলেন, এবং সঞ্জয়ই বা কে তা। অনেক পাঠক বুঝিবেন না।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসমৃদ্ধি দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন, তাহা অপহরণ

করিবার অভিপ্রায়ে যুধিষ্ঠিরকে কপটদ্যূতে আহ্বান করেন। যুধিষ্ঠির কপটদ্যূতে পরাজিত হইয়া এই পণে আবদ্ধ হয়েন, যে দ্বাদশ বৎসর তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ বনবাস করিবেন, তার পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের রাজ্য ভোগ করিবেন। তারপর, পাণ্ডবেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাপন করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তার পর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কাজেই পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। উভয়পক্ষ সেনা সংগ্রহ করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল। যখন উভয় সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন এই গীতার আরম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন—তিনি হস্তিনা নগরে আপনার রাজভবনে আছেন। তাহার কারণ, তিনি জন্মান্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ দর্শন সুখেও বঞ্চিত। কিন্তু যুদ্ধে কি হয়, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার সম্ভাষণে আসিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, যে "আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না, আপনার তেজঃ-প্রভাবে আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব।" তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী, সঞ্জয়কে বরদান করিলেন। বর-প্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বৃত্তান্ত সকল দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেছেন, সঞ্জয় উত্তর দিতেছেন। মহাভারতের যুদ্ধ পর্ব্বগুলি এই প্রণালীতে লিখিত। সকলই সঞ্জয়োক্তি। এক্ষণে, উভয় পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া, ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উভয় পক্ষ কি করিলেন। গীতার এইরূপ আরম্ভ।

এই দিব্য চক্ষুর কথাটা অনৈসর্গিক, পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না। গীতোক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

যে ধর্মব্যাখ্যা গীতার উদ্দেশ্য, প্রথমাধ্যায়ে তাহার কিছুই নাই। কি প্রসঙ্গোপলক্ষে এই তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে কেবল তাহারই পরিচয় আছে। গীতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এতদংশের কোন প্রয়োজন নাই। পাঠক ইচ্ছা করিলে এতদংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার যে উদ্দেশ্য তাহাতে এতদংশের কোন টীকা লিখিবারও প্রয়োজন নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে শ্রেণী বিশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। এজন্য দুই একটা কথা লেখা গেল।

কুরুক্ষেত্র একটি চক্র বা জনপদ। ঐ চক্র এখনকার স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর নগরের দক্ষিণবর্ত্তী। আম্বালা নগর হইতে উহা ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ। পানিপাট হইতে উহা ২০ ক্রোশ উত্তর। কুরুক্ষেত্র ও পানিপাট ভারতবর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের ভাগ্য অনেকবার ঐ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি পাইয়াছে। "ক্ষেত্র" নাম শুনিয়া ভরসা করি কেহ একখানি মাঠ বুঝিবেন না। কুরুক্ষেত্র প্রাচীন কালেই পঞ্চ যোজন দীর্ঘে এবং পঞ্চ যোজন প্রস্থে। এইজন্য উহাকে সমন্তপঞ্চক বলা যাইত। চক্রের সীমা এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

কুরু নামে একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহা হইতেই এই চক্রের নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। তিনি দুর্য্যোধনাদির ও পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বপুরুষ; এজন্য দুর্য্যোধনাদিকে কৌরব বলা হয়, এবং কখন কখন পাণ্ডবদিগকেও বলা হয়। তিনি এই স্থানে তপস্যা করিয়া বরলাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম কুরুক্ষেত্র। মহাভারতে কথিত হইয়াছে, যে তাঁহার তপস্যার কারণই উহা পুণ্যতীর্থ। ফলে চিরকালই কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র বা ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, "দেবাঃ হ বৈ সত্রং নিষেদুরগ্নিরিন্দ্রঃ সোমো মখো বিষ্ণুর্বিশ্বেদেবা অন্যত্রৈবাশ্বিভ্যাম্। তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস। তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্।" অর্থাৎ দেবতারা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে 'দেবতাদিগের যজ্ঞস্থান' বলে।

মহাভারতের বনপর্ব্বের তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে কুরু-

ক্ষেত্র ত্রিলোকীর মধ্যে প্রধান তীর্থ। বনপর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের সীমা এইরূপ লেখা আছে—"উত্তরে সরস্বতী দক্ষিণে দৃষদ্বতী; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী।" (৮৩ অধ্যায়)। মনুসংহিতায় বিখ্যাত ব্রহ্মাবর্ত্তেরও ঠিক সেই সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যো র্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। ২। ১৭।

অতএব কুরুক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাবর্ত্ত একই। কালিদাসের নিম্নলিখিত কবিতাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে।

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্র প্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিবকমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি॥
মেঘদূত ৪৯।

কিন্তু মনুতে আবার অন্যপ্রকার আছে। যথা

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউন্থসাঙ্‌ও ইহাকে স্বীয় গ্রন্থে "ধর্ম্মক্ষেত্র" বলিয়াছেন। *

কুরুক্ষেত্র আজিও পুণ্যতীর্থ বলিয়া ভারতবর্ষে পরিচিত; অনেক যোগী সন্ন্যাসী তথা পরিভ্রমণ করে। কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি মহাভারতের যুদ্ধের স্মারক স্বরূপ। যে স্থানে অভিমন্যু সপ্তরথিকর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে অভিমন্যুক্ষেত্র বা অমিন বলিয়া থাকে। সেখানে আজিও পুত্রহীনারা পুত্রকামনায় অদিতির মন্দিরে অদিতির উপাসনা করে। যেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদিগের সৎকার সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই বীরগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল; এখনও তাহাকে অস্থিপুর

* M. Stanislaus Julien অনুবাদে লিখিয়াছেন, "*Le champ du bonheur,*" অর্থাৎ ধর্ম্মক্ষেত্র।

বলে। যেখানে সাত্যকিতেও ভূরিশ্রবাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, এবং অর্জ্জুন সাত্যকির রক্ষার্থ অন্যায় করিয়া ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদ করেন, সেই স্থানকে এক্ষণে "ভোর" বলে। জনপ্রবাদ আছে যে ভূরিশ্রবার সালঙ্কার ছিন্ন হস্ত পক্ষিতে লইয়া যায়। সেই ছিন্ন হস্তের অলঙ্কারে একখণ্ড বহুমূল্য হীরক ছিল। তাহাই কহীনুর, এক্ষণে ভারতেশ্বরীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে। কথাটা যে সত্য, তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ নাই।

কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালী মাত্রেরই মুখে আছে। একটা কিছু গোল দেখিলে বাঙ্গালীর মেয়েরাও বলে "কুলুক্ষেত্র হইতেছে।" অথচ কুরুক্ষেত্রের সবিশেষ তত্ত্ব কেহই জানে না। বিশেষ টমসন, হুইলর প্রভৃতি ইংরেজ লেখকেরা সবিশেষ না জানিয়া অনেক গোলযোগ বাধাইয়াছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের কথা এখানে এত সবিস্তারে লেখা গেল।*

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—

ব্যূহিত পাণ্ডবসৈন্য দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের নিকটে গিয়া বলিলেন, (২)

দুর্য্যোধনাদির অস্ত্র বিদ্যার আচার্য্য ভরদ্বাজ পুত্র দ্রোণ। ইনি পাণ্ডবদিগেরও গুরু। ইনি ব্রাহ্মণ। কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যায় অদ্বিতীয়। শস্ত্রবিদ্যা

---

* সাহেবদিগের ভ্রমের উদাহরণ স্বরূপ গীতার অনুবাদক টম্সনের টীকা হইতে দুই ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

"A part of Dharmakshetra, the flat plain around Dehli, which city is often identified with Hastinapur, the capital of Kurukshetra."

এই টুকুর ভিতর ৫টি ভুল। (১) ধর্ম্মক্ষেত্র নামে কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র নাই। (২) কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রের অংশ মাত্র নহে। (৩) "The flat plain around Dehli কুরুক্ষেত্র নহে। (৪) দিল্লী হস্তিনাপুর নহে। (৫) হস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্রের রাজধানী নহে। এতটুকুর ভিতর এতগুলি ভুল একত্র করা যায়, আমরা জানিতাম না।

ক্ষত্রিয়দিগেরই ছিল, এমন নহে। দ্রোণাচার্য্য, পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ, অথচ সচরাচর ক্ষত্রিয়দিগের অপেক্ষা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যখন পশ্চাৎ স্বধর্ম্মপালনের কথা উঠিবে তখন এই কথা স্মরণ করিতে হইবে।

যুদ্ধার্থ সৈন্য সন্নিবেশকে ব্যূহ বলে।

সমগ্রস্যতু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ।
স ব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্॥

আধুনিক ইউরোপীয় সমরে সেনাপতির ব্যূহ রচনাই প্রধান কার্য্য।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩॥

হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্রের দ্বারা ব্যূহিতা পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা দর্শন করুন। ৩।

দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, পাণ্ডবদিগের একজন সেনাপতি। তিনিই ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে ইঁহার পিতা দ্রোণবধ কামনায় যজ্ঞ করিলে ইঁহার জন্ম হয়। ইনিও দ্রোণের শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। এ কথাটা স্বধর্ম্মপালন বুঝিবার সময়ে স্মরণ করিতে হইবে। নিজ বধার্থ উৎপন্ন শত্রুকে দ্রোণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আচার্য্যের ধর্ম্ম বিদ্যাদান।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাচ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥ ৬॥

ইহার মধ্যে শূর, বাণক্ষেপে মহান্, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন তুল্য, যুযুধান, (১) বিরাট, (২) মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, (৩) চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, (৪) নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য; বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্

উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র, (৫) দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ইহারা সকলেই মহারথা। ৪, ৫, ৬।

(১) যুযুধান—যদুবংশীয় মহাবীর সাত্যকি (২) দ্রুপদ "বিরাট" সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু, প্রভৃতি সকলে অক্ষৌহিণীপতি।

(৩) ধৃষ্টকেতু মহাভারতে চেদি দেশের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অন্যবিধ বর্ণনাও আছে। (মহা, উদ্যোগ, ১৭১ অধ্যায়।

(৪) কুন্তিভোজ বংশের নাম। বৃদ্ধ কুন্তিভোজ বসুদেবের পিতা শূরের পিতৃস্বসৃ-পুত্র। পাণ্ডব-মাতা কুন্তী তাঁহার ভবনে প্রতিপালিতা হয়েন। পুরুজিৎ এ সম্বন্ধে পাণ্ডব মাতুল।

(৫) বিখ্যাত অভিমন্যু।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম !
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

হে দ্বিজোত্তম ! আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, তাঁহাদিগের অবগত হউন্। আপনার অবগতির জন্য সে সকল আপনাকে বলিতেছি ৭।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥ *

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, (৬) অশ্বত্থামা, (৭) বিকর্ণ, সোমদত্ত পুত্র (৮) ও জয়দ্রথ (৯) ৮।

(৬) ইনিও ব্রাহ্মণ এবং অস্ত্রবিদ্যায় কৌরবদিগের আচার্য্য।

(৭) দ্রোণিপুত্র।

(৮) ইনিই বিখ্যাত ভুরিশ্রবা।

(৯) দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

---

* সৌমদত্তিস্তথৈবচ ইতি পাঠান্তর আছে।

আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন (অর্থাৎ জীবন ত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন)। তাঁহারা সকলে নানাস্ত্রধারী এবং যুদ্ধ বিশারদ ॥ ৯॥

গীতার প্রথমাধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু নাই। কিন্তু প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে বড় উৎকৃষ্ট। উপরে উভয় পক্ষের বহু গুণবান্ সেনানায়ক-দিগের নাম যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইল, ইহা কবির একটা কৌশল। পশ্চাতে অর্জ্জুনের যে করুণাময়ী মনোমোহিনী উক্তি লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এখন হইতে উদ্যোগ হইতেছে।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০॥

ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদিগের সেই সৈন্য অসমর্থ। আর ইহাদিগের ভীমাভিরক্ষিত সৈন্য সমর্থ। ১০।

পর্য্যাপ্ত এবং অপর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ শ্রীধর স্বামির টীকানুসারে করা গেল। অন্যে অর্থ করিয়াছেন—পরিমিত এবং অপরিমিত।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্বএব হি॥ ১১॥

আপনারা সকলে স্ব-স্ব বিভাগানুসারে সকল ব্যূহদ্বারে অবস্থিতি করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন। ১১।

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতি।

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনাদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২॥

(তখন) প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) দুর্য্যোধনের হর্ষ জন্মাইয়া উচ্চ সিংহনাদ করতঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১২।

পূর্ব্বকালে রথীগণ যুদ্ধের পূর্ব্বে শঙ্খ-ধ্বনি করিতেন। ভীষ্ম দুর্য্যোধনের পিতামহের ভাই।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোহভবৎ ॥ ১৩॥

তখন, শঙ্খ, ভেরী, পনব, আনক, গোমুখ সকল (বাদ্যযন্ত্র) সহসা আহত হইলে সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল। ১৩।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

তখন, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত কৃষ্ণার্জ্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্ম্মা ভীম পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ, এবং সহদেব মণিপুষ্পক (নামে) শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫।১৬।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

পরম ধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র,—হে পৃথিবীপতে—ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন। ১৭ ১৮।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥*

সেই শব্দ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ও আকাশ এবং পৃথিবীকে তুমুল ধ্বনিত করিল ১৯।

---

* তুমুলোব্যনুনাদয়ন্ ইতি পাঠান্তর আছে।

সীতারাম।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভূষণা দখল হইল। যুদ্ধে সীতারামের জয় হইল। তোরাব খাঁ মেনাহাতির হাতে মারা পড়িলেন। সে সকল ঐতিহাসিক কথা। কাজেই আমাদের কাছে ছোট কথা। আমরা তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় কালক্ষেপ করিতে পারি না। উপন্যাস লেখক অন্তর্ব্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন— ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা নিষ্প্রয়োজনীয়।

ভূষণা অধিকৃত হইল। বাদশাহী সনদের বলে এবং নিজ বাহুবলে সীতারাম বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া মহারাজা উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড প্রতাপে শাসন আরম্ভ করিলেন।

শাসন সম্বন্ধে আগেই গঙ্গারামের দণ্ডের কথাটা উঠিল। তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব ছিল না। পতিপ্রাণা অপরাধিনী রমাই সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে সীতারামের নিকট প্রকাশ করিল। বাকি যে টুকু সে টুকু মুরলা ও চাঁদশাহ ফকির সকলই প্রকাশ করিল। কেবল গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করা বাকি—এমন সময়ে এ কথা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল।

কথা গুলা রমা, অন্তঃপুরে বসিয়া, সীতারামের কাছে, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল। সীতারাম তাহার একবর্ণ অবিশ্বাস করিলেন না। বুঝিলেন সরলা রমা নিরপরাধিনী, অপরাধের মধ্যে কেবল পুত্রস্নেহ। কিন্তু সাধারণ পুরবাসী লোক তাহা ভাবিল না। গঙ্গারাম কয়েদ হইল কেন? এই কথাটা লইয়া সহরে বড় আন্দোলন পড়িয়া গেল। কতক মুরলার দোষে, কতক সেই পাহারাওয়ালা পাঁড়ে ঠাকুরের গল্পের জাঁকে,

রমার নামটা সেই সঙ্গে লোকে মিলাইতে লাগিল। কেহ বলিল যে গঙ্গারাম মোগলকে রাজ্য বেচিতে বসিয়াছিল, কেহ বলিল যে সে ছোট রাণীর মহলে গিরেপ্তার হইয়াছিল, কেহ বলিল দুই কথাই সত্য, আর রাজ্য বেচার পরামর্শে ছোট রাণীও ছিলেন। রাজার কাণে এত কথা উঠে না, কিন্তু রাণীর কানে উঠে—মেয়ে মহলে এ রকম কথা গুলা সহজে প্রচার পায়—শাখা প্রশাখা সমেত। দুই রাণীর কানেই কথা উঠিল। রমা শুনিয়া শয্যা লইল, কাঁদিয়া বালিশ ভাসাইল, শেষ গলায় দড়ি দিয়া কি জলে ডুবিয়া মরা ঠিক করিল। নন্দা শুনিয়া বুদ্ধিমতীর মত কাজ করিল।

নন্দা খুঁজিয়া খুঁজিয়া রমা যেখানে বালিশে মুখ ঝাঁপিয়া কাঁদিতেছে, আর পুকুরে ডুবিয়া মরা সোজা কি গলায় দড়ি দিয়া মরা সোজা, ইহার যতদূর সাধ্য মিমাংসা করিতেছে, সেইখানে গিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল,

"দেখিতেছি, তুমিও এ ছাই কথা শুনিয়াছ?" রমা কেবল ঘাড় নাড়িল—অর্থাৎ "শুনিয়াছি।" চক্ষের জল বড় বেশী ছুটিল।

নন্দা তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া, সস্নেহ বচনে বলিল, "কাঁদিলে কলঙ্ক যাবে না, দিদি! না কাঁদিয়া, যাতে এ কলঙ্ক মুছিয়া তুলিতে পারি, তাই করিতে হইবে। পারিস ত উঠিয়া বসিয়া ধীরে সুস্থে আমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বল্ দেখি। এখন আমাকে সতীন্ ভাবিস না—কালি চুন তোর গালে পড়ুক না পড়ুক, রাজারই বড় মাথা হেঁট হয়েছে। তিনি তোর ও প্রভু—আমারও প্রভু; এ লজ্জা আমার চেয়ে তোর যে বেশী তা মনে করিস্ না। আর মহারাজা আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁর কানে এ কথা উঠিলে আমি কি জবাব দিব?"

রমা বলিল, "যাহা যাহা হইয়াছিল, আমি তাঁহাকে বলিয়াছি। তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। আমার ত কোন দোষ নাই।"

নন্দা। তা বলিতে হইবে না—তোর যে কোন্ দোষ নাই, সে কথা আমায় বলিয়া কেন দুঃখ পাস্। তবে কি হইয়াছিল, তা আমাকে বলিস না বলিস—

রমা। বলিব না কেন? আমি একথা সকলকেই বলিতে পারি।

এই বলিয়া রমা চক্ষের জল সামলাইয়া উঠিয়া বসিয়া, সকল কথা যথার্থ রূপে নন্দাকে বলিল। নন্দার সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। নন্দা বলিল,

"যদি ঘুণাক্ষরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ কাজ করিতে দিদি, তবে কি এত কাণ্ড হইতে পায়? তা যাক্—যা হয়ে গিয়েছে, তার জন্য তিরস্কার করিয়া এখন আর কি হইবে? এখন যাহাতে আবার মান সম্ভ্রম বজায় হয়, তাই করিতে হইবে।"

রমা। যদি তা না কর দিদি, তবে তোমায় নিশ্চিত বলিতেছি, আমি জলে ডুবিয়া মরিব কি গলায় দড়ি দিয়া মরিব। আমি ত রাজার মহিষী—এমন কাঙ্গাল গরিব ভিখারীর মেয়ে কে আছে যে এ অপবাদ হইলে আর প্রাণ রাখিতে চায়?

নন্দা। মরিতে হইবে না, দিদি! কিন্তু একটা খুব সাহসের কাজ করিতে পারিস্? বোধ হয়, তা হলে কাহারও মনে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

রমা। এমন কাজ নাই যে এর জন্য আমি করিতে পারি না। কি করিতে হইবে?

নন্দা। তুমি যে রকম করিয়া আমার কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলে, এই রকম করিয়া তুমি যার সাক্ষাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিবে সেই তোমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে, ইহা আমার নিশ্চিত বিবেচনা হয়। যদি রাজধানীর লোক সকলে তোমার মুখে এ কথা শুনে, তবে আর এ কলঙ্ক থাকে না।

রমা। তা, কি প্রকারে হইবে?

নন্দা। আমি মহারাজকে বলিয়া দরবার করাইব। তিনি ঘোষণা দিয়া সমস্ত নগরবাসীকে সেই দরবারে উপস্থিত করিবেন; সেখানে গঙ্গারামের সাক্ষাৎকারে, সমস্ত নগরবাসীর সাক্ষাৎকারে, তুমি এই কথা গুলি বলিবে। আমরা রাজমহিষী, সূর্য্যও আমাদিগকে দেখিতে পান না। এই সমস্ত নগরবাসীর সম্মুখে বাহির হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তুমি এই সকল কথা কি বলিতে পারিবে? পার ত সব কলঙ্ক হইতে আমরা মুক্ত হই।

রমা তখন সিংহীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি সমস্ত নগরবাসী কি বলিতেছ দিদি! সমস্ত জগতের লোক জমা কর, আমি জগতের লোকের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলিব।"

নন্দা। পারিবি?

রমা। পারিব—নহিলে মরিব।

নন্দা। আচ্ছা, তবে আমি গিয়া মহারাজকে বলিয়া দরবারের বন্দোবস্ত করাই। তুই আর কাঁদিস না।

নন্দা উঠিয়া গেল। রমাও শয্যা ত্যাগ করিয়া, চোখের জল মুছিয়া, পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিল। এতক্ষণ তাহাও করে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নন্দা রাজাকে সম্বাদ দিয়া অন্তঃপুরে আনাইল। যে কুরব উঠিয়াছে, সকলেই যাহা বলিতেছে, তাহা রাজাকে শুনাইল। তার পর রমার সঙ্গে নন্দার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সকলই অবিকল তাঁহাকে বলিল। তার পর বলিল, "আমরা দুইজনে গলায় কাপড় দিয়া তোমার পায়ে লুটাইয়া (বলিবার সময়ে নন্দা গলায় কাপড় দিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাতে দুই পা চাপিয়া ধরিল) পায়ে লুটাইয়া বলিতেছি, যে এখন তুমি আমাদের মান রাখ, এ কলঙ্ক হইতে উদ্ধার কর, নহিলে আমরা দুইজনেই আত্মহত্যা করিয়া মরিব।"

সীতারাম বড় বিষণ্ণভাবে, কলঙ্কের জন্যেও বটে, নন্দার প্রস্তাবের জন্যও বটে, বলিলেন,

"রাজার মহিষী—আমি কি প্রকারে দরবারে বাহির করিব? কি প্রকারে আপনার মহিষীকে সামান্যা কুলটার ন্যায় বিচারালয়ে খাড়া করিয়া দিব?"

নন্দা। তুমি যেমন বুঝিবে, আমরা কিন্তু তেমন বুঝিবনা; কিন্তু সে বেশী লজ্জা, না রাজমহিষীর কুলটা অপবাদ বেশী লজ্জা?

সীতা। এরূপ মিথ্যা অপবাদ রাজার ঘরে, সীতা হইতে চলিয়া

আসিতেছে। প্রথমত কাজ করিতে হইলে, এত কাণ্ড না করিয়া, সীতার ন্যায় রমাকে আমার ত্যাগ করাই শ্রেয়। তাহা হইলে আর কোন কথা থাকে না।

নন্দা। মহারাজ! নিরপরাধিনীকে ত্যাগ করিবে, তবু তার বিচার করিবে না? এই কি তোমার রাজধর্ম্ম? রামচন্দ্র করিয়াছিলেন বলিয়া কি তুমিও করিবে? যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম, তাঁর আর ত্যাগই কি গ্রহণই বা কি? তোমার কি তা সাজে মহারাজ!

সীতা। এই সমস্ত প্রজা, শত্রু মিত্র, ইতর ভদ্র লোকের সাক্ষাতে আপনার মহিষীকে কুলটার ন্যায় খাড়া করিয়া দিতে আমার বুক কি ভাঙ্গিয়া যাইবে না? আমি ত পাষাণ নহি?

নন্দা। মহারাজ—যখন পঞ্চাশ হাজার লোকের সামনে, শ্রী, গাছের ডালে চড়িয়া নাচিয়াছিল, তখন কি তোমার বুক দশ হাত হইয়াছিল?

সীতারাম নন্দার প্রতি ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "তা হয়েছিল, নন্দা! আবার তেমন হইল না, সেই দুঃখই আমার বেশী।"

ইট্‌টী মারিয়া, পাটখেল খাইয়া, নন্দা যোড় হাতে ক্ষমা প্রর্থনা করিল। যোড় হাত করিয়া, নন্দা জিতিয়া গেল। সীতারাম শেষ দরবারে সম্মত হইলেন। বুঝিলেন, ইহা না করিলে রমাকে ত্যাগ করিতে হয়। অথচ রমা নিরপরাধিনী। কাজেই দরবার ভিন্ন আর কর্ত্তব্য নাই।

বিষণ্ণভাবে রাজা, চন্দ্রচূড়ের নিকটে আসিয়া দরবারের কর্ত্তব্যতা নিবেদিত হইলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের আব্রু পরদার উপর ততটা শ্রদ্ধা হইল না। তিনি সাধুবাদ করিয়া সম্মত হইলেন। তাঁর কেবল ভয়, রমা কথা কহিতে পারিবে না। সীতারামেরও সে ভয় ছিল। সে যদি না পারে, তবে সকল দিক যাইবে। তাই দরবারে আরও অনিচ্ছুক ছিলেন। তবে রাজা রাজপুরুষেরা সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলেন না—এই জন্য তিনি নন্দাকে কেবল আব্রু পরদার কথা বলিয়া ভুলাইতেছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তখন সীতারাম ঘোষণা করিলেন, যে আমদরবারে গঙ্গারামের বিচার হইবে। রাজার আজ্ঞানুসারে সমস্ত নগরবাসী উপস্থিত হইয়া বিচার দর্শন করিবে। আজ্ঞা পাইয়া অবধারিত দিবসে, সহস্র সহস্র প্রজাবৃন্দ আসিয়া দরবার পরিপূর্ণ করিল। দিল্লীর অনুকরণে সীতারাম ও এক "দরবারে আম" প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আজিকার দিন তাহা রাজ কর্ম্মচারিদিগের যত্নে সুসজ্জিত হইয়াছিল। দিল্লীর মত তাঁহার রূপার চাদনি, মতির ঝালর ছিল না, কিন্তু তথাপি চন্দ্রাতপ পট্টবস্ত্র নির্ম্মিত, তাহাতে জরির কাজ। স্তম্ভ সকল সেই রূপ কারুকার্য্যখচিত, পট্টবস্ত্রে আবৃত। নানাচিত্রবর্ণরঞ্জিত কোমল গালিচায় সভামণ্ডপ শোভিত, তাহার চারি পার্শ্বে বিচিত্রপরিচ্ছদধারী সৈনিকগণ সশস্ত্রে শ্রেনীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। বাহিরে অশ্বরূঢ় রক্ষিবর্গ শান্তি রক্ষা করিতেছে। সভা মণ্ডপমধ্যে উচ্চ বেদীর উপর সীতারামের জন্য স্বর্ণখচিত, রৌপ্যনির্ম্মিত, মুক্তাঝালরশোভিত সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে দুর্গ লোকারণ্য হইয়া উঠিল। সভা মণ্ডপ মধ্যে কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই স্থান পাইল। নিম্ন শ্রেণীর লোকে সহস্রে সহস্রে সভা মণ্ডপ পরিবেষ্টিত করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

বাতায়ন হইতে এই মহাসমারোহ দেখিতে পাইয়া, মহারাজ্ঞী নন্দা দেবী, রমাকে ডাকিয়া আনিয়া এই ব্যাপার দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেমন, এই সমারোহের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে? সাহস হইতেছে ত?"

রমা। যদি আমার স্বামীপদে ভক্তি থাকে তবে নিশ্চয় পারিব।

নন্দা। আমরা কেহ সঙ্গে যাইব? বল ত আমি যাই?

রমা। তুমি ও কেন আমার সঙ্গে এ অসম্ভ্রমের সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে? কাহাকে যাইতে হইবে না। কেবল একটা কাজ করিও। যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে, তখন যেন আমার ছেলেকে কেহ লইয়া গিয়া আমার নিকট দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে আমার সাহস হইবে।

নন্দা স্বীকৃত হইয়া বলিল, "এখন সভামধ্যে যাইতে হইবে, একটু কাপড় চোপড় দুরস্ত করিয়া নাও। এই বেলা প্রস্তুত হও।"

রমা স্বীকৃত হইয়া আপানার মহলে গেল। সেখানে ঘর রুদ্ধ করিয়া মাটিতে পড়িয়া, যুক্ত করে ডাকিতে লাগিল, "জয় লক্ষ্মীনারায়ণ! জয় জগদীশ্বর! আজিকার দিনে আমার যাহা বলিবার তাহা বলিয়া, আমি যদি তার পর জন্মের মত বোবা হই, তাহা ও আমি তোমার কাছে ভিক্ষা করি। আজিকার দিন সভা মধ্যে আপনার কথা বলিয়া, আর কখন ইহ জন্মে কথা না কই, তাও তোমার কছে ভিক্ষা করি। আজিকার দিন মুখ রাখিও! তার পর মরণে আমার কোন দুঃখ থাকিবে না।"

তার পর বেশ পরিবর্ত্তনের কথাটা মনে পড়িল। রমা, ধাত্রীদিগের একখানা সামান্য বস্ত্র চাহিয়া লইয়া তাই পরিয়া সভামণ্ডপে যাইতে প্রস্তুত হইল। নন্দা দেখিয়া বলিল "এ কি এ?"

রমা বলিল, "আজ আমার সাজিবার দিন নয়। বিধাতা যদি আবার কখন সাজিবার দিন দেন, তবে আবার সাজিব। নহিলে এই সাজাই শেষ। এই বেশেই সভায় যাইব।"

নন্দা বুঝিল, ইহা উপযুক্ত। আর কোন আপত্তি করিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যথাকালে, মহারাজা সীতারাম রায় সভাস্থলে সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। নকিব স্তুতিবাদ করিল, কিন্তু গীত বাদ্য সে দিন নিষেধ ছিল।

তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ গঙ্গারাম, সম্মুখে আনীত হইল। তাহাকে দেখিবার জন্য বাহিরে দণ্ডায়মান জনসমূহ বিচলিত ও উন্মুখ হইয়া উঠিল। শান্তিরক্ষকেরা তাহাদিগকে শান্ত করিল।

রাজা তখন গঙ্গারামকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "গঙ্গারাম! তুমি আমার কুটুম্ব, আত্মীয়, প্রজা এবং বেতনভোগী। আমি তোমাকে বিশেষ

স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতাম, তুমি বড় বিশ্বাসের পাত্র ছিলে, ইহা সকলেই জানে। একবার আমি তোমার প্রাণও রক্ষা করিয়াছি। তার পর, তুমি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিলে কেন? তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

গঙ্গারাম বিনীতভাবে বলিল, "কোন শত্রুতে আপনার কাছে আমার মিথ্যাপবাদ দিয়াছে। আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করি নাই। মহারাজ স্বয়ং আমার বিচার করিতেছেন—ভরসা করি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত প্রমাণ না পাইলে আমার কোন দণ্ড করিবেন না।"

রাজা। তাহাই হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা শুন, আর যথাসাধ্য উত্তর দাও।

এই বলিয়া রাজা চন্দ্রচূড়কে অনুমতি করিলেন, যে "আপনি যাহা জানেন, তাহা ব্যক্ত করুন।"

তখন চন্দ্রচূড় যাহা জানিতেন, তাহা সবিস্তারে সভামধ্যে বিবৃত করিলেন। তাহাতে সভাস্থ সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইল যে, যে দিন মুসলমান, দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য নদী পার হইতেছিল, সে দিন চন্দ্রচূড়ের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও গঙ্গারাম দুর্গ রক্ষার কোন চেষ্টা করেন নাই। চন্দ্রচূড়ের কথা সমাপ্ত হইলে, রাজা গঙ্গারামকে আজ্ঞা করিলেন,

"নরাধম! ইহার কি উত্তর দাও?"

গঙ্গারাম, যুক্ত করে বলিল, "ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ইনি যুদ্ধের কি জানেন? মুসলমান এপারে আসেও নাই, দুর্গ আক্রমণও করে নাই। যদি তাহা করিত, আর আমি তাহাদের না হঠাইতাম, তবে ঠাকুর মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য হইত। মহারাজ! দুর্গ মধ্যে আমিও বাস করি; দুর্গের বিনাশে আমার কি লাভ?"

রাজা। কি লাভ, তাহা আর এক জনের নিকট শুন।

এই বলিয়া রাজা চাঁদশাহ ফকিরকে আজ্ঞা করিলেন, "আপনি যাহা জানেন তাহা বলুন।"

চাঁদশাহ তখন দুর্গ আক্রমণের পূর্ব্ব রাত্রে তোরাবখাঁর নিকট গঙ্গারামের গমন বৃত্তান্ত যাহা জানিতেন, তাহা বলিলেন। রাজা তখন গঙ্গারামকে আজ্ঞা করিলেন,

"ইহার কি উত্তর দাও?"

গঙ্গারাম বলিল, "আমি সে রাত্রে তোরাবখাঁর নিকট গিয়াছিলাম বটে। বিশ্বাসঘাতক জানিয়া, কুপথে আনিয়া তাঁহাকে গড়ের নীচে আনিয়া টিপিয়া মারিব—আমার এই অভিপ্রায় ছিল।"

রাজা। সে জন্য তোরাবখাঁর কাছে কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করিয়াছিলে?

গঙ্গারাম। নহিলে তাহার বিশ্বাস জন্মিবে কেন?

রাজা। কি পুরস্কার চাহিয়াছিলে?

গঙ্গারাম। অর্দ্ধেক রাজ্য।

রাজা। আর কিছু?

গঙ্গা। আর কিছু না।

তখন রাজা চাঁদশাহ ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ কথা কিছু জানেন?"

চাঁদশাহ। জানি।

রাজা। কি প্রকারে জানিলেন?

চাঁদ। আমি মুসলমান ফকির, তোরাব খাঁর কাছে যাতায়াত করিতাম। তিনিও আমাকে বিশেষ আদর করিতেন। আমি কখন তাঁহার কথা মহারাজের কাছে বলিতাম না, অথবা মহারাজের কথা তাঁহার কাছে বলিতাম না। এজন্য কোন পক্ষ বলিয়া গণ্য নহি। এখন তিনি গত হইয়াছেন, এখন ভিন্ন কথা। যে দিন তিনি মহারাজের হাতে ফতে হইয়া মধুমতীর তীর হইতে প্রস্থান করেন, সেই দিন তাঁহার সঙ্গে পথিমধ্যে আমার দেখা হইয়াছিল। তখন গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। গঙ্গারাম তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে, এই বিবেচনায় তিনি আপনা হইতেই সে সকল কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। গঙ্গারাম অর্দ্ধেক রাজ্য পুরস্কারস্বরূপ চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু আরও কিছু চাহিয়াছিল। তবে সে কথা হুজুরে নিবেদন করিতে বড় ভয় পাই—অভয় ভিন্ন বলিতে পারি না।

রাজা। নির্ভয়ে বলুন।

চাঁদ। দ্বিতীয় পুরস্কার মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী।

দর্শকমণ্ডলী সমুদ্রবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল—গঙ্গারামকে নানাবিধ গালি পাড়িতে লাগিল। শান্তিরক্ষকেরা শান্তি রক্ষা করিল। গঙ্গারাম বলিল,

"মহারাজ! এ অতি অসম্ভব কথা। আমার নিজের পরিবার আছে—মহারাজের অবিদিত নাই। আর আমি নগররক্ষক—স্ত্রীলোকে আমার রুচি থাকিলে, আমার দুষ্প্রাপ্য বড় অল্প। আমি মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী কখন দেখি নাই—কিজন্য তাঁহাকে কামনা করিব?

রাজা। তবে, তুমি কুকুরের মত রাত্রে লুকাইয়া আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে কেন?

গঙ্গারাম। কখন না।

তখন সেই পাঁড়েঠাকুর পাহারাওয়ালাকে তলব হইল। পাঁড়েঠাকুর, দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন, যে গঙ্গারাম প্রত্যহ গভীর রাত্রে মুরলার সঙ্গে, তাহার ভাই পরিচয়ে, অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত।

শুনিয়া গঙ্গারাম বলিল, "মহারাজ ইহা সম্ভব নহে। মুরলার ভাইকেই বা ঐ ব্যক্তি পথ ছাড়িয়া দিবে কেন?"

তখন পাঁড়েঠাকুর উত্তর করিলেন, যে তিনি গঙ্গারামকে বিলক্ষণ চিনিতেন তবে কোতোয়ালকে তিনি রোখেন কি প্রকারে? এজন্য চিনিয়াও চিনিতেন না।

গঙ্গারাম দেখিল, ক্রমে গতিক মন্দ হইয়া আসিল। এক ভরসা মনে এই উদয় হইল, যে মুরলা নিজে কখনও এ সকল কথা প্রকাশ করিবে না—কেন না তাহা হইলে সেও দণ্ডনীয়—তার কি আপনার প্রাণের ভয় নাই? তখন গঙ্গারাম বলিল,

"মুরলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হউক—কথা সকলই মিথ্যা প্রকাশ পাইবে।"

বেচারা জানিত না যে মুরলাকে, মহারাজ্ঞী শ্রীমতী নন্দা ঠাকুরাণী পূর্ব্বেই হাত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নন্দা, মুরলাকে বুঝাইয়াছিল, যে "মহারাজা স্ত্রীহত্যা করেন না—তোর মরিবার ভয় নাই। স্ত্রীলোককে শারীরিক কোন রকম সাজা দেন না। অতএব বড় সাজার তোর ভয় নাই। কিছু সাজা তোর হইবেই হইবে। তবে, তুই যদি সত্য কথা বলিস্—তোর সাজা বড়

কম হবে।” মুরলাও তাহা বুঝিয়াছিল, সুতরাং সব কথা ঠিক বলিল—কিছুই ছাড়িল না—আড়াইটা বিবাহের ব্যঙ্গটাও ছাড়িল না। শুনিয়া বাহিরের দর্শকমণ্ডলী মধ্যে অস্ফুট স্বরে কেহ কেহ বলিল, “আমি, আমি রাজি।” কেহ বা বলিল, “মাসী, আমার খুড়ো রাজি।”

মুরলার কথা গঙ্গারামের মাথায় বজ্রাঘাতের মত পড়িল। তথাপি সে আশা ছাড়িল না। বলিল, “মহারাজ! এ স্ত্রীলোক অতি কুচরিত্রা। আমি নগর মধ্যে ইহাকে অনেকবার ধরিয়াছি, এবং কিছু শাসনও করিতে হইয়াছিল। বোধ হয় সেই রাগে এসকল কথা বলিতেছে।”

রাজা। তবে কার কথায় বিশ্বাস করিব, গঙ্গারাম? খোদ মহারাণীর কথা বিশ্বাসযোগ্য কি?

গঙ্গারাম যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস, যে রমা কখন এ সভামধ্যে আসিবে না, বা এ সভায় এ সকল কথা বলিতে পারিবে না। গঙ্গারাম বলিল,

“অবশ্য বিশ্বাস যোগ্য। তাঁর কথায় যদি আমি দোষী হই, আমাকে সমুচিত দণ্ড দিবেন।”

রাজা অন্তঃপুর অভিমুখে দৃষ্টি করিলেন। তখন গঙ্গারাম সবিস্ময়ে দেখিল, অতি ধীরে ধীরে, সশঙ্কিত শিশুর মত, এক মলিনবেশধারিনী অবগুণ্ঠনবতী রমণী সভামধ্যে আসিতেছে। যে রূপ, গঙ্গারামের হাড়ে হাড়ে আঁকা, তাহা দেখিয়াই চিনিল। গঙ্গারাম বড় শঙ্কিত হইল। দর্শকমণ্ডলী মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। শান্তি রক্ষকেরা তাহাদের থামাইল।

রমা আসিয়া আগে রাজাকে, পরে গুরু চন্দ্রচূড়কে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দাঁড়াইল—মলিনবেশেও রূপ রাশি উছলিয়া পড়িতে লাগিল। চন্দ্রচূড় দেখিল, রাজা কথা কহিতে পারিতেছেন না—অধোবদনে আছেন। তখন চন্দ্রচূড় রমাকে বলিলেন,

“মহারাণি! এই গঙ্গারামের বিচার হইতেছে। এ ব্যক্তি কখন আপনার অন্তঃপুরে গিয়াছিল কি না, গিয়া থাকে তবে কেন গিয়াছিল, আপনার

সঙ্গে কি কি কথা হইয়াছিল, সব স্বরূপ বলুন। রাজার আজ্ঞা, "আর আমি তোমার গুরু. আমারও আজ্ঞা, সকল কথা সত্য বলিবে।"

রমা গ্রীবা উন্নত করিয়া গুরুকে বলিল, "রাজার রাণীতে কখন মিথ্যা বলে না। আমরা যদি মিথ্যাবাদিনী হইতাম, তবে এই সিংহাসন এত দিন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইত।"

দর্শকমণ্ডলী বাহির হইতে জয়ধ্বনি দিল—"জয় মহারাণীজিকী!"

রমা সাহস পাইয়া বলিতে লাগিল, "বলিব কি গুরুদেব! আমি রাজার মহিষী—রাজার ভৃত্য আমার ভৃত্য—আমি যে আজ্ঞা করিব—রাজার ভৃত্য তা কেন পালন করিবে না? আমি রাজকার্য্যের জন্য কোতোয়ালকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম—কোতোয়াল আসিয়া আজ্ঞা শুনিয়া গিয়াছিল—তার আর বিচারই বা কেন, আমি বলিবই বা কি?"

কথা শুনিয়া দর্শকমণ্ডলী এবার আর জয়ধ্বনি করিল না—অনেকে বিষণ্ণ হইল—অনেকে বলিল—"কবুল।" চন্দ্রচূড় বলিলেন,

"এমন কি রাজকার্য্য মা! যে রাত্রে কোতোয়ালকে ডাকিতে হয়?"

রমা তখন বলিল, "তবে সকল কথা শুনুন।" এই বলিয়া রমা, দেখিল, পুত্র কোথা? পুত্র সুসজ্জিত হইয়া ধাত্রীক্রোড়ে। মুখ দেখিয়া সাহস পাইল। তখন রমা সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল।

প্রথমে অতি ধীরে ধীরে, অতি দূরাগত সঙ্গীতের মত, রমা বলিতে লাগিল—সকলে শুনিতে পাইল না। বাহিরের দর্শকমণ্ডলী বলিতে লাগিল, "মা! আমরা শুনিতে পাইতেছি না—আমরা শুনিব।" রমা আরও একটু স্পষ্ট বলিতে লাগিল। ক্রমে আরও স্পষ্ট—আরও স্পষ্ট। তার পর যখন রমা, পুত্রের বিপদ শঙ্কায় এই সাহসের কাজ করিয়াছিল, এই কথা বুঝাইতে লাগিল—যখন একবার একবার সেই চাঁদমুখ দেখিতে লাগিল, আর অশ্রু পরিপ্লুত হইয়া, মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছ্বাস, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিতে লাগিল—তখন পরিষ্কার, স্বর্গীয়, অপ্সরানিন্দিত তিনগ্রাম সংমিলিত মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের মত শ্রোতৃদিগের কর্ণে সেই মুগ্ধকর বাক্য বাজিতে লাগিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। তার পর সহসা রমা, ধাত্রীক্রোড় হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইয়া, সীতারামের পদতলে

তাহাকে ফেলিয়া দিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! আপনার আরও সন্তান আছে—আমার আর নাই। মহারাজ আপনার রাজ্য আছে—আমার রাজ্য এই শিশু। মহারাজ! তোমার ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, যশ আছে, স্বর্গ আছে—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমার ধর্ম্ম এই, কর্ম্ম এই, যশ এই, স্বর্গ এই—মহারাজ! অপরাধিনী হইয়া থাকি, তবে দণ্ড করুন—" শুনিয়া দর্শকমণ্ডলী অশ্রুপূর্ণ হইয়া পুনঃ পুনঃ জয় ধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু লোক ভাল মন্দ দুই রকমই আছে—অনেকেই জয়ধ্বনি করিতে লাগিল—কিন্তু আবার অনেকেই তাহাতে যোগ দিল না। জয়ধ্বনি ফুরাইলে তাহারা কেহ অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল—"আমার ত এ কথায় বিশ্বাস হয় না।" কোন বর্ষীয়সী বলিল, "পোড়া কপাল! রাত্রে মানুষ ডাকিয়া নিয়া গিয়াছেন—উনি আবার সতী!" কেহ বলিল, "রাজা এ কথায় ভুলেন ভুলুন—আমরা এ কথায় ভুলিব না।" কেহ বলিল, "রাণী হইয়া যদি উনি এই কাজ করিবেন, তবে আমরা গরিব দুঃখী কি না করিব?"

এ সকল কথা সীতারামের কাণে গেল। তখন রাজা, রমাকে বলিলেন, "প্রজাবর্গ সকলে ত তোমার কথা বিশ্বাস করিতেছে না।"

রমা কিছুক্ষণ মুখ অবনত করিয়া রহিল। চক্ষে প্রবল বারিধারা বহিল—তার পর রমা সামলাইল। তখন মুখ তুলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—

"যখন লোকের বিশ্বাস হইল না, তখন আমার এক মাত্র গতি। আপনার রাজপুরীর কলঙ্ক স্বরূপ এ জীবন আর রাখিতে পারিব না। আপনি চিতা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিন—আমি সকলের সম্মুখেই পুড়িয়া মরি। দুঃখ তাহাতে কিছু নাই! লোকে আমাকে কলঙ্কিনী বলিল—মরিলেই সে দুঃখ গেল। কিন্তু এক নিবেদন মহারাজ! আপনিও কি আমাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিতেছেন? তাহা হইলে বুঝি—(আবার রমার চক্ষে জলের ধারা ছুটিল,)—বুঝি আমার পুড়িয়া মরাও বৃথা হইবে। তুমি যদি এই লোক সমারোহের সম্মুখে বল, যে আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস নাই—তাহা হইলে আমি সেই চিতাই স্বর্গ মনে করিব। মহারাজ! পরলোকের উদ্ধার কর্ত্তা, ভূদেব তুল্য, আমার গুরুদেব এই

সম্মুখে, আমি তাঁহার সম্মুখে, ইষ্টদেবকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি আমি অবিশ্বাসিনী নহি। যিনি গুরুর অপেক্ষাও আমার পূজ্য, যিনি মনুষ্য হইয়াও দেবতার অপেক্ষা আমার পূজ্য, সেই পতি দেবতা, আপনি স্বয়ং আমার সম্মুখে—আমি পতিদেবতাকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। মহারাজ! এই নারীদেহ ধারণ করিয়া যে কিছু দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা, দান ব্রত নিয়ম করিয়াছি, যদি আমি বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া থাকি, তবে সে সকলেরই ফলে যেন বঞ্চিত হই। পতিসেবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর পুণ্য নাই, কায়মনোবাক্যে আমি যে আপনার চরণসেবা করিয়াছি, তাহা আপনিই জানেন,—আমি যদি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে আমি যেন সে পুণ্যফলে বঞ্চিত হই। আমি ইহজীবনে যে কিছু আশা, যে কিছু ভরসা, যে কিছু কামনা, যে কিছু মানস করিয়াছি,—আমি যদি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, সকলই যেন নিষ্ফল হয়। মহারাজ! নারীজন্মে স্বামী সন্দর্শনের তুল্য পুণ্যও নাই, সুখও নাই—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, যেন ইহজন্মে আমি সে সুখে চিরবঞ্চিত হই। যে পুত্রের জন্য আমি এই কলঙ্ক রটাইয়াছি—যাহার তুলনায় জগতে আমার আর কিছুই নাই—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হই, আমি যেন সেই পুত্রমুখ দর্শনে চিরবঞ্চিত হই। মহারাজ! আর কি বলিব—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে জন্মে জন্মে যেন নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া, জন্মে জন্মে স্বামী পুত্রের মুখ দর্শনে চিরবঞ্চিত হই।”—

রমা আর বলিতে পারিল না—ছিন্ন লতার মত সভাতলে পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিতা হইল—ধাত্রীগণে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে বহিয়া লইয়া গেল। ধাত্রী-ক্রোড়স্থ শিশু রমার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল। সভাতলস্থ সকলে অশ্রুমোচন করিল। গঙ্গারামের করচরণস্থিত শৃঙ্খলে ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল। দর্শকমণ্ডলী বাত্যাপীড়িত সমুদ্রের ন্যায় চঞ্চল হইয়া মহান্ কোলাহল সমুত্থিত করিল—রক্ষিবর্গ কিছুই নিবারণ করিতে পারিল না।

তখন “গঙ্গারাম কি বলে?” “গঙ্গারাম কি এ কথা মিছা বলে!” “গঙ্গারাম যদি মিছা বলে, তবে আইস আমরা সকলে মিলিয়া গঙ্গারামকে

[illegible]

মারিয়া ফেলি।" এইরূপ রব চারিদিক হইতে উঠিতে লাগিল। গঙ্গারাম দেখিল, এই সময়ে লোকের মন ফিরাইতে না পারিলে, তাহার আর রক্ষা নাই। গঙ্গারাম বুদ্ধিমান্, বুঝিয়াছিল, যে প্রজাবর্গ যেমন নিষ্পত্তি করিবে, রাজাও সেই সেই মত করিবেন। তখন সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া লোকের মনভুলান কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

"মহারাজ! কথাটা এই যে স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন—না আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন? প্রভু! আপনার এই রাজ্য কি স্ত্রীলোকে সংস্থাপিত করিয়াছে—না আমার ন্যায় রাজভৃত্যদিগের বাহুবলে স্থাপিত হইয়াছে? মহারাজ! সকল স্ত্রীলোকেই বিপথগামিনী হইতে পারে, রাজরাণীরাও বিপথগামিনী হইয়া থাকেন; রাজরাণী বিপথগামিনী হইলে রাজার কর্ত্তব্য যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। বিশ্বাসী ভৃত্য কখন বিপথগামী হয় না; তবে স্ত্রীলোকেরা আপনার দোষ ক্ষালন জন্য ভৃত্যের ঘাড়ে চাপ দিতে পারে। এই মহারাণী রাত্রে কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে দোষী করিতেছেন তাহার স্থিরতা—"মহারাজ রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

কথা কহিতে কহিতে গঙ্গারাম কথা সমাপ্ত না করিয়া,—অতিশয় ভীত হইয়া, "মহারাজ রক্ষা কর! রক্ষা কর!" এই শব্দ করিয়া স্তম্ভিত ও বিহ্বলের মত হইয়া নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকলে দেখিল গঙ্গারাম থর থর কাঁপিতেছে। তখন সমস্ত জনমণ্ডলী সবিস্ময়ে, সভয়ে চাহিয়া দেখিল—অপূর্ব্বমূর্ত্তি! জটাজুটবিলম্বিনী গৈরিকধারিণী, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ সিংহবাহিনী দুর্গা তুল্য, ত্রিশূল হস্তে, গঙ্গারামকে ত্রিশূলাগ্রভাগে লক্ষ্য করিয়া, প্রখরগমনে তাহার অভিমুখে সভামণ্ডপ পার হইয়া আসিতেছে। দেখিবা মাত্র সেই সাগরবৎ সংক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী একেবারে নিস্তব্ধ হইল। গঙ্গারাম এক দিন রাত্রে সে মূর্ত্তি দেখিয়াছিল—আবার এই বিপৎকালে যখন মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারায় নিরপরাধিনী রমার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত, সেই সময়ে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া, চণ্ডী তাহাকে বধ করিতে আসিতেছেন, বিবেচনা করিয়া "ভয়ে কাতর হইয়া রক্ষা কর! রক্ষা কর!" শব্দ করিয়া উঠিল। এ দিকে রাজা; ও দিকে চন্দ্রচূড় সেই

রাত্রিদৃষ্ট দেবীতুল্য মূর্ত্তি দেখিয়া চিনিলেন, এবং নগরের রাজলক্ষ্মী মনে করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন সভাস্থ সকলেই গাত্রোত্থান করিল।

জয়ন্তী কোনদিকে দৃষ্টি না করিয়া, খরপদে গঙ্গারামের নিকট আসিয়া, গঙ্গারামের বক্ষে ত্রিশূলাগ্রভাগ স্থাপন করিল। কথার মধ্যে কেবল বলিল, "এখন বল।"

গঙ্গারাম মনে করিল, আর একটি মিথ্যা কথা বলিলেই এই ত্রিশূল আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে। গঙ্গারাম তখন সভয়ে, বিনীতভাবে, সত্য বৃত্তান্ত সভাসমক্ষে বলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ না তাহার কথা সমাপ্ত হইল, ততক্ষণ জয়ন্তী তাহার হৃদয় ত্রিশূলাগ্রভাগের দ্বারা স্পর্শ করিয়া রহিল। গঙ্গারাম তখন রমার নির্দ্দোষিতা, আপনার মোহ, লোভ, ফৌজদারের সহিত সাক্ষাত, কথোপকথন, এবং বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা সমুদায় সবিস্তারে কহিল।

জয়ন্তী তখন ত্রিশূল লইয়া খরপদে চলিয়া গেল। গমনকালে সভাস্থ সকলেই নতশিরে সেই দেবীতুল্য মূর্ত্তিকে প্রণাম করিল। সকলেই ব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে বা অনুসরণ করিতে সাহস পাইল না। সে কোন দিকে কোথায় চলিয়া গেল কেহ জানিল না।

জয়ন্তী চলিয়া গেলে রাজা গঙ্গারামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখন তুমি আপন মুখে সকল অপরাধ স্বীকৃত হইলে। এরূপ কৃতঘ্নের মৃত্যু ভিন্ন অন্য দণ্ড উপযুক্ত নহে। অতএব তুমি রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হও।"

গঙ্গারাম দ্বিরুক্তি করিল না। প্রহরীরা তাহাকে লইয়া গেল। বধ দণ্ডের আজ্ঞা শুনিয়া সকল লোক স্তম্ভিত হইয়াছিল। কেহ কিছু বলিল না। নীরবে সকলে আপনার ঘরে ফিরিয়া গেল। গৃহে গিয়া সকলেই রমাকে "সাক্ষাৎ লক্ষ্মী" বলিয়া প্রশংসা করিল। রমার আর কোন কলঙ্ক রহিল না।

গোময়ের সদ্ব্যবহার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গোময়ে যে সকল দ্রব্য একত্রে মিশিয়া আছে, তাহারা মাটির সঙ্গে মিশিয়া উদ্ভিদ্ আকারে পরিণত হইয়া, গোজাতির আহারের স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া পুনরায় যখন গোময়ের আকার প্রাপ্ত হয় তখনই সেই দ্রব্যগুলির একটি চক্র পূর্ণ হয়, গোময়স্থিত পদার্থ সকল এইরূপ চক্রাবর্ত্তে ঘুরিয়া পুনরায় গোময়রূপ প্রাপ্ত হইবে ইহাই স্বভাবের নিয়ম। গোজাতি উদ্ভিদ্ হইতে যে ধার করে, স্বভাবের বশে তাহারা সেই ধার শোধ দিতে বিলম্ব করে না। গোজাতি ক্ষেত্রোৎপন্ন পদার্থই আহার করে। ঘাস, বিচালী, ভূষি, খোল, কেন সকল গুলিই ক্ষেত্রোৎপন্ন পদার্থ। গরুরা স্বভাবের বশে যদি থাকিতে পায় তবে ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য আহার করিয়া মলমূত্র ক্ষেত্রেই ত্যাগ করে, এবং ঐ মলমূত্র উদ্ভিদ-জীবনের উপযোগী সারের কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উদ্ভিদ্গণের ধার শোধ দিবার জন্য গোময় ও গোমূত্র ক্ষেত্রে নিহিত হয় ইহাই স্বভাবের নিয়ম।

প্রাণীগণ যে উদ্ভিজ্জ দ্রব্য সকল ভক্ষণ করে উদ্ভিদ্গণ সেই দ্রব্য সকল কতক ভূমি হইতে কতক বায়ু হইতে সংগ্রহ করে; ভূমি হইতে উদ্ভিদ্গণ যে দ্রব্য ধার করে, উদ্ভিদ্ভোজী প্রাণীগণের মলমূত্র ভূমিতে ফিরাইয়া দিলে সেই ধার শোধ যায়, এবং উদ্ভিদেরা বায়ু হইতে যে সকল দ্রব্য সংগ্রহ করে, প্রাণীগণ প্রশ্বাস সহকারে যে সকল দ্রব্য বায়ুতে মিশায়, তাহা দ্বারাই বায়ুর ধার শোধ যায়। এখন দেখ স্বভাবের বশে প্রাণী উদ্ভিদ্ এবং মাটি বায়ু জল প্রভৃতি সকলে যে রকমে আপনাদের ভিতর দেনা পাওনা পরিষ্কার রাখিতে চায়, মানুষে যদি তাহার বিপরীতাচরণ করে, তবে কি মনুষ্য তাহার ফলভোগ করিবে না? স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইতে গেলে যে কুফল ফলিবে তাহাতে কেহই সন্দেহ করেন না।

গোময় ও গোমূত্র শস্যক্ষেত্রে নিপতিত হইয়া ক্ষেত্রের সারের কার্য্য করিবে ইহাই স্বভাবের নিয়ম, ইহার অন্যথা করিলে কি কুফল ফলে, তাহাই এইবারে দেখাইব। ঘুঁটে পুড়াইলে গোময়স্থিত অধিকাংশ দ্রব্যই ধুয়া হইয়া উড়িয়া গিয়া বাতাসে মিশে, কেবল ভস্মগুলি পড়িয়া থাকে। যাহা উড়িয়া যায় তাহার মধ্যে এমন একটি দ্রব্য থাকে যাহা ভূমিতে না থাকিলে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি কমিয়া যায়। এই পদার্থটি যবক্ষার-জান বিশিষ্ট পদার্থ। ক্ষেত্রে উহা না থাকিলে তথায় শস্য জন্মিতে পারে না এবং এই পদার্থের ইতর-বিশেষে ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যের পরিমাণের অনেক ইতর-বিশেষ হয়। সার পদার্থের মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ। ঘুঁটে পুড়াইলে এই সার পদার্থটি বাতাসে মিশাইয়া যাইল, যে ভস্ম বাকি রহিল তাহা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় না হইলেও (কোন কোন উদ্ভিদ্‌ভস্ম সারে সমধিক বর্দ্ধিত হয় ইহা সত্য) তাহার আবশ্যকতা অপেক্ষাকৃত অল্প। সুতরাং ঘুঁটে পুড়াইলে এই ফল হয়, যে পদার্থগুলি মাটির প্রাপ্য তাহা মাটিতে না পড়িয়া বাতাসে মিশে। মাটি উদ্ভিদ্‌গণকে যে যে দ্রব্যগুলি ধার দিয়া ছিল মাটি তাহা আর শীঘ্র ফিরিয়া পায় না; সুতরাং উহার শস্যোৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যায়, ভূমি আর সুন্দর শস্য উৎপন্ন করে না, শস্য আর প্রাণীগণের উপযুক্ত সম্যক্ আহার যোগায় না, মানুষে আপনার দুর্ব্বুদ্ধিতার ফল আপনারা ভোগ করে।

ঘুঁটে পোড়াইলে ভূমির সারোপযোগী যে পদার্থ বায়ুতে মিশিয়া যায় তাহা যে চিরকালই বায়ুতে মিশিয়া থাকে এ কথা ঠিক নহে বটে। কেন না স্বভাবের নিয়ম বশে ভূমির যে দ্রব্যে দাওয়া আছে তাহা কালে ভূমিতেই মিশিবে ইহা নিশ্চয়, কেন না তাহা না হইলে চক্র পুরে না। কিন্তু ঘুঁটে পোড়াইলে এই চক্র পূর্ণ হইতে অকারণ এত বেশী বিলম্ব হইয়া পড়ে, যে সেই বিলম্ব শস্যজীবনের পক্ষে বড়ই হানিজনক হইয়া উঠে। শস্য উৎপাদনের জন্য ভূমির যে দ্রব্যগুলি যখন প্রয়োজন তখন পায় না। এ বৎসর যে ক্ষেত্রে ধান্য জন্মিল, সে বৎসর সেই ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি দ্রব্য খড় ও ধান্যের সঙ্গে মিশিল, পর বৎসর ধান্য উৎপন্ন হইবার সময় ক্ষেত্রের সেই অভাবগুলি পূরণ হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু ঘুঁটে পোড়াইলে বায়ুর সহিত

যে সার পদার্থ মিশিয়া যায় তাহা শস্যক্ষেত্রে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়ত যুগযুগান্তের বিলম্ব হইবে। সুতরাং ক্ষেত্রের অভাব ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্র সমূহে যবক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থের যে অভাব জন্মিয়াছে। গোময় সার স্বরূপ ব্যবহৃত না হইয়া জ্বালানী কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়াই যে ইহার এক প্রধান কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই।

জলের স্রোতে পাহাড়ের মাটি ধুইয়া যায়; প্রতি বৎসর পাহাড়ের যে মাটি ধুইয়া যায় তাহা সমগ্র পাহাড়ের সহিত তুলনায় এত কম যে পাহাড়ের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে ইহা টের পাওয়া যায় না। কিন্তু এইরূপে একটু একটু করিয়া ক্ষয় হইয়া কালে সমগ্র পাহাড় ধূলিসাৎ হইয়া যায়। গোময় ঘুঁটের আকারে পরিণত হইয়া জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়ায় দেশের ভূমির উৎপাদিকা শক্তির যে হ্রাস হয় তাহা দু এক বৎসরে বড় টের পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু এই একটু একটু হ্রাস হইয়া কালে যে কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ঘুঁটের ব্যবহার আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত এবং এই বহুকাল ধরিয়া ভূমির প্রাপ্য পদার্থ বাতাসে মিশিতেছে; বায়ু হইতে মাটিতে ফিরিয়া আসিতে গিয়া আমাদের দেশের ভূমির প্রাপ্য পদার্থ কোন দেশের জমিতে মিশিতেছে তাহা কে জানে? শস্য ক্ষেত্রের প্রাপ্য দ্রব্য কোন অরণ্যে পতিত হইতেছে তাহা কে জানে? আমরা আপনাদের দোষে আমাদের ভূমির উর্ব্বরাশক্তি কমাইতেছি। ভারত ভূমি তাই রাগ করিয়া ভারতবাসিগণকে দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত করিতেছে; ভূমির প্রাপ্য দ্রব্য ভূমিকে দিয়া ভূমিকে সন্তুষ্ট কর, তবেই ভূমি তোমাদের উপযুক্ত আহার যোগাইবে।

আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ কথা আছে যে, ভূমি আদি ভূতাধিষ্ঠাতা দেবতাগণ আমাদের ইষ্ট ভোজ্যবস্তু সকল প্রদান করিয়া দাসের ন্যায় সেবা করিয়া থাকে, তাহাদের প্রাপ্য দ্রব্য তাহাদিগকে প্রদান না করিয়া যে জন ভোজ্য বস্তু ভোগ করে সে চোর। সেই জন্য আমরা বলিতে চাই যে যাঁহারা গোময় মাটির সার স্বরূপ ব্যবহার না করিয়া জ্বালানী ইন্ধন স্বরূপ ব্যবহার করেন তাঁহারা চোর।

পাশ্চাত্য কৃষিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ অনেক পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে গোময়ের সারে উদ্ভিদ্ জীবনের আবশ্যকীয় সকল প্রকার দ্রব্যই আছে,

এই জন্য গোময়ের সার সকল প্রকার সার অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। আমাদের দেশীয় কৃষকগণ সার স্বরূপ ব্যবহার করার পক্ষে গোময়ের উপকারিতা যে কিছুই বুঝে না এমন নহে, তথাপি এই দেশের অধিকাংশ গোময় কেন যে ইন্ধন স্বরূপ ব্যবহৃত হয় তাহার অবশ্য একটা কারণ আছে। সেই কারণটা কি তাহাই এইবারে বলিব। গোবরকে ঘুঁটে করিলে গৃহস্থের সদ্য লাভ হয়, আর সারের জন্য ব্যবহার করিলে যে উপকার পাওয়া যায় তাহা অনেক দিন পরে পাওয়া যায়। আজ ঘুঁটে দিলাম দু দিন পরেই তাহা পুড়াইতে পারিব, কিম্বা দু দিন বাদে তাহা বিক্রয় করিয়া তাহা হইতে দু পয়সা লাভ করিতে পারি, কিন্তু সার দিয়া জমি উর্ব্বরা করিতে পারিলে যে লাভ হইবে তাহা সেই বৎসরের শেষে ফসল পাকিবার সময় বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং সে লাভ বেশী হইলেও অত দিন অপেক্ষা করে কে? পরিণাম ভেবে কাজ করার চলনটা আমাদের দেশ থেকে এক রকম উঠিয়া গিয়াছে। সকলেই আজিকার দিনটা এক রকমে কাটাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত, কালিকার দিনের কথা প্রায়ই কেউ ভাবে না। এই হেতু যাহাতে সদ্য দু পয়সা পাওয়া যায় সেই জন্যই ব্যস্ত হইয়া লোকে গোময়ের ঘুঁটে করিয়া ঘুঁটে পোড়াইয়া ফেলে এবং ঘুঁটে করা অপেক্ষা জমিতে সার দেওয়ায় যে কত বেশী লাভ সে বিষয় আদৌ লক্ষ্য করে না। যাঁহারা একটু পরিণাম ভাবিয়া দেখিবেন তাঁহারাই কিন্তু বুঝিতে পারিবেন সে গোময় সার স্বরূপ ব্যবহৃত হইলে পয়সা সম্বন্ধে অনেক বেশী লাভ নিশ্চয়ই হইবে। পাশ্চাত্য কৃষিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ কত গোময় সার হইতে কিরূপ লাভ হয় তাহা সম্যক্ পরীক্ষা দ্বারা যেরূপ স্থির করিয়াছেন এবং আমাদের দেশে ঘুঁটে করিয়া সেই পরিমাণ গোময় হইতে কি লাভ হয় তাহার একটা হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল। কৃষকগণকে এই গুলি সম্যক বুঝাইয়া দিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি যাহাতে সম্যক বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে।

একটি বড় ভাল গরু হইতে বৎসরে প্রায় ২৫০ মণ গোময় ও ১০০ মণ গোমূত্র পাওয়া যায়। ২৫০ মণ গোময় হইতে কমবেশি ৬৪ মণ ঘুঁটে প্রস্তুত হয়, কলিকাতায় এই ঘুঁটে বিক্রয় করিলে প্রায় ১৪ টাকা পাওয়া যায়।

পল্লিগ্রামে ঘুঁটের দর কলিকাতার দর অপেক্ষা অনেক সস্তা। নানা স্থানের দর সামঞ্জস্য করিয়া হিসাব করিলে ২৫০ মণ গোময় হইতে যে ঘুঁটে পাওয়া যায় তাহার দর যদি ১৪ টাকা ধরা যায় তবে দর বেশী বই কম ধরা হইল না। একটী ভাল গরু হইতে ২৫০ মণ গোময় ও ১০০ মণ গোমূত্র পাওয়া যায় ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; ঘুঁটে করিতে গেলে গোমূত্র কোন কাজে আসে না কিন্তু উহাতে যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থ যে পরিমাণে আছে তাহাতে সারের ব্যবহারে গোমূত্রের অপব্যয় হয় না। সকল গরু হইতেই যে ২৫০ মণ গোময় ও ১০০ মণ গোমূত্র পাওয়া যায় এ কথা ঠিক না। হইলেইও ২৫০ মণ গোময় ও ১০০ মণ গোমূত্র হইতে ভাল সার কত মণ প্রস্তুত হয় তাহা বিজ্ঞানবিৎগণ যেমন দেখাইয়াছেন তাহা বলিতেছি। ঐ ২৫০ মণ গোময় ও ১০০ মণ গোমূত্র হইতে ক্ষেত্রের ব্যবহারের নিতান্ত উপযোগী সুন্দর সার প্রায় ১৭০ মণ পাওয়া যাইবে। * অর্থাৎ ৩৫০ মিশ্রিত মল ও মূত্র শুকাইয়া গিয়া ১৭০ মণ খাঁটি সারে দাঁড়াইবে। এই ১৭০ মণ ভাল সারে ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি কিরূপ বৃদ্ধি করে এবং তাহা হইতে কত লাভ হয় তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

	গম	বিচালি
* বিনাসারে গমের চাষ করিলে ভালরূপ হইলে অর্থাৎ অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে গাছ মরিয়া না যাইলে বিঘা পেছু—	৩মণ-২০ সের ও	৫মণ-১৫ সের হয়
আর বিঘা পেছু ১৩০ মণ গোময় সার দিলে, তাহা হইতে—	৮মণ ৩০ সের ও	১৫মণ ২০ সের হয়
অর্থাৎ ১৩০ মণ গোময় সারে	=৫মণ ১০সের ও	১০মণ ৫সের লাভ হইয়া থাকে।
সুতরাং—১৭০মণ সারে	=৬মণ ৩৪ সের ও	১৩ মণ ১০ সের লাভ হইবে।
মূল্য অল্প করিয়া ধরিলে	=১৮।৫ গম ও	৮৸৶১৫ বিচালি

এই তালিকা ২৮ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করার পর প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে ভুলচুকের সম্ভাবনা নাই।

এই ত গেল লাভালাভের কথা। তার পর দেখাইতে চাই যে পূর্ব্বে আমাদের দেশে ঘুঁটে জ্বালাইবার যে প্রয়োজন ছিল আজ কাল আর সে প্রয়োজন নাই। জ্বালানী কাষ্ঠের অভাবেই ঘুঁটে পোড়াইবার প্রয়োজন ছিল। আজকাল পাথুরিয়া কয়লা আমাদের দেশে যে পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে তাহাতে জ্বালানী ইন্ধনের অভাব প্রকৃত পক্ষে আদৌ নাই। তবে আমাদের দেশের লোকেরা চির প্রচলিত প্রথা উঠাইয়া কোন নূতন ধরণের কার্য্য করিতে বড়ই নারাজ; এই জন্যই রন্ধন কার্য্যে পাথুরিয়াকয়লার চলনটা এখন ও বড় বেশী হয় নাই। অনেকের মনে এরূপ বিশ্বাস আছে যে ঘুঁটের রান্না যেমন সুন্দর হয়, কয়লার রান্না তেমন হয় না; ঘুঁটের আগুণে যেমন ভাত হয়, কয়লার আগুণে তেমন ভাত হয় না। আজকাল গৃহস্থেরা যেরূপ কয়লার জ্বাল দিয়া ভাত রাঁধেন তাহাতে ঘুঁটের জ্বালের ভাত যে কয়লার জ্বালের ভাত হইতে ভাল হয় একথা স্বীকার করি। কিন্তু কেন যে ঘুঁটের জ্বালের ভাত কয়লার জ্বালের ভাত হইতে ভাল হয় তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন না। একটু ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এ বিষয়ে দোষটা কয়লার নহে, কয়লা রন্ধন কার্য্য সম্বন্ধে সুচারুরূপে ব্যবহার করিতে না জানাতেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

ঘুঁটের জ্বালটা নরম, কিন্তু আজকাল যে রকম উনানে একগাদি কয়লা চাপাইয়া রন্ধন কার্য্য চলিতেছে তাহাতে কয়লার আঁচ বড় বেশী হয়, সেই জন্যই রান্না অনেক স্থলে ভাল হয় না। অল্প অল্প কয়লা দিয়া আঁচ নরম রাখিয়া কয়লা ব্যবহার করিলে কয়লার জ্বালের আর কোন দোষই লক্ষিত হইবে না।

আমরা এই যে সকল কথাগুলি বলিলাম সাধারণে সেই গুলি সম্যক্ আলোচনা করিয়া গোময় সারের যথার্থ উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখেন ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। প্রচারের কৃতবিদ্য পাঠকেরা সামান্য গোবরের কথায় অনাস্থা প্রকাশ না করিয়া সাধারণকে—বিশেষতঃ কৃষকগণকে—সুবিধামত এই সকল কথা বুঝাইবার চেষ্টা করেণ ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায়।

কালিদাসের উপমা।

রঘুবংশের প্রথম সর্গ উপমা জন্য বিখ্যাত। প্রথম শ্লোকে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ স্বরূপ কবি পার্ব্বতী পরমেশ্বরকে প্রণাম করিতেছেন—বাক্য এবং অর্থের ন্যায় উঁহারা চিরসম্পৃক্ত।

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥

তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

ভেলায় সাগর পার—বামন হইয়া চাঁদে হাত ইত্যাদি কথা আজকাল আমাদের 'household word'। কালিদাস এই সকল উপমার প্রথম প্রযোক্তা বলিয়াই বোধ হয়।

রাজা প্রজাদিগের নিকট কর স্বরূপ যে অর্থ লন, প্রজাদের হিতের জন্যই আবার উহা ব্যয় করা উচিত—অন্ততঃ কালিদাসের সময়ে লোকের মনে এইরূপ ভাবটা ছিল। রঘুবংশীয়েরা এক গুণ কর লইতেন, সহস্র গুণে প্রজার হিতে ব্যয় করিতেন।

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥

তস্য সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ
ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব।

তিনি গোপনে রাজনৈতিক মন্ত্রণা করিতেন এবং বাহ্যিক আকার ইঙ্গিতে তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা প্রকাশ হইয়া পড়িত না, সুতরাং জন্মান্তরীন সংস্কার-সমূহের ন্যায়—কেবল ফলেরদ্বারাই তাঁহার উপায়প্রযোগাদি অনুমিত হইত।

এই জন্মান্তরীন সংস্কারের কথা কুমারসম্ভবেও আছে—

স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ॥

গর্ভলক্ষণা সুদক্ষিণার বর্ণনে কবি দুই একটী মাত্র তারা এবং ম্লানপ্রভ চন্দ্রযুক্ত প্রায়াবসন্না রজনীর সহিত, শরীরের অবসাদনিবন্ধন দুই একখানি মাত্র অলঙ্কারবিশিষ্টা এবং লোধ্রপুষ্পতুল্যপাণ্ডুবর্ণমুখী রাজ্ঞীর তুলনা করিতেছেন—

শরীরসাদাদসমগ্রভূষণা
মুখেন সালক্ষত লোধ্রপাণ্ডুনা।
তনু প্রকাশেন বিচেয়তারকা
প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্ব্বরী॥

দিলীপ রঘুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে রাজ্যলক্ষ্মী কিয়দংশে রঘুকে আশ্রয় করিলেন।

নরেন্দ্রমূলায়তনাদনন্তরং
তদাস্পদং শ্রীর্যুবরাজসংজ্ঞিতম্।
অগচ্ছদংশেন গুণাভিলাষিণী
নবাবতারং কমালাদিবোৎপলম্॥

যেমন শোভার অধিষ্ঠাত্রী শ্রী, পূর্ণবিকসিত একটী অরবিন্দ হইতে অচিরোদ্গত উৎপলে কিয়ৎ পরিমাণে আবির্ভূত হয়, গুণাভিলাষিণী রাজ্যলক্ষ্মী সেইরূপ নিজের প্রধান আশ্রয়স্থল নরপতি হইতে রাজার সন্নিহিত যুবরাজ সংজ্ঞাযুক্ত আশ্রয়ে অংশে সংক্রমণ করিতে লাগিলেন।

রঘুর পুত্র অজ ঠিক রঘুর মত হইলেন—

রূপং তদোজস্বি তদেব বীর্য্যং
তদেব নৈসর্গিকমুন্নতত্বং।
ন কারণাৎ স্বাদ্বিভিদে কুমারঃ
প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ॥

সেই উজ্জ্বলরূপ, বীর্য্যও সেইরূপ, নৈসর্গিক উন্নতত্বও সেই, প্রদীপ হইতে উৎপাদিত দীপের ন্যায় কুমার পিতা হইতে কোন প্রকারেই ভিন্ন হইল না।

ইন্দুমতীস্বয়ম্বরে দৌবারিকী সুনন্দা ইন্দুমতীকে এক রাজার নিকট হইতে অন্য রাজার নিকট লইয়া যাইতেছে—

তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা
রাজান্তরং রাজসুতাং নিনায়।
সমীরনোত্থেব তরঙ্গলেখা
পদ্মান্তরং মানসরাজহংসীং ॥

সেই বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা (দৌবারিকী) ইন্দুমতীকে, সমীরণে উত্থিত তরঙ্গলেখা যেমন মানস রাজহংসীকে পদ্মান্তরে লইয়া যায়—তদ্রূপ অন্য রাজার নিকট লইয়া গেল।

সুনন্দা অঙ্গেশ্বরের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

অনেন পর্য্যাসয়তাশ্রুবিন্দূন্
মুক্তাফলস্থূলতমান্‌স্তনেষু।
প্রত্যর্পিতাঃ শত্রুবিলাসিনীনাং
মুন্মুচ্য সূত্রেন বিনেব হারাঃ ॥

ইনি শত্রুবিলাসিনীদিগের স্তনে মুক্তাফলবৎ স্থূলতম অশ্রুবিন্দু সকল পাতিত করিয়াছেন। তাহাদের মুক্তাহার কাড়িয়া লইয়া সুতাগাছটী খুলিয়া লইয়া যেন উহা ফিরাইয়া দিয়াছেন।

সুনন্দা ইন্দুমতীকে যে রাজার কাছে লইয়া যান তিনি তাহাকেই পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। কেহ রাত্রিকালে প্রদীপ হস্তে রাজপথস্থিত প্রাসাদাবলির নিকট দিয়া যাইলে তখনকার প্রদীপের সহিত ইন্দুমতীর তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন—

সঞ্চারিনী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতীয়ায় পতিম্বরা সা।
নরেন্দ্র মার্গাট্ট ইব প্রপেদে
বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥

রাত্রিকালে সঞ্চারিণী দীপশিখা রাজমার্গ স্থিত অট্টালিকার নিকট দিয়া গমন করিলে পরে সেই অট্টালিকা যেমন ম্লান দেখায়, পতিম্বরা ইন্দুমতী যে২ রাজাকে অতিক্রম করিয়া গেলেন সেই সেই রাজা তদ্রূপ বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হইলেন।

সুনন্দা ইন্দুমতীকে অবন্তিনাথের নিকট লইয়া গিয়া সেই রাজার

শারীরিক সৌন্দর্য্য, প্রতাপ, ঐশ্বর্য্য, এবং বিলাসিতার সম্যক পরিচয় শুনাইল। কিন্তু ইন্দুমতী তাঁহাকে মনোনিত করিলেন না।

তস্মিন্নভিদ্যোতিতবন্ধুপদ্মে
প্রতাপসংশোষিতশত্রুপঙ্কে।
ববন্ধ সা নোত্তমসৌকুমার্য্যা
কুমুদ্বতী ভানুমতীব ভাবম্‌॥

সূর্য্যে কুমুদিনীর ন্যায়, মিত্ররূপ পদ্মের হর্ষবর্দ্ধক এবং শত্রুরূপ পঙ্কের শোষণকারী সেই অবন্তি নাথে, উৎকৃষ্ট সৌকুমার্য্যবিশিষ্টা সেই ইন্দুমতী অনুরাগিনী হইলেন না।—

এখানে চন্দ্রানুরাগিণী কুমুদিনীর সহিত ইন্দুমতীর এবং প্রতাপশালী অবন্তিনাথের সহিত সূর্য্যের তুলনা করা হইল। আবার এই সর্গে আর দুইটী শ্লোকে সূর্য্যপ্রিয়া নলিনীর সহিত, ইন্দুমতীর, এবং চন্দ্রের সহিত প্রত্যাখ্যাত রাজার তুলনা আছে।

তস্যাঃ প্রকামং প্রিয়দর্শনোঽপি
ন স ক্ষিতীশো রুচয়ে বভূব।
শরৎপ্রমৃষ্টাম্বুধরোপরোধঃ
শশীব পর্য্যাপ্তকলো নলিন্যাঃ॥

নলিনীর সম্বন্ধে মেঘাবরণশূন্য শারদীয় পূর্ণশশীর ন্যায়, যথেষ্ট প্রিয়দর্শন হইলেও, সেই রাজা ইন্দুমতীর রুচিকর হইলেন না।

স্বসুর্বিদর্ভাধিপতেস্তদীয়ঃ
লেভেঽন্তরং চেতসি নোপদেশঃ।
দিবাকরাদর্শনবদ্ধকোষে
নক্ষত্রনাথাংশুরিবারবিন্দে॥

দিবাকরের অদর্শনে মুকুলিত পদ্মে, চন্দ্রকিরণের ন্যায়, বিদর্ভাধিপতির ভগিনী ইন্দুমতীর চিত্তে, সুনন্দার উপদেশ, প্রবেশ লাভ করিতে পারিল না।

অনন্তর ইন্দুমতী অন্যান্য রাজগণকে অতিক্রম করিয়া অজকে বরণ করিলেন। তখন সেই রাজসভার সহিত প্রভাত কালীন সরোবরের কেমন তুলনা!

প্রমুদিত বরপক্ষমেকতস্তৎ
ক্ষিতিপতিমণ্ডলমন্যতো বিতানম্।
উষসি সর ইব প্রফুল্লপদ্মম্
কুমুদবনপ্রতিপন্ননিদ্রমাসীৎ॥

সভার একপার্শ্বে হৃষ্টচিত্ত বরপক্ষ, অপর পার্শ্বে ভগ্নমনোরথ রাজন্যবর্গ—সরোবরের একপার্শ্বে সূর্য্যসম্মিলনে হর্ষোৎফুল্লা কমলিনীশ্রেণী—অপর পার্শ্বে চন্দ্র বিরহে বিষন্না কুমুদিনীমালা।

তার পর সেই ভগ্নমনোরথ ঈর্ষান্বিত রাজাদের আন্তরিক দুরভিসন্ধি এবং বাহ্যিক ভদ্রতার বর্ণনে—

লিঙ্গৈর্মুদা সংবৃতবিক্রিয়াস্তে
হ্রদাঃ প্রসন্না ইব গূঢ়নক্রাঃ॥

হ্রদটী বাহিরে বেশ প্রসন্ন—কেমন নির্ম্মল ঢল ঢল করিতেছে—কিন্তু ভিতরে—দারুণহিংস্রনক্রসঙ্কুল।

ভবিতব্যতানিবন্ধন নারদের বিনাচ্যুত স্বর্গীয় মালা স্তনাগ্রভাগে পতিত হওয়ায় ইন্দুমতীর মৃত্যু হইল।

ক্ষণমাত্র সখীং সুজাতয়োঃ
স্তনয়োস্তামবলোক্য বিহ্বলা।
নিমিমীল নরোত্তমপ্রিয়া
হৃতচন্দ্রা তমসেব কৌমুদী॥

সুন্দর স্তন যুগলের ক্ষণমাত্র সখী সেই মালা দৃষ্টে বিহ্বলা রাজমহিষী রাহুগ্রস্থ চন্দ্রকিরণের ন্যায় নিমীলিত হইলেন।

বপুষা করণোজ্ঝিতেন সা
নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈল নিষেকবিন্দুনা
সহ দীপার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীং॥

ইন্দুমতীর ইন্দ্রিয় চেষ্টাশূন্য শরীর পতিত হইয়া স্বামীকেও পাতিত করিল। প্রদিপ্ত দীপশিখায় নিষিক্ত তৈলবিন্দু দীপার্চ্চি সহিতই ভূতলে পতিত হইয়া থাকে।

অজের ক্রোড়ে ইন্দুমতীর মৃতদেহ—

পতিরঙ্কনিষন্নয়া তয়া
করণাপায়নিষন্নবর্ণয়া।
সমুলক্ষত বিভ্রদাবিলাম্
মৃগলেখামুষসীব চন্দ্রমা॥

—প্রাণবিনাশহেতু ম্লান ক্রোড়স্থিত সেই ইন্দুমতী কর্তৃক অজ উষাকালে ম্লানমৃগচিহ্নধারী চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

অজ ইন্দুমতীর জন্য বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন

অথবা মৃদুবস্তুহিংসিতুং
মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।
হিমসেক বিপত্তিরত্র মে
নলিনী পূর্ব্বনিদর্শনংমতা॥

অথবা প্রজানাশক কাল কোমল বস্তু হিংসার জন্য কোমল বস্তুই অবধারিত করিয়াছেন। হিমপাতে বিনশ্বর কমলই আমার পক্ষে ইহার প্রথমোদাহরণ।

অথবা মম ভাগ্য বিপ্লবাৎ
অশনিঃ কল্পিত এষ বেধসা।
যদনেন তরুর্ণপাতিতঃ
ক্ষপিতা তদ্বিটপাশ্রয়া লতা॥

কিম্বা আমার দুর্ব্বাগ্যবশতঃ বিধাতা এই পুষ্পমালাকেই বজ্র কল্পনা করিয়াছেন, যে হেতু এই বজ্র দ্বারা আশ্রয় বৃক্ষ পাতিত হইল না কিন্তু তদাশ্রিতা লতা বিনষ্টা হইল।

কুমারসম্ভবে রতি খেদ করিতেছেন যে যখন আশ্রয়বৃক্ষ পাতিত হইল তখন তদাশ্রিতা লতা বিনষ্ট হইল না কেন—

অনপায়িনি সংশ্রয়দ্রুমে
গজভগ্নে পতনায় বল্লরী—

তারপর—

শশিনং পুনরেতি শর্ব্বরী—
দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণম্।
ইতি তৌ বিরহান্তরক্ষমৌ
কথমত্যন্তগতা ন মাং দহে।

শর্ব্বরী শশীকে আবার পায়, চক্রবাকবধূ ও সহচর পক্ষীর সহিত আবার মিলিত হয়, সুতরাং তাহারা বিরহান্তর সহিতে পারে। কিন্তু তুমি একেবারে গিয়াছ সুতরাং কেন না আমাকে দগ্ধ করিবে?

কুমারসম্ভবে—

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী
সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃপতিবর্ত্মগা ইতি
প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি॥

শশীর সহিত কৌমুদী নষ্ট হয়; বিদ্যুৎ মেঘের সহিত বিলীন হয়: যে পথে পতি গিয়াছেন স্ত্রীরও যে সেই পথে যাওয়া উচিত ইহা বিচেতন পদার্থরাও প্রতিপন্ন করিতেছে।

[ক্রমশঃ

সীতারাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজা মুরলাকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া নগরের বাহির করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। সে হুকুম তখনই তামিল হইল। মুরলার নির্গমনকালে একপাল ছেলে, এবং অন্যান্য রসিক লোক দল বাঁধিয়া কর-তালি দিতে দিতে এবং গীত গায়িতে গায়িতে চলিল। অনেকেই মুরলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, আড়াইটার উপর সাড়ে তিনটা হয় না?" মুরলারও লজ্জা নাই—সে উত্তর দিল, "হয়—তোর বাবাকে ডেকে আন্‌গে যা—"

গঙ্গারামের ন্যায় কৃতঘ্নের পক্ষে, শূলদণ্ড ভিন্ন অন্য দণ্ড তখনকার রাজনীতিতে ব্যবস্থিত ছিল না। অতএব তাহার প্রতি সেই আজ্ঞাই হইল। কিন্তু গঙ্গারামের মৃত্যু আপাততঃ দিন কতক স্থগিত রাখিতে হইল। কেন না সম্মুখে রাজার অভিষেক উপস্থিত। সীতারাম নিজ বাহুবলে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়া রাজা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অভিষেক হয় নাই। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে তাহা হওয়া উচিত। চন্দ্রচূড়ঠাকুর এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলে, সীতারাম তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এরূপ একটা মহোৎসবের দ্বারা প্রজাবর্গ পরিতুষ্ট হইলে তাহাদের রাজভক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। অতএব বিশেষ সমারোহের সহিত অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিবার কল্পনা হইতেছিল। নন্দা এবং চন্দ্রচূড় উভয়েই এক্ষণে সীতারামকে অনুরোধ করিলেন, যে এখন একটা মাঙ্গলিক ক্রিয়া উপস্থিত, এখন গঙ্গারামের বধরূপ অশুভ কর্ম্মটা করা বিধেয় নহে; তাহাতে অমঙ্গলও যদি না হয়, লোকের আনন্দেরও লাঘব হইতে পারে। একথায় রাজা অতি সহজে সম্মত হইলেন। ভিতরের আসল কথা এই যে, গঙ্গারামকে শূলে দিতে সীতারামের আন্তরিক ইচ্ছা নাই, তবে রাজধর্ম্ম পালন এবং রাজ্যশাসন

জন্য ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল না. তাহার কারণ—গঙ্গারাম শ্রীর ভাই। শ্রীকে সীতারাম ভুলেন নাই, তবে এতদিন ধরিয়া তাহাকে খুঁজিয়া, না পাইয়া নিরাশ হইয়া বিষয়কর্ম্মে চিত্তনিবেশ করিয়া শ্রীকে ভুলিবেন. ইহা স্থির করিয়াছিলেন। অতএব আবার রাজ্যের উপর তিনি মন স্থির করিতেছিলেন সেইজন্যই দিল্লীতে গিয়া, বাদশাহের দরবারে হাজির হইয়াছিলেন। এবং বাদশাহকে সন্তুষ্ট করিয়া সনদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেইজন্য উৎসাহ সহকারে সংগ্রাম করিয়া ভূষণা অধিকার করিয়াছিলেন, এবং দক্ষিণ বাঙ্গালায় এক্ষণে একাধিপত্য প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রী এখনও হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারিণী। অতএব গঙ্গারামের শূলে যাওয়া এখন স্থগিত রহিল।

এদিকে অভিষেকের বড়ধুম পড়িয়া গেল। অত্যন্ত সমারোহ—অত্যন্ত গোলযোগ। দেশ বিদেশ হইতে লোক আসিয়া নগর পরিপূর্ণ করিল—রাজা, রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক, দৈবজ্ঞ, ইতর, ভদ্র, আহূত, অনাহূত, রবাহূত, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, সাধু, অসাধুতে নগরে আর স্থান হয় না। এই অসংখ্য জনমণ্ডলের কর্ম্মের মধ্যে প্রতিনিয়ত আহার। ভক্ষ্য ভোজ্য লুচি সন্দেশের দধির ছড়াছড়িতে সহরে এক হাঁটু কাদা হইয়া উঠিল, পাতা কাটার জ্বালায় সীতারামের রাজ্যের সব কলাগাছ নিষ্পত্র হইল, ভাঙ্গা ভাঁড় ও ছেঁড়া কলাপাতে গড়খাই ও মধুমতী বুজিয়া উঠিবার গোছ হইয়া উঠিল। অহরহ বাদ্য ও নৃত্যগীতের দৌরাত্ম্যে ছেলেদের পর্য্যন্ত মাথা গরম হইয়া উঠিল।

এই অভিষেকের মধ্যে প্রধান ব্যাপার দান। সীতারাম অভিষেকের দিনে সমস্ত দিবস, কখন স্বহস্তে, কখন আপন কর্ত্তৃত্বাধীনে ভৃত্য হস্তে, সুবর্ণ. রজত, তৈজস, এবং বস্ত্র দান করিতে লাগিলেন। অসংখ্য দীন, বিপন্ন, এবং লোভী লোক আসিয়া দুর্গ পরিপূর্ণ করিল—তাহাদিগের জয় জয় শব্দে উচ্চ প্রাসাদ সকল চারি দিক্ হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজপুরুষেরা একে একে ভিক্ষুকদিগকে সীতারামের সিংহাসন সন্নিধানে আনিল, তিনি তাহাদিগকে উপযুক্ত দান করিতে বা করাইতে লাগিলেন—তখন রাজপুরুষেরা দ্বারান্তর দিয়া তাহাদিগকে

বিদায় করিয়া দিল। যে টাকা চাহিল সে টাকা পাইল, যে সোণা চাহিল সে সোণা পাইল, যে তৈজস চাহিল সে তৈজস পাইল, যে বনাত চাহিল সে বনাত পাইল, যে শাল চাহিল সে শাল পাইল, যে ভূমি চাহিল সে ভূমি পাইল। অর্দ্ধ রাত্র পর্য্যন্ত এইরূপ দান করিয়া সীতারাম আর পারিয়া উঠিলেন না। অবশিষ্ট লোকের বিদায় জন্য রাজপুরুষদিগের উপর ভার দিয়া অন্তঃপুরে বিশ্রামার্থ চলিলেন। যাইতে সভয়ে, সবিস্ময়ে সেই অন্তঃপুর দ্বারে—দেখিলেন যে, ত্রিশূলধারিনী সুবর্ণময়ী রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তি!

রাজা ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! আপনি কে, আমাকে দয়া করিয়া বলুন।"

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ! আমি ভিখারিনী! আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিয়াছি।"

রাজা। মা! কেন আমায় ছলনা করেন? আপনি দেবী আমি চিনিয়াছি। আপনি সাক্ষাৎ কমলা—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

জয়ন্তী। মহারাজ! আমি সামান্যা মানুষী। নহিলে আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিতাম না। শুনিলাম, আজ যে যাহা চাহিতেছে, আপনি তাহাকে তাই দিতেছেন। আমার আশা বড়, কিন্তু যার এমন দান, তার কাছে আশা নিষ্ফল। হইবে না মনে করিয়া আসিয়াছি।"

রাজা বলিলেন, "মা, আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। আপনি একবার আমার রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন, দ্বিতীয়বারে আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন! আপনি দেবীই হউন, আর মানবীই হউন—আপনাকে সকলি আমার দেয়। কি বস্তু কামনা করেন আজ্ঞা করুন, আমি এখনিই আনিয়া উপস্থিত করিতেছি।"

জয়ন্তী। মহারাজ! গঙ্গারামের বধ-দণ্ডের বিধান হইয়াছে। কিন্তু এখনও সে মরে নাই। আমি তার জীবন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি!

রাজা। আপনি!

জয়ন্তী। কেন মহারাজ? অসম্ভাবনা কি?

রাজা। গঙ্গারাম কীটানুকীট—আপনার তার প্রতি দয়া কিসে হইল?

জয়ন্তী। আমরা ভিখারী—আমাদের কাছে সবাই সমান।

রাজা। কিন্তু আপনিই ত তাহাকে ত্রিশূল বিঁধিয়া মারিতে চাহিয়াছিলেন—আপনা হইতেই তুইবার তাহার অসদভিসন্ধি ধরা পড়িয়াছে। বলিতে কি, আপনি মহারাণীর প্রতি দয়াবতী না হইলে সে সত্য স্বীকার করিত না, তাহার বধদণ্ড হইত না। এখন তাহার অন্যথা করিতে চান কেন?

জয়ন্তী। মহারাজ! আমা হইতে ইহা ঘটিয়াছে বলিয়াই তাহার প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছি। ধর্ম্মের উদ্ধার জন্য ত্রিশূলাঘাতে অধর্ম্মাচারির প্রাণ বিনাশে ও দোষ বিবেচনা করিনা, কিন্তু ধর্ম্মের এখন রক্ষা হইয়াছে, এখন প্রাণিহত্যা পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। গঙ্গারামের জীবন আমাকে ভিক্ষা দিন।

রাজা। আপনাকে অদেয় কিছুই নাই। আপনি যাহা চাহিলেন, তাহা দিলাম। গঙ্গারাম এখনই মুক্ত হইবে। কিন্তু মা! তোমাকে ভিক্ষা দিই, আমি তাহার যোগ্য নহি। আমি তোমায় ভিক্ষা দিব না। গঙ্গারামের জীবন তোমাকে বেচিব—মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে।

জয়ন্তী। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) কি মূল্য মহারাজ! রাজ-ভাণ্ডারে এমন কোন ধনের অভাব, যে ভিখারিনী তাহা দিতে পারিবে?

রাজা। রাজভাণ্ডারে নাই—রাজার জীবন। আপনি সেই মধুমতীতীরে ঘাটের উপর কামানের নিকট দাঁড়াইয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যে আমার জীবন একদিন আমায় দান করিবেন। যে অমূল্য সামগ্রী আমাকে দিবেন বলিয়াছিলেন—সেই মূল্যে আজ গঙ্গারামের জীবন আপনার নিকট বেচিব।

জয়ন্তী। সে কি মহারাজ! আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা রাজাধিরাজের জীবনের সঙ্গে সেই নরাধম পাপাত্মার জীবনের কি বিনিময় হয়? মহারাজ! কাণা কড়ি লইয়া কি রত্নাকর বেচিব?

রাজা। মা! জননী যত দেন, ছেলে কি মাকে কখনও তত দিতে পারে!

জয়ন্তী। মহারাজ! আপনি আজ অন্তঃপুর দ্বার সকল মুক্ত রাখিবেন;

আর অন্তঃপুরের প্রহরীদিগকে আজ্ঞা দিবেন ত্রিশূল দেখিলে যেন পথ ছাড়িয়া দেয়। আপনার শয্যাগৃহে আজ রাত্রেই মূল্য পৌঁছিবে। গঙ্গারামের মুক্তির হুকুম হোক।

রাজা হর্ষে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "গঙ্গারামের এখনই মুক্তি দিতেছি।" এই বলিয়া অনুচর বর্গকে সেইরূপ আজ্ঞা দিলেন।

জয়ন্তী বলিলেন, "আমি এই অনুচর দিগের সঙ্গে গঙ্গারামের কারাগারে যাইতে পারি কি?"

রাজা। আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিছুতেই আপনার নিষেধ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অন্ধকারে, কূপের ন্যায় নিম্ন, আর্দ্র, বায়ুশূন্য কারাগৃহ মধ্যে, গঙ্গারাম শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া একা পড়িয়া আছে। সেই নিশীথ কালেও তাহার নিদ্রা নাই—যে পর্য্যন্ত সে শুনিয়াছে যে তাহাকে শূলে যাইতে হইবে, সেই পর্য্যন্ত আর সে ঘুমায় নাই—আহার নিদ্রা সকলই বন্ধ। এক দণ্ডে মরা যায়, মৃত্যু তত বড় কঠিন দণ্ড নহে; কিন্তু কারাগৃহে একাকী পড়িয়া দিবারাত্র সম্মুখেই মৃত্যু দণ্ড, ইহি ভাবনা করার অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড আর কিছুই নাই। গঙ্গারাম পলকে পলকে শূলে যাইতেছিল। দণ্ডের আর তাহার কিছু বাকি নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া, চিত্তবৃত্তি সকল প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। মন অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়া ছিল—ক্লেশ অনুভব করিবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন তিরোহিত হইয়াছিল। মনের মধ্যে কেবল দুটি ভাব এখনও জাগরিত ছিল—ভৈরবীকে ভয়, আর রমার উপর রাগ। এ ভয়ের অপেক্ষা, এই রাগই প্রবল। গঙ্গারাম, আর রমার প্রতি আসক্ত নহে, এখন রমার তেমন আন্তরিক শত্রু আর কেহ নহে।

গঙ্গারাম এখন রমাকে সম্মুখে পাইলে নখে বিদীর্ণ করিতে প্রস্তুত। গঙ্গারামের যখন কিছু চিন্তাশক্তি হইল, তখন কি উপায়ে মরিবার সময়ে

রমার সর্ব্বনাশ করিয়া মরিতে পারিবে, গঙ্গারাম তাহাই ভাবিতেছিল। শূল তলে দাঁড়াইয়া রমার সম্বন্ধে কি অশ্লীল অপবাদ দিয়া যাইবে, গঙ্গারাম তাহাই কখন কখন ভাবিত। অন্য সময়ে জড়পিণ্ডের মত স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া থাকিত। কেবল মধ্যে মধ্যে বাহিরে অভিষেকের উৎসবের মহান্ কোলাহল শুনিত। যে পাচক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ তাহার নূন ভাত লইয়া আসিত, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া গঙ্গারাম উৎসবের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিল। শুনিল যে রাজ্যের সমস্ত লোক অতি বৃহৎ উৎসবে নিমগ্ন—কেবল সেই একা অন্ধকারে আর্দ্র ভূমিতে মূষিকদষ্ট হইয়া, কীটপতঙ্গপীড়িত হইয়া, শৃঙ্খল ভার বহন করিতেছে। মনে মনে বলিতে লাগিল, রমার কবে এই রকম স্থান মিলিবে!

যেমন অন্ধকারে বিদ্যুৎ জ্বলে তেমনি গঙ্গারামের একটা কথা মনে পড়িত। যদি শ্রী বাঁচিয়া থাকিত! শ্রী একবার প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিল, আবার ভিক্ষা চাহিলে কি ভিক্ষা পাইত না! আমি যত পাপী হই না কেন, শ্রী কখন আমাকে পরিত্যাগ করিত না। এমন ভগিনীও মরিল!

দুই প্রহর রাত্রে ঝঞ্ঝনা বাজাইয়া কারাগৃহের বাহিরের শিকল খুলিল। গঙ্গারামের প্রাণ শুকাইল—এত রাত্রে কেন শিকল খুলিতেছে! আরও কিছু নূতন বিপদ আছে না কি?

অগ্রে রাজপুরুষেরা প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল। গঙ্গারাম স্তম্ভিত হইয়া তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। তাহার পর জয়ন্তীকে দেখিয়া—চিনিয়া—আর চীৎকার করিয়া বলিল,

"রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমি কি করিয়াছি।"

জয়ন্তী বলিল, "বাছা! কি করিয়াছ, তাহা জান। কিন্তু তুমি রক্ষা পাইবে। শ্রীকে মনে আছে কি?

গঙ্গা। শ্রী! যদি শ্রী বাঁচিয়া থাকিত!

জয়ন্তী। শ্রী বাঁচিয়া আছে। তার অনুরোধে আমি মহারাজের কাছে তোমার জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম। ভিক্ষা পাইয়াছি। তোমাকে মুক্ত

করিতে আসিয়াছি। পলাও গঙ্গারাম! কাল প্রভাতে এ রাজ্যে আর মুখ দেখাইও না। দেখাইলে আর তোমাকে বাঁচাইতে পারিব না।"

গঙ্গারাম বুঝিতে পারিল কি না, সন্দেহ। বিশ্বাস করিল না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু দেখিল, যে রাজপুরুষেরা বেড়ী খুলিতে লাগিল। গঙ্গারাম নীরবে দেখিতে লাগিল। যখন বেড়ী প্রায় খোলা হইয়াছে—তখন গঙ্গারাম জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল,

"মা! রক্ষা করিলে কি?"

জয়ন্তী বলিলেন, "বেড়ী খুলিয়াছে। চলিয়া যাও।"

গঙ্গারাম উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সেই রাত্রেই নগর ত্যাগ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গারামের মুক্তির আজ্ঞা প্রচার করিয়া, জয়ন্তীর আজ্ঞা মত দ্বার মুক্ত রাখিবার অনুমতি প্রচার করিয়া, রাজা শয্যাগৃহে আসিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। নন্দা তখনই আসিয়া পদসেবায় নিযুক্ত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"রমা কেমন আছে?"

রমার পীড়া। সে কথা পরে বলিব। নন্দা উত্তর করিল,

"কই—কিছু বিশেষ হইতে ত দেখিলাম না।"

রাজা। আমি এত রাত্রে তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না, বড় ক্লান্ত আছি। তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যাও—তাহাকে আমি যেমন যত্ন করিতাম তেমনি যত্ন করিও; আর আমি যে জন্য যাইতে পারিলাম না তাহাও বলিও।"

কথাটা শুনিয়া পাঠক সীতারামকে ধিক্কার দিবেন। কিন্তু সে সীতারাম আর নাই। যে সীতারাম হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, সে সীতারাম রাজ্যপালন ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকে খুঁজিয়া বেড়াইল। যে সীতারাম আপনার প্রাণ দিয়া শরণাগত বলিয়া গঙ্গারামের

প্রাণরক্ষা করিতে গিয়াছিলেন—সেই সীতারাম রাজা হইয়া, রাজদণ্ডপ্রণেতা হইয়া, শ্রীর লোভে গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দিল। যে লোকবৎসল ছিল, সে এখন আত্মবৎসল হইতেছে।

নন্দা বুঝিল, প্রভু আজ একা থাকিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। নন্দা আর কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। সীতারাম তখন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া শ্রীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সীতারাম সমস্ত দিন, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত ছিলেন। অন্য দিন হইলে পড়িতেন, আর নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। কিন্তু আজ স্বতন্ত্র কথা—যাহার জন্য রাজ্যসুখ বা রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া এতকাল ধরিয়া দেশে দেশে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়াছেন, যাহার চিন্তা অগ্নিস্বরূপ দিবারাত্রি হৃদয় দাহ করিতেছিল, তাহার সাক্ষাৎলাভ হইবে। সীতারাম জাগিয়া রহিলেন।

কিন্তু নিদ্রাদেবীও ভুবন-বিজয়িনী। যে যতই বিপদাপন্ন হউক না কেন, এক সময়ে না এক সময়ে তাহারও নিদ্রা আসে। সীতারাম বিপদাপন্ন নহেন, সুখের আশায় নিমগ্ন, সীতারামের একবার তন্দ্রা আসিল। কিন্তু মনের ততটা চাঞ্চল্য থাকিলে তন্দ্রাও বেশী ক্ষণ থাকে না। ক্ষণকাল মধ্যেই সীতারামের নিদ্রা ভঙ্গ হইল—চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে গৈরিকবস্ত্র রুদ্রাক্ষভূষিতা মুক্ত-কুন্তলা কমনীয় মূর্ত্তি!

সীতারাম প্রথমে জয়ন্তী মনে করিয়া অতি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কই? শ্রী কই?" কিন্তু তখনই দেখিলেন জয়ন্তী নহে, শ্রী!

তখন চিনিয়া, "শ্রী! শ্রী! ও শ্রী! [illegible] শ্রী!" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাহু প্রসারণ করিলেন। কিন্তু কেমন মাথা ঘুরিয়া গেল—চক্ষু বুজিয়া রাজা আবার শুইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনিই মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল।

তখন সীতারাম, ঊর্দ্ধমুখে, স্পন্দিততারলোচনে, অতৃপ্ত দৃষ্টিতে শ্রীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন কথা নাই—যেন বা নয়নের তৃপ্তি না হইলে কথার স্ফূর্ত্তি সম্ভাবিত হইতেছে না। দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে—যেন তাঁহার আনন্দ-প্রফুল্ল মুখ-মণ্ডল আর তত প্রফুল্ল রহিল না—

একটা নিশ্বাস পড়িল। রাজা, আমার শ্রী বলিয়া ডাকিয়া ছিলেন, বুঝি দেখিলেন, আমার শ্রী নহে। বুঝি দেখিলেন, যে স্থিরমূর্ত্তি, অবিচলিত ধৈর্য্যসম্পন্না, অশ্রু-বিন্দুমাত্রশূন্যা, উদ্ভাসিতরূপরশ্মিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী, মহা-মহিমাময়ী এ যে দেবী প্রতিমা! বুঝি এ শ্রী নহে!

হায়! মূঢ় সীতারাম-মহিষী খুঁজিতে ছিল—দেবী লইয়া কি করিবে!

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অথ ব্যবস্থিতান্দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০॥

পরে হে মহীপতে! * ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন।২০।

"ব্যবস্থিত" শব্দের ব্যাখায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন "যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত।"

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥২১॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং যএতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩॥

---

* বোধ করি পাঠকের স্মরণ আছে যে সঞ্জয়োক্তি চলিতেছে। সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেছেন।

অর্জ্জুন বলিলেন—

যাহারা যুদ্ধ কামনায় অবস্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণসমুদ্যমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে (যাবৎ তাহা দেখি), যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের প্রিয়চিকীর্ষায় এই খানে যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থিদিগকে (যাবৎ) আমি দেখি, (তাবৎ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। ২১২।২।২৩।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—

হে ভারত*! অর্জ্জুনের দ্বারা হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ কর।২৪।২৫।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

তখন অর্জ্জুন সেইখানে স্থিত উভয়সেনায় পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, সখিগণ† এবং সুহৃদগণকে দেখিলেন। ২৬।

---

* ধৃতরাষ্ট্র এবং অর্জ্জুন উভয়কেই "ভারত" বলিয়া এই গ্রন্থে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহার কারণ, ইহাঁরা দুষ্মন্তপুত্র ভরতের বংশ।

† সখা ও সুহৃদে অবশ্য প্রভেদ আছে। যাঁহার নিকট উপকার পাওয়া গিয়াছে সেই সখা।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

সেই কুন্তীপুত্র সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া বিষাদপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।২৭।

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৯॥

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধেচ্ছু সম্মুখে অবস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে।২৮।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥

আমার দেহ কাঁপিতেছে, রোমহর্ষ জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম্ম জ্বালা করিতেছে।২৯।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, আমি দুর্লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি। ৩০।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥

যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি কোন মঙ্গল দেখিনা—হে কৃষ্ণ! আমি জয় চাহি না, রাজ্য সুখ চাহি না।৩১।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥

---

* দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্। ইতি পাঠান্তর আছে।

তইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

যাহাদিগের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখ, কামনা করা যায়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালা, এবং কুটুম্বগণ, ধন প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যেই কাজ কি' ভোগেই কাজ কি, জীবনেই কাজ কি? হে মধুসূদন! আমি হত হই হইব; তথাপিও তাহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। ৩২।৩৩।৩৪।

"আমি হত হই হইব (ঘ্নতোপি)" কথার তাৎপর্য্য এই যে "আমি না মারিলে তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে বটে। যদি তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি আমি তাহাদিগকে মারিব না।" বস্তুতঃ ভীষ্ম, দ্রোণের সহিত অর্জ্জুন এই ভাবেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের "মৃদুযুদ্ধের" কথা আমরা অনেকবার শুনিতে পাই।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

পৃথিবীর কথা দূরে থাক ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যই বা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে বধ করিলে কি সুখ হইবে, জনার্দ্দন? ৩৫।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।*
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥

এই আততায়িদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। হে মাধব! স্বজন হত্যা করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব। ৩৬।

---

* স্ববান্ধবান্ ইতি পাঠান্তর আছে।

ছয় জনকে আততায়ী বলে—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারীচ ষড়েতে আততায়িনঃ॥

যে ঘরে আগুণ দেয়, যে বিষ দেয়, শস্ত্রপাণি, ধনাপহারী, ভূমি যে অপহরণ করে, ও বনিতা অপহরণ করে, এই ছয়জন আততায়ী। অর্থ শাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য। টীকাকারেরা অর্জ্জুনের বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন, যে যদিও অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে গুরু প্রভৃতি অবধ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রের কাছে অর্থশাস্ত্র দুর্ব্বল, সুতরাং দ্রোণ ভীষ্মাদি আততয়ী হইলেও তাঁহাদিগের বধে পাপাশ্রয় হইবে। একালে আমরা "Law" এবং "Morality"র মধ্যে যে প্রভেদ করি এ বিচার ঠিক সেই রূপ। "Law"র উপর "Morals"। ইংরেজের পিনাল কোডেও লিখে যে অবস্থা বিশেষে আততায়ীর বধ জন্য দণ্ড নাই। কিন্তু সেই সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সর্ব্বত্র আধুনিক নীতিশাস্ত্রসঙ্গত নহে।

আনন্দগিরি এই শ্লোকের আর একটা অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন এমন ও বুঝাইতে পারে যে গুরু প্রভৃতি বধ করিলে আমরাই আততায়ী হইব; সুতরাং আমাদের পাপাশ্রয় করিবে। "গুরুভ্রাতৃসুহৃৎপ্রভৃতীনেতান-হত্বা বয়মাততায়িনঃ স্যামঃ।"

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥৩৮॥

যদ্যপি ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দোষ এবং মিত্রদ্রোহে যে পাতক তাহা দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয় করার দোষ দেখিতেছি, আমরা সে পাপ হইতে নিবৃত্তিবুদ্ধিবিশিষ্ট কেন না হইব? ৩৭।৩৮।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥৩৯॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয়। ৩৯।

সনাতন কুলধর্ম্ম—অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষপরম্পরা প্রাপ্ত কুলধর্ম্ম।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০॥

হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়, স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে হে বার্ষ্ণেয়! * বর্ণসঙ্কর জন্মায়। ৪০।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥

এই সঙ্কর কুলনাশকারিদিগের কুলের নরকের নিমিত্ত হয়। পিণ্ডোদক ক্রিয়ার লোপ হেতু তাহাদিগের পিতৃগণ পতিত হয়। ৪১।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২॥

এইরূপ কুলঘ্নদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই দোষে জাতিধর্ম্ম এবং সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়। ৪২।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসোভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩॥

হে জনার্দ্দন! আমরা শুনিয়াছি যে যে মনুষ্যদিগের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায় তাহাদিগের নিয়ত নরকে বাস হয়। ৪৩।

৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, এই পাঁচটী শ্লোক আধুনিক কৃতবিদ্য পাঠকদিগের কানে ভাল লাগিবে না। ইহা বর্ণসঙ্কর বিরোধী প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে, তার উপর "লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ" প্রভৃতি অলঙ্কারও আছে। বর্ণসঙ্করের উপর গীতাকারের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়। ইনি স্বয়ং ভগবানের মুখেও বর্ণসঙ্করের নিন্দা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা যখন তদ্বিষয়িণী ভগবদুক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব তখন তদুক্তির তাৎ-

* কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশসম্ভূত, এজন্য বার্ষ্ণেয়।

পর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে অর্জ্জুনোক্তির স্থূল মর্ম্ম বুঝিলেই যথেষ্ট হইল। কুলের পুরুষগণ মরিলে কুলস্ত্রীগণ যে ব্যভিচারিণী হয় ইহা সচরাচর দেখা যায়। কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে তাহাদিগের গর্ভে নীচ লোকের ঔরসে সন্তান জন্মিতে থাকে। বংশ নীচসন্ততিতে পরিপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধর্ম্ম লোপ পায়। বর্ণসঙ্করে যাঁহারা দোষ না দেখেন, এবং পিণ্ডাদির স্বর্গকারকতায় যাঁহারা বিশ্বাসবান্ নহেন—স্বর্গ নরকাদিও যাঁহারা মানেন না, তাঁহারাও বোধ করি এতটুকু স্বীকার করিবেন।* বাকীটুকু কালোচিত ভাষা এবং অলঙ্কার।† কথাটা অতি মোটা কথা বটে। কথাটা অর্জ্জুনের মুখে বসাইবার একটু কারণ আছে—অর্জ্জুনের এই "কুলধর্ম্মের" বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্ "স্বধর্ম্মের" কথাটা তুলিবেন। এটুকু গ্রন্থকারের কৌশল। "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ" এই অমৃতময় বাক্যের পর বলিবার যোগ্য কথা এ নহে।

---

* The women, for instance, whose husbands, friends or relations have been all slain in battle, no longer restrained by law, seek husbands among other and lower castes, or tribes, causing a mixture of blood, which many nations at all ages have regarded as a most serious evil; but particularly those who—like the Aryans, the Jews and the Scotch—were at first surrounded by foreigners very different to themselves, and thus preserved the distinction and genealogies of their races more effectively than any other. (*Thomson's Translation of the Bhagavadgita P. 7*).

* By the destruction of the males the rites of both tribe and family would cease, because women were not allowed to perform them; and confusion of castes would arise, for the women would marry men of another caste. Such marriages were considered impure (Manu X. 1-40) Such marriages produced elsewhere a confusion of classes. Livy tells us that the Roman patricians at the instance of Canuleius complained of the intermarriages of the plebian class with their own, affirming that "omnia divina humanaque turbari, ut qui natus sit, ignoret, cujus sanguinis, quorum sacrorum sit"

(*Davies' Translation of the Bhagavadgita p. 26*)

† In bringing forward these and other melancholy superstitions of Brahmanism in the mouth of Arjuna, we are not to suppose that our poet—though as much Brahman as philosopher in many unimportant points of belief—himself received and approved of them. (*Thomson p. 7*)

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ং।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥

হায়! আমরা রাজ্যসুখলোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি—মহৎ পাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি। ৪৪।

যদিমামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণেহন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

যদি আমি প্রতীকারপরাঙ্মুখ এবং অশস্ত্র হইলে শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করে তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর হইবে। ৪৫।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থউপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরংচাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

সঞ্জয় বলিলেন—

অর্জ্জুন এই রূপ বলিয়া শোকাকুল মানসে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামস্থলে রথোপস্থে উপবেশন করিলেন। ৪৬

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াংযোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে অর্জ্জুনবিষাদো*
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বলিয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু নাই, কিন্তু এই অধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্যের উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রে উভয় সেনা সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্যূহবদ্ধা হইয়াছে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন, পরম রণপণ্ডিত আপনার আচার্য্যকে দেখাইলেন। একটু ভীত হইয়া আচার্য্যকে বলিলেন, "আপনারা আমার সেনাপতি ভীষ্মকে রক্ষা করিবেন।" কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভীষ্ম যুবার অপেক্ষাও উদ্যমশীল—

* কোন কোন পুস্তকে "সৈন্যদর্শনং" ইতি পাঠ আছে।

তিনি সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন—(শঙ্খ তখনকার bugle)। তাঁহার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া উৎসাহে বা প্রত্যুত্তরে উভয় সৈন্যস্থ যোদ্ধৃগণ সকলেই শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন উভয়দলে নানাবিধ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল—শঙ্খে, ভেরীতে, অন্যান্য বাদ্যের কোলাহলে, গগন বিদীর্ণ হইল—আকাশ পৃথিবী তুমুল হইয়া উঠিল। সেই মহোৎসাহের সময়ে স্থিরচিত্ত অর্জ্জুন—যাঁহার উপরে কৌরব জয়ের ভার—আপনার সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন—"একবার উভয় সেনার মধ্যে রথ রাখ দেখি—দেখি কাহার সঙ্গে আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে।" কৃষ্ণ, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন,—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা বলিলেন, "এই দেখ।" অর্জ্জুন দেখিলেন দুই দিকেই ত আপনার জন,—পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালা, সুহৃৎ, সখা—তাঁহার গা কাঁপিয়া উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, মাথা ঘুরিল, হাত হইতে সেই মহাধনু গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। বলিলেন, "কৃষ্ণ, রাজ্য যাদের জন্য, তাদের মারিয়া রাজ্যে কি ফল?—আমি যুদ্ধ করিব না!" এই সংগ্রামক্ষেত্র, দুই দিকে দুই মহতী সেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাদ্য এবং ঘোরতর উৎসাহ—সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে স্থৈর্য্য তার পর তাঁহার হৃদয়ে সেই করুণ এবং মহা প্রশান্ত ভাব—এরূপ মহচ্চিত্র সাহিত্য জগতে দুর্লভ। "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ"—ঈদৃশী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে?

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তন্তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১॥

সঞ্জয় বলিলেন।

তখন সেই কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুললোচন বিষাদযুক্ত (অর্জ্জুন) কে মধুসূদন এই কথা বলিলেন॥ ১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥ ২॥

শ্রীভগবান বলিলেন।

হে অর্জ্জুন! এই শঙ্কটে অনার্য্যসেবিত স্বর্গহানিকর এবং অকীর্ত্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল?॥ ২॥

মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়* নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠপরন্তপ॥ ৩॥

হে কৌন্তেয়! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর।৩।

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪॥

অর্জ্জুন বলিলেন,

হে শত্রুনিসূদন মধুসূদন! পূজার্হ যে ভীষ্ম এবং দ্রোণ, যুদ্ধে তাঁহাদের সহিত বাণের দ্বারা কি প্রকারে আমি প্রতিযুদ্ধ করিব? ৪।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ৫॥

মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন করিতে

* "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ" ইতি আনন্দগিরি ধৃত পাঠ।

হয় সেও শ্রেয়। আর গুরুদিগকে বধ করিয়া যে অর্থ কাম ভোগ করা যায় তাহা রুধিরলিপ্ত। ৫।

ন চৈতদ্বিদ্ম কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬॥

আমরা জয়ী হই, বা আমাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোনটী শ্রেয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না—যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত।৬।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

কার্পণ্য দোষে আমি অভিভূত হইয়াছি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা ভাল হয় আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—আমাকে শিক্ষা দাও।৭।

কার্পণ্য অর্থে দীনতা। তারানাথ 'বাচস্পত্যে' এই অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া উদাহরণস্বরূপ গীতার এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভরসা করি কোন পাঠকই এখানে দীনতা অর্থে দারিদ্র্য বুঝিবেন না। 'দীন' অর্থে মহাব্যসনপ্রাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ—তারানাথ রামায়ণ হইতে আর একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যথাঃ—"মহদ্ব্যসনং প্রাপ্তো দীনঃ কৃপণ উচ্যতে।" আনন্দগিরি বলেন "যোঽল্পাং স্বল্পামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ।" যে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না সেই কৃপণ * শ্রীধরস্বামী বুঝাইয়াছেন যে "এই

---

* কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং "কার্পণ্য" শব্দের প্রতিবাক্য দিয়াছেন "helplessness."

সকল বন্ধুবর্গকে নষ্ট করিয়া কি প্রাণ ধারণ করিব ?" অর্জ্জুনের ইতি বুদ্ধিই কার্পণ্য।* তিনি "কার্পণ্য দোষ" ইতি সমাসকে দ্বন্দ্ব সমাস বুঝিয়াছেন—কার্পণ্য এবং দোষ। দোষ শব্দে এখানে পূর্ব্বকথিত কুলক্ষয়কৃতের পাপ বুঝিতে হইবে। অন্যান্য টীকাকারেরা সেরূপ অর্থ করেন নাই।

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্‌-
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্‌।
অবাপ্যভূমাবসপত্নমৃদ্ধম্‌
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্‌॥ ৮॥

পৃথিবীতে অসপত্ন সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশোষণ করিবে, তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না।৮।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯॥

সঞ্জয় বলিতেছেন,

শত্রুজয়ী অর্জ্জুন * হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া, যুদ্ধ করিব না, ইহা গোবিন্দকে বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ৯।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০॥

হে ভারত! হৃষীকেশ হাস্য করিয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপর অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন। ১০।

---

* মূলে 'গুড়াকেশ' শব্দ আছে। গুড়াকেশ অর্জ্জুনের একটি নাম। টীকাকারেরা ইহার অর্থ করেন 'নিদ্রাজয়ী'। অন্যবিধ অর্থও দেখা গিয়াছে।

শ্রীভগবান উবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবান বলিতেছেন

তুমি বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ বটে; কিন্তু যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে তাহাদের জন্য শোক করিতেছ। কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না। ১১।

এইখানে প্রকৃত গ্রন্থারম্ভ। এখন, কি কথাটা উঠিতেছে তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক।

দুর্য্যোধনাদি অন্যায় পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাঁহার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এখানে যুদ্ধ কি কর্ত্তব্য?

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে এই কথাটার অনেক বিচার হইয়াছে। বিচারে স্থির হইয়াছিল যে যুদ্ধই কর্ত্তব্য। তাই এই উভয় সেনা সংগৃহীত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে।

এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্ত্তব্য কি না, আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করিলেও, আমরা পাণ্ডবদিগের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। আমেরিকায় ওয়াশিংটন, ইউরোপে উলিয়ম দি সাইলেণ্ট, এবং ভারতবর্ষে প্রতাপসিংহ প্রভৃতি যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পরম ধর্ম্ম—দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পাণ্ডবদিগেরও এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর ধর্ম্ম। এ বিচার আমি কৃষ্ণচরিত্রে সবিস্তারে করিয়াছি—এক্ষণে সে সকল পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই।* এ বিচারের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যেটি যাহার ধর্ম্মানুমত অধিকার, তাহার সাধ্যানুসারে রক্ষা করা তাহার ধর্ম্ম। রক্ষার অর্থ এই যে, কেহ অন্যায় পূর্ব্বক, তাহার অপহরণ বা অবরোধ করিতে না পারে; করিলে তাহার পুনরুদ্ধার এবং অপহর্ত্তার দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য। যদি লোকে স্বেচ্ছামত পরকে অধিকারচ্যুত করিয়া সচ্ছন্দে পরস্বাপ-

---

* এবং নবজীবন, প্রথম খণ্ড দেখ।

হরণ পূর্ব্বক উপভোগ করিতে পারে, তবে সমাজ এক দিন টিকে না। সকল মনুষ্যই তাহা হইলে অনন্তঃ দুঃখ ভোগ করিবে। অতএব আপনার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্ত্তব্য। যদি বল ভিন্ন অন্য সদুপায় থাকে, তবে তাহাই অগ্রে অবলম্বনীয়। যদি বল ভিন্ন সদুপায় না থাকে, তবে বলই প্রযুজ্য। এখানে বলই ধর্ম্ম।

মহাভারতে দেখি যে অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্বে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। যখন, যুদ্ধে স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজনবর্গের মুখ দেখিয়া তিনি যে কাতরচিত্ত ও যুদ্ধবুদ্ধি হইতে বিচলিত হইবেন, ইহাও সজ্জনস্বভাব-সুলভ ভ্রান্তি।

মহাভারতে ইহাও দেখিতে পাই, যে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। পরে যখন যুদ্ধ অলংঘ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া কেবল অর্জ্জুনের সারথ্য মাত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলেও তিনি পরম ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং এ স্থলে ধর্ম্মের পথ কোন্‌টা তাহা অর্জ্জুনকে বুঝাইতে বাধ্য। অতএব অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন, যে যুদ্ধ করাই এখানে ধর্ম্ম, যুদ্ধ না করাই অধর্ম্ম।

বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভসময়ে কৃষ্ণার্জ্জুনে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

যুদ্ধে প্রবৃত্তিসূচক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিতেছেন, তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই আছে। অন্যান্য অধ্যায়েও "যুদ্ধ কর" এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্ মধ্যে মধ্যে আপনার বাক্যের উপসংহার করেন বটে, কিন্তু সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ হয়, যে যে কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অনুভূত করিতে না পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা যুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধ-

পক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মনুষ্যধর্ম্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয় পাঠক মনে মনে বুঝিবেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণার্জ্জুনে যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। দুই পক্ষের সেনা ব্যূহিত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত, সেই সময়ে যে এক পক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ম্ম শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না। একথার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যাউক না যাউক, পাঠকের আর কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

(১) গীতায় ভগবৎ প্রচারিত ধর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু, গীতাগ্রন্থখানি ভগবৎপ্রণীত নহে, অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা।

(২) যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথনকালে সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বসিয়া সব লিখিয়াছিলেন, বা স্মৃতিধরের মত স্মরণ রাখিয়াছিলেন, এমন কথাও বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং যে সকল কথা গীতাকার ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, সে সকলই যে প্রকৃত পক্ষে ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস করা যায় না। অনেক কথা যে গ্রন্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে বাহির করিতেছেন, ইহা সম্ভব।

যাঁহারা বলিবেন, যে এই গ্রন্থ মহাভারতান্তর্গত, মহাভারত মহর্ষি ব্যাস প্রণীত, তিনি যোগ বলে সর্ব্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত, অতএব এরূপ সংশয় এখানে অকর্ত্তব্য, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিচার হইতে পারে না। সেশ্রেণীর পাঠকের জন্য এই ব্যাখ্যা প্রণীত হয় নাই, ইহা আমার বলা রহিল।

(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য প্রণীত হইবার পর কোন শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তাঁহার ভাষ্যের সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের ঐক্য আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের

অনূ্যন সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে ও গীতা প্রচলিত ছিল। এই কাল মধ্যে যে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয় নাই তাহা কি প্রকারে বলিব? আমরা মধ্যে মধ্যে এমন শ্লোক পাইব, যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়।

এই সকল কথা স্মরণ না রাখিলে আমরা গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব না। এ জন্য আগেই এই কয়টি কথা বলিয়া রাখিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই যুদ্ধের ধর্ম্ম্যতা বুঝাইতেছেন, সে সকল কথার সার মর্ম্ম কি?

আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া উপরে যে প্রণালীতে সংক্ষেপে এই যুদ্ধের ধর্ম্ম্যতা বুঝাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ যে সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কথার স্থূল মর্ম্ম এই, যে সকলেরই স্বধর্ম্মপালন করা কর্ত্তব্য।

আগে আমাদিগের বুঝিয়া দেখা চাই যে স্বধর্ম্ম সামগ্রীটা কি?

শঙ্করাদি পূর্ব্বপণ্ডিতগণের পক্ষে এ তত্ত্ব বুঝান বড় সহজ হইয়াছিল। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, সুতরাং অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম ক্ষাত্রধর্ম্ম বা যুদ্ধ। তিনি যে যুদ্ধ না করিয়া বরং বলিতেছিলেন, যে "ভিক্ষাবলম্বন করিব, সেও ভাল," সেটা তাহার পরধর্ম্মাবলম্বনের ইচ্ছা—কেননা ভিক্ষা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।*

কিন্তু আমরা এই ব্যাখ্যায় সকল বুঝিলাম কি? বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের স্বধর্ম্ম বর্ণবিভাগানুসারে নির্ণীত হইতে পারে, ইহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু অহিন্দুর পক্ষে স্বধর্ম্ম কি? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের যে সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোক সংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ—অধিকাংশ মনুষ্য চতুর্ব্বর্ণের বাহির; তাহাদের স্বধর্ম্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন ধর্ম্ম বিহিত করেন নাই? কোটি কোটি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া কেবল ভারতবাসির জন্য ধর্ম্মবিহিত করিয়া আর সকলকেই ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন? ভগবদুক্ত ধর্ম্ম কি হিন্দুর জন্যই? ম্লেচ্ছেরা কি তাঁহার সন্তান নহে? ভাগবত ধর্ম্ম এমন অনুদার নহে।

---

* শোকমোহাভ্যাং হ্যভিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বত এব ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোপি তস্মাদ্‌যুদ্ধাদুপররাম পরধর্ম্মঞ্চ ভিক্ষাজীবনাদিকং কর্ত্তুং প্রববৃতে।—শাঙ্করভাষ্য।

যিনি স্বয়ং জগদীশ্বরের এইরূপ ধর্ম্মচ্যুতিতে বিশ্বাসবান্, তিনি খ্রীষ্টানের* তুল্য। আর যিনি তাহাতে বিশ্বাসবান্ নহেন, তিনি "স্বধর্ম্মের" অন্য তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান করিবেন সন্দেহ নাই।

যাহার যে ধর্ম্ম, তাহার তাই স্বধর্ম্ম। এখন মনুষ্যের ধর্ম্ম কি? যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। কি লইয়া মনুষ্যত্ব? মানুষের শরীর আছে, এবং মন † আছে। এই শরীরই বা কি? এবং মনই বা কি? শরীর কতকগুলি জড়পদার্থের সমবায়, তাহাতে কতকগুলি শক্তি আছে। এই শক্তিগুলি শরীর হইতে তিরোহিত হইলে, মনুষ্যত্ব থাকে না; কেন না মানুষের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন কথা বলা যায় না। তবেই জড়পদার্থকে ছাড়িয়া দিতে হইবে—সেই দৈহিকী শক্তি গুলিই মনুষ্য শরীরের প্রকৃত উপাদান। আমি স্থানান্তরে এই গুলির নাম দিয়াছি—"শারীরিকী বৃত্তি।" মনুষ্যের মনও এইরূপ শক্তি বা বৃত্তির সমষ্টি। সেই গুলির নাম দেওয়া যাউক, মানসিক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে যে এই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি লইয়াই মানুষ, বা মানুষের মানুষত্ব।

যদি তাই হইল, তবে সেই সকল বৃত্তি গুলির বিহিত অনুশীলনই মানুষের ধর্ম্ম।

বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ম্ম করি, না হয় কিছু জানি। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই। ‡

---

* খ্রীষ্টানদিগের বিশ্বাস যে, যে যীশুখ্রীষ্ট না ভজে জগদীশ্বর তাহাকে অনন্তকাল জন্য নরকে নিক্ষেপ করেন।

† "মন" চলিত কথা, এইজন্য "মন" শব্দ ব্যবহার করিলাম। এই চলিত কথাটি ইংরেজি "mind" শব্দের অনুবাদ মাত্র। হিন্দুদর্শন শাস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে, ইহার পরিবর্ত্তে বুদ্ধি ও মন উভয় শব্দ, এবং তৎসঙ্গে অহঙ্কার এই তিনটি শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে "matter and mind" এই বিভাগের অনুবর্ত্তী হওয়াই ভাল।

‡ কোম্‌ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিনভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন, "Thought, Feeling, Action," ইহা ন্যায্য। কিন্তু Feeling অবশেষে Thought কিম্বা Action প্রাপ্ত হয়। এইজন্য পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দ্বিবিধ বলাও ন্যায্য।

অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম মানুষের স্বধর্ম্ম। সকল বৃত্তি গুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুষ্ঠিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না।* কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধর্ম্মস্থানীয় করেন, কেহ কর্ম্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধর্ম্ম স্বরূপ গ্রহণ করেন।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম ; সমস্ত জগত ব্রহ্মে আছে। এ জন্য জ্ঞানার্জ্জন যাহাদিগের স্বধর্ম্ম তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মণ্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্ম্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্বিষয় আছে, ও বহির্বিষয় আছে। অন্তর্বিষয় কর্ম্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না ; বহির্বিষয়ই কর্ম্মের বিষয়। সেই বহির্বিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হৌক, অথবা সবই হৌক, মনুষ্যের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা, (১) উৎপাদন (২) সংযোজন বা সংগ্রহ (৩) রক্ষা। যাহারা উৎপাদন করে তাহারা কৃষিধর্ম্মী ; (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে তাহারা শিল্প বা বাণিজ্য ধর্ম্মী ; এবং যাহারা রক্ষা করে তাহারা যুদ্ধধর্ম্মী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, একথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি ?

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শূদ্রের ধর্ম্ম নহে ; বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই বৈশ্যের ধর্ম্ম। অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই কৃষি প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। যখন জ্ঞানধর্ম্মী, যুদ্ধধর্ম্মী, বাণিজ্যধর্ম্মী, বা কৃষিধর্ম্মীর কর্ম্মের এত বাহুল্য হয়, যে তদ্ধর্ম্মিগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেনা, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব

* আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি।

(১) জ্ঞানার্জ্জন বা লোক শিক্ষা (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা. (৩) শিল্প বা বাণিজ্য (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম।

ইহার অনুরূপ পাঁচটি জাতি, রূপান্তরে, সকল সমাজেই আছে। তবে অন্য সমাজের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই, যে এখানে ধর্ম্ম পুরুষপরম্পরাগত। কেবল হিন্দু সমাজেই যে এরূপ তাহা নহে, হিন্দুসমাজসংলগ্ন মুসলমানদিগের মধ্যেও এইরূপ ঘটিয়াছে। দরজিরা পুরুষানুক্রমে সিলাই করে, জোলারা পুরুষানুক্রমে বস্ত্র বুনে, কলুরা পুরুষানুক্রমে তৈল বিক্রয় করে। ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরানিবদ্ধ হইলে একটা দোষ ঘটে এই, যে যখন কোন জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, তখন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় কুলান হয় না, কর্ম্মান্তর অবলম্বন না করিলে জীবিকানির্ব্বাহ হয় না। প্রাচীনকালের অপেক্ষা এ কালে শূদ্রজাতির সংখ্যা বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে*। এজন্য শূদ্র এখন কেবল পরিচর্য্যা ছাড়িয়া কৃষিধর্ম্মী। পক্ষান্তরে পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজস্থ অধিকাংশ লোক এইরূপ সামাজিক কারণে শিল্প, বাণিজ্য, বা কৃষিধর্ম্মী ছিল। এবং তাহাদিগেরই নাম বৈশ্য।

সে যাই হৌক, মনুষ্য মাত্রে, জ্ঞান বা কর্ম্মানুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক, শিল্পী, কৃষক, বা পরিচারকধর্ম্মী। সামাজিক অবস্থার গতি দেখিয়া যদি বল, যে মনুষ্য মাত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, তাহাতেও কোন আপত্তি হইতে পারে না। স্থূল কথা, এই যে এই ষড়্‌বিধ বা পঞ্চবিধ বা চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম ভিন্ন মনুষ্যের কর্ম্মান্তর নাই। যদি থাকে, তাহা কুকর্ম্ম।† এই ষড়্‌বিধ কর্ম্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠেয়

* কেবল কাল সহকারে প্রজাবৃদ্ধির কথা বলিতেছি না। "বাঙ্গালির উৎপত্তি" বিষয়ে বঙ্গদর্শনে যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি, যে অনার্য্য জাতিবিশেষসকল হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু শূদ্র জাতি বিশেষে পরিণত হইয়াছে। যথা, পুণ্ড্র নামক প্রাচীন অনার্য্য জাতি বিশেষ এখন কোন স্থানে পুঁড়া কোন স্থানে পোদে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে কালক্রমে শূদ্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বর্ণ সঙ্কর শূদ্রবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

† যথা চৌর্য্যাদি।

কর্ম্ম, তাঁহার Duty. তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত স্বধর্ম্মের উদার ব্যাখ্যা। যাঁহারা ইহার কেবল প্রাচীন হিন্দুসমাজের উপযোগী অর্থ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা ভগবদুক্তিকে অতি সঙ্কীর্ণার্থক বিবেচনা করেন। ভগবান কখনই সঙ্কীর্ণবুদ্ধি নহেন।

যাহা ভগবদুক্তি,—গীতাই হৌক, Bibleই হৌক, স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের স্বমুখনির্গতই হউক, বা তাঁহার অনুগৃহীত মনুষ্যের মুখনির্গতই হউক, যখন উহা প্রচারিত হয়, উহা তখনকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে। এবং তখনকার সমাজের এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার অনুমত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা, এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারসকল কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়। তখন ভগবদুক্তির ব্যাখ্যার ও সম্প্রসারণ আবশ্যক হয়। কেন না, ধর্ম্ম নিত্য; এবং সমাজের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও নিত্য। ঈশ্বরোক্ত ধর্ম্ম যে কেবল একটি বিশেষ সমাজ বা বিশেষ সামাজিক অবস্থার পক্ষেই ধর্ম্ম, সমাজের অবস্থান্তরে তাহা আর খাটিবে না, এজন্য সমাজকে পূর্ব্বাবস্থাতে রাখিতে হইবে, ইহা কখন ঈশ্বরাভিপ্রায়-সঙ্গত হইতে পারে না। কালক্রমে সামাজিক পরিবর্ত্তনানুসারে ঈশ্বরোক্তির সামাজিক জ্ঞানোপযোগিনী ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণোক্ত স্বধর্ম্মের অর্থের ভিতর বর্ণাশ্রমধর্ম্মও আছে; আমি যাহা বুঝাইলাম তাহাও আছে, কেননা উহা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সম্প্রসারণ মাত্র। তবে প্রাচীনকালে বর্ণাশ্রম বুঝিলেই ঈশ্বরোক্তির কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়; আমি যেরূপ বুঝাইলাম, এখন সেইরূপ বুঝিলেই কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়।

স্বধর্ম্ম কি, তাহা যদি, যা হৌক এক রকম, আমরা বুঝিয়া থাকি, তবে এক্ষণে স্বধর্ম্ম পালন কেন করিব তাহা বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ দুই প্রকার বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক এ তত্ত্ব অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন। একটি জ্ঞান মার্গ, আর একটি কর্ম্ম মার্গ। এই অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোক হইতে আটত্রিশ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞান মার্গ কীর্ত্তন, তৎপরে কর্ম্ম মার্গ।

জ্ঞানমার্গের স্থূল তত্ত্ব আত্মা অবিনশ্বর। পর শ্লোকে সেই কথা উঠিতেছে।

নিষ্কাম কর্ম্ম।

"এখন এসো প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি 'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র, কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ তাই আবার আসিলাম

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশয় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'"

গ্রন্থকার এই কটি কথা বলিয়া তাঁহার দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। এই দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থ বাহির হইবার পর হইতেই একটি বাক্য আমাদের সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। কথাটি পুরাতন—সেই একটি কথার ভিতরে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নিহিত রহিয়াছে—সেই একটি কথার ভিতরে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, শাস্ত্র সমুদায় লুক্কায়িত রহিয়াছে,—ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাগণের মধ্যে যে বিবাদ বিষম্বাদ, সমুদায় সেই একটি কথার আশ্রয়ে বিলুপ্ত হইয়া যায়, মৃত সঞ্জীবনী রস যদি কোথাও থাকে তবে তাহা সেই কথাটির ভিতর আছে। কথাটি—নিষ্কাম কর্ম্ম।

এক একটি কথা কে জানে কেমন সময় বুঝিয়া, সমাজের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়া, কত কি কার্য্য সমাধা করিয়া, আবার চলিয়া যায়। এক Liberty, Fraternity, Equality তিনটি কথা ফ্রান্সে কি কাণ্ড না করিয়াছে। এই সব দেখিয়া আমি ইহা বুঝি যে, এক একটি বাক্যই এক একটি দেবতা। হিন্দুরা বলেন বেদের বাক্‌শক্তিই দৈবশক্তি, এবং সেই দৈবশক্তি হইতেই জগৎ চলিতেছে; প্লেটোও ঐরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন। প্লেটো বলেন যে "Ideas rule this world"। মনুষ্যসমাজচক্র আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এক এক সময়ে এক একটি বাক্যই যেন সমাজের রাজা স্বরূপ হইয়া আধিপত্য করিতে থাকে। তাই বলিতেছিলাম যে এক একটি বাক্যই এক একটি দেবতা। আজকাল যে

বাক্যটি আমাদের সমাজের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইতে কালে যে কত অমৃতময় ফল ফলিবে তাহা এখন কে বলিতে পারে? কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, কথাটি সম্যক্ আদর না পাইয়া হয় ত অল্পদিন মধ্যেই সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। এক একটি কথা এক একটি বীজ স্বরূপ। সম্যক্ জল সেচন না করিলে বীজ প্রায়ই শুকাইয়া যায়; চিন্তা-স্রোতের জলে বাক্য-বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাই বলি যে যখন সুন্দর, শুভফল-প্রদ বাক্য তোমাদের সাক্ষাতে দেখা দিবে, তখন তাহাকে হৃদয়ে করিয়া, মনের মধ্যে স্থান দিয়া, তাহার সম্যক্ উপাসনা করিও। সকলে মিলিয়া একটি কথা লইয়া সদাই মনোমধ্যে বিচার করিতে থাক, তবেই দেখিবে যে, অল্পদিন মধ্যেই সেই কথা কতদূর প্রভাবশালী হইয়া উঠিবে। ভয়ানক ঝড়ের পর আকাশ যে শান্তভাব ধারণ করে, পতিব্রতা রমণীর মুখের যে মাধুর্য্যময় ভাব, মদন ভস্ম করিতে উদ্যত মহাদেবের যে রৌদ্র ভাব, যে বিশ্বব্যাপী করুণ ভাবের বশে বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হইয়া জগৎ মাতাইয়া গিয়াছেন, সেই সকল ভাব গুলি একত্রিত হইয়া এই "নিষ্কামকর্ম্ম" কথাটির ভিতর রহিয়াছে দেখিতে পাই। এমন সুন্দর কথাটি যখন আমাদের সমক্ষে আসিয়াছে, তখন এস আমরা সকলে মিলিয়া এই কথার উপাসনা করি। এই "নিষ্কাম কর্ম্ম" কথাটির অর্থভাবনা, এবং সেই ভাবনানুযায়ী কর্ম্ম দ্বারা নিজের জীবন পরিচালিত করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব; সুতরাং ইহারই নাম ঈশ্বরোপাসনা।

যখন কোন একটি বড় প্রয়োজনীয় কথা মনে আসিয়াও আসিতেছে না, তখন মনের ভিতর কি একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তাহার পর কিছুক্ষণ বাদে হয় ত কথাটির গোড়ার অক্ষরটি মনে আসিলে আবার সেই অক্ষরটি অবলম্বন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে হারান কথাটি পুনরায় মনে ফিরিয়া আসিতে পারে। আমাদের হিন্দুসমাজ কি একটি বড় প্রয়োজনীয় সত্য মনে আনিয়াও মনে আনিতে পারিতেছে না। কি কতকগুলি পুরাতন কথার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া দৃঢ়বদ্ধ সমাজ গঠিত হইয়াছিল সেই গুলি সমাজ ভুলিয়া গিয়াছে। আজ কাল জ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হওয়ায় সেই কথা গুলি মনে আনিবার ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু মনে আসিতেছে না—সমাজের

বড়ই যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে। সমাজের ভিতর কেবল দলাদলি বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। এমন সময় এই যে "নিষ্কাম কর্ম্ম" কথাটি আমাদের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এইটি সেই সমস্ত হারান বাক্যের আদ্য অক্ষর স্বরূপ। এই গোড়ার কথাটি কেহ মন হইতে ছাড়িয়া দিও না, এই গোড়ার কথাটি অবলম্বনে পুরাতন কথা গুলি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে থাক, তাহা হইলেই যাহাদের ভুলিয়াছি তাহারা ক্রমে ক্রমে দেখা দিবে, ভারতের পূর্ব্বগৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে।

আজি 'দেবী-চৌধুরাণী" অবলম্বন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে গুটিকত বলিতে চাহি। নিষ্কাম ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিরূপ ক্ষেত্রে নিষ্কাম ধর্ম্মের বীজ ফলপ্রদ হয় তাহাই এই প্রথম পরিচ্ছেদে বুঝান আছে।

প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মার কথোপকথন লইয়া গ্রন্থের আরম্ভ। ইহারা কাঙ্গালিনী। মা মেয়েকে ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুন চেয়ে আনিতে বলিল।

প্রফুল্লমুখী বলিল,—"আমি পারিব না, আমার চাইতে লজ্জা করে।"

মা। তবে খাবি কি? আজ যে ঘরে কিছু নাই।

প্র। তা শুধু ভাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন গা?

কিন্তু শুধু ভাতও জোটে না—ঘরে চাল নাই। কাজেই মা ধার করিতে চলিল। কন্যা বলিল "আমরা কত লোকের চাল ধারি, শোধ দিতে পারি না আর ধার করিও না। আজ মায়ে ঝিয়ে পৈতা তুলি, কাল বিক্রয় করিয়া চাল কিনিব।" কিন্তু পৈতার পাঁজটা পর্য্যন্ত গৃহে নাই—তখন প্রফুল্লমুখী অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল। মা আবার ধুচুনি লইয়া চাল ধার করিতে যায় দেখিয়া প্রফুল্ল বলিল—"মা আমি কেন ধার করে খাব? আমার ত সব আছে। আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে শ্বশুরের অন্ন খাইতে পাই না? শোন মা, আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি—শ্বশুরের অন্ন কপালে জোটে তবে খাইব, নহিলে আর খাইব না। যাহাদের উপর আমার ভরণপোষণের ভার তাহাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করিতে আমার অপমান নাই। আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইব তাহাতে লজ্জা কি?"

এই প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে আমরা কি শিখিলাম ?

যদি মরিতে হয় সেও স্বীকার, তথাপি যে ধার শোধ দিতে পারিব না সে ধার করিতে মনে যাঁহার সদাই সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, তাঁহার চিত্ত নিষ্কাম-ধর্ম্মবীজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। একদিন দু মূঠা চাল ধার করিয়া সেই ধার শোধ দিতে না পারিলে যে কেহ একেবারে ধর্ম্মে পতিত হয়, এ কথা যদিও ঠিক নহে ; কিন্তু যে জনের চিত্তের গঠন এরূপ সুন্দর; যে তিনি কোন সামান্য বিষয়েও ঋণী থাকিতে ইচ্ছা করেন না, নিষ্কাম ধর্ম্ম তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ঋণ পরিশোধ করিবার জন্যই এ জীবন ধারণ করিয়াছি, নূতন কোন ঋণে আবদ্ধ হইতে যেন না হয়, এইরূপ মনে করিয়া কার্য্য করিতে শিখাই নিষ্কাম কর্ম্মের প্রথম আরম্ভ। অপ্রতিগ্রহ নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।

২য়। প্রফুল্লের লজ্জা। পাড়া পড়সীর নিকট হইতে একটা বেগুন চাইতে প্রফুল্লের লজ্জা করে। কিন্তু যে শ্বশুর বাড়ীতে কখনও তাহার নাম করে না সেইখানে উপযাচিকা হইয়া যাইতে প্রফুল্লের লজ্জা নাই। ইহার কারণ যাহাদের উপর ধর্ম্মতঃ তাহার ভরণ পোষণের ভার তাহাদের কাছে অন্ন ভিক্ষা করিতে প্রফুল্লমুখী লজ্জিতা নহেন।

লজ্জা দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার লজ্জা ধর্ম্মচর্চ্চার অনুকূল এবং অন্য প্রকার লজ্জা ধর্ম্মচর্চ্চার প্রতিকূল। আমি এ কাজটা কেমন করিয়া করিব, পাঁচজনে আমার নিন্দা করিবে এবং সেই ভয়ে কোন কাজ করিতে যে সঙ্কোচ হয় তাহা একপ্রকারের লজ্জা এবং যে কাজ আমার নিজের মনে অধর্ম্ম বলিয়া বুঝি তাহা করিতে যে সঙ্কোচ, তাহা অন্য প্রকারের লজ্জা। যাঁহাদের লজ্জা কেবল লোক নিন্দার উপর নির্ভর করে তাঁহারা গোপনে অধর্ম্মাচরণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, কিম্বা সমাজে যে সকল অধর্ম্ম প্রশ্রয় পাইয়াছে সেই সমস্ত অধর্ম্মাচরণে তাঁহাদের লজ্জা হয় না। কিন্তু উন্নতচেতাদের লজ্জা অন্যরূপ। যাহাতে চিত্তের সঙ্কীর্ণতা জন্মিতে পারে, এইরূপ ভাব মনে আসিলেই তাঁহাদের চিত্ত আপনা আপনি কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং সেই বিষয়ে কেমন লজ্জা উপস্থিত হয়। এইরূপ লজ্জাই ধর্ম্মের সহায়। প্রফুল্ল গরিব কাঙ্গাল একটা বেগুন চাইতে গেলে পাঁচজনে

তাহাকে লজ্জা দিবে না বটে, কিন্তু ঐ ভিক্ষা করিবার নামেই তাহার প্রশস্ত মনে কেমন লজ্জা উপস্থিত হইল। "দারিদ্র্যদোষোহি গুণরাশিনাশী" এই একটি কথা প্রচলিত আছে; কথাটি অধিকাংশ স্থলেই সত্য, কিন্তু প্রফুল্লের দারিদ্র্য তাহার মানসিক তেজ নষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই; প্রফুল্ল পৈতা তুলিয়া খাইবে, তবু ভিক্ষা করিতে রাজি নহে। যিনি নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিতে চান, তাঁহার চিত্তকে প্রথমে এইরূপ গড়িয়া লইতে হইবে যেন গুণরাশিনাশী দারিদ্র্যদশা উপস্থিত হইলেও তাঁহার চিত্তের প্রশস্ততা না কমে।

প্রফুল্লের লজ্জার কথা বলিতেছিলাম। প্রফুল্ল যখন উপযাচিকা হইয়া শ্বশুর বাড়ী যাইবে, তখন তাহারা কত কি কথা কহিবে, পাঁচ জনে কত নিন্দা করিবে, তাহাকে কত লোকে বেহায়া বলিবে, এ সব কথা মনে আসিলে প্রফুল্লের উন্নত চিত্তের কোন সংকোচ জন্মাইতে পারে নাই; কেন না ধর্ম্মতঃ তাঁহার যাহাতে অধিকার আছে, তাহা পাইবার চেষ্টা করায় তাঁহার চিত্তে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা জন্মিতে পারে না, ইহা তাঁহার অন্তরের দেবতা তাঁহার মনকে বুঝাইয়াছিল।

নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিতে গেলে প্রথমতঃ অন্যায় লোকলজ্জা ত্যাগ করিতে শিখিতে হইবে। সামান্য লোকলজ্জা ভয়ে ধর্ম্মকর্ম্মে যেন কুণ্ঠিত হইতে না হয়। মান অপমান বোধটি দুরস্ত করিয়া লইতে হইবে। পাঁচজনের কাছে ছোট হইয়া দাঁড়াইতে হইলে আমাদের অপমান বোধ হয়—কিন্তু উন্নত-চেতা কেবল নিজের অন্তরের সাক্ষী দেবতার নিকট সঙ্কীর্ণ মন লইয়া দাঁড়াইতে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন।

৩য়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়া গিয়াছেন

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

এই স্বধর্ম্ম প্রতিপালনই নিষ্কাম ধর্ম্মের সার কথা।

এই ধর্ম্মপ্রতিপালন কথাটি চিত্রিত করাই দেবীচৌধুরাণীগ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা দেখিতে পাই যে, এই গ্রন্থের নায়িকা অশিক্ষিতা অবস্থাতেও স্বতঃই স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে তৎপরা। বিবাহিতা স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার স্বামীর উপর। স্বামীর অন্নে স্ত্রী সেই দেহ পোষণ

করিয়া স্বামী-সেবায় সেই দেহ পাত করিবে, ইহাই বিবাহিতা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। আপনা হইতেই প্রফুল্লর মনে এই কথা উদয় হইয়াছে যে, আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইতে লজ্জা করা অকর্ত্তব্য।

ভিক্ষা করিও না, যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না সেরূপ ঋণে বদ্ধ হইও না, এবং আপনার ধন যদি পরের নিকট থাকে তবে সেই ধন চাহিয়া লইয়া ভোগ করিতে লজ্জিত হইও না।—নিষ্কাম কর্ম্ম যিনি অভ্যাস করিতে চান তাঁহাকে এই কয়টি কথানুসারে কার্য্য করিতে প্রথম শিখিতে হইবে। এই কয়টি কথার ভিতরেই নিষ্কাম ধর্ম্মের সমস্ত রহস্য লুকায়িত রহিয়াছে। নিজের ধন অর্থাৎ নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিতে কখনও সঙ্কুচিত হইও না, কেন না কর্ম্মফল ভোগ করিয়া কর্ম্ম ক্ষয় করাই নিষ্কামধর্ম্মের উদ্দেশ্য। পরের ধন অর্থাৎ পরের কর্ম্মের ফল উপভোগ করিতে যেন কখনও প্রবৃত্তি না হয়, কেন না তাহা হইলে তোমাকে নূতন ঋণে বদ্ধ হইতে হইবে এবং যত দিন সেই ঋণ-মুক্ত না হও তত দিন তোমার মুক্তি হইবে না।

এই সংসারটা একটা ভারি বাজার। আমরা সকলেই এক এক জন ব্যাপারী। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে দেনা পাওনার ব্যাপারে জড়াইয়া রহিয়াছি। এ বাজারে ব্যবসা ক'রে লাভটা যে কি তাত কিছুই খুঁজে পেলাম না, তাই এক এক দিন দোকান পাঠ বন্ধ ক'রে পালাবার মতলব হয়। কিন্তু পালাবার যো নাই। দেনা পাওনা না চুকাইয়া যাইবার যো নাই। যিনি এই সংসারের বাজারের দেনা পাওনার খাতা পত্র লইয়া হিসাব রোকসোদ করিবার মতলব করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মকেই নিষ্কাম ধর্ম্ম বলা যায়। বাজার দেনার জ্বালায় এক এক সময় বড়ই অস্থির হইতে হয়; তোমরা কেউ বাজার দেনা রাখিও না। যেখানে একটু ময়লা একদিন জমে তাহা যদি তখনই পরিষ্কার না কর, তবে পরদিন আর একটু ময়লা জমিবে। বাজার দেনাও সেই রকম। সেই জন্য আমি এক পরামর্শ বলি তোমরা শুন, যখন কিছু খরিদ করিতে হইবে, তখন উহা নগদমূল্যে খরিদ করিয়া আনিয়া খরচ করিও। এক এক জনের এমনি স্বভাব আছে যে তাঁহারা ধারে হাতি কিনিতে পারেন—এরূপ লোক

শেষ দশায় বড়ই কষ্ট পান। যিনি নগদ মূল্যে খরিদ করিয়া খরচ করেন তাঁহাকে দেনা পাওনার হিসাবের গোলমালে পড়িতে হইবে না। কর্ম্মের খাতায় যা লেখা আছে তাহা আবার এমনি মুহুরীর লেখা, যে বোঝে কার সাধ্য। এই লেখা পড়িতে শিখার নাম জ্ঞানচর্চ্চা। এসব কথা সময়ান্তরে তুলিব।

এই বারে দেবীচৌধুরাণীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রফুল্লমুখীর কি গুণের পরিচয় আছে তাহা দেখা যাউক। প্রফুল্লমুখী মাকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুর বাড়ীতে পহুঁছিল। প্রফুল্লের মার এক মিথ্যা অপবাদ প্রচার হওয়া অবধি প্রফুল্লর শ্বশুর তাহাদের সহিত অনেক দিন হইতে সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রফুল্ল তাঁহার মাকে সঙ্গে লইয়া উপযাচিকা হইয়া শ্বশুর-বাড়ীতে আসিয়াছে দেখিয়া গৃহিণী বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। গৃহিণীর সহিত দু চারি কথা হওয়ার পরই মা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। প্রফুল্ল গেল না, যেমন ঘোমটা দেওয়া ছিল তেমনই ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিল "তোমার মা গেল তুমিও যাও। নড় না যে? কি জ্বালা আবার কি তোমার সঙ্গে লোক দিতে হবে না কি?"

নিরভিমানিনী প্রফুল্লমুখী এখন মুখের ঘোমটা খুলিল, চাঁদপানা মুখ, চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে। শাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এমন চাঁদপানা বৌ নিয়ে ঘর করিতে পেলেম না।" মন একটু নরম হইল।

প্রফুল্ল অতি অস্ফুটস্বরে বলিল "আমি যাইব বলিয়া আসি নাই"।

গিন্নি। তা কি করিব মা—আমার কি অসাধ যে তোমায় নিয়ে ঘর করি? লোকে পাঁচ কথা বলে—একঘরে করবে বলে, কাজেই তোমায় ত্যাগ করতে হয়েছে।

প্রফুল্ল। মা একঘরে হবার ভয়ে কোথায় সন্তান ত্যাগ করেছে? আমি কি তোমার সন্তান নই?

শাশুড়ীর মন আরও নরম হইল। বলিলেন, "কি জান মা, জেতের ভয়।"

প্রফুল্ল পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিল "হলেম যেন আমি অজাতি—কত

শূদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কি?"

গিন্নি আর বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন "তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কর্ত্তার কাছে তিনি কি বলেন। তুমি এখানে বসো মা বসো।" প্রফুল্ল তখন চাপিয়া বসিল।

এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা ইহা দেখিতে পাই যে, যে ব্যক্তি দারুণ কঠোর ভাব ধারণ করিয়া প্রফুল্লকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি প্রফুল্লের দুটি গুণে একেবারে নরম হইয়া তাহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। গুণ দুটি এই—প্রফুল্লর মুখশ্রী বড় সুন্দর এবং কথা বড় মিষ্ট। যদি কেহ তোমরা নিষ্কাম ধর্ম্মব্রতাবলম্বী হইয়া সমাজে আদর্শ স্বরূপ দাঁড়াইতে অভিলাষ করিয়া থাক, তবে প্রফুল্লের ন্যায় মুখশ্রী সুন্দর করিতে শিখ এবং মিষ্ট কথায় (তা বলিয়া যেন কথা মিথ্যা না হয়) লোককে তোমার পক্ষাবলম্বী করিতে শিখ। মুখের শ্রীর এবং মুখের কথার সৌন্দর্য্যরজ্জুতে সমাজকে বাঁধিয়া ধর্ম্মের দিকে টানিতে শিখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেব, যীশু, চৈতন্য সকলেই মুখশ্রী এবং বাক্যের মধুরতার মোহিনীশক্তির সহিত ধর্ম্মের পবিত্রতা মিশাইয়া জগৎ মাতাইয়া গিয়াছেন।

মুখশ্রী সুন্দর করিতে শিখ—এই কথা বলায় অনেকে হয়ত বলিবেন যে, ওটা কি নিজের হাত, যে নিজের চেষ্টায় মানুষ মুখের শ্রী সুন্দর করিতে পারিবে? যে যেমন মুখ লইয়া জন্মিয়াছে সে মুখ কি সে বদল করিতে পারিবে? আমি এইরূপ কথার উত্তরে এই কথা বলিতে চাই যে আমার যা কিছু সবই আমার কর্ম্মের ফল, আমাতে যা কিছু কুৎসিৎ তাহাকে সুন্দর করিয়া আনা ও আমার চেষ্টার উপর নির্ভর করে। আমি যদি এ জন্মে কুৎসিৎ মুখ লইয়া জন্মিয়া থাকি তাহা আমার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল, এ জন্মে আবার উপযুক্ত কর্ম্ম ও অভ্যাস দ্বারা পরজন্মে সুন্দর মুখ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব। যিনি পরজন্ম পূর্ব্বজন্ম মানিতে চান না তাঁহাকে এই কথা বলিতে পারি, যে যাহাকে মুখশ্রী বলা যায় এই জন্মেই তাহার পরিবর্ত্তন করা মনুষ্যের নিজের আয়ত্তাধীন। একই মুখের শ্রী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিয়াছ কি? হাসিভরা আশা মাখা যে মুখের শ্রী

একদিন বড় সুন্দর দেখিয়াছি সেই মুখে যখন অসন্তোষব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ পায় এবং মুখ হাসি শূন্য হইয়া গোম্‌ড়া পানা হইয়া থাকে তখন সেই মুখই আবার কুৎসিৎ বলিয়া বোধ হয়। মনের ভাব যে আকারে মুখে প্রকাশ পায় তাহাকে মুখের শ্রী বলিতে পারা যায়। ক্রমাগত সুন্দর ভাব মনোমধ্যে আনিতে অভ্যাস করিতে করিতে মুখের শ্রীও ক্রমে ক্রমে সুন্দর হইতে থাকে। মনে আনন্দ ভার উদয় হইলে মুখ যেন হাসি হাসি হয়। কিন্তু অসন্তোষ ভাব মনে আসিলে মুখের ভাব অন্য রূপ হইয়া যায়। আনন্দ ভাবের উদয়ের সঙ্গে মুখের পেশী সকলে এক প্রকার টান্ পড়ে। কিন্তু অসন্তোষ ভাবের উদয়ে মাংস পেশী সকলে অন্যরূপ টান পড়ে, পেশী গুলি যেন ভ্রূর গোড়ায় কুঁচ-কায় এবং ঠোট দুখানিকে যেন একটু বেশী চাপিয়া দেয়। এখন দেখ যিনি ক্রমাগত চিত্তে আনন্দ, আশা, সন্তোষ এই সকল সুন্দর ভাব আনিতে চেষ্টা করেন তাঁহার মুখের মাংসপেশী সকল ক্রমাগত সুন্দর ভাবে টান পাইতে থাকে, এবং সুন্দর ভাবব্যঞ্জক মুখের শ্রীটুকু মুখ মণ্ডলে স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়। মনের অসন্তোষে আবার কত সুন্দর মুখ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায় ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন; সুন্দর মুখ যখন শ্রীভ্রষ্ট হইতে পারে তখন যাহা সুন্দর নয় তাহাও চেষ্টা ও অভ্যাসে সুন্দর হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

মনে সুন্দর ভাব উদিত করিয়া সেই ভাব বাহিরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে এবং এই অভ্যাস দ্বারা মুখশ্রী সুন্দর হইবে। নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিতে গেলে ভিতর ও বাহির দুই সুন্দর করিতে হইবে। এই খানে একটি কথা বলিয়া রাখি—মুখে পাউডার মাখিলে মুখশ্রী সুন্দর হয় না।

এইবারে মিষ্ট কথা সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব। যযাতি পুরুকে রাজ্য-ভার অর্পণ করিয়া যে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন তাহার ভিতর এই কটি কথা আছে

"যে কথায় অন্যে উদ্বিগ্ন হয় এমত কথা উচ্চারণ করা অনুচিত। যে ব্যক্তি লোকের মর্ম্মপীড়ক, পরুষ-ভাষী ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহাকে অলক্ষীক বলে! তাহার মুখে অলক্ষীর চিহ্ন সকল সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অসতেরা আপন মুখ হইতে নির্গত বাক্য রূপ সায়ক

দ্বারা অন্যকে আহত করে। আহত ব্যক্তি ঐ সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অহর্নিশ যন্ত্রণা ভোগ করে। অতএব পণ্ডিতেরা তাঁহা কস্মিন কালেও অন্যের উপর নিক্ষেপ করেন না। জীবের প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান, ও মধুর বাক্য প্রয়োজন, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না। অতএব সর্ব্বদা সান্ত্ব-বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কদাচ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিও না।”— মহাভারত কালীসিংহের অনুবাদ।

মিষ্ট কথা উন্নত চিত্তের পরিচায়ক। কিন্তু মিষ্টকথা কহিবার জন্য কেহ যেন মিথ্যাবাদী না হন। মিথ্যার ন্যায় অধর্ম্ম আর নাই।

অন্তরে ভালবাসার ভাব যত বাড়িবে মুখের কথাও সেই অনুযায়ী সুমিষ্ট হইতে থাকিবে। অন্তরের প্রেম, দয়া, এবং মৈত্রী ভাব বাহিরে মিষ্ট কথায় প্রকাশ পায়। যদি অন্তরে ভালবাস, দয়া, ও মৈত্রীভাব না থাকে তবে কেবল মিষ্ট কথা কহা কপটাচার। প্রফুল্লমুখীর হৃদয় ভালবাসা, দয়া, ও মৈত্রীভাবে পূর্ণ; তাই তিনি মিষ্টভাষী হইয়া মিষ্ট কথায় শাশুড়ীর মন নরম করিতে পারিয়াছিলেন। প্রফুল্লমুখীর প্রফুল্ল অন্তঃকরণে দয়া, মৈত্রী ভাব, ও ভালবাসা যে কত স্রোতবাহী তাহা পরে প্রকাশ পাইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

অলস জোছনাময়ী নিথর যামিনী।

১

অলস জোছনাময়ী নিথর যামিনী;
মৃদুল মধুর বায়,
ধীরে নদী ব’হে যায়,
মধু ভরে ঝরে পড়ে বকুল কামিনী।
অলস জোছনাময়ী নিথর যামিনী।—

২

প'ড়ে আছি নদী-কূলে শ্যাম দুর্ব্বাদলে;
—কি যেন মদিরা পানে,
কি যেন প্রেমের গানে,
কি যেন নারীর রূপে ছেয়েছে সকলে!
প'ড়ে আছি নদী-কূলে শ্যাম দুর্ব্বাদলে।

৩

অবশ পরাণ যেন গেছে ভেঙ্গে চুরে!
কতটা যেন কি স্রোতে
ভেসে গেছে ধরা হ'তে!
অবশিষ্ট ল'য়ে আমি ব'সে আছি দূরে!—
অবশ পরাণ যেন গেছে ভেঙ্গে চুরে!

৪

—ধীরে ধীরে আসে স্মৃতি, যেন কার্ কথা!
না জানায়ে আসে যায়,
হাসি অশ্রু নাই তায়!
—দিয়ে মৃদু অনুভব, মৃদু অলসতা,
ধীরে ধীরে আসে স্মৃতি, যেন কার্ কথা!

৫

প'ড়েছি গাথায় কোন্, যেন কোন নারী,
এমনি মধুর রাতে,
তরু-তলে, ধীর বাতে,
অঞ্চলে মুছিয়া গেছে নয়নের বারি!
—প'ড়েছি গাথায় কোন্, যেন কোন নারী!

৬

শুকায়ে গিয়াছে কোথা কার্ ফুল-হার!
খেলিতে নদীর কূলে,
কি ফেলিয়া গেছে ভুলে!
—বাঁধিতে পারেনি ফিরে ঘরে মন তার!
শুকায়ে গিয়াছে কোথা কার্ ফুল-হার!

৭

শুনেছি বাঁশীতে কার্ কোথাকার সুরে!
কে নাহি দেখিলে চাই'—
এ জগতে কিছু নাই!
—ভাঙ্গিতে গড়িতে সুধু নিজে ভেঙ্গে-চুরে,
শুনেছি বাঁশীতে কার্ কোথাকার সুরে!

৮

দেখেছি হাসিতে যেন অশ্রুজল কার্!
—দেখা হ'লে নত আঁখি,
দুটি শ্বাস থাকি থাকি,
আকুল পরাণ-পাখী—ছাড়িতে সংসার!
—দেখেছি হাসিতে যেন অশ্রুজল কার্।

৯

দেখেছি অশ্রুতে যেন কার্ মৃদু হাসি!
—দীপ নিভ-নিভ-প্রায়,
চারিদিকে হায় হায়;
—নিস্পন্দ নয়নে চেয়ে, ভাল বাসাবাসি!
দেখেছি অশ্রুতে যেন কার্ মৃদু হাসি।

১০

—সত্য যেন উপকথা, দূর স্বপ্ন-জাল!
জানিতে হয় না সাধ,—
গত দুখে সুখ-স্বাদ!
পরের ঘটনা ল'য়ে কাটে যেন কাল!
সত্য যেন উপকথা, দূর স্বপ্ন-জাল!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

NAWAB FAMILY LIBRARY MOHARAYA

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥ ১২॥

অনুবাদ।

আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে। তুমি বা এই রাজগণ ছিলেন না, এমন নহে। ইহার পরে আমরা সকলে যে থাকিব না, এমন নহে। ১২।

টীকা।

যুদ্ধে স্বজন-নিধন সম্ভাবনা দেখিয়া অর্জ্জুন অনুতাপ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ ইহার পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন, "যাহার জন্য শোক করিতে নাই, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ।" যে মরিবে, তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে কেন, তাহা এই শ্লোকে বুঝাইতেছেন। ভাবার্থ এই, যে "দেখ, কেহ মরে না। দেখ আমি, তুমি, আর এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই চিরস্থায়ী; পূর্ব্বে ও সকলেই ছিলাম, এ জীবন-ধ্বংসের পর সবাই থাকিবে। যদি থাকিবে, মরিবে না, তবে তাহাদের জন্য শোক করিবে কেন?"

ইহাই হিন্দুধর্ম্মের স্থূল কথা—হিন্দু ধর্ম্মান্তর্গত প্রধান তত্ত্ব। কেবল হিন্দু-ধর্ম্মের নহে, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের, বৌদ্ধ ধর্ম্মের, ইস্‌লাম ধর্ম্মের, সকল ধর্ম্মের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ত্ব। সে তত্ত্ব এই যে দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা অবিনাশী। শরীরের ধ্বংস হইলেও আত্মা পরকালে বিদ্যমান্ থাকে। পরকালে আত্মার কি অবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে নানা মত ভেদ আছে ও হইতে পারে, কিন্তু দেহাতিরিক্ত অথচ দেহস্থিত আত্মা আছেন, এবং তিনি বিনাশ-শূন্য, অমর, ইহা হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, মুসলমান, প্রভৃতি সকলের সম্মত। এই সকল ধর্ম্মের ইহাই মূলভিত্তি।

এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা। তাঁহারা বলেন, শরীরাতিরিক্ত আর কিছু নাই। শরীরাতিরিক্ত আর একটা যে আত্মা আছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমান নাই।

আজ কাল বৈজ্ঞানিকেরাই বড় বলবান্। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম এক-দিকে, তাঁহারা আর একদিকে তাঁহাদের প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম, হঠিয়া যাইতেছে। অথচ বিজ্ঞানের * অপেক্ষা ধর্ম্ম বড়। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম বড় বলিয়া আমরা বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। ধর্ম্ম ও সত্য, বিজ্ঞানও সত্য। অতএব এস্থলে আমাদের বিচার করিয়া দেখা যাউক, কতটুকু সত্য, কোন দিকে আছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী, বিজ্ঞান জানুন, বা না জানুন, বিজ্ঞানের প্রতি অচলভক্তিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ হয়, জাহাজ চলে, কল চলে, কাপড় হয়, নানা রকমে টাকা আসে, অতএব বিজ্ঞানই তাঁহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ। যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা যাইতেছে, তখন আত্মবাদের বিজ্ঞান যে প্রতিবাদ করেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

এ বিচারে আগে বুঝা কর্ত্তব্য যে আত্মা কাহাকে বলা যাইতেছে, এবং হিন্দুরা আত্মাকে কি রূপ বুঝে।

হিন্দু দার্শনিকেরা আত্মাকে বলেন, "অহম্প্রত্যয়বিষয়াহম্পদপ্রত্যয় লক্ষিতার্থঃ"—অর্থাৎ "আমি" বলিলে যাহা বুঝিব, সেই আত্মা। এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই বাক্যের সম্প্রসারণ মাত্র।

"আমি দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু আমি কে? বাহ্য-প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু তোমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি—আমি বড় সুখী। কিন্তু একটী মনুষ্য দেহ ভিন্ন "তুমি" বলিব এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখ দুঃখ ভোগ বলিব?

তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর

---

* পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে প্রচলিত প্রথানুসারে Science কেই বিজ্ঞান বলিতেছি ও বলিব।

কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে, তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমার দেহ দুঃখভোগ করে না। যে দুঃখ-ভোগ করে সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে।

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইন্দ্রিয়-গোচর, কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, এবং সুখ দুঃখাদির ভোগ কর্ত্তা। যে সুখ দুঃখাদির ভোগ কর্ত্তা সেই আত্মা।"*

আত্মতত্ত্ব বিষয়ক, এই স্থূল কথাটা খ্রীষ্টীয়াদি সকল ধর্ম্মেই আছে। কিন্তু তাহার উপর আর একটা অতি সূক্ষ্ম, অতি চমৎকার কথা, কেবল হিন্দু ধর্ম্মেই আছে। সেই তত্ত্ব অতি উন্নত, উদার, বিশুদ্ধ, বিশ্বাসমাত্রে মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়। হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতিই সেই অতি মহত্তত্ত্ব অনুভূত করিতে পারে নাই। যে সকল কারণে, হিন্দু ধর্ম্ম অন্য সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা তাহার মধ্যে একটি অতি গুরুতর কারণ। সেই তত্ত্ব এখন বুঝাইতেছি।

আত্মা সকলেরই আছে। তুমি যখন আমা হইতে ভিন্ন, তখন তোমার আত্মা আমা হইতে কাজেই ভিন্ন। কিন্তু ভিন্ন হইয়াও প্রকৃত রূপে ভিন্ন নহে। মনে কর বহু সংখ্যক শূন্য পাত্র আছে। তাহার সকলগুলির ভিতর আকাশ আছে। এক পাত্রাভ্যন্তরস্থ আকাশ পাত্রান্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন। কিন্তু পৃথক্ হইলেও সকল পাত্রস্থ আকাশ জাগতিক আকাশের অংশ। পাত্রগুলি ভগ্ন করিলেই আর কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। সকল পাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবগত আত্মা পরস্পর পৃথক্ হইলেও জাগতিক আত্মার অংশ; দেহ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলে সেই জাগতিক আত্মায় বিলীন হয়। এই জগদাত্মাকে হিন্দু-দার্শনিকেরা পরমাত্মা বলেন। জীব দেহস্থায়ী আত্মা যতদিন সেই পরমাত্মায় বিলীন না হয় ততদিন তাহাকে জীবাত্মা বলেন।

এখন এই জীবাত্মা কি নশ্বর? দেহের ধ্বংস হইলেই কি তাহার ধ্বংস হইল? ইহার সহজ উত্তর এই যে, যাহা অবিনশ্বরের অংশ, তাহা কখন

---

* প্রবন্ধ পুস্তক।

নশ্বর হইতে পারে না। যদি জাগতিক আকাশ অবিনশ্বর হয়, তবে ভাণ্ডস্থ আকাশও অবিনশ্বর। যদি পরমাত্মা অবিনশ্বর হয়েন, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর।

এই হইল হিন্দু ধর্ম্মের কথা। অন্য কোন ধর্ম্ম এই অত্যুন্নত তত্ত্বের নিকটেও আসিতে পারেন নাই। আমরা পরে দেখাইব যে, ইহার অপেক্ষা উন্নত তত্ত্ব মনুষ্যজ্ঞাত তত্ত্বের ভিতর আর নাই বলিলেও হয়। প্রাচীন ঋষিরা বলিতে পারেন, "আমরা যদি আর কিছু না করিতাম, কেবল এই কথাটা পৃথিবীতে প্রচার করিয়া যাইতাম, তাহা হইলেও আমরা সকল মনুষ্যের উপরে আসন পাইবার যোগ্য হইতাম।" * বাস্তবিক এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে মনুষ্য মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না; দেবতা বলিতেই ইচ্ছা করে।

এখন দেখা যাউক, বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন। তাঁহারা বলেন, আদৌ আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। প্রমাণাভাবে কোন কথাই স্বীকার কর্ত্তব্য নহে। যখন আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করা যাইতে পারে না, তখন তাহার অবিনাশিতা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, এ সকল উপন্যাসমধ্যে গণনা করিতে হয়। এই শ্রেণীর একজন জগদ্বিখ্যাত লেখক, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার পক্ষে যে আপত্তি তাহা বিশদ রূপে বুঝাইয়াছেন।

"Thought and consciousness, though mentally distinguishable from the body, may not be a substance separable from it, but a result of it, standing in relation to it, like that of a tune to the musical instrument on which it is played; and that the arguments used to prove that the soul does not die with the body, would equally prove that the tune not does die with the instrument but survives its destruction and continues to exist apart. In fact those moderns who dispute the evidences of the immortality of the soul, do not in general believe the soul to be a substance *per se*, but regard it as a bundle of attributes, the attributes of feeling, thinking, reasoning, believing, willing and these attributes they regard as a consequence of the bodily organization which therefore, they urge, it is as unreasonable to suppose surviving when that organization is dispersed, as to suppose

---

* যে তত্ত্বটা বুঝাইলাম, তাহা যে বিলাতী Pantheism নয়, একথা বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই।

the color or odour of a rose surviving when the rose itself has perished. Those, therefore, who would deduce the immortality of the soul from its own nature have first to prove that the attributes in question are not attributes of the body, but of a separate substance." *

এইখানে পাঠক একটু সূক্ষ্ম বুঝিয়া দেখুন। এই বিচারের তাৎপর্য্য এই যে আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব অসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন ইহার দ্বারা আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে না। আত্মা নাই, এমন কথা মিল কি কেহই বলিতে পারেন না। উক্ত বিচারে যে আত্মার অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, তাহা মিল নিজেই বুঝাইতেছেন।

"In the first place, it does not prove, experimentally, that any mode of organization has the power of producing feeling or thought. To make that proof good, it would be necessary, that we should be able to produce an organism, and try whether it would feel, which we cannot do."

পুনশ্চ—

"There are thinkers who regard it as a truth of reason that miracles are impossible; and in like manner there are others who, because the phenomena of life and consciousness are associated in their minds by undeviating experience with the action of material organs, think it an absurdity *per se* to imagine it possible those phenomena can exist under any other conditions. But they should remember that the uniform co-existence of one fact with another does not make the one fact a part of the other or the same with it. The relation of thought to a material brain is no metaphysical necessity; but simply a constant co-existence within the limits of observation. And when analysed to the bottom on the principles of the associative Psychology, just as much as the mental functions, is, like matter itself, merely a set of human sensations either actual or

* Three Essays on Religion, p. 197. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা যাইতেছে, সুতরাং ইংরেজির তরজমা দেওয়া যাইবে না।

inferrible as possible.........Experience furnishes us with no example of any series of states of consciousness without this group of contingent sensations attached to it; but it is as easy to imagine such a series of states without, as with, this accompaniment, and, we know of no reason in the nature of things against the possibility of its being thus disjoined. We may suppose that the same thoughts, emotions, volition and even sensations which we have here, may persist or recommence somewhere else under other conditions, just as we may suppose that other thoughts and sensations may exist under other conditions in other parts of the universe. And in entertaining this supposition we need not be embarrassed by any metaphysical difficulty about a thinking substance. Substance is but a general name for the perdurability of attributes; wherever there is a series of thoughts connected together by memories, that constitutes a thinking substance."

জড়বাদীর আপত্তি এই বিচারে ভাসিয়া গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। তথাপি ইহাতেই আত্মবাদী জয়ী হইতেছেন না। পৃথক্ আত্মা নাই, অথবা তাহা নশ্বর, এ কথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই, ইহাতে প্রমানীকৃত হইল। কিন্তু আত্মা যে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং তাহা অবিনাশী ইহা প্রমানীকৃত হইল না। তুমি বলিতেছ স্বতন্ত্র আত্মা আছে, এবং তাহা অবিনাশী, এ কথার প্রমান কি?

অনেক সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অপ্রচুর বলিয়া উড়াইয়া দেন। বৈজ্ঞানিকেরা সত্যবাদী এবং প্রমাণ সম্বন্ধে তাঁহারা সুবিচারক। অতএব তাঁহারা এ কথা কেন বলেন, সেটাও বুঝিয়া রাখা চাই।

বুঝিতে গেলে, আগে বুঝিতে হইবে প্রমাণ কি? যাহার দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তাহাই তাহার প্রমাণ। আমি এই পুষ্পটি দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই, জানিতে পারিতেছি যে পুষ্পটি আছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে পুষ্পের অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি গৃহ মধ্যে শয়ন করিয়া মেঘগর্জ্জন শুনিলাম, ইহাতে জানিলাম যে আকাশে মেঘ আছে। এখানে মেঘ আমার

প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্তু মেঘের ধ্বনি আমার প্রত্যক্ষের* বিষয়। প্রত্যক্ষাভাবেও মেঘবিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার কারণ পূর্ব্বকৃত প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান। যখনই যখনই এই রূপ গর্জ্জন ধ্বনি শুনিয়া আকাশ প্রতি দৃষ্টি পাত করা গিয়াছে, তখনই তখনই আকাশে মেঘ দেখা গিয়াছে।

অতএব আমরা দ্বিবিধ প্রমাণের দেখা পাইতেছি (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান। ভারতবর্ষীয়েরা অন্যবিধ প্রমাণও স্বীকার করেন, তাহার কথা পরে বলিতেছি। বৈজ্ঞানিক বা জড়বাদীগণ অন্য কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা অনুমান সম্বন্ধে ইহাও বলেন, যে যে অনুমান প্রত্যক্ষ মূলক নহে, সে অনুমান অসিদ্ধ; অথবা এরূপ অনুমান হইতেই পারে না। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য ইউরোপীয়েরা এক অতি বিচিত্র এবং মনোহর দর্শন শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবার স্থান নাই।

এখন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আত্মা কখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই। শরীর প্রত্যক্ষ কিন্তু শরীরস্থ আত্মার প্রত্যক্ষ নাই। শরীর বিমুক্ত আত্মার ও, কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন অনুমানও হইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে। আত্মা ভিন্ন এমন অন্য কোন পদার্থ সম্বন্ধে মনুষ্যের কোন প্রকার প্রত্যক্ষজাত কোন প্রকার জ্ঞান নাই, যে তাহা হইতে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এরূপ যে সকল প্রমাণ এদেশে বা ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিচারে টিকে না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। †

---

* যাহা ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয়। পুষ্পের চক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল, মেঘের ধ্বনির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল।

† তবে সর্ব্ব দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে মৃতব্যক্তির দেহবিমুক্ত আত্মা কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হয়। দেহবিমুক্তাত্মা এই রূপে মনুষ্যের ইন্দ্রিয় গোচর হইলে অবস্থা বিশেষে ভূত প্রেত নাম প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এ সকল চিত্তের ভ্রমমাত্র, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রম জ্ঞান মাত্র, আর ঈদৃশ ভ্রমজ্ঞানই আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসের কারণ। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকায় Spiritualism তত্ত্বের প্রাদুর্ভাবে, এই প্রেত

তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খুঁজিয়া পায় না। বিজ্ঞান সত্যবাদী। বিজ্ঞানের যতদূর সাধ্য, বিজ্ঞান ততদূর সন্ধান করিল, কিন্তু যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়াও, সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাইল না কেন, না বিজ্ঞানের ততদূর গতিশক্তি নাই। যাহার যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে পারে না। ডুবুরী কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সাগরে নামে, যতটুকু দড়ি ততদূর যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে পারে না, সাগরে সমস্ত রত্ন কুড়াইবার তার সাধ্য নাই। প্রমাণের দড়ি বিজ্ঞানের কোমরে বাঁধা, বিজ্ঞান প্রমাণের অপ্রাপ্য আত্মতত্ত্ব পাইবে কোথা? যেখানে বিজ্ঞান পৌঁছে না, সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ ধামের নিম্ন সোপানে বসিয়া বিজ্ঞান জন্ম সার্থক করে, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুসন্ধান করাই ভ্রম। "Our victorious Science fails to sound one fathom's depth on any side, since it does not explain the parentage of *mind.* * For mind was in truth before all science, and remains for ever, the seer, judge, interpreter, even father of all its systems, facts, and laws.' Our faculties are none the less truly above our heads because we no longer wonder like children at processes we do not understand. Spite of category and formula of Kant and Hegel, we are abashed before our own untraceable thought. The star of heaven, the grass of the field, the very dust that shall be man, foil our curiosity as much as ever, and none the less for yielding to the lens, the prison and the polariscope of

---

তত্ত্বই বিজ্ঞানের একটি শাখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং Crookes, Wallace প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা এতদ্বিষয়ক প্রমাণ সকল এমন উত্তম রূপে পরীক্ষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, যে প্রতিপক্ষেরা কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন। ইহার নানা প্রকার বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে প্রেতপ্রত্যক্ষের যাথার্থ্য এখনও বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। সুতরাং উহা আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণের মধ্যে আমি গণনা করিতে পারিলাম না। আর ঈদৃশ প্রমাণের উপর ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি না। ধর্ম্ম বিজ্ঞান নহে; তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়সংস্থাপিত।

* আত্মা।

science ever now triumphs for our pride and delight *" যখন বিজ্ঞান একটি ধুলি-কণার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না, † তখন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে কি প্রকারে? যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে না পায়, সে বিজ্ঞানে পায় না। যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাহার কাছে আত্মবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই।

এখন, বৈজ্ঞানিক উত্তর করিবেন, যে বিচার বড় অন্যায় হইতেছে। যখন বলিতেছ, জ্ঞান মাত্রের উপায় প্রমাণ, তখন অবশ্য স্বীকার করিতেছ যে প্রমাণাতিরিক্ত জ্ঞেয় কিছুই নাই। আত্মতত্ত্ব যখন প্রমাণের অতীত, আত্মার অস্তিত্বের যখন প্রমাণ নাই, তখন আত্মসম্বন্ধে মনুষ্যের কোন জ্ঞান নাই, ও হইতে পারে না। অতএব আত্মা আছে কি না জানি না, ইহা ভিন্ন আর কিছু আমাদের বলিবার উপায় নাই।

এ কথার দুইটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। একটি প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদিগের উত্তর, একটি আধুনিক জর্ম্মাণদিগের উত্তর। দর্শন শাস্ত্রে এই দুইটি জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। এই দুই জাতিই দেখিয়াছেন, যে প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক যে অনুমান তাহার গতিশক্তি অতি সঙ্কীর্ণ, তাহা কখনই মনুষ্য জ্ঞানের সীমা নহে। এই জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা অন্যবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা বলেন, আর দ্বিবিধ প্রমাণ আছে, উপমান এবং শব্দ। সাংখ্যেরা উপমান স্বীকার করেন না, কিন্তু শব্দকে তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন।

উপমান (Analogy) যে একটি পৃথক প্রমাণ, ইহা আমরা পাঠকদিগকে স্বীকার করিতে বলিতে পারি না। অনেকস্থলে উহার দ্বারা প্রমাণজ্ঞান জন্মে না, ভ্রম জ্ঞান জন্মে। যেখানে উপমান প্রমাণের কার্য্য করে, সেখানে উহা পৃথগ্‌বিধ প্রমাণ নহে, অনুমান-বিশেষ মাত্র। এক্ষণে "শব্দ" কি তাহা বুঝাইতেছি।

---

* Oriental Religions, India, P. 447.

† কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মতে বহির্জ্জগতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই।

আপ্তোপদেশই শব্দ, অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য যে বাক্য তাহাই তৃতীয় প্রমাণ। যদি বেদাদিকে ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহা প্রমাণ। যদি বেদাদিকে আমরা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা বেদে উক্ত হইয়াছে বলিয়া, উহা অনায়াসে স্বীকার করা যাইতে পারে। পরন্তু বেদাদি যদি মনুষ্যোক্তি হয়, তবে উহা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, কেন না মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদাদির অধীন। স্থূল কথা, এক ঈশ্বরই ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য পুরুষ। যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহাই প্রকৃত শব্দরূপ প্রমাণ। খ্রীষ্টিয়ানেরাও ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন— ইংরাজি নাম Revelation. বস্তুতঃ যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেন না প্রত্যক্ষ ও অনুমানও ভ্রান্ত হইতে পারে, ঈশ্বর কখনই ভ্রান্ত হইতে পারেন না। যদি এই গীতাকে কাহারও ঈশ্বরোক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা সম্বন্ধে তাঁহার অন্য প্রমাণ খুঁজিবার প্রয়োজন নাই; এই গীতাই অখণ্ডনীয় প্রমাণ। তবে নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক, গীতাদিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করিবেন না। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে তিনি কি বাধ্য নহেন?

তাঁহাদিগের জন্য জর্ম্মাণ-দার্শনিকদিগের উত্তর আছে। কাণ্টের বিচিত্র দর্শনশাস্ত্র পাঠককে বুঝাইবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু কাণ্ট এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কতগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিকদিগের মত এই যে প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কারণ আছে। তাঁহারা বলেন কতকগুলি তত্ত্ব মনুষ্যচিত্তে স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহারা কেবল "বলেন," ইহাই নয়, কাণ্ট এই তত্ত্বের যে প্রকার প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা মনুষ্য বুদ্ধির আশ্চর্য্য পরিচয় স্থল। কাণ্ট ইহাও বলেন যে যাহাকে আমরা বুদ্ধি বলি, অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষাদি হইতে প্রাপ্তজ্ঞান লইয়া বিচার করি, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর আমাদের আর এক শক্তি আছে। যাহা বিচারে অপ্রাপ্য, সেই শক্তির প্রভাবে আমরা তাহা জানিতে পারি। ঈশ্বর, আত্মা, এবং জগতের

একত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা সেই মহতী শক্তি হইতে পাই। এই "Transcendental Philosophy," সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। অতএব এমন লোক অনেক আছেন যে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতায় বিশ্বাস তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। তবে যাহা, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য, তাহা আমি এখানে বলিতে বাধ্য। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জ্জিত হইলে, আত্মসম্বন্ধীয় এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয়। *

ভক্তের এ সকল কচকচিতে কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরভক্ত, কেবল ক্ষুদ্র দর্শনশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না। ভক্তের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে তিনিই পরমাত্মা, এবং স্বয়ংই সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন। তবে যে এই দীর্ঘ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার কারণ এই যে অনেকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মতত্ত্বকে উপহসিত করেন। তাঁহাদের জানা উচিত যে আত্মতত্ত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দুষ্প্রাপনীয় হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩।

অনুবাদ।

দেহীর যেমন এই দেহে কৌমার ও যৌবন ও বার্দ্ধক্য, তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তি। পণ্ডিত তাহাতে মুগ্ধ হন না ॥ ১৩ ॥

টীকা।

গীতোক্ত প্রথম প্রধান তত্ত্ব, আত্মার অবিনাশিতা। এই শ্লোকে দ্বিতীয় প্রধান তত্ত্ব কথিত হইতেছে—জন্মান্তরবাদ। যেমন এই দেহেতেই আমাদিগকে ক্রমশঃ কৌমার, যৌবন, জরা ইত্যাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে হয়, তেমনি দেহান্তে দেহান্তর-প্রাপ্তি অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র। অর্থাৎ মৃত্যু

* অনেকে বলিবেন, তবে কি Huxley, Tyndall প্রভৃতির মত লোকের চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জ্জিত হয় নাই? উত্তর—না। সকলগুলি হয় নাই।

কেবল অবস্থান্তর মাত্র, যেমন কৌমার গেলে যৌবন উপস্থিত হয়, যৌবন গেলে জরা উপস্থিত হয়, তেমনি এ দেহ যায়, আর এক দেহ আসে;—যেমন কৌমার গিয়া যৌবন আসিলে কেহ শোক করে না, যৌবন গিয়া জরা আসিলে কেহ শোক করে না, তেমনি এ দেহ গেলে দেহান্তর-প্রাপ্তির বেলাই বা কেন শোক করিব?

এই কথায়, মানিয়া লওয়া হইল যে মরিলেই আবার জন্ম আছে। আত্মার অবিনাশিতা যেমন হিন্দুধর্ম্মের প্রথম তত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ তেমনি দ্বিতীয় তত্ত্ব। কিন্তু আত্মার অবিনাশিতা যেমন খ্রীষ্টিয়াদি অন্যান্য প্রধান ধর্ম্মে স্বীকৃত, জন্মান্তরবাদ সেরূপ নহে। পক্ষান্তরে জন্মান্তরবাদ যে কেবল হিন্দুধর্ম্মেই আছে, এমনও নহে। বৌদ্ধধর্ম্মেরও ইহা প্রধান তত্ত্ব, এবং অন্যান্য ধর্ম্মেও ছিল বা আছে। তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহ্য এবং ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। এজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালি এ মত গ্রাহ্য করেন না।

বাস্তবিক আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমনি জন্মান্তর সম্বন্ধেও তদ্রূপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে যেমন আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা যায় না, জন্মান্তরও অপ্রমাণ করা যায় না। তা না থাক্, যাহার প্রমাণাভাব তাহা মানিতে কেহ বাধ্য নহে। এই তত্ত্বে বিশ্বাস যে চিত্তবৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনে স্বতঃসিদ্ধ হয়, এমন কথাও আমি বলিতে পারি না। তবে যিনি স্বর্গ নরকাদি মানেন, জন্মান্তরবাদির অপেক্ষা তাঁহার বেশী জোর কিছুই নাই। যেমন জন্মান্তরবাদের আপ্তোপদেশ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই, স্বর্গ নরকাদিরও তেমনি অন্য প্রমাণ নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের দেখাদেখি প্রমাণাভাবেও স্বর্গনরকে বিশ্বাসবান—অর্থাৎ সুখ দুঃখযুক্ত পারলৌকিক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসবান্, কিন্তু জন্মান্তরে কোন মতেই বিশ্বাসবান্ নহেন।

কথাটা একটু সবিস্তারে সমালোচনা করিবার আমাদের একটু প্রয়োজন আছে। যিনি আত্মার অস্তিত্ব মানেন না, তাঁহার সঙ্গে ত আমাদের কথাই নাই, কেন না তিনি কাজেই জন্মান্তর মানিবেন না। কিন্তু যিনি

আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা মানেন, তাঁহার সম্মুখে একটা বড় গুরুতর প্রশ্ন আপনা হইতেই উপস্থাপিত হয়।

জীবাত্মা যদি অবিনশ্বর হইল, তবে দেহান্তে তাহার কি গতি হয়? এ বিষয়ে জগতে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে।

১। ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর অসভ্য জাতিদিগের বিশ্বাস।

২। স্বর্গাদি লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের এই মত।

৩। জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধদিগের এই মত।

৪। পরব্রহ্মে লীন হয়, বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

হিন্দুধর্ম্মে শেষোক্ত এই তিনটি মতই প্রচলিত আছে। এই তিনটি মতের সামঞ্জস্য কি প্রকার হইয়াছে তাহা বুঝাইতেছি। হিন্দুরা বলেন, যে দেহান্তে জীবাত্মা মুক্ত হয় না; আপনার কৃত কর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহারি আবার জন্মান্তর হয়। যখন জীবাত্মা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যে ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর জন্ম হয় না, ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় বা নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। ইহাকেই সচরাচর মুক্তি বা মোক্ষ বলে। কিসে জীবাত্মা এই অবস্থাপন্ন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। হিন্দুরা ইহাও বলেন, যে যখন জীবাত্মা মুক্ত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ এমন কোন সুকৃত করিয়াছে যে স্বর্গাদি উপভোগের যোগ্য, তখন জীবাত্মা কৃত পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী কাল, স্বর্গাদি উপভোগ করে, পরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়।

আপাততঃ শুনিলে এ সকল কথা পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের নিকট অশ্রদ্ধেয় বুলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু একটু বিচার করিলে আর এক রকম বোধ হইবে।

এই জন্মান্তরবাদ, হিন্দুধর্ম্মে অতিশয় প্রবল। উপনিষদুক্ত হিন্দুধর্ম্ম, গীতোক্ত হিন্দুধর্ম্ম, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম বা দার্শনিক হিন্দুধর্ম্ম, সকল প্রকার হিন্দুধর্ম্ম ইহার উপর স্থাপিত। যেমন সূত্রে মণি গ্রথিত থাকে, হিন্দুধর্ম্মের সকল তত্ত্বগুলিই তেমনি এই সূত্রে গ্রথিত আছে। অতএব এই তত্ত্বটি

আমাদিগকে বড় যত্নপূর্ব্বক বুঝিতে হইবে। কথাটাও বড় গুরুতর,—অতি দুরূহ। আমরা বাল্যকাল হইতে কথাটা শুনিয়া আসিতেছি, ইহা আমাদের বাল্য সংস্কারের মধ্যে, সুতরাং আমরা সচরাচর ইহার গৌরব অনুভব করি না। কিন্তু বিদেশীয় এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা কুসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া ইহার আলোচনা কালে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েন। গীতার অনুবাদকার টমসন সাহেব এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Undoubtedly it is the most novel and startling idea ever started in any age or country." টেলর সাহেব ইহাকে "one of the most remarkable developments of ethical speculation" বলিয়া প্রশংসিত করিয়াছেন।*

কথাটা যদি এমনই গুরুতর, তবে ইহা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

বলা হইয়াছে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি। পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের অংশ তাঁহা হইতে পার্থক্য লাভ করিল কি প্রকারে? তাহার দেহবদ্ধাবস্থা বা কেন? হিন্দুশাস্ত্রে ইহার যে উত্তর আছে, তাহা বুঝাইতেছি। ঈশ্বরের অশেষ প্রকার শক্তি আছে। একটী শক্তির নাম মায়া। এই মায়া কি তাহা স্থানান্তরে বুঝাইব। এই মায়ার দ্বারা তিনি আপনার সত্ত্বাকে জগতে পরিণত করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যময়; তাঁহা ভিন্ন আর চৈতন্য নাই; অতএব জগতে যে চৈতন্য দেখি ইহা তাঁহারই অংশ; তাঁহার সিসৃক্ষাক্রমে এই অংশ মায়ার বশীভূত হইয়া পৃথক ও দেহবদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই পৃথগভূত চৈতন্য বা জীবাত্মা কোন প্রকারে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর তাহার পার্থক্য থাকিবে কেন? পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে, জীবাত্মা আবার পরমাত্মায় বিলীন হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে জীবাত্মা এই মায়াকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়োগ ক্রমেই বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আবার বিমুক্ত হইবার সাধ্য কি? ইহার উত্তর এই যে ঈশ্বরের নিয়োগ এরূপ নহে, যে জীবাত্মা চিরকালই মায়াবদ্ধ থাকিবে। তিনি যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, মায়ার অতিক্রমের উপায়ও তাহার ভিতরে

* Primitive Culture, Vol. I p 12.

রাখিয়াছেন। সে উপায় কি, তদ্বিষয়ে মত ভেদ আছে। কেহ বলেন জ্ঞানেই সেই মায়াকে অতিক্রম করা যায়; কেহ বলেন কর্ম্মে, কেহ বলেন ভক্তিতে। এই সকল মতের মধ্যে কোনটি সত্য, বা কোনটি অসত্য তাহার বিচার পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন সকল গুলিই সত্য, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক। এখন, এই গুলিই যদি ঈশ্বরে বিলীন হইবার উপায় হয়, তবে যে ব্যক্তি ইহজীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম, বা ভক্তির সমুচিত অনুষ্ঠান করে নাই, সে ঈশ্বরে লয় বা মুক্তি লাভ করিবে না। তবে সে ব্যক্তির আত্মা, মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে? আত্মা অবিনশ্বর; সুতরাং দেহভ্রষ্ট আত্মাকে কোথাও না কোথাও যাইতে হইবে।

ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে, যে দেহভ্রষ্ট আত্মা কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে যাইবে। স্বর্গ বা নরক প্রভৃতি লোকান্তরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। কিন্তু প্রমাণের কথা এখন থাক। স্বীকার করা যাউক কর্ম্মফলানুসারে আত্মা স্বর্গে বা নরকে যায়। এখন জিজ্ঞাস্য, যে জীবাত্মা স্বর্গে বা নরকে কিয়ৎ কালের জন্য যায়, না অনন্তকালের জন্য যায়?

যদি বল কিয়ৎকালের জন্য যায়, তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় যাইবে? জন্মান্তর স্বীকার না করিলে, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হয় বল যে জীব কর্ম্মফলের উপযোগী কাল স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া, পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিবে, নয় বল যে অনন্ত কাল সে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে।

খ্রীষ্টিয়ানেরা তাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে ঈশ্বর বিচার করিয়া পাপীকে অনন্ত নরকে এবং পুন্যবান্‌কে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন।

এ কথায় বড় গোলযোগে পড়িতে হয়। মনুষ্য লোকে এমন কেহই নাই যে কোন সৎকর্ম্ম কখন করে নাই বা কোন অসৎ কর্ম্ম কখন করে নাই। সকলেই কিছু পাপ, কিছু পুণ্য করে। এখন জিজ্ঞাস্য যে, যে কিছু পাপ করিয়াছে, কিছু পুণ্য করিয়াছে সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, না অনন্ত নরকে যাইবে? যদি সে অনন্ত স্বর্গে যায়, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার পাপের দণ্ড হইল না কেন? যদি বল অনন্ত নরকে যাইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার পুণ্যের পুরস্কার হইল না কেন?

যদি বল যাহার পাপের ভাগ বেশী সে অনন্ত নরকে, যাহার পুণ্যের

ভাগ বেশী, সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, তাহা হইলও ঈশ্বরে অবিচার আরোপ করা হইল। কেন না তাহা হইলে, এক পক্ষে পুণ্যের কিছুই পুরস্কার হইল না, আর এক পক্ষে পাপের কিছুই দণ্ড হইল না।

কেবল ঈশ্বরের প্রতি অবিচার আরোপ করা হয় এমত নহে। ঘোরতর নিষ্ঠুরতা আরোপ করাও হয়। যাঁহাকে দয়াময় বলি, তিনি যে এই অল্পকাল পরিমিত মনুষ্যজীবনে কৃত পাপের জন্য অনন্তকালস্থায়ী দণ্ড বিধান করিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা আর কি আছে? ঈদৃশ নিষ্ঠুরতা ইহলোকের পামরগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না।

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, পুণ্যের ভাগ কম, সে পুণ্যানুরূপ কাল স্বর্গ ভোগ করিয়া অনন্ত কাল জন্য নরকে যাইবে, এবং তদ্বিপরীতে বিপরীত ফল হইবে; তাহাতেও ঐ সকল আপত্তির নিরাস হইল না। কেন না, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও. অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন হইতে পারে, অভাব হইল না। অতএব তুমি যদি স্বর্গ নরক স্বীকার কর, তবে তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ নরক ভোগ বিহিত হইতে পারে না। তুমি উর্দ্ধ ইহাই বলিতে পার যে পাপ পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী পরিমিত কাল জীব স্বর্গ বা নরক, বা পৌর্ব্বপর্য্যের সহিত উভয় লোক ভোগ করিবে। তাহা হইলে সেই সাবেক প্রশ্নটীর উত্তর বাকি থাকে। সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যাইবে? পরব্রহ্মে লীন হইতে পারে না, কেননা, জ্ঞান কর্ম্মাদিই যদি মুক্তির উপায়, তবে স্বর্গ নরকে সে উপায়ের সাধনাভাবে মুক্তি অপ্রাপ্য। কেন না স্বর্গ নরক ভোগ মাত্র—কর্ম্ম ক্ষেত্র নহে, এবং দেহশূন্য আত্মার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাবে, স্বর্গ নরকে জ্ঞান কর্ম্মের অভাব। অতএব এখনও জিজ্ঞাস্য, সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যায়?

হিন্দুশাস্ত্র এ প্রশ্নের উত্তরে বলে,—জীবাত্মা তখন জীবলোকে প্রত্যাগমন করিয়া দেহান্তর ধারণ করে। হিন্দুধর্ম্মের বিশেষতঃ এই গীতোক্ত ধর্ম্মের এই অভিপ্রায়, যে জীবাত্মা সচরাচর দেহধ্বংশের পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। সেই দেহান্তর-প্রাপ্তিতে কর্ম্মফলানুসারে

এবং পাপ পুণ্যের তারতম্যানুসারে সদসৎ যোনি প্রাপ্ত হয়। সচরাচর কর্ম্মফল ভোগ জন্মান্তরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে, আর কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে তাহার ফলে নরক ভোগ করিতে হয়। যে সেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে তাহাকে স্বর্গে বা নরকে যাইতে হইবে। কর্ম্মের ফলের পরিমাণানুযায়ী কাল্লই স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে, তাহার পর আবার জীবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্তর মানে না, তাহার সকল আপত্তির এখনও নিরাস হয় নাই। সে বলিবে, "যাহা বলিলে, এটা সাফ আন্দাজি কথা। অনন্ত স্বর্গ নরক ভোগ অসঙ্গত কথা স্বীকার করি। স্বর্গ ও নরক আমি আদৌ মানিতেছি না। কেন না তাহার প্রমাণাভাব। কিন্তু স্বর্গ নরক না মানিলেই জন্মান্তর মানিব কেন? মানিলাম যে আত্মা অবিনাশী। তুমি বলিতেছ, যে অবিনাশী আত্মা, যদি দেহান্তরে না যায়, তবে কোথায় যাইবে? আমি উত্তরে বলিব, কোথায় যায় তাহা জানি না। পরকালের কথা কিছুই জানি না। যাহা জানি না, যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিব না। জন্মান্তরের প্রমাণ দাও, তবে মানিব। গত্যন্তরের প্রমাণাভাব, জন্মান্তরের প্রমাণ নয়। তুমি যে রামও নও, শ্যামও নও, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে যে তুমি যাদব কি মাধব। জন্মান্তর যে হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি?"

কথা বড় শক্ত। জন্মান্তরবাদীরা এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন, বা ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন, তাহা আমি যথাসাধ্য নিম্নে সংগ্রহ করিলাম।

১। এ দেশে সচরাচর, লোকের অদৃষ্ট তারতম্য দেখাইয়া এই মত সমর্থন করা হয়। কেহ বিনা দোষে দুঃখী; কেহ সহস্র দোষ করিয়াও সুখী, এ দেশীয়গণ জন্মান্তরের সুকৃত দুষ্কৃত ভিন্ন এরূপ বৈষম্যের কিছু কারণ দেখেন না। লোকান্তরে অর্থাৎ স্বর্গ নরকে সুকৃতের পুরস্কার ও দুষ্কৃতের দণ্ড হইবে, এ কথা বলিলে ইহলোকের অদৃষ্ট-বৈষম্য সম্পূর্ণ রূপে বুঝা যায় না। কেহ আজন্ম দুঃখী, অন্নহীনের ঘরে জন্মিয়াছে;

কেহ আজন্ম সুখী, রাজার এক মাত্র পুত্র;—জন্ম কালেই এ অদৃষ্ট তারতম্য কেন? যদি ইহা জীবের কর্ম্মফল হয়, তবে ইহজন্মের কর্ম্মফল নহে, কেন না সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ত কিছুই ইহজন্মকৃত কর্ম্ম নাই। কাজেই তাঁহারা এখানে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল বিবেচনা করিয়া থাকেন।

আপত্তিকারক এ বিচারে সন্তুষ্ট হইবেন না। মনে কর, তিনি বলিবেন "সকলই কি কর্ম্মফল? যদি তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও কর্ম্মফল বলিতে হইবে। কিন্তু কখনও কোন জীব, মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধ যে এমন কোন কর্ম্ম বা অকর্ম্ম নাই, যদ্দ্বারা মৃত্যু হইতে রক্ষা হইতে পারে। অতএব মৃত্যু কর্ম্মফল হইতে পারে না। যদি মৃত্যু কর্ম্মফল না হইল, তবে জন্মই বা কর্ম্মফল বলিব কেন? যাহা কর্ম্মফল আর যাহা কর্ম্মফল নহে সকলই ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে। ইহাও তাই। দম্পতী-সংসর্গে অবস্থা বিশেষে পুত্র জন্মে, রাজার ঘরেও জন্মে; মুটের ঘরেও জন্মে। ইহাও তাই ঘটিয়াছে। এমন স্থলে জাতব্যক্তির কর্ম্মফল খুঁজিব কেন?"

এখানেও বিচার শেষ হয় না। পূর্ব্বজন্মবাদী প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন, "ঈশ্বরের নিয়মের ফলে সকলই ঘটে, ইহা আমিও স্বীকার করি। তবে বলিতেছি, যে এ বিষয়ে ঈশ্বরের নিয়ম এই যে পূর্ব্বজন্মকৃত ফলানুসারে এই সকল বৈষম্য ঘটে। তুমি যে নিয়ম বলিতেছ, আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি—জন্মের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্ম ঘটিবে—তা রাজ্ঞীর গর্ভেই কি, আর দরিদ্রের গর্ভেই কি? কিন্তু এ নিয়মে কি জন্ম তত্ত্ব সকলই বুঝাইতে পার? কেহ রূপ, কান্তি, বুদ্ধি, সদ্গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে—কেহ কুরূপ, নির্ব্বোধ ও গুণহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। তুমি যদি বল, যে এইরূপ প্রভেদ অনেক স্থলে জন্মের পরবর্ত্তী শিক্ষার ফল, তাহাতে আমার উত্তর এই যে শিক্ষার প্রভেদে কতক তারতম্য ঘটে বটে, কিন্তু সমস্ত তারতম্য টুকু শিক্ষাধীন বলিয়া বুঝা যায় না। কেন না অনেক স্থলেই দেখা যায় যে এক প্রকার শিক্ষায় পাত্র ভেদে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে। এমন কি শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দেহ ও বুদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। ছয় মাসের শিশুদিগের মধ্যেও এ প্রভেদ লক্ষিত হয়। জানি, তুমি বলিবে, যে, যে টুকু শিক্ষার অধীন বলিয়া বুঝা

যায় না. সে তারতম্য টুকু, বৈজিক, অর্থাৎ পিতা মাতা বা পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকৃতির ফল। আমি ইহাও মানি, যে মাতা পিতা বা তৎপূর্ব্বগামী পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রকৃতি এমন কি সংস্কার পর্য্যন্ত আমাদিগকে পাইতে হয়, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্য মধ্যে যে তারতম্যের কথা বলিতেছি, তাহা তোমার বৈজিক তত্ত্বে নিঃশেষে বুঝা যায় না। দেখ, এক মাতার গর্ভে এক পিতার ঔরসে অনেকগুলি ভ্রাতা জন্মে; তাহাদের মাতা পিতা বা পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে কোনই প্রভেদ নাই; অথচ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ইহার উত্তরে তুমি বলিতে পার বটে, যে গর্ভাধান কালে মাতা পিতার দৈহিক অবস্থা এবং যতদিন শিশু গর্ভে থাকে, ততদিন মাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটনা সকল এই তারতম্যের কারণ। না হয় ইহাও মানিলাম—কিন্তু যমজেও এরূপ তারতম্য দেখা যায়—সে তারতম্যের কিছু কারণ নির্দ্দেশ করিতে পার কি?"

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন, যে এই সকল তারতম্য এতদূর মনুষ্য-পরিজ্ঞাত নৈসর্গিক নিয়মাধীন বলিয়া বুঝা গেল, তবে বাকি টুকু মনুষ্যের অজ্ঞেয় নিয়মের অধীন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত—পূর্ব্বজন্ম কল্পনা করা অনাবশ্যক। এখনও বিজ্ঞান এতদূর যায় নাই, যে এই তারতম্যের কারণ সর্ব্বত্র নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু একদিন যাইবে ভরসা করা যায়।

এ দিকে জন্মান্তরবাদীও বলিতে পারেন যে, এ তোমার আন্দাজি কথা। যাহা বিজ্ঞান এখন বুঝাইতে পারিতেছে না, তাহা যে বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে বুঝাইতে পারিবে, এটা আন্দাজি কথা। ইহা আমি মানি না।

এরূপ বিচারের অন্ত নাই। কোন পক্ষের জয় পরাজয় নাই। এখানে বৈজ্ঞানিক, জন্মান্তরবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন না, বা জন্মান্তরবাদী বৈজ্ঞানিককে নিরস্ত করিতে পারেন না। উভয়ের দশা তুল্য হইয়া পড়ে। যাহা অজ্ঞাত, উভয়কেই তাহার আশ্রয় লইতে হয়। তবে জন্মান্তর-বাদীকেই বিশেষ প্রকারে অজ্ঞাত ও অপ্রামাণিকের আশ্রয় লইতে হয়।

এ বিচারে জন্মান্তর প্রমাণীকৃত হইতেছে এমন আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

২। যাহাতে মনুষ্য সাধারণের বিশ্বাস, তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, এমন কথা অনেকে বলেন। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানেরা যাই বলুন, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যেরা সাধারণতঃ জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, নানা দেশে নানা জাতিই জন্মান্তরে বিশ্বাসবান।*

বলাবাহুল্য যে এ প্রমাণও অনেক লোকের প্রতীতিকর হইবে না। যাহা জনসাধারণের বিশ্বাস, তাহাও সকল সময়ে সত্য হয় না, ইহা প্রসিদ্ধ। যথা, পৃথিবী সূর্য্যাদির সম্বর্ত্তনকেন্দ্র।

৩। যত দিন না আত্মা বহুজন্মার্জ্জিত জ্ঞান কর্ম্মাদির দ্বারা বিধূতপাপ হয়, তত দিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয় না। এক জন্মে সকলে তদুপযোগী চিত্তশুদ্ধি লাভ করে না। এ কথাটা আমাদের দেশী, কিন্তু গ্রীক দার্শনিকেরাও এই যুক্তির দ্বারা জন্মান্তরবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা তাহা সবিস্তারে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Phœdon নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সোক্রেতিসের উক্তি অধ্যয়ন করিবেন। বৈজ্ঞানিক বলিবেন, এ কথারও প্রমাণাভাব।

---

* It has been accepted, in some form, by disciples of every Great religion in the world. It is common to Greek philosophers, Egyptian priests, Jewish Rabbins, and several early Christian sects It appears in the speculations of the Neo-Platonists, of later European mystics, even of socialists like Fourier, who elaborates a fanciful system of successive lines mutually connected by numerical relation. It reaches from the Eleusinian mysteries down to the religions of many rude tribes of north America and the Pacific isles. Not a few noble dreams of the cultivated imagination are subtly associated with it, as in Plato, Giordano Primo, Herder, Sir Thomas Browne, and specially notable is Lessing's conception of gradual improvement of the human type through metamorphosis in a series of future lives." Oriental Religions ; India p 517.

যিনি এ সকল কথার বিস্তারিত প্রথম সংগ্রহ দেখিতে চান, তিনি টৈলর প্রণীত "Primitive culture" নামক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় অধ্যয়ন

৪। অনেকের বিশ্বাস যে যোগসিদ্ধ পুরুষেরা আপনাদিগের পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারেন। কিন্তু কোন সিদ্ধ পুরুষের যে এরূপ পূর্ব্বজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসজনক কিছু প্রমাণ নাই। পুরাণেতিহাসের সকল কথা যে বিশ্বাসযোগ্য নহে ইহা বলা বাহুল্য। * আর যদি কোন সিদ্ধ পুরুষ যথার্থই বলিয়া থাকেন, যে তাঁহার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। কেননা দুইটি সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকে (১) তিনি সত্য কথা বলিতেছেন কি না, (২) যদিও ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা না বলুন, তাঁহার সেই বিস্মৃতি কোন পীড়াজনিত মস্তিষ্কের বিক্রিয়া মাত্র কি না?

৫। যোগীদিগের পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতিতে বিশ্বাসবান না হইলেও, আর এক প্রকার পূর্ব্বজন্মস্মৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেকেরই এমন ঘটে যে কোন নূতন স্থানে আসিলে মনে হয়, যে পূর্ব্বে যেন কখনও এস্থানে আসিয়াছি—কোন একটা নূতন ঘটনা হইলে মনে হয়, যেন এ ঘটনা পূর্ব্বে কখন ঘটিয়াছিল। অথচ ইহাও নিশ্চিত স্মরণ হয়, যে এজন্মে কখন সে স্থানে আসি নাই বা সে ঘটনা ঘটে নাই। অনেকে এমন স্থলে বিবেচনা করেন, যে পূর্ব্বজন্মে সেই স্থানে গিয়াছিলাম, অথবা সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল—নহিলে এরূপ স্মৃতি কোথা হইতে উদয় হয়?

---

*কিন্তু ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরূপ পূর্ব্বজন্মস্মৃতির কথা বলেন।

"Pythagoras is made to illustrate in his own person his doctrine of metempsychosis, by recognizing where it hung in Here's temple the shield he had carried in a former birth, when he was that Euphorbas whom Menelaus slew at the seige of Troy. Afterwards he was Hermotunos, the Klazomenian prophet, whose funeral rites were so prematurely celebrated while his soul was out, and after that, as Lucian tells the story, his prophetic soul entered the body of a cock. Mikyllos asks the cock to tell him of the siege of Troy—were things there really as Homer has said? But the cock replies ;—"How should Homer have konwn, O Mikyllôs, when the Trojan war was going on, he was a camel in Bactria"—*Tylor's Primitive Culture, Vol II*, p 13.

বলা বাহুল্য ইহা সব খোস গল্প মাত্র।

এরূপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া থাকে, তাহা সত্য। অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি সত্য। অনেক পাঠকই বলিতে পারিবেন, যে তাঁহাদের মনে কখন না কখন এমন স্মৃতির উদয় হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রও ইহার সত্যতা স্বীকার করে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যে এ সকল "Fallacies of Memory" অথবা মস্তিষ্কের Double action. কিরূপে এরূপ স্মৃতির উদয় হয়, তাহা কার্পেণ্টর সাহেবের Mental Physiology নামক গ্রন্থ হইতে দুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব।

"Several years ago the Rev. S. Hansard, now Rector of Bethnal Green, was doing clerical duty for a time at Hurstmonceaux in Sussex and while there, he one day went over with a party of friends to Pevensey Castle, which he did not remember to have previously visited. As he approached the gateway he became conscious of a very vivid impression of having seen it before and he "seemed to himself to see" not only the gateway itself but donkeys beneath the arch and people on the top of it. His conviction that he *must* have visited the castle on some former occasion—although he had neither the slightest remembrance of such a visit, nor any knowledge of having ever been in the neighbourhood previously to his residence at Hurstmonceaux—made him enquire from his mother if she could throw any light on the matter. She at once informed him that being in that part of the country when he was about *eighteen months* old, she had gone over with a large party and had taken him in the pannier of a donkey, that the elders of the party having brought lunch with them, had eaten it on the roof of the gateway, where they would have been seen from below, whilst he had been left with the attendants and donkeys.—This case is remarkable for the vividness of the sensorial impression (it may be worth mentioning that Mr. Hansard has a decidedly artistic temperament) and for the reproduction of details which were not likely to have been brought up in conversation, even if he had happened to hear the visit itself mentioned as an event of his childhood, and of such mention he has no remembrance whatever."

যদি এই ব্যক্তির মা না বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে এ স্মৃতি কোথা হইতে আসিল, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা হইত না। পূর্ব্বজন্মবাদিগণ ইহা পূর্ব্বজন্মস্মৃতি বলিয়া ধরিতেন সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক স্মৃতি আছে, যাহার

আমরা কোন কারণ দেখি না, অনুসন্ধান করিলে ইহজন্মেই তাহার কারণ পাওয়া যায়। এইরূপ সফল অনুসন্ধানের আর একটি উদাহরণ কার্পেণ্টর সাহেবের ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

In a Roman Catholic town in Germany a young woman who could neither read nor write, was seized with a fever and was said by the priests, to be possessed of a devil, because she was heard talking Latin, Greek and Hebrew. Whole sheets of her ravings were written out and found to consist of sentences intelligible in themselves, but having slight connection with each other. Of her Hebrew sayings only a few could be traced to the Bible and most seemed to be in Rabbinical dialect. All trick was out of the question; the woman was a simple creature; there was no doubt as to the fever. It was long before any explanation, save that of demoniacal possession, could be obtained. At last the mystery was unveiled by a physician who determined to trace back the girl's history and who after much trouble discovered that at the age of nine she had been charitably taken by an old Protestant pastor, a great Hebrew scholar, in whose house she lived till his death. On further inquiry it appeared to have been the old man's custom for years to walk up and down a passage in his house into which the kitchen opened, and to read to himself with a loud voice out of his books. The books were ransacked and among them were found several of the Greek and Latin Fathers together with a collection of Rabbinical writings. In these works so many of the passages taken down at the young woman's bedside were identified that there could be no reasonable doubt as to their source."

এ দেশে হইলে ইহার আর কোন অনুসন্ধান হইত না, গ্রীক, লাটিন ও হিব্রু এই স্ত্রীলোকের "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যার" মধ্যে গণিত ও স্থিরীকৃত হইত।

পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে পারা যায় না, যে এরূপ সকল স্মৃতিই, অনুসন্ধান করিলে, এই বর্ত্তমান জীবনমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বেশী অনুসন্ধান না হইলে এ কথা স্থির করিয়া বলা যায় না। তেমন বেশী অনুসন্ধান আজিও হয় নাই। যতদিন না হয়, ততদিন এ প্রমাণ কতদূর গ্রাহ্য তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

অনুসন্ধানের ফল যাহা হউক, আর একটা তর্ক উঠিতে পারে। স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, না আত্মার ক্রিয়া? যদি বল আত্মার ক্রিয়া, তবে পূর্ব্বজন্মের সবিশেষ স্মৃতি আমাদের মনে উদয় হয় না কেন? কেবল এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতি কখন কদাচিৎ মনে আসার কথা বল কেন? আত্মা ত সেই আছে, তবে তাহার স্মৃতি কোথায় গেল? আর যদি বল স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, তবে এই এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতিই বা উদিত হইতে পারে কি প্রকারে? কেন না যে মস্তিষ্কে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ছিল, সে মস্তিষ্ক ত দেহের সঙ্গে ধ্বংস পাইয়াছে—আর নাই।

এ আপত্তির সুমীমাংসা করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন নাই। কেন না এই সকল স্মৃতি যে পূর্ব্বজন্মস্মৃতি ইহাই সিদ্ধ হইতেছে না।

শেষ কথা এই যে যাঁহারা জীবাত্মার নিত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের জন্মান্তর স্বীকার ভিন্ন গতি নাই। আত্মা যদি নিত্য হয়, তবে অবশ্য পূর্ব্বে ছিল। কোথায় ছিল? পরমাত্মায় লীন ছিল, এ কথা বলা যায় না। কেন না পরমাত্মায় যাহা লীন তাহা জীবাত্মা নহে, তাহার পৃথক অস্তিত্ব নাই। আর যদি বল, লোকান্তরে ছিল, তাহা হইলে ইহলোকে তাহার জন্ম, জন্মান্তর বলিতেই হইবে। লোকান্তরে ছিল, যদি এমন না বল, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, যে ইহ লোকেই দেহান্তরে ছিল।

এমন কেহ থাকিতে পারেন, যে আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করিবেন, কিন্তু নিত্যতা স্বীকার করিবেন না। অর্থাৎ বলিবেন যে দেহের সহিত আত্মার জন্ম হয়, জন্ম হইলে আর ধ্বংস নাই; কিন্তু জন্মের-পূর্ব্বে যে আত্মা ছিল, এমন না হইতে পারে। যাঁহারা এমন বলেন, তাঁহারা প্রত্যেক জীব-জন্মে একটি নূতন সৃষ্টির কল্পনা করেন। এরূপ কল্পনা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। কেন না বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূল সূত্র এই, যে জাগতিক নিয়ম সকল নিত্য, তাহার কখন বিপর্য্যয় ঘটে না। এখন জাগতিক নিয়মের মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রমাণীকৃত একটি নিয়ম এই যে জগতে নূতন সৃষ্টি নাই। জগতে কিছু নূতন সৃষ্টি হয় না,—নিত্য নিয়মাবলীর প্রভাবে বস্তুর রূপান্তর হয় মাত্র *। এই যে জীব-শরীর, ইহা জন্মিলে বা গর্ভে সঞ্চারিত হইলে কোন নূতন সৃষ্টি হইল, এমন কথা

* নাবস্তুনাবস্তু-সিদ্ধিঃ *Ex nihilo nihil fit.*

বলা যায় না; পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান্ জড় পদার্থ সমূহের নূতন সমবায় হইল মাত্র। অন্য বস্তুর রূপান্তর হইল মাত্র। আত্মা যাহা শরীরের সহিত জন্ম গ্রহণ করিল, তাহা কিছুরই রূপান্তর বলা যায় না। কেন না আত্মা জড় পদার্থ নহে, সুতরাং জড়ের বিকার নহে। পূর্ব্বজাত আত্মা সকল ও অবিনাশী, সুতরাং তাহার ও রূপান্তর নহে। কাজেই নূতন সৃষ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু নূতন সৃষ্টি জাগতিক নিয়মবিরুদ্ধ। অতএব আত্মাকে অবিনাশী বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই বলিতে হয়। নিত্য ও অনাদি বলিলে জন্মান্তর কাজেই স্বীকার করিতে হয়।

আর যাঁহারা আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অবশ্য জন্মান্তর ও স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে জন্মান্তরবাদ অপ্রামাণ্য হইলেও ইহা তাঁহাদিগের কাছে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। তাঁহাদিগেরই সম্প্রদায় ভুক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কি বলেন শুনা যাউক। *

বৌদ্ধতত্ত্ববেত্তা Rhys Davids লেখেন,

"The doctrine of Transmigration in either the Brahmanical or the Buddhist form, is not capable of disproof; while it affords an explanation, quite complete to those who can believe in it, of the apparent anomalies and wrongs in the distribution of happiness or woe. † The explanation can always be exact, for it is scarcely more than a repetition of the facts to be explained; it may always fit the facts, for it is derived from them; and it cannot be disproved ‡, for it lies in a sphere beyond the reach of human enquiry."

* অনেকগুলি আধুনিক ইউরোপীয় লেখক জন্মান্তর বাদ সমর্থন করিয়াছেন। Herder ও Lessing তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তদ্ভিন্ন Fourier, Soame Jenyns, Figuier, Dupont de Nemours, Pezzani প্রভৃতি অনেক ইতর লেখকের নাম করা যাইতে পারে।

† Buddhism—p. 100.

‡ যদি বল, প্রেততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিতেছেন যে দেহভ্রষ্ট মনুষ্যাত্মা কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে, তাহাতেও জন্মান্তর বাদের নিরাশ হয় না। জন্মান্তরবাদিরা এমন বলেন না. যে সকল সময়েই মৃত্যু হইবা মাত্র আত্মা দেহান্তরে প্রবেশ করে। যদি এমন হয় যে কখন কখন দেহান্তর প্রাপন পক্ষে কালবিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে জন্মান্তর অপ্রমাণিত হইল না।

টৈলর সাহেব লিখিতেছেন—

"The Buddhist Theory of "Karma," or "Action," which controls the destiny of all sentient beings, not by judicial rewards and punishment, but by the inexhorable result of cause into effect, where the present is ever determined by the past in an unbroken line of causation. is indeed one of the world's most remarkable developments of ethical speculation." *Primitive Culture—Vol II.* p. 12.

কথাটার ভিতর একটু নিগূঢ়ার্থ আছে। খৃষ্টানেরা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা বলেন স্বর্গে বসিয়া ঈশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া দোষীর দণ্ড ও পুণ্যাত্মার পুরস্কার বিহিত করেন। টৈলর সাহেবের এ কথাটার তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর যে হাকিমের মত বেঞ্চে বসিয়া ডিক্রী ডিসমিস করেন, তাহার অপেক্ষা এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ জীবাদৃষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বটে। কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা উচিত। জগতের শাসন প্রণালী এই যে, কতকগুলি জাগতিক নিয়ম আছে। তাহা নিত্য, কথন বিপর্য্যস্ত হয় না। সেই গুলির প্রভাবে সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়; জগদীশ্বরকে কথনও হস্তক্ষেপ করিয়া নিজে কোন কাজ করিতে হয় না। ইহাও সত্য সকল কাজ তিনি নিজেই করেন, কিন্তু সে নিয়মের আড়ালে থাকিয়া। কিন্তু যদি বলি যে তিনি বিচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবের মৃত্যুর পর, তাহার অদৃষ্ট সম্বন্ধে ডিক্রী ডিসমিস করিয়া কাহাকে স্বর্গে বা কাহাকে নরকে পাঠাইতেছেন. তবে যাহা জগতের বিরুদ্ধ তাহা কল্পনা করা হইল। এখানে নিয়মের দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে না স্বয়ং জগদীশ্বরকে কার্য্য করিতে হইতেছে। প্রত্যেক জীবের দণ্ড পুরস্কার বিধান, এক একটি ঈশ্বরের অনিয়মসিদ্ধ কার্য্য—অর্থাৎ miracle. কিন্তু জন্মান্তরবাদে এ আপত্তি ঘটে না। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে এইরূপ পাপাচারী এইরূপ যোনি প্রাপ্ত হইবে। কর্ম্ম কারণ, যোনি বিশেষ তাহার কার্য্য। এইরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিবদ্ধ কর্ম্মফলের দ্বারাই জন্মান্তর সম্পাদিত হয়—"miracle" প্রয়োজন হয় না।

শ্লেগেল বড় গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান, কিন্তু তিনি ইউরোপের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও পণ্ডিত। তিনি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

"In this doctrine, there was a noble element of truth—the feeling that man, since he has gone astray, and wandered so far from his God, must needs exert many efforts, and undergo a long and painful pilgrimage before he can regain the source of all perfection ;—the firm conviction and positive certainty that nothing defective, impure, or defiled with earthly stains can enter the pure region of perfect spirits, or be eternally united to God ; and that thus before it can attain to this blissful end, the immortal soul must pass through long trials and many purifications. It may now well be conceived, (and indeed the experience of this life would prove it) that suffering, which deeply pierces the soul, anguish that convulses all the members of existence, may contribute, or may even be necessary, to the deliverance of the soul from all alloy, and pollution, or to borrow a comparison from natural objects, the generous metal is melted down in fire and purged from its dross. It is certainly true that the greater the degeneracy and the degradation of man, the nearer is his approximation to the brute ; and when the transmigration of the immortal soul through the bodies of various animals is merely considered as the punishment of its former transgressions, we can very well understand the opinion which supposes that man who by his crimes and the abuse of his reason, had descended to the level of the brute should at last be transformed into the brute itself.'.*

পরিশেষে আমেরিকা নিবাসী সামুয়েল জনসন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ইঁহার মত বিজ্ঞ লেখক দুর্লভ।

"The Transmigration faith was so widely spread in the elder world, because it had its roots in natural and profound aspirations. It combined the two fold intuition of immortality and moral sequence with that mystic sense of the unity of being which is a germ of the highest religious truth.†"

এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহার স্থূল মর্ম্ম বলিতেছি।

১। জন্মান্তরবাদ অপ্রমাণ করা যায় না।

---

* Philosophy of History—translated by Robertson—Bohn's Edition—p. 157-8.

† Oriental Religions, India p 539.

২। ইহার পক্ষে কোন রকম কিছু প্রমাণও আছে।

৩। যাঁহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহার প্রামাণ্যতা অখণ্ডনীয়।

৪। যাঁহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, এই তত্ত্ব তাঁহাদিগের নিকটও অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না, কেন না জাগতিক নিত্য নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত পরলোকবাদ আর কিছুই প্রচলিত নাই।

যিনি ভক্ত তাঁহার পক্ষে এ সকল বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। যদি এই শ্লোকটিতে ঈশ্বরোক্তির মর্ম্ম থাকে তবে তাহাই তাঁহার বিশ্বাসের যথেষ্ঠ কারণ। তাঁহার বিচার্য্য বিষয় এই যে, জন্মান্তরবাদ যাহা গীতায় আছে তাহা যথার্থ ঈশ্বরোক্তি, না গ্রন্থকারের বিশ্বাস মাত্র—তিনি আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাক্য মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন?

যদি কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয়, যে ইহা ভগবদুক্তি কি না, এবং উপরে যে সকল প্রমাণের উপরে সমালোচনা করা গেল, তাহাতে যদি জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্ না হয়েন, তবে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন জন্মান্তরে বিশ্বাস না করিলেও, এই গীতোক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করা যায় কি না?

ইহার উত্তর বড় সোজা। এই গীতোক্ত ধর্ম্ম সমস্ত মনুষ্যের জন্য। জন্মান্তরে যে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; যে না করে তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; যে ভক্তি না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করে তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; কেন না চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযম অনীশ্বরবাদীর পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; সেই চিত্তশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য। এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্ব্বব্যাপক ধর্ম্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। যাঁহার যতটুকুতে অধিকার তিনি ততটুকু গ্রহণ করিবেন। যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনধিকারী। যাঁহার যাহাতে অধিকার, তিনি তাহা ইহাতে পাইবেন।

বঙ্গে দশভুজা।

(বিজয়া দশমীর ছড়া।)

হরি হরি একি রঙ্গ বঙ্গের ভিতরে?—
সিংহের উপরে বামা রণবেশ ধ'রে,
মুক্তকেশী—ত্রিনয়না—সর্প বাম করে—
দলিছে দনুজ-তনু চরণের ভরে!
হরি হরি একি রঙ্গ বঙ্গের ভিতরে?
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গি, নয়নে ভ্রুকুটি,
দশভুজা—ভয়ঙ্করা—হাতে শূলমুঠি;
বাঙালির ঘরে একি—নারী রণবেশ?
একি রঙ্গ বাঙ্গালায়—একি হ'ল দেশ?
রাঙা পায়ে জবাফুল—মাথায় কিরীট,
অসুরের কাঁধ তাহে শোভে যেন পীঠ;
দশভুজা প্রতিমায় বাঙ্গালা উজ্জ্বল!—
হরি হরি একি ভক্তি—বাঙালি কি হ'ল?
একি হেরি তব ঘরে—ও বাঙালি ভায়া?
জন্ম জন্ম সুখভোগ পেলে পদছায়া—
দাসবৃত্তি—রাজসেবা—যার হ'লে দয়া,
এ বামার পদতলে সে অসুর-কায়া?
একি রঙ্গ তব ঘরে—ও বাঙালি ভায়া?
ঘরে আছে ছেলে, মেয়ে, পিতা মাতা জয়া,
গৃহলক্ষ্মী—'পরিবার'—সর্ব্ব দুঃখ হরা!
ভাই, বন্ধু, শালী, শালা, ভগিনা, জামাই;
তাদের মমতা তবে ভুলিলে কি ভাই?
বাঙালির বীজমন্ত্র—'কভু অকস্মাৎ

রণবার্ত্তা শুনো যদি কাণে দিবে হাত,—
সে মন্ত্র তবে কি আজ কাণে নাহি ধরে ?
দশভুজা পূজা কর গাঢ় ভক্তি ভরে ?
হরি হরি একি রঙ্গ বঙ্গের ভিতরে ?
ঘোটক দেখিলে যাঁর পরাণে তরাস !
আগন্ন পুরুষ যার রণে অনভ্যাস !
তার ঘরে রণরূপা মূর্ত্তি পরকাশ ?
একি রঙ্গ বাঙ্গালায়—একি পরিহাস ?
সিংহের উপরে বামা দর্পভরে হেলে,
চরণে অসুর-কায়া — সর্প বাঁধা গলে,
পদভরে সে অসুরে দলে জটা ধ'রে ;—
হরি হরি একি রঙ্গ বঙ্গের ভিতরে ?
কে তুমি গা—কোথা থেকে—কি ভেবে এখানে ?
এ বেশে দিয়েছ দেখা—এ বঙ্গ-ভুবনে ?
রহস্য দেখাতে দেশ পেলে না কি আর,
বঙ্গে এলে খুঁজে খুঁজে নিতে ভক্তিহার ?—
মহামায়া তব মায়া বুঝে উঠা ভার !
হায় হায় চিরকাল বাঙালি বেচারা—
খায়, পরে, শোয়, দেয় 'অন্দরে' পাহারা !
ভাল মন্দ—যে যখন—ছুটো খেতে দেয়,
তখনি গোলাম তার—পদধূলি নেয় !
সে কেন ও রাঙা পায়ে গন্ধপুষ্প দেয় ?
হেথা, মা, তোর সিংহচড়া ভঙ্গি ছেড়ে দে ;
এরা যদি ভজে তোমায়— মুটে হবে কে ?
কে পিষিবে কালি কলম—কে দেবে জাঙাল ?
ভুলাতে পারিবি না, মা,—শিক্ষা চিরকাল !
বাঙালির চির দিনই গোলামের হাল !
বুঝ না ভণ্ডামি, মা গো, হায় হায় হায় !

বঙ্গে দশভুজা।

অন্তরেতে পূজা এরা করে কি তোমায়?
হাড়ে হাড়ে চিরকাল ভক্তি যারে অতি,
তব কাছে সেই অস্থরের হেন গতি!
ও পদে কভু কি হয় বাঙালির মতি?
অই শোনো দেশ যুড়ে উঠে কি উচ্ছ্বাস,
শোনো শোনো কলরব ফাটায় আকাশ—
'ত্বংহি মাতা, ত্বংহি পিতা, তব রাজ্যে বাস,
বরং দেহি—বরং দেহি—আমি অন্নদাস!'
হেথা, মা, তোর সিংহচড়া ভঙ্গি ছেড়ে দে;
এরা যদি পূজে তোমায়—দাস হবে কে?
কে পিষিবে কালি কলম—কে দেবে জাঙাল?
ভুলাতে পারিবি না, মা,—শিক্ষা চিরকাল!
বাঙালির চির দিনই গোলামের হাল!
'নমস্তস্যৈ,' নমস্তস্যৈ'—ওকি পুরোহিত?
জাননা কি যুগধর্ম্মে কিসে হিতাহিত?
কারে ব'ল 'নমস্তস্যৈ' বেদ তন্ত্র খুলে?
নমস্য কলিতে কেটা সেটা গেছ ভুলে?
রেখে দেও তোমার ও পাঁজি পুঁথি তুলে!
শুন পুরোহিত দ্বিজ—ছাড় হে ও পাঠ,
সে মন্ত্র উচ্চারো যা'তে মজে ভবনাট;
রায়, রায়বাহাদুর, রাজা মহারাজা,
যাতে সিদ্ধ এবে পড় সেই মন্ত্র তাজা;
দূর কর বেদ তন্ত্র দেব দেবী পূজা!
ছাতা পড়া কতকেলে পুথিপাটা খুলে
কি হবে এখন আর চক্ষে ধুল দিলে?
কি হবে মাটীর সঙ্গে বুকে মেরে খোঁচা?

রণ-ইতিহাসে বঙ্গ চিরকালই মোছা!
এ বঙ্গে গৃহীর ঘরে চণ্ডী-পড়া গিছা!
তাই বলি একি হেরি বঙ্গের ভিতরে?—
সিংহের উপরে বামা গ্রীবাভঙ্গি ক'রে,
দলিছে দনুজ-তনু চরণের ভরে,
একি রঙ্গ হরি হরি বঙ্গের ভিতরে?
নামো ত, মা ক্ষেপা মেয়ে শান্তবেশ ধ'রে;
রণবেশে এ শশ্মানে কেন সিংহ প'রে?—
পূজে না কেহই তোরে! -ফিরে যা, মা ঘরে—
এ খেপামি আর যেন বাঙালি না করে!
বিজয়াদশমীছড়া গাও ঘরে ঘরে॥

হাজারিবাগ,
১২৯৩ সাল বিজয়াদশমী।

সতীতেজ।

১। হিন্দু রমণীগণের কাছে সাবিত্রী সুন্দরী সতীত্বের আদর্শ; এই আদর্শ সমক্ষে রাখিয়া হিন্দুগণ ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে যোগই বল আর ধর্ম্মই বল আর কর্ম্মই বল সতীত্বই স্ত্রীলোকের সব! অন্ধকার রজনীতে উপবাসক্লান্তা সাবিত্রী সুন্দরী মৃত স্বামীকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন এবং যমরাজ সেই সতীর তেজে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত স্বামীর জীবন দান করিতেছেন এই চিত্র মনে থাকিলেই অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে এবং মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

"লোকমাতা সতীস্ত্রীগণ এই সসাগরা পৃথিবীরে ধারণ করিতেছেন।" মহাভারতে এইরূপ কথা উল্লিখিত আছে। বাস্তবিকই একটু ভাবিয়া দেখিলে এই কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য ইহা বেশ বুঝা যায়। সমাজের বর্ত্তমান

অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখ, প্রাচীন সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে ইহাই দেখিতে পাইবে সতীর প্রণয় আশ্রয় করিয়াই পৃথিবীতে ধর্ম্ম স্থাপিত রহিয়াছে এবং সতীর ক্রোধ হইতেই অধর্ম্মের বিনাশ সম্পাদিত হইতেছে। রামায়ণ এবং মহাভারতের ইতিহাসের ভিতর এই সত্যটি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা আছে। পাপাত্মা দুঃশাসন কর্ত্তৃক অপমানিতা সতী দ্রৌপদীর ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া পাপনিরত দুর্য্যোধনকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছিল এই টুকু মহাভারতের ধর্ম্মালোচনার সার; মহা পরাক্রান্ত অতুল বিভবশালী লঙ্কাধিপতি, সতীর অবমাননা করিয়া সবংশে নিহত হইয়াছিল, এই টুকু রামায়ণের ভিতরকার আসল কথা, বলিয়া বুঝি। যেখানে সতীর আদর ধর্ম্ম সেইখানে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সতীর আদর নাই সেইখানেই নানারূপ অধর্ম্ম আশ্রয় লইয়া থাকে। সতীর অবমাননায় অধর্ম্মের মাত্রা পূর্ণ হয়।

পুরাণে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ যেরূপ বর্ণনা আছে তাহার ভিতরে ইহাই দেখিতে পাই যে যে দিন পাপিষ্ঠরা সতীর অবমাননা করিতে উদ্যত হইল সেই দিনই তাহাদের অধর্ম্মের মাত্রা পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অবমানিতা সতীর তেজে পাপিষ্ঠরা শীঘ্রই বিনষ্ট হইল।

প্রাচীন ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া নূতন ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এই বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে দিন হইতে সিরাজউদ্দৌলা সতীর উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন সেই দিনে তাঁহার অধর্ম্ম পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং সেই সিরাজউদ্দৌলা হইতেই মুসলমানরাজত্ব বাঙ্গালা হইতে ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইল।

যাঁহারা সতীর আদর বুঝিয়াছেন, যাঁহারা সতীর অবমাননায় আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করেন, ধর্ম্ম তাঁহাদেরই আশ্রয় করিয়া থাকে। যাঁহারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি খুঁজেন তাঁহারা যেন সতীর আদর করিতে শিখেন। সতীতেজ যাহাতে দেশে পুনরাবির্ভূত হয় সেই বিষয়ে সকলে যেন সচেষ্ট থাকেন; আমাদের দেশে আজ কাল আর সতীর আদর তেমন নাই তাই সতীতেজ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। তাই আমরা আজ পরাধীন।

আমাদের দেশের রমণীগণের সতীতেজ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে তাই হেম বাবুর উন্মাদিনী বলিয়াছে

"সুখে থাকে তারা সুখে থাকে ঘরে
পতিপদতল বক্ষঃস্থলে ধরে
বিবাহিতা নারী, সখের খেলনা
খায় দায় পরে নাহিক ভাবনা
জানে না ভাবে না প্রণয় কেমন
প্রাণের বল্লভ পতি কিবা ধন
ইহারাই সতী;: বিহত প্রমাণ
আশা ধরি স্নেহ ইহাদের প্রাণ,
নারীর মাহাত্ম্য রমণীর মন
কত যে গভীর ভাবে কতজন
প্রণয় কি ধন নারীর তরে?"

তোমরা সকলে সাবিত্রী সতীর আরাধনা করিতে শিখ তবেই সতীতেজে তোমাদের রমণীগণ উজ্জ্বল প্রভাশালী হইয়া উঠিবে তবেই ধর্ম্ম কি পদার্থ তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। সাবিত্রী সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। আমিও ইহাই বুঝি যে যিনি সত্যবান্ সাবিত্রী দেবী তাঁহার গৃহেই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। পুরুষগণ তোমরা যদি সত্যবান্ হও তবে নিশ্চয়ই তোমরা আপন আপন পার্শ্বে সতী সাবিত্রীকে দেখিতে পাইবে।

২। সাবিত্রী একটি আদর্শ। এরূপ এক একটি আদর্শ এক একটি দেবতা। আদর্শানুযায়ী মনুষ্য গড়িয়া লওয়ার নামই দেব আরাধন। আদর্শচিত্রে প্রগাঢ় ভক্তি না থাকিলে মনুষ্যের দেবারাধনারূপ কর্ম্মে একাগ্রতা থাকে না এবং কর্ম্মও সফল হয় না। সুতরাং যদি সতী দেবীর আরাধনা করিতে চাও তবে সতী নামে প্রগাঢ় ভক্তি সংস্থাপন করিতে শিখ। তাহার পর 'তৎত্বমসি' বেদের এই মহাবাক্য অবলম্বনে দেবারাধনা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ পূজা পদ্ধতি অবলম্বনে কর্ম্ম আরম্ভ করিলে সাবিত্রী শক্তি তোমার ঘরে আবির্ভূতা হইবেন।

"তৎ ত্বম্ অসি" অর্থাৎ তুমিই সেই, এই কথাটি ভালবাসা শিক্ষার মূল

মন্ত্র বলিয়া বুঝ। কল্পনাপটে চিত্রিত যে আদর্শকে বড় সুন্দর বলিয়া বুঝিয়া, তাহাকে ভাল বাসিয়াছ, বাহিরের কোন মনুষ্যে সেই ভালবাসা ন্যস্ত করিতে শিখার নাম ভালবাসা শিক্ষা। কর্ম্মসূত্রে যাহার সহিত বদ্ধ থাকায় যাহাকে জীবনের চিরসঙ্গিনী করিবে স্থির করিয়াছ তাহাকে সাবিত্রী সদৃশী সতীতেজে তেজস্বিনী করিয়া লওয়াই তোমার প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। "তৎত্বমসি" অর্থাৎ 'তুমিই সেই সাবিত্রী' সহধর্ম্মিণীকে এই জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে, স্নেহভাবে ভালবাসিতে শিখ। যাহার সঙ্গে একত্রে থাকা যায় তাহাকে ভাল ভাবিতে ভাবিতে সে ভাল হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে মন্দ ভাবিতে ভাবিতে সে মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। তোমার সহধর্ম্মিণীকে যদি তোমার আদর্শ রমণীর ন্যায় দেখিতে শিখ তবে ক্রমে ক্রমে তোমার সঙ্গিনী সেই আদর্শ রমণীর অনুরূপ হইয়া উঠিবে। যদি তাহা না হয় তবে তোমার ভালবাসার জোর নাই—বুঝিও। তোমার আদর্শ রমণী সম্মুখে থাকিলে তাহার সহিত তুমি যে অবস্থায় যেরূপ ভালবাসামাখা কথা কহিতে, যেরূপ ভালবাসামাখা আচার ব্যবহার করিতে, তোমার সঙ্গিনীর সহিত যদি ঠিক সেই সেই অবস্থায় সেইরূপ কথাবার্ত্তা সেইরূপ আচার ব্যবহার কর তবে তোমার ভালবাসার গুণে ও তোমার কথাবার্ত্তার গুণে বদ্ধ হইয়া তোমার সঙ্গিণী তোমাতে এরূপ আকৃষ্ট হইবেন যে তখন তুমি তাঁহাকে সহজেই নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে পারিবে।

এখন একটি কথা আছে। যাহাকে মন্দ বলিয়া বুঝিতেছি তাহাকে ভাল ভাবিয়া তাহার সহিত সেই রকম কথাবার্ত্তা কহাটা কপটাচার কি না? যেখানে সত্য সেই স্থানেই ধর্ম্ম; যেখানে মিথ্যা সেই খানেই অধর্ম্ম। সুতরাং মন্দকে ভাল ভাবা যদি মিথ্যা হয়, তবে সে রূপ কাজে অধর্ম্ম আছে। ইহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে মন্দকে ভাল ভাবা কখনই কর্ত্তব্য নহে। মন্দকে মন্দ বলিয়াই বুঝিতে হইবে; কিন্তু ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে আসলে মানুষ কখনও মন্দ নয়। মানুষে যখন যাহা মন্দ দেখিতে পাই তাহা ময়লা মাত্র; সেই ময়লা পরিষ্কার করিতে পারিলেই মানুষের স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশ পায়। তুমি যাহাকে মন্দ বলিয়া বুঝিতেছ বাস্তবিক সেই মনুষ্য বড় পবিত্র বড় সুন্দর, তোমার ভালবাসার জলে সেই ময়লা ধৌত

করিয়া লইলেই দেখিতে পাইবে যে ভিতরকার মানুষ বড়ই পবিত্র বড়ই সুন্দর। কাদা মাখা ঝিনুকের ভিতর মুক্তা আছে এটি যিনি জানেন তিনি কাদা মাখা ঝিনুকেরও আদর বুঝেন। মানুষের বাহিরে মলা দেখিয়াই মানুষকে ঘৃণা করিও না, পাপকে ঘৃণা করিও কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না। মহাভারতে এইরূপ কথা আছে যে স্ত্রীলোক মাত্রেই সতীদেবীর অংশ এবং পুরুষমাত্রেই অনঙ্গ-বিজয়ী উর্দ্ধলিঙ্গ মহাদেবের অংশ। এই কথাটির মর্ম্ম বুঝিয়া 'তত্ত্বমসি' মহা মন্ত্র সাধনা করিতে শিখ তাহা হইলেই ভালবাসার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে।

৩। স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং পুরুষের সত্যবস্থা এক সঙ্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যেখানে স্ত্রী সতী সেই খানে স্বামী সত্যবান্ হইতে থাকেন এবং যেখানে স্বামী সত্যবান্ সেই খানে স্ত্রী সতীতেজে ভূষিতা হন। সুতরাং যিনি স্ত্রীকে সতীতেজে প্রদীপ্ত করিতে ইচ্ছা করেন তিনি যেন সত্যের আদর্শানুযায়ী নিজের চরিত্র গঠন করিতে সদাই সচেষ্ট থাকেন। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের বলে শিষ্যা স্ত্রীকে উন্নতা করিতে হইবে এবং 'সোঽহং' অর্থাৎ 'সেই আদর্শপুরুষই আমি,' এই ভাবিয়া নিজের অন্তঃকরণকে সেই আদর্শ-পুরুষের মনের ন্যায় সুন্দর করিতে হইবে।

যখন দেখিবে যে তোমার ভালবাসার আধারের কাছে তোমার অন্তরের ভাবসমূহ যথাবৎ প্রকাশ করিতে তোমার আগ্রহতা জন্মিয়াছে কোন বিষয় গোপন করিবার ইচ্ছা কখনও হয় না তখনই জানিও যে তোমার ভালবাসা পরিপক্কতা পাইয়াছে। যিনি নিজের মনের ভাব অকপটে যথাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিয়া থাকেন তিনিই যথার্থ সত্যবান। স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেই স্ত্রীর হৃদয়ে সতীত্ব ধর্ম্ম প্রকাশ পায়; স্বামী সত্যের সাহায্যে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারেন। সত্য আর সতীত্ব এই দুটির যোগই প্রধান যোগ। যেখানে এই যোগ ঘটিয়াছে ধর্ম্মভাব সকল সেই খানে হৃদয়ে আপনা আপনি ফুটিতে থাকে। অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেবের সহিত অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী পার্ব্বতীর মিলনই পবিত্র যোগ। একাত্মা পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রুপদ দুহিতার মিলন এই প্রকারের যোগ; এই যোগ হইতে যে সকল ধর্ম্মভাব ফুটিয়াছিল সেই সকল কথাই মহাভারতের নিষ্কাম ধর্ম্মের দৃষ্টান্তস্বরূপ।

৪। সত্য কাহাকে বলে? ভ্রান্তি সত্যের বিপরীত; ভ্রান্তির সহিত যুদ্ধ করিতে যিনি দৃঢ় সংকল্প তাঁহারই আচরণকে সত্যাচার কহে। যিনি নিজের ভ্রম দূর করিতে সতত সচেষ্ট এবং যিনি কখনও অপরকে ভ্রমে ফেলিবার ইচ্ছা করেন না তিনিই সত্যবান। 'সত্য বাক্য' কথাটির দুই প্রকার অর্থে প্রয়োগ আছে; যাহা যেমন দেখিয়াছি যেমন শুনিয়াছি বাহিরে ঠিক সেইরূপ বলার নাম সত্য বাক্য প্রয়োগ এবং যে কথা কহিব যে প্রতিজ্ঞা করিব সেই কথা, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার নামও সত্য বাক্য প্রয়োগ। পূর্ব্বে সত্য কথাটির যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে সেই মুখ্য অর্থ হইতেই 'সত্য' কথাটির এই দুই প্রকার অর্থ দাঁড়াইয়াছে। আমি যাহা যেরূপ দেখিয়াছি যেরূপ শুনিয়াছি অন্যকে তাহা না বলিয়া যদি অন্যরূপ বলি তবে সেই অন্য লোককে ইচ্ছা-পূর্ব্বক একটি ভ্রমে ফেলা হইল। আমি যদি এক জনকে বলি যে কাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তবে সে ব্যক্তি আমার জন্য অপেক্ষা করিবে। কেননা সে বুঝিয়াছে যে আমি তাহার সহিত কল্য সাক্ষাৎ করিব, তাহার পর আমি যদি আমার কথা মত কার্য্য না করি তবে সেই লোককে একটি ভুল বুঝাইয়া দিলাম বলিতে হইবে।

অপরকে কখনও ভ্রমে ফেলিও না; কেননা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়, তুমি যদি একজনকে ভ্রমে ফেলিয়া থাক তবে তোমাকেও এক দিন না এক দিন ভ্রমে পড়িতে হইবে। ভ্রান্তিই মনের মলা। যেখানে ভ্রান্তি দেখিতে পাইবে সেইখান হইতেই সেই মলা ঘুচাইবার চেষ্টা করিবে তবেই ক্রমশঃ সুন্দর হইতে পারিবে।

ছোট খাট রকম দুই একটা মিথ্যা কহিতে দোষ কি? আমি যদি অপর কাহাকেও দুই একটা ছোট রকমের ভ্রমে ফেলিয়া থাকি তবে আমিও না হয় দুই একবার ছোট্ট রকমের ভ্রমে পতিত হইব তাহাতে আর বেশী ক্ষতি কি? যদি কেহ ওরূপ কথা বলেন তবে তাহার উত্তর এই। সত্য এই কথাটির উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মানই সত্যাচারী হইবার প্রধান উপায়; চিত্তের গঠন এতদূর উন্নত করিয়া লওয়া চাই যে অসত্য ব্যবহার মনে থাকিলেই যেন মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; যাঁহার অন্তর এইরূপ পবিত্র হইয়াছে তিনি ছোটখাট মিথ্যা ব্যবহারেও আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। সত্য মিথ্যা

বিচার করিয়া তাঁহাকে সত্যাচারে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। তাঁহার অন্তরের মানুষ তাঁহাকে যাহা সত্য সেই কার্য্যেই উত্তেজিত করে এবং যাহা অসত্য সেই কার্য্য হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে। সুতরাং 'সত্য' এই কথাটির উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সংস্থাপন করিয়া যাহা সৎ তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে শিখা কর্ত্তব্য। মনের মলা পরিষ্কার করিতে পারিলে অন্তরে যে উজ্জ্বল জ্ঞানালোক প্রকাশ পায় সেই আলোকটির নামই সৎ। এই আলোক যথাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিবার চেষ্টার নাম সত্যাচার। সৎ পদার্থের ভাবকে সত্য বলা যায়। সৎ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ সতী নাম এই সতীর ভাবকে সতীত্ব বলে।

৫। ক্রমাভিব্যক্তি * (Evolution) এই জগতের নিয়ম। এই নিয়মের বশে যে সৌন্দর্য্য অব্যক্তভাবে আছে তাহাই ক্রমে ক্রমে ব্যক্তভাবে প্রকাশ পাইতেছে। লোহা ও ইস্পাতের সংঘর্ষণে যেমন অব্যক্ত অগ্নি বহ্নিভাবে প্রকাশ পায় সেইরূপ স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির সম্মিলনে জগতের অব্যক্ত সৌন্দর্য্য ক্রমে ক্রমে বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্ত্রীচিত্ত সৌন্দর্য্যগ্রাহী; যেখানে সৌন্দর্য্যের আধিক্য স্ত্রীচিত্ত সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়। এবং স্ত্রীজাতিকে আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে অব্যক্ত সৌন্দর্য্যকে ব্যক্তভাবে প্রকাশ করিবার আগ্রহতাই পুরুষচিত্তের লক্ষণ। ক্রমাভিব্যক্তি তথ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য পণ্ডিতবর ডারউইন ইতর জীব জন্তু সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে ইতর জীব জন্তুগণের মধ্যে পুরুষজাতি স্ত্রীজাতি অপেক্ষা, অধিকতর সুন্দর। কোকিলের স্বর যেমন সুন্দর, কোকিলার স্বর তেমন নয়, ময়ূরের পুচ্ছ যেরূপ সুন্দর বর্ণে চিত্রিত ময়ূরীর সেরূপ নহে, সিংহের কেশর কেমন সুন্দর কিন্তু সিংহীর কেশর নাই, কুক্কুটের ঝোটন কেমন সুশ্রী কিন্তু কুক্কুটীর ঝোটন নাই। এইরূপ হইবার কারণ কি? স্ত্রীজাতিকে আকর্ষণ করিবার জন্য সুন্দর হইবার আগ্রহতা থাকা নিবন্ধন পুরুষজাতি সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে সচেষ্ট থাকে এবং সেই উদ্দেশে কার্য্য করিয়া থাকে। পুরুষজাতির মধ্যে যে গুলিতে অধিকতর সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় স্ত্রীজাতি তাহাদের দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। এই পুরুষ-

* শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় Evolution কথাটির এই বাঙ্গালা নাম দিয়াছেন।

গুলির সৌন্দর্য্যটুকু আবার তাহাদিগের পুরুষসন্ততিতে প্রকাশ পায়; এই পুরুষ সন্তানগণ আবার আরও অধিকতর সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত করিতে সচেষ্ট থাকে, এইরূপে সৌন্দর্য্য পুরুষগণেই অধিকমাত্রায় অভিব্যক্ত। কোকিলা কোকিলের স্বরের সৌন্দর্য্যগ্রাহিনী, তাই কোকিলের স্বর সুন্দর; ময়ূরী ময়ূরের পুচ্ছের শোভার সৌন্দর্য্যগ্রাহিনী তাই ময়ূরের পুচ্ছ সুন্দর।

জীবজন্তুগণের মধ্যে স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির মধ্যে যেরূপ প্রভেদ বলা হইল মনুষ্য জাতির ভিতরেও স্ত্রী ও পুরুষের ভিতর ঐরূপ স্বাভাবিক বৈলক্ষণ্য আছে। ইতর জন্তুদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহা বুদ্ধির অধীন নয় কিন্তু মনুষ্যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং মনুষ্যের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ স্বাভাবিক প্রকৃতি আছে তাহা বুদ্ধিবৃত্তির অধীন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকে সৌন্দর্য্য ভালবাসে, এবং পুরুষ স্ত্রীলোকের জন্য সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে চায়। দুজনের এই দুটি ভাবের সঙ্গে প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি সেইটি বুঝিয়া স্ত্রী ও পুরুষে মিলিত হইতে পারিলেই ধর্ম্মচর্চ্চার পথ পরিষ্কার হইয়া পড়ে। অর্থাৎ অব্যক্ত সৌন্দর্য্য সহজে বাহিরে অভিব্যক্ত হইতে পারে।

অব্যক্ত সৌন্দর্য্য বাহিরে অভিব্যক্ত করা প্রকৃতির কাজ। প্রকৃতির এই কাজে সহায়তা করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং তাহাই ধর্ম্ম।

স্ত্রীলোকে সৌন্দর্য্য ভালবাসে এবং যেখানে সৌন্দর্য্যের আধিক্য সেইখানেই আকৃষ্ট হইয়া থাকিতে ভালবাসে; পুরুষও স্ত্রীজাতিকে আকর্ষণ করিতে ভালবাসে এবং যাহার মন যত আকৃষ্ট হয়, যাহার মনে তাহার সৌন্দর্য্য যত দৃঢ়াঙ্কিত হয় পুরুষ তাহাতেই তত অনুরক্ত হয়। The fittest would survive অর্থাৎ কালের বশে যাহা কিছু নিকৃষ্ট সব নষ্ট হইয়া যাইবে কেবল যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহারাই বজায় থাকিবে। স্ত্রীলোকের ও পুরুষের অন্তরে যে দুইটি ভাবের বীজ নিহিত আছে বলা হইয়াছে, তাহা যখন সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইবে তখন সুন্দর পুরুষ ব্যতীত নিকৃষ্ট পুরুষ থাকিবে না এবং যে স্ত্রীচিত্তে সৌন্দর্য্য ঐরূপ দৃঢ়াঙ্কিত থাকে যে সেই আঁক কিছুতেই মোছা যায় না সেইরূপ স্ত্রী ভিন্ন অপরা স্ত্রী থাকিবে না। ভবিষ্যতে যাহা থাকিবে অব্যক্ত ভাবে তাহারই বীজ বর্ত্তমান আছে—তাহাই সৎ ও সতী।

৬। লোকলজ্জা ভয়ে, সমাজের ভয়ে, অথবা ধর্ম্মের ভয়ে অথবা পরকালের ভয়ে অনেক সুন্দরী পর পুরুষের মুখ পর্য্যন্ত দেখেন না কিন্তু তাই হইলেই সতী হয় না। যে রমণী যথার্থ সৌন্দর্য্যগ্রাহী, যাঁহার মনে কোন উন্নতমনা পুরুষের মানসিক সৌন্দর্য্য এরূপ দৃঢ়াঙ্কিত যে তাহা মন হইতে কিছুতেই দূর হইবার নহে, যিনি তাঁহার সেই মনের মতন পুরুষ ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত মিলিতা হইতে চান না সেই সৌন্দর্য্যভক্তা স্ত্রীকেই সতী বলিতে পারা যায়। এক কথায় যাঁহার ভক্তি অচলা তিনিই সতী। স্বামীর সৌন্দর্য্য যিনি বুঝেন নাই তিনি কখন স্বামীভক্ত হইতে পারিবেন না, কেন না যেখানে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না সেখানে কি জোর জবরদস্তি করিয়া বা সমাজের ভয়ে দৃঢ়াভক্তি থাকিতে পারে? জ্ঞানের সাহায্যে স্বামীর ভিতর যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা বুঝিতে যিনি চেষ্টা করিবেন তিনিই দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার স্বামীর ভিতরেই সেই সত্য শিব সুন্দরের সৌন্দর্য্য নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে। তখনই তিনি অচলা স্বামীভক্তি কি তাহার আস্বাদন পাইবেন। পতি যদি তাঁহার স্ত্রীকে নিজের অন্তরের পবিত্র পুরুষমূর্ত্তি দেখাইতে সতত সচেষ্ট থাকেন তবেই তিনি সত্যবান্ হইয়া স্ত্রীকে সতীতেজে প্রদীপ্তা করিতে সক্ষম হইবেন।

৭। যিনি সামান্য ইন্দ্রিয়-সুখভোগে মুগ্ধ, তিনি সতীত্ব বা সত্য কাহারও উপাসক হইতে সক্ষম হন না। যিনি ইন্দ্রিয়-সুখে আসক্ত তিনি মানুষের ভিতরকার স্থির সৌন্দর্য্য কিরূপ তাহা বুঝিতে সক্ষম হন না। ইন্দ্রিয় সুখভোগের ইচ্ছা থাকিলে মনে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় সেই চাঞ্চল্য নিবন্ধন প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি তাহা মানুষে বুঝিতে পারে না; বাহ্যিক অসুন্দর বিষয়ে আকৃষ্ট হয়; পতি নিজেকে চিনিতে পারে না এবং স্ত্রীও স্বামীকে চিনিতে পারে না। সম গুণ না থাকিলে কেহই সতী বা সত্যবান্ হইতে সক্ষম হন না। হরপার্ব্বতীর মিলনের পূর্ব্বে মদন ভস্মীকৃত হইয়াছিল; পার্ব্বতীর প্রতিজ্ঞা মহাদেব ব্যতীত অন্য বর চাই না; তিনি সেই কামনায় ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া তপঃপ্রভাবে মহাদেবের মন তৎপ্রবণীকৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সতীত্ব ও সত্য সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে তাহা কিছুই

বলা হইল না। সতীত্ব ও সত্য এই দুটি কথার আদর যতই বাড়িবে পৃথিবীর ততই শ্রীবৃদ্ধি এই সত্যটি এত গভীর বলিয়া বোধ হয় যে সেই গভীরতা প্রকাশ করিবার ভাষা যেন নাই। যাহা হউক উপসংহার এই একান্ত কামনা যে আমার এই কথা গুলি আমাদের সমাজে যেন একেবারে হতাহত না হয়। যদি একজনও এই কথা গুলি লইয়া একদিনও একটু স্থিরচিত্তে ভাবেন তবেই আমার এই লেখাটির সার্থকতা সিদ্ধ হইবে।

সীতারাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাজার কথা শ্রী সব শুনিল, শ্রীর কথা রাজা সব শুনিলেন। যেমন করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া সীতারাম শ্রীর জন্য পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সীতারাম তাহা বলিলেন। শ্রী আপনার কথাও কতক কতক বলিল, সকল বলিল না।

তার পর, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল,

"এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

প্রশ্ন শুনিয়া সীতারামের চক্ষে জল আসিল। চিরজীবনের পর স্বামিকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল কি না, এখন আমাকে কি করিতে হইবে? সীতারামের মনে হইল, উত্তর করেন, "কড়িকাঠে দড়ি ঝুলাইয়া দিবে, আমি গলায় দিব।"

তাহা না বলিয়া সীতারাম বলিলেন, "আমি আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া আমার মহিষী খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি। এখন তুমি আমার মহিষী হইয়া রাজপুরী আলো করিবে।"

শ্রী। মহারাজ! নন্দার প্রশংসা বিস্তর শুনিয়াছি। তোমার সৌভাগ্য যে তুমি তেমন মহিষী পাইয়াছ। অন্য মহিষীর কামনা করিও না।

সীতা। তুমি জ্যেষ্ঠা। নন্দা যেমন হোক, তোমার পদ তুমি গ্রহণ করিবে না কেন?

শ্রী। যে দিন, তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সে দিন গিয়াছে।

সীতারাম। সে কি? কেন গিয়াছে! কিসে গিয়াছে?

শ্রী। আমি সন্ন্যাসিনী; সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি।

সীতারাম। পতিযুক্তার সন্ন্যাসে অধিকার নাই। পতি সেবাই তোমার ধর্ম্ম।

শ্রী। যে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পতিসেবাও ধর্ম্ম নহে; দেবসেবা ও তাহার ধর্ম্ম নহে।

সীতা। সর্ব্ব কর্ম্ম কেহ ত্যাগ করিতে পারে না; তুমিও পার নাই। গঙ্গারামের জীবন রক্ষা করিয়া কি তুমি কর্ম্ম করিলে না? আমাকে দেখা দিয়া তুমি কি কর্ম্ম করিলে না?

শ্রী। করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে। একবার ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া এখন চিরকাল ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইতে বল?

সীতা। স্বামী-সহবাস স্ত্রীজাতির পক্ষে ধর্ম্মভ্রংশ এমন কুশিক্ষা তোমায় কে দিলে? যেই দিক্, ইহার উপায় আমারই হাতে আছে। আমি তোমার স্বামী, তোমার উপর আমার অধিকার আছে। সেই অধিকার বলে, আমি তোমাকে আর যাইতে দিব না।

শ্রী। তুমি স্বামী, আর তুমি রাজা। তা ছাড়া তুমি উপকারী, আমি উপকৃত। অতএব তুমি যাইতে না দিলে, আমি যাইতে পারিব না।

সীতা। আমি স্বামী, আমি রাজা আর আমি উপকারী, তাই আমি যাইতে না দিলে তুমি যাইতে পারিবে না। বলিতেছ না কেন, যে আমি তোমায় ভালবাসি, তাই আমি ছাড়িয়া না দিলে তুমি যাইতে পারিবে না? স্নেহের সোণার শিকল কাটিবে কি প্রকারে?

শ্রী। মহারাজ, সে ভ্রমটা এখন গিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, যে ভালবাসে, ভালবাসায় তাহার ধর্ম্ম এবং সুখ আছে। কিন্তু যে ভালবাসা পায়, তাহার তাতে কি? তুমি মাটির ঠাকুর গড়িয়া, তাহাকে পুষ্প-চন্দন দাও তাহাতে তোমার ধর্ম্ম আছে, সুখ ও আছে, কিন্তু তাহাতে মাটির পুতুলের কি?

সীতা। কি ভয়ানক কথা!

শ্রী। ভয়ানক নহে—অমৃতময় কথা। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। ঈশ্বরে প্রীতিই জীবের সুখ বা ধর্ম্ম। তাই সর্ব্বভূতকে ভাল বাসিবে। কিন্তু ঈশ্বর নির্ব্বিকার, তাঁর সুখ দুঃখ নাই ঈশ্বরের অংশ স্বরূপ যে আত্মা জীবে আছেন, তাঁহারও তাই। ঈশ্বরে অর্পিত যে প্রীতি, তাহাতে তাঁহার সুখ দুঃখ নাই। তবে যে, কেহ ভালবাসিলে আমরা সুখী হই, সে কেবল মায়ার বিক্ষেপ।

সীতা। শ্রী! দেখিতেছি কোন ভণ্ড সন্ন্যাসীর হাতে পড়িয়া তুমি স্ত্রী-বুদ্ধি বশতঃ কতকগুলা বাজে কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছ। ও সকল স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল নহে ভাল যা, তা বলিতেছি, শুন। আমি তোমার স্বামী, আমার সহবাসই তোমার ধর্ম্ম; তোমার ধর্ম্মান্তর নাই। আমি রাজা, সকলেরই ধর্ম্মরক্ষা আমার কর্ম্ম। এবং স্বামিরও কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে স্ত্রীকে ধর্ম্মানুবর্ত্তিনী করে। অতএব তোমার ধর্ম্মে আমি তোমাকে প্রবৃত্ত করিব। তোমাকে যাইতে দিব না।

শ্রী। তা বলিয়াছি, তুমি স্বামী, তুমি রাজা, তুমি উপকারী। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কেবল আমার এই টুকু বলিয়া রাখা, যে আমা হইতে তুমি সুখী হইবে না।

সী। তোমাকে দেখিলেই আমি সুখী হইব।

শ্রী। আর এক ভিক্ষা এই, যদি আমাকে গৃহে থাকিতে হইল, তবে আমাকে এই রাজপুরী মধ্যে স্থান না দিয়া, আমাকে একটু পৃথক কুটীর তৈয়ার করিয়া দিবেন। আমি সন্ন্যাসিনী, রাজপুরীর ভিতর আমিও সুখী হইব না, লোকে আপনাকে উপহাস করিবে।

সী। আর কুটীরে রাজমহিষীকে রাখিলে লোকে উপহাস করিবে না কি?

শ্রী। রাজমহিষী বলিয়া কেহ নাই জানিল।

সী। আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে না কি?

শ্রী। সে আপনার অভিরুচি।

সী। তোমার সঙ্গে আমি দেখা শুনা করিব, অথচ তুমি রাজমহিষী নও; লোকে তোমাকে কি বলিবে জান?

শ্রী। জানি বৈকি? লোকে আমাকে রাজার উপপত্নী বিবেচনা করিবে। মহারাজ! আমি সন্ন্যাসিনী,—আমার মান অপমান কিছুই নাই। বলে বলুক না। আমার মান অপমান আপনারই হাতে।

সী। সে কি রকম?

শ্রী। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী—আমার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন অধর্ম্মাচরণ করিও না। ধর্ম্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি তাহা অধর্ম্ম ইন্দ্রিয় তৃপ্তি পশুবৃত্তি। পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নাই। পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্ম্মার্থেই বিবাহ। রাজর্ষিগণ যখন বিশুদ্ধচিত্ত না হইয়া সহধর্ম্মিণীর সহবাস করিতেন না। ইন্দ্রিয়বশ্যতা মাত্রই পাপ। আপনি যখন নিষ্পাপ হইয়া, শুদ্ধচিত্তে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারিবেন, তখন আমি এই গৈরিক বস্ত্র ছাড়িব। যতদিন আমি এ গেরুয়া না ছাড়িব, ততদিন মহারাজ! তোমাকে পৃথক আসনে বসিতে হইবে।

সী। আমি তোমার প্রভু, আমার কথাই চলিবে।

শ্রী। একবার চলিতে পারে, কেন না তুমি বলবান কিন্তু আমারও এক বল আছে। আমি বনবাসিনী, বনে আমরা অনেক প্রকার বিপদে পড়ি। এমন বিপদ ঘটিতে পারে যে তাহা হইতে উদ্ধার নাই। সে সময়ে আপনার রক্ষার জন্য আমরা সঙ্গে একটু বিষ রাখি। আমার নিকট বিষ আছে—আবশ্যক হইলে খাইব।

হায়! এ শ্রী ত সীতারামের শ্রী নয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

সীতারাম তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। মন কিছুতেই বুঝিল না। যাহার ভালবাসার জিনিষ মরিয়া যায়, সেও মৃত দেহের কাছে বসিয়া থাকে, কিছুক্ষণ বিশ্বাস করে না যে আর নিশ্বাস নাই। পাগল লিয়রের মত দর্পণ খুঁজিয়া বেড়ায়, দর্পণে নিশ্বাসের দাগ ধরে কি না। সীতারাম এত বৎসর ধরিয়া, মনোমধ্যে একটা শ্রীমূর্ত্তি

গড়িয়া, তাহার আরাধনা করিয়াছিল। বাহিরের শ্রী যাই হৌক, ভিতরের শ্রী তেমনিই আছে। বাহিরের শ্রীকেই ত সীতারাম হৃদয়ে লাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বাহিরের শ্রী ত বাহিরেই আছে, তবে সে দয়ের শ্রী হইতে ভিন্ন কিসে? ভিন্ন বলিয়া সীতারাম বারেক মাত্রও ভাবিতে পারিলেন না। লোকের বিশ্বাস আর সব যাই হৌক, মানুষ যা তাই থাকে। মানুষ যে কতবার মরে, তাহা আমরা বুঝি না। এক দেহেই কতবার যে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে, তাহা মনেও করি না। সীতারাম বুঝিল না, যে সে শ্রী মরিয়াছে, আর একটা শ্রী সেই দেহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মনে করিল যে আমার শ্রী আমার শ্রীই আছে। তাই শ্রীর চড়া চড়া কথা গুলা কাণে তুলিল না। তুলিবারও বড় শক্তি ছিল না। শ্রীকে ছাড়িলে সব ছাড়িতে হয়।

তা, শ্রী কিছুতেই রাজপুরী মধ্যে থাকিতে রাজি হইল না। তখন সীতারাম "চিত্তবিশ্রাম" নামে ক্ষুদ্র অথচ মনোরম প্রমোদ ভবন শ্রীর নিবাসার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শ্রী তাহাতে বাঘছাল পাতিয়া বসিল। রাজা প্রত্যহ তাহার সাক্ষাৎ জন্য যাইতেন। পৃথক আসনে বসিয়া তাহার সঙ্গে আল্যপ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। ইহাতে রাজার পক্ষে বড় বিষময় ফল ফলিল।

আলাপটা কি রকম হইত মনে কর? রাজা বলিতেন, ভালবাসার কথা, শ্রীর জন্য তিনি এতদিন যে দুঃখ পাইয়াছেন তাহার কথা, শ্রীভিন্ন জীবনে তাঁহার আর কিছুই নাই, সেই কথা। কত দেশে কত লোক পাঠাইয়াছেন, কত দেশে নিজে কত খুঁজিয়াছেন, সেই কথা। শ্রী বলিত, কত পর্ব্বতের কথা, কত অরণ্যের কথা, কত বন্য পশু পক্ষী ফল মূলের কথা, কত যতি পরমহংস ব্রহ্মচারির কথা, কত ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কর্ম্ম অকর্ম্মের কথা, কত পৌরাণিক উপন্যাসের কথা, কত দেশবিদেশী রাজার কথা, কত দেশাচার লোকাচারের কথা।

শুনিতে শুনিতে, সেই পৃথক আসনে বসিয়াও রাজার বড় বিপদ হইল। কথাগুলি বড় মনোমোহিনী। যে বলে সে আরও মনোমোহিনী। আগুণ ত জলিয়াই ছিল, এবার ঘর পুড়িল। শ্রী ত চিরকালই

মনোমোহিনী। যে শ্রী, বৃক্ষ বিটপে দাঁড়াইয়া আঁচল হেলাইয়া রণ জয় করিয়াছিল, রূপে এ শ্রী তাহার অপেক্ষা অনেক গুণে রূপসী। শরীরের স্বাস্থ্য, এবং মনের বিশুদ্ধি হইতেই রূপের বৃদ্ধি জন্মে;—শ্রীর শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের বিশুদ্ধি শতগুণে বাড়িয়াছিল; তাই রূপও শতগুণে বাড়িয়াছিল। সদ্যপ্রস্ফুটিত প্রাতঃপুষ্পের যেমন পূর্ণ স্বাস্থ্য—কোথাও অপুষ্ট নয়, কোথাও অঙ্গহীন নয়, কোথাও বিবর্ণ নয়, কোথাও বিশুষ্ক নয়,—সর্ব্বত্র মসৃণ, সম্পূর্ণ, শীতল, সুবর্ণ;—শ্রীর তেমনই স্বাস্থ্য;—শরীর সম্পূর্ণ, সেইজন্য শ্রী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিমতী। তারপর চিত্ত প্রশান্ত, ইন্দ্রিয়ক্ষোভশূন্য, চিন্তাশূন্য, বাসনাশূন্য, ভক্তিময়, প্রীতিময়, দয়াময়,—কাজেই সেই সৌন্দর্য্যের বিকার নাই, কোথাও একটা দুঃখের রেখা নাই, একটু মাত্র ইন্দ্রিয়ভোগের ছায়া নাই, কোথাও চিন্তার চিহ্ন নাই, সর্ব্বত্র সুমধুর, সহাস্য, সুখময়—এ ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির কাছে সে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি কোথায় দাঁড়ায়! তাহার পর সেই মনোমোহিনী কথা—নানা দেশের, নানা বিষয়ের, নানাবিধ অশ্রুতপূর্ব্ব কথা, কখন কৌতুহলের উদ্দীপক, কখন মনোরঞ্জন, কখন জ্ঞানগর্ভ—এই দুই মোহ একত্রে মিশিলে কোন্ অসিদ্ধ ব্যক্তির রক্ষা আছে? সীতারামের অনেক দিন ত আগুণ জ্বলিয়াছিল, এখন ঘর পুড়িতে লাগিল।

প্রথমে সীতারাম প্রত্যহ সায়াহ্নকালে চিত্তবিশ্রামে আসিতেন, প্রহরেক কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যাইতেন। তারপর ক্রমশঃ রাত্রি বেশী হইতে লাগিল। পৃথক আসন হউক, রাজা ক্ষুধা ও নিদ্রায় পীড়িত না হইলে সেখান হইতে ফিরিতেন না। ইহাতে কিছু কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং সীতারাম, চিত্তবিশ্রামেই নিজের সায়াহ্ন আহার, এবং রাত্রে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। সে আহার বা শয়ন পৃথক গৃহে; শ্রীর বাঘছালের নিকটে ঘেঁষিতে পাইতেন না। ইহাতেও সাধ মিটিল না; প্রাতে রাজবাড়ী ফিরিয়া যাইতে দিন দিন বেলা হইতে লাগিল। শ্রীর সঙ্গে ক্ষণেক প্রাতেও কথাবার্ত্তা না কহিয়া যাইতে পারিতেন না! যখন বড় বেলা হইতে লাগিল, তখন আবার মাধ্যাহ্নিক আহারটাও চিত্তবিশ্রামেই হইতে লাগিল। রাজা আহারান্তে একটু নিদ্রা দিয়া, বৈকালে একবার রাজকার্য্যের জন্য রাজবাড়ী যাইতেন। তার পর

কোন দিন যাইতেন, কোন দিন বা কথায় কথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। শেষ এমন হইয়া উঠিল যে, যখন যাইতেন, তখনই একটু ঘুরিয়া ফিরিয়াই চলিয়া আসিতেন, চিত্তবিশ্রাম ছাড়িয়া তিষ্ঠিতেন না। চিত্তবিশ্রামেই রাজা বাস করিতে লাগিলেন, কখন কখন রাজভবনে বেড়াইতে যাইতেন।

এ দিকে চিত্তবিশ্রামে কাহারও কোন কার্য্যের জন্য আসিবার হুকুম ছিল না। চিত্তবিশ্রামের অন্তঃপুরে কীটপতঙ্গও প্রবেশ করিতে পারিত না। কাজেই রাজকার্য্যের সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ প্রায় ঘুচিয়া উঠিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ, দুইজন নিরীহ গৃহস্থ লোক, মহম্মদপুরে বাস করে। রামচাঁদের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া, প্রদোষকালে, নিভৃতে তামাকুর সাহায্যে দুইজনে কথোপকথন হইতেছিল। কিয়দংশ পাঠককে শুনিতে হইবে।

রামচাঁদ। ভাল, ভায়া, বলিতে পার চিত্তবিশ্রামের আসল ব্যাপারটা কি?

শ্যামচাঁদ। কি জান, দাদা, ও সব রাজা রাজাড়ার হয়েই থাকে। আমাদের গৃহস্থ ঘরে কারই বা ছাড়া—তার আর রাজা রাজাড়ার কথায় কাজ কি? তবে আমাদের মহারাজাকে ভাল বল্‌তে হবে—মাত্রায় বড় কম। মোটে এই একটি।

রাম। হাঁ তাত বটেই! তবে কি জান, আমাদের মহারাজা না কি সে রকম নয়, পরম ধার্ম্মিক, তাই কথাটা জিজ্ঞাসা করি। বলি এত কালত এ সব ছিল না।

শ্যাম। রাজাও আর সে রকম নাই, লোকে ত বলে। কি জান, মানুষ চিরকাল এক রকম থাকে না। ঐশ্বর্য্য সম্পদ বাড়িলে, মনটাও কিছু এ দিক ওদিক হয়। আগে আমরা রাম রাজ্যে বাস করিতাম—ভূষণা দখল হ'য়ে অবধি কি আর তাই আছে?

রাম। তা বটে। তা আমার যেন বোধ হয়, যে চিত্তবিশ্রামের কাণ্ডটা

হ'য়ে অবধিই যেন বাড়াবাড়ি ঘটেছে। তা, মহারাজকে এমন বশ করাও সহজ ব্যাপার নয়। মাগীও ত সামান্যা নয়—কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসিল ?

শ্যাম। শুনেছি সেটা না কি একটা ভৈরবী। কেউ কেউ বলে, সেটা ডাকিনী। ডাকিনীরা নানা মায়া জানে, মায়াতে ভৈরবী বেশ ধ'রে বেড়ায় আবার কেউ বলে তার একটা জোড়া আছে, সেটা উড়ে উড়ে বেড়ায়, তাকে বড় দেখতে পায় না।

রাম। তবে ত বড় সর্ব্বনাশ! রাজ্য পড়িল ডাকিনীর হাতে! এ রাজ্যের কি আর মঙ্গল আছে ?

শ্যাম। গতিকে ত বোধ হয় না। রাজা ত আর কাজ কর্ম্ম দেখেন না। যা করেন তর্কালঙ্কার ঠাকুর। তা তিনি, লড়াই ঝকড়ার কি জানেন। এ দিকে না কি নবাবি ফৌজ শীঘ্র আসিবে।

রাম। আসে মেনাহাতী আছে।

শ্যাম। তুমিও যেমন দাদা! পরের কি কাজ! যার কর্ম্ম তার সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। এইত দেখ্‌লে গঙ্গারাম রায় কি কর্‌লে ? আবার কে জানে মেনাহাতীই বা কি করে ? সে যদি নেড়ের সঙ্গে মিশে যায়, তবে আমরা দাঁড়াই কোথা ? গোষ্ঠি শুদ্ধ জবাই হব দেখতে পাচ্চি।

রাম। তা বটে। তাই একে একে সব সরিতে আরম্ভ করেছে বটে। সে দিন তিলক ঘোষেরা উঠে যশোর গেল, তখন বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম যে কেন যাও ? বলে এখানে জিনিস পত্র মাগ্যি। এখনই ত আরও কয় ঘর আমাদের পাড়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

শ্যাম। তা দাদা তোমার কাছে বলচি প্রকাশ করিও না, আমিও শিগ্‌গির সরবো।

রামচাঁদ। বটে! ত আমিই পড়ে জবাই হই কেন ? তবে কি জান, এই সব বাড়ী ঘর দ্বার খরচ পত্র করে করা গেছে, এখন ফেলে ঝেলে যাওয়া গরিব মানুষের বড় দায়।

শ্যাম। তা কি করবে প্রাণটা আগে, না বাড়ী ঘর আগে। ভাল, রাজ্য বজায় থাকে, আবার আসা যাবে। ঘর দ্বার ত পালাবে না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রী। মহারাজ! তুমি ত সর্ব্বদাই চিত্ত বিশ্রামে। রাজ্য করে কে?

সীতা। তুমিই আমার রাজ্য। তোমাতে যত সুখ, রাজ্যে কি তত সুখ!

শ্রী। ছি! ছি! মহারাজ এই জন্য কি হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে! আমার কাছে হিন্দু সাম্রাজ্য খাটো হইয়া গেল, ধর্ম্ম গেল, আমিই সব হইলাম! এই কি রাজা সীতারাম রায়?

সীতা। রাজ্য ত সংস্থাপিত হইয়াছে।

শ্রী। টিকিবে কি?

সীতা। ভাঙ্গে কার সাধ্য?

শ্রী। তুমিই ভাঙ্গিতেছ। রাজার রাজ্য, আর বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সমান। যত্নে রক্ষা না করিলে থাকে না।

সীতা। কৈ, অরক্ষাও ত হইতেছে না।

শ্রী। তুমি কি রাজ্য রক্ষা কর? তোমাকে ত আমার কাছেই দেখি।

শ্রী। আমি রাজকর্ম্ম না দেখি, তা নয়। প্রায় প্রত্যহই রাজপুরীতে গিয়া থাকি। আমি একদণ্ড দেখিলে যা হইবে, অন্যের সমস্ত দিনে তত হইবে না। তা ছাড়া, তর্কালঙ্কার ঠাকুর আছেন, মৃণ্ময় আছে, তাঁহারা সকল কর্ম্মে পটু। তাঁহারা থাকিতে কিছু না দেখিলেও চলে।

শ্রী। একবার ত তাঁহারা থাকিতেও রাজ্য যাইতেছিল। দৈবাৎ তুমি সে রাত্রে না পৌঁছিলে, রাজ্য থাকিত না। আবার কেন কেবল তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছ?

সীতা। আমি ত আছি। কোথাও যাই নাই। আবার বিপদ পড়ে, আবার রক্ষা করিব।

শ্রী। যতক্ষণ এই বিশ্বাস থাকিবে, ততক্ষণ তুমি কোন যত্নই করিবে না, যত্ন ভিন্ন কোন কাজই সফল হয় না।

সী। যত্নের ত্রুটি কি দেখিলে?

শ্রী। আমি স্ত্রী জাতি, সন্ন্যাসিনী, আমি রাজকার্য্য কি বুঝি যে, সে কথার

উত্তর দিতে পারি। তবে একটা বিষয়ে মনে বড় শঙ্কা হয়। মুরশিদাবাদের সম্বাদ পাইতেছেন কি? তোরাব খাঁ গেল, ভূষণা গেল, বারো ভূঁইয়া গেল, নবাব কি চুপ করিয়া আছে?

সী। সে ভাবনা করিও না। মুরশীদ কুলি যতক্ষণ মাল খাজানা ঠিক কিস্তী কিস্তী পাইবে, ততক্ষণ কিছু বলিবে না।

শ্রী। পাইতেছে কি?

সী। হাঁ। পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে বটে—তবে এবার দেওয়া যায় নাই, অনেক খরচ পত্র হইয়াছে।

শ্রী। তবে সে চুপ করিয়া আছে কি?

সীতারাম মাথা হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—

"সে কি করিবে, কি করিতেছে? তাহার কিছু সম্বাদ পাই নাই।"

শ্রী। মহারাজ! চিত্তবিশ্রামে থাক বলিয়া কি সম্বাদ পাইতে ভুলিয়া গিয়াছ?"

সীতারাম চিন্তামগ্ন হইয়া বলিলেন, "বোধ হয় তাই। শ্রি! তোমার মুখ দেখিলে আমি সব ভুলিয়া যাই।

শ্রী। তবে, আমার এক ভিক্ষা আছে। এ পোড়ার মুখ, আবার লুকাইতে হইবে। নহিলে সীতারাম রায়ের নামে কলঙ্ক হইবে; ধর্ম্ম রাজ্য ছারে খারে যাইবে। আমায় হুকুম দাও, আমি বনে যাই।

সীতা। যা হয় হোক, আমিও ভাবিয়া দেখিতেছি। হয় তোমায় ছাড়িতে হইবে, নয় রাজ্য ছাড়িতে হইবে। আমি রাজ্য ছাড়িব তোমায় ছাড়িব না।

শ্রী। তবে তাহাই করুন। রাজ্য কোন উপযুক্ত লোকের হাতে দিন। তার পর সন্ন্যাস গ্রহন করিয়া আমার সঙ্গে বনে চলুন।

সীতারাম চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। রাজার তখন ভোগ লালসা অত্যন্ত প্রবল। আগে হইলে সীতারাম রাজ্য ত্যাগ করিতে পারিতেন, এখন সে সীতারাম নাই; রাজ্য ভোগে সীতারামের চিত্ত সমল হইয়াছে। সীতারাম রাজ্য ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সেই যে সভাতলে, রমা মূর্চ্ছা পাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল; সখীরা ধরাধরি করিয়া আনিয়া শুয়াইল, সেই অবধি রমা আর উঠে নাই। প্রাণ পণ করিয়া আপনার সতী নাম রক্ষা করিয়াছিল। নাম রক্ষা হইল, কিন্তু প্রাণ বুঝি গেল।

এখন রোগ পুরাতন হইয়াছে। কিন্তু গোড়া থেকে বলি। রাজার রাণী, চিকিৎসার অভাব হয় নাই। প্রথম হইতেই কবিরাজ যাতায়াত করিতে লাগিল। অনেকগুলা কবিরাজ রাজ বাড়ীতে চাকরি করে, তত কর্ম্ম নাই, সচরাচর ভৃত্যবর্গকে মশলা খাওয়াইয়া, এবং পরিচারিকাকে পোষ্টাই দিয়া, কালাতিপাত করে; এক্ষণে ছোট রাণীকে রোগী পাইয়া কবিরাজ মহাশয়েরা হঠাৎ বড় লোক হইয়া বসিলেন। তখন রোগ নির্ণয় লইয়া মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মূর্চ্ছা, বায়ু, অম্লপিত্ত, হৃদ্রোগ, ইত্যাদি নানা-বিধ রোগের লক্ষণ শুনিতে শুনিতে রাজপুরুষেরা জ্বালাতন হইয়া উঠিল। কেহ নিদানের দোহাই দেন, কেহ বাভটের; কেহ চরক সংহিতার বচন আওড়ান, কেহ সুশ্রুতের টীকা ঝাড়েন। রোগ অনির্ণীত রহিল।

কবিরাজ মহাশয়েরা, কেবল বচন ঝাড়িয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, এমন নিন্দা আমরা করি না। তাঁহারা নানা প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কেহ বটিকা, কেহ গুঁড়া, কেহ ঘৃত, কেহ তৈল; কেহ বলিলেন, ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, কেহ বলেন, আমার কাছে যাহা প্রস্তুত আছে, তেমন আর হইবে না। যাই হউক, রাজার বাড়ী; রাণীর রোগ, ঔষধের প্রয়োজন থাক না থাক, নূতন প্রস্তুত হইবে না, এমন হইতে পারে না। হইলে দশজনে দুটাকা দুসিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, অতএব ঔষধ প্রস্তুতের ধূম পড়িয়া গেল। কোথাও হামানদিস্তায় মূল পিষ্ট হইতেছে, কোথাও ঢেঁকিতে ছাল কুটিতেছে; কোথাও হাঁড়িতে কিছু সিদ্ধ হইতেছে, কোথাও খুলিতে তৈলে মূর্চ্ছনা পড়িতেছে। রাজ বাড়ীর একজন পরিচারিকা এক দিন দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "রাণী হইয়া রোগ হয়, সেও ভাল।"

যার জন্য ঔষধের এত ধুম, তার সঙ্গে ঔষধের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বড় অল্প।

কবিরাজ মহাশয়েরা ঔষধ যোগাইতেন না, তা নয়। সে গুণে তাঁহাদের কিছু মাত্র ত্রুটি ছিল না। তবে রমার দোষে সে যত্ন বৃথা হইল—রমা ঔষধ খাইত না। মুরলার বদলে, যমুনা নাম্নী এক জন পরিচারিকা, রাণীর প্রধানা দাসী হইয়াছিল। যমুনাকে একটু প্রাচীন দেখিয়া নন্দা তাহাকে এই পদে অভিষিক্তা করিয়াছিলেন। আমরা এমন বলিতে পারি না যে যমুনা আপনাকে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিত; শুনিয়াছি কোন রাজভৃত্য বিশেষের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মতান্তর ছিল; তথাপি স্থুল কথা এই যে যমুনা একটু প্রাচীন চালে চলিত, রমাকে বিলক্ষণ যত্ন করিত; রোগিনীর সেবার কোন প্রকার ত্রুটি না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগিনী ছিল। রমার জন্য কবিরাজেরা যে ঔষধ দিয়া যাইত, তাহা তাহারই হাতে পড়িত; সেবন করাইবার ভার তাহার উপর। কিন্তু সেবন করান তাঁহার সাধ্যাতীত; রমা কিছুতেই ঔষধ খাইত না।

এদিকে রোগের কোন উপশম নাই, ক্রমেই বৃদ্ধি, রমা আর মাথা তুলিতে পারে না। দেখিয়া শুনিয়া যমুনা স্থির করিল, যে, সে সকল কথা বড় রাণীকে গিয়া জানাইবে। অতএব রমাকে বলিল, "আমি বড় মহারাণীর কাছে চলিলাম; ঔষধ তিনি নিজে আসিয়া খাওয়াইবেন।"

রমা বলিল, "বাছা! মৃত্যুকালে আর কেন জালাতন করিস! বরং তোর সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করি।"

যমুনা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বন্দোবস্ত মা?"

রমা। তোমার এই ঔষধগুলি আমারে বেচিবে? আমি এক এক টাকা দিয়া এক একটা বড়ি কিনিতে রাজি আছি।

যমুনা। সে আবার কি মা! তোমার ঔষধ, তোমায় আবার বেচিব কি?

রমা। টাকা নিয়া তুমি যদি আমায় বড়িগুলি বেচ, তা হ'লে তোমার আর তাতে কোন অধিকার থাকিবে না। চাই আমি খাই, চাই না খাই, তুমি আর কথা কহিতে পাবে না।

যমুনা কিছুক্ষণ ভাবিল। সে বুদ্ধিমতী, মনে মনে বিচার করিল, যে এ ত মরিবেই, তবে আমি টাকা গুলা ছাড়ি কেন? প্রকাশ্যে বলিল।

"তা মা তুমি যদি খাও, ত টাকা দিয়াই নাও, আর অমনিই নাও. নাও না কেন! আর যদি না খাও, ত আমার কাছে ওষুধ পড়ে থেকেই কি ফল?"

অতএব চুক্তি ঠিক হইল। যমুনা টাকা লইয়া, ঔষধ রমাকে বেচিল। রমা ঔষধের কতকগুলা পিকদানিতে ফেলিয়া দিল, কতক বালিশের নীচে গুঁজিল। উঠিতে পারে না, যে অন্যত্র রাখিবে।

এদিগে, ক্রমশঃ শরীর ধ্বংসের লক্ষণ সকল দেখা দিতে লাগিল। নন্দা প্রত্যহ রমাকে দেখিতে আসে, দুই একদণ্ড বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিয়া যায়। নন্দা দেখিল, যে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে; যাহার ছায়া, সে নিকটেই। নন্দা ভাবিল, "হায়! রাজবাড়ীর কবিরাজ গুলোকেও কি ডাকিনীতে পেয়েছে?" নন্দা একেবারে কবিরাজের দলকে ডাকাইয়া পাঠাইল। সকলে আসিলে, নন্দা অন্তরালে থাকিয়া তাহাদিগকে উত্তম মধ্যম রকম ভৎসনা করিল। বলিল "যদি রোগ ভাল করিতে পার না, তবে মাসিক লও কেন?"

একজন প্রাচীন কবিরাজ বলিল, "মা! কবিরাজে ঔষধ দিতে পারে, পরমায়ু দিতে পারে না।"

নন্দা বলিল, "তবে আমাদের ঔষধে ও কাজ নাই, কবিরাজে ও কাজ নাই! তোমরা আপনার আপনার দেশে যাও।"

কবিরাজ মণ্ডলী বড় ক্ষুণ্ণ হইল। প্রাচীন কবিরাজটি বড় বিজ্ঞ। তিনি বলিলেন, "মা! আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাই এমন ঘটিয়াছে। নহিলে, আমি যে ঔষধ দিয়াছি, তাহা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। আমি এখনও আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি, যে তিন দিনের মধ্যে আরাম করিব, যদি একটা বিষয়ে আপনি অভয় দেন।

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?"

কবিরাজ বলিল, "আমি নিজে বসিয়া থাকিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া আসিব।" বুড়ার বিশ্বাস, যে "বেটি ঔষধ খায় না; আমার ঔষধ খাইলে কি রোগী মরে!"

নন্দা স্বীকৃত হইয়া কবিরাজদিগকে বিদায় দিল। পরে রমার কাছে আসিয়া সব বলিল। রমা অল্প হাসিল, বেশী হাসিবার শক্তিও নাই, মুখে স্থান ও নাই; মুখ বড় ছোট হইয়া গিয়াছে।

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"হাসিলি যে ?"

রমা আবার তেমনি হাসি হাসিয়া বলিল "ঔষধ খাব না।"

নন্দা। ছি দিদি! যদি এত ওষুধ খেলে, ত আর তিনটা দিন খেতে কি ?

রমা। আমি ওষুধ খাই নাই। নন্দা চমকিয়া উঠিল,—বলিল, "সে কি ? মোটে না ?"

রমা। সব বালিশের নীচে আছে।

নন্দা বালিশ উল্টাইয়া দেখিল, সব আছে বটে। তখন নন্দা বলিল, "কেন বহিন্,—এখন আর আত্মঘাতিনী হইবে কেন ? পাপ ত মিটিয়াছে।"

রমা। তা নয়—ঔষধ খাব।

নন্দা। আর কবে খাবি ?

রমা। যবে রাজা আমাকে দেখিতে আসিবেন।

ঝর ঝর করিয়া রমার চোক দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নন্দার ও চক্ষে জল আসিল। আর এখন সীতারাম রমাকে দেখিতে আসে না। সীতারাম চিত্তবিশ্রামে থাকে। নন্দা চোখের জল মুছিয়া বলিল, "এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন," এই কথা বলিয়া নন্দা রমাকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিল। সেই আশ্বাসে রমা কোন রকমে বাঁচিয়াছিল—কিন্তু আর বুঝি বাঁচে না। নন্দা তাহাকে যে আশ্বাস বাক্য দিয়া আসিয়াছে, নন্দাও তাহা জপমালা করিয়াছিল, কিন্তু রাজাকে ধরিতে পারিতেছিল না, যদি কখন ধরে, তবে "আজ না কাল" করিয়া রাজা প্রস্থান করেন। নন্দা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে কিছুতেই সে সীতারামের উপর রাগ করিবে না। ভাবিল, 'রাজাকে ত ডাকিনীতে পেয়েছে সত্য, কিন্তু তাই ব'লে আমায় যেন ভুতে না পায়। আমার ঘাড়ে রাগ ভুত

চড়িলে—এ সংসার এখন আর রাখিবে কে ?” তাই নন্দা সীতারামের উপর রাগ করিল না—আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম প্রাণপাত করিয়া করিতে লাগিল। কিন্তু ডাকিনীটার উপর রাগ বড় বেশী। ডাকিনী যে শ্রী, তাহা নন্দা জানিত না; সীতারাম ভিন্ন কেহই জানিত না। নন্দা অনেকবার সন্ধান জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সীতারামের আজ্ঞা ভিন্ন চিত্ত বিশ্রামে মক্ষিকা প্রবেশ করিতে পারিত না, সুতরাং কিছু হইল না। তবে জনপ্রবাদ এই যে, ডাকিনীটা দিবসে পরম সুন্দরী মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহধর্ম্ম করে, রাত্রে শৃগালী রূপ ধারণ করিয়া শ্মশানে শ্মশানে বিচরণ পূর্ব্বক নরমাংস ভক্ষণ করে। অতিশয় ভীতা হইয়া নন্দা চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে সবিশেষ নিবেদন করিল। চন্দ্রচূড় উত্তম তন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া রাজার উদ্ধারার্থ তান্ত্রিক যজ্ঞ সকল সম্পাদন করাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ডাকিনীর ধ্বংস হইল না। পরিশেষে একজন সুদক্ষ তান্ত্রিক বলিলেন, “মনুষ্য হইতে ইহার কিছু উপায় হইবে না। ইনি সামান্যা নহেন। ইনি কৈলাসনিবাসিনী, সাক্ষাৎ ভবানীর সহচরী, ইঁহার নাম বিশালাক্ষী। ইনি রুদ্রের শাপে কিছু কালের জন্য মর্ত্যলোকে মনুষ্য সহবাসার্থ আসিয়াছেন। শাপান্ত হইলে আপনিই যাইবেন।” শুনিয়া চন্দ্রচূড় ও নন্দা নিরস্ত ও চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। তবু নন্দা মনে মনে ভাবিত, ভবানীর সহচরী হউক, আর যেই হউক, আমি একবার তাকে পাইলে নখে মাথা চিরি।”

তাই, নন্দার সীতারামের উপর কোন রাগ নাই। সীতারামও রাজধানীতে আসিলে নন্দার সঙ্গে কখন কখন সাক্ষাৎ করিতেন। এই সকল সময়ে, নন্দা রমার কথা সীতারামকে জানাইত—বলিত, “সে বড় ‘কাতর’—তুমি গিয়া একবার দেখিয়া এসো।” সীতারাম যাচ্চি যাব করিয়া, যান নাই। নন্দা জোর করিয়া ধরিয়া বসিল—বলিল, “আজ দেখিতে যাও—নহিলে এ জন্মে আর দেখা হবে না।”

কাজেই সীতারাম রমাকে দেখিতে গেলেন। সীতারামকে দেখিয়া রমা বড় কাঁদিল। সীতারামকে কোন তিরস্কার করিল না। কিছুই বলিতে পারিল না। সীতারামের মনে কিছু অনুতাপ জন্মিল কি না জানি না। সীতারাম স্নেহসূচক সম্বোধন করিয়া রোগমুক্তির ভরসা দিতে লাগিলেন।

ক্রমে রমা প্রফুল্ল হইল, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল! কিন্তু কি হাসি! হাসি দেখিয়া সীতারামের শঙ্কা হইল যে আর অধিক বিলম্ব নাই।

সীতারাম পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। সেইখানে রমার পুত্র আসিল। আবার রমার চক্ষে জল আসিল—কিছুক্ষণ অবাধে জল, শুষ্ক গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেও মার কান্না দেখিয়া কাঁদিতেছিল। রমা ঈঙ্গিতে, অস্ফুটস্বরে সীতারামকে বলিলেন, "ওকে একবার কোলে নাও।" সীতারাম অগত্যা পুত্রকে কোলে লইলেন। তখন রমা, সকাতরে ক্ষীণকণ্ঠে, রুদ্ধশ্বাসে বলিতে লাগিল, "মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। এই তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা। বড় রাণীর হাতে ওকে সমর্পণ করিয়া যাব মনে করেছিলাম—কিন্তু তা না করিয়া তোমারই হাতে সমর্পণ করিলাম। কথা রাখিবে কি?"

সীতারাম কলের পুতুলের মত স্বীকৃত হইলেন, রমা তখন সীতারামকে আরও নিকটে আসিয়া বসিতে ঈঙ্গিত করিলেন। সীতারাম সরিয়া বসিলে, রমা তাঁর পায়ে হাত দিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া আপনার মথায় দিল। বলিল, "এজন্মের মত বিদায় হইলাম। আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন তোমা-কেই পাই।"

তার পর বাক্য বন্ধ হইল। শ্বাস বড় জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। চক্ষুর জ্যোতি গেল। মুখের উপর কালো ছায়া আরও কালো হইতে লাগিল। শেষে সব অন্ধকার হইল। সব জ্বালা জুড়াইল। রমা চলিয়া গেল।

নিষ্কাম কর্ম্ম।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতায় বলিয়াছেন—

"লোকেস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং॥"

এই লোকে ধর্ম্মনিষ্ঠা দুই প্রকার, ইহা বেদে আমাকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনের অধিকারী সাংখ্য যোগীরা জ্ঞান যোগে রত হন এবং

প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে অধিকারী যোগীরা কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন।

যাঁহারা আত্মবিষয়ে বিবেকবান্, তাঁহারা সংসার আশ্রমাদি পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া জ্ঞানযোগ দ্বারা যে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হন তাহাই নিবৃত্তিমার্গ নিষ্ঠা, এবং কর্ম্মিগণ কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া যে নিষ্ঠা লাভ করেন তাহাই প্রবৃত্তিমার্গ নিষ্ঠা। যিনি যে মার্গ অবলম্বনে অধিকারী তাঁহার সেই পথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে অধিকারী, সংসারাশ্রম ত্যাগরূপ সন্ন্যাস তাঁহাদিগের ধর্ম্ম নহে; এই কথাটি দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

যাহার চিত্ত, সুখ লাভেচ্ছায় বাহ্য বিষয়ে স্বতঃই আকৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তি যদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযম করিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল মনে মনে স্মরণ করিতে থাকেন তবে সেই বিমূঢ়াত্মাকে মিথ্যাচারী বলা যায়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে। গীতা ৩।৮

এরূপ কপটাচার প্রকৃত ধর্ম্ম চর্চ্চার ব্যাঘাত স্বরূপ। কেন না, মন হইতে বিষয়তৃষ্ণা দূর করাই ধর্ম্মচর্চ্চার উদ্দেশ্য, বাহ্য কর্ম্ম সন্ন্যাস অবলম্বনে মনের তৃষ্ণা দূর হয় না। প্রবৃত্তি অনুযায়ী ধর্ম্মকর্ম্ম আচরণ ব্যতিরেকে মনের তৃষ্ণা দূর করা দুঃসাধ্য। সেই জন্য ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াই তাহাদিগের পক্ষে বিধি। এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও নির্লিপ্ত থাকিবার কৌশলকেই কর্ম্মযোগ বলে। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং"। এইরূপ কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করার নামই নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ। দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে এই কথাই স্পষ্টরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে।

বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কে আসিয়া পুরুষ সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। এই সুখ দুঃখের স্মৃতি চিত্তপটে সংস্কাররূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে। কোন কোন লোকের মনে সুখের স্মৃতিটি যত দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া থাকে, সেই সুখের আনুষঙ্গিক দুঃখের স্মৃতি তত দৃঢ়াঙ্কিত হয় না; অপর অপর লোকের মনে দুঃখের স্মৃতিটি যত দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া থাকে, সুখের স্মৃতি তত দৃঢ়াঙ্কিত হয় না। যেখানে সুখের সংস্কারের প্রাধান্য, মনুষ্যচিত্ত সেইখানে সুখপ্রদ

বিষয়ে স্বতই আকৃষ্ট হয় এবং ইহা হইতেই কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। যেখানে দুঃখের সংস্কারের প্রাধান্য, সেই খানে মনুষ্য বিষয়বিদ্বেষী হইয়া ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে যত্নশীল হয়। প্রসূতি, প্রসবের পর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়াই প্রসবযন্ত্রণা সমস্ত ভুলিয়া যায়। যাহারা এইরূপ সুখপ্রদ বিষয়ের সম্পর্কে আসিয়াই আনুষঙ্গিক দুঃখ সমস্ত ভুলিয়া যায়, তাহাদের অন্তঃকরণে বিষয়বতী প্রবৃত্তির প্রাধান্য অধিক বুঝিতে হইবে। প্রবৃত্তিমার্গবিহিত স্বধর্ম্ম পালনই তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এক কথায়, চিত্তে বাসনার বীজ যত দিন থাকিবে, ততদিন মনুষ্য নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

দেবীচৌধুরাণীর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রফুল্লের প্রথম স্বামিসম্মিলন ঘটিল। একটি অপূর্ব্ব আনন্দভাব প্রফুল্লের চিত্তে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গেল। পতিভক্তি-রূপ যে চিত্তবৃত্তি প্রফুল্লের অন্তরে অব্যক্ত ভাবে ছিল, তাহা এই পতি-সম্মিলনে ফুটিয়া উঠিল। প্রফুল্ল কাঙ্গালিনী, প্রফুল্ল কখনও কাহারও নিকট আদর পায় নাই—সেই প্রফুল্লের স্বামী আজি আদর করিয়া প্রফুল্লের মুখ চুম্বন করিল, প্রফুল্ল তখন মনে মনে ভাবিতেছিল যে “বুঝি এই মুখচুম্বনের মত পবিত্র পুণ্যময় কর্ম্ম ইহজগতে কখনও কেহ করে নাই।” এই দিন প্রফুল্ল যে সুখ অনুভব করিয়াছে, তাহা সে জীবনে কখনও ভুলিতে পারে নাই। এই দিন প্রফুল্ল পতিভক্তি কি পদার্থ তাহা বুঝিল। এই পতিভক্তিবৃত্তিই প্রফুল্লের চিত্তের মূল প্রবৃত্তি; এই মূল প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্ম করাই অর্থাৎ পতিসেবায় জীবন যাপন করাই প্রফুল্লের ধর্ম্ম; এবং অহংকারশূন্য হইয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালনের নামই নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ।

এইবারে মূল প্রবৃত্তি ও অহংকার এই দুইটি কথার অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝান প্রয়োজন। মনুষ্যের প্রবৃত্তি সুখানুযায়ী ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একই রূপ বিষয়ে, সকলে কিছু সমান সুখ অনুভব করে না; সেইজন্য আমার যে বিষয়সম্পর্কে সুখ হয়, আর একজন তাহাতে যে কি সুখ আছে তাহা বুঝিতে পারে না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন লোকের চিত্তের বর্ত্তমানাবস্থায়, প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ইহা বুঝিতে হইবে। তাহার পর,

ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে আমার ভিন্ন ভিন্ন সুখের সংস্কার সকলের মধ্যে, বিশেষ কোন একটি সংস্কার সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়াঙ্কিত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহাকেই মূল প্রবৃত্তি বলিতে পারা যায়। যে সুখভাবনা উপস্থিত হইলে ইতর সকল সুখ তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, সেই সুখের প্রবৃত্তিকেই মূল প্রবৃত্তি বলিতে পারা যায়। শত্রুর সম্পর্কে আসিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে অর্জ্জুনের যে তৃপ্তিলাভ হইত, সেই সুখসংস্কার অর্জ্জুনের চিত্তে দৃঢ়াঙ্কিত ছিল এবং সেইজন্যই তাঁহার মূল প্রবৃত্তি অনুযায়ী ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিহিত যুদ্ধকার্য্যই অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম ছিল, ভগবান্ এই জন্যই তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দেন নাই।

চিত্ত বড় চঞ্চল পদার্থ; এক ভাবে স্থির থাকিতে চায় না। চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু মনুষ্য তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ঠিক বুঝিতে পারে না এবং সেই জন্য নানারূপ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। এইজন্য জ্ঞানিগণ দুঃখ নিবৃত্তির জন্য প্রথমতঃ চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিতে পরামর্শ দেন। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন,

"তৎ প্রতিশোধার্থম্ একতত্ত্বাভ্যাস।"

চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য কোন এক তত্ত্বে চিত্ত স্থির রাখিতে সতত অভ্যাস করিবে।

মূল প্রবৃত্তিতে চিত্ত স্থির রাখায় সেই প্রবৃত্তি মনুষ্যকে যেরূপ ধর্ম্মকর্ম্মে প্রেরণ করে তাহাই মনুষ্যের স্বধর্ম্ম। মনে কর, শত্রুসংহারে একজনের বড়ই আনন্দ হয়, শত্রুসংহারবাসনা তাহার মূল প্রবৃত্তি; সেই প্রবৃত্তি তাহাকে শত্রু সংহারে প্রেরণ করে এবং সেইজন্য শত্রু দেখিলেই সংহার করাই কি তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম? শত্রুসংহার বৃত্তি মূল প্রবৃত্তি হইলেই যে শত্রু দেখিলেই সংহার করিতে হইবে এরূপ নহে। যেখানে শত্রুসংহার ধর্ম্ম কর্ম্ম, সেইখানেই কেবল তিনি তাঁহার চিত্তের বৃত্তি ব্যক্ত ভাবে প্রকাশ করিতে অধিকারী; অন্যত্র নহে।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে? আমি একটি চেতন জীব; যাহা চেতন জীবে আছে কিন্তু জড় পদার্থে নাই, তাহাই চেতন জীবের ধর্ম্ম। জড় পদার্থ সকলের স্বাধীন ইচ্ছা নাই, কিন্তু আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে; এই স্বাধীনতাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। সাংখ্যকার কপিলদেব মতে প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার

ইত্যাদি যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সহিত মনুষ্যের সংযোগ দেখা যায়, এ সমস্তই জড় পদার্থ এবং কেবল একমাত্র পুরুষই চেতন পদার্থ। এই সমস্ত জড় পদার্থের যে ক্রমপরিণাম দেখা যায় তাহা এক অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশে হইতেছে। অর্থাৎ জড় পদার্থ আত্মবশে নাই কিন্তু পুরুষের যে সুখ-দুঃখ-ভোগ আছে ইহা তাহার আত্মাধীন; পুরুষের সুখ-দুঃখ-ভোগ তাহার নিজের কর্ম্মের অধীন এবং দুঃখ নিবৃত্তিই সাংখ্য শাস্ত্রানুসারে পুরুষার্থ। দুঃখ নিবৃত্তি করা এবং না করা চেতন পুরুষের আত্মাধীন এবং এই হেতু পরবশ প্রকৃতিকে জড় এবং পুরুষকে চেতন পদার্থ বলা যায়।

আমার যেটুকু আমার নিজের বশে আছে সেই টুকুই চেতন পদার্থ, সেই টুকুতেই আমার আমিত্ব বা পুরুষত্ব আছে। অর্থাৎ স্বাধীনতাই চেতনের ধর্ম্ম।

সাংখ্য শাস্ত্রানুসারে পুরুষ সংখ্যায় অনেক আছেন। আমি একজন পুরুষ, তুমি একজন পুরুষ, তিনি একজন পুরুষ ইত্যাদি। স্বাধীনতাই সকল পুরুষের সাধারণ ধর্ম্ম।

আমার সুখ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের আয়ত্তাধীন রাখিতে চেষ্টা করাই যেমন আমার পুরুষত্ব, সেইরূপ তোমার সুখ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে তোমার নিজের আয়ত্তাধীন রাখিতে চেষ্টা করা তোমার পুরুষত্ব। আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্থাৎ আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে; তোমারও সেইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে; সকল চেতন জীব মাত্রেরই এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে। মনুষ্য সকল পরস্পর পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া যে কার্য্য করে, তাহাই মনুষ্যধর্ম্ম। অর্থাৎ আমার যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, আমার দুঃখনিবৃত্তির জন্য যে স্বাধীন চেষ্টা আমার আছে, সেই স্বাধীনতার একটি সীমা আছে; আমার স্বাধীনতা ব্যক্ত করিতে গেলে যেখানে অন্যের স্বাধীন ইচ্ছার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সে ক্ষেত্র আমার স্বাধীনতা ব্যক্ত করিবার স্থল নহে। আমার যে কর্ম্মে অন্যের সুখ দুঃখ জন্মে, সেই সুখ-দুঃখ-ভোগ যদি তাহার স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধী হয়, তবে আমার সেই কর্ম্ম অধর্ম্ম অর্থাৎ চেতন মনুষ্যোচিত কর্ম্ম নহে।

এইবারে শত্রুসংহার কোন্ স্থলে ধর্ম্ম কর্ম্ম, কোথায় বা অধর্ম্ম তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। শত্রু যখন স্বেচ্ছায় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অধর্ম্ম নহে।

এইবারে অহংকার কথাটির অর্থ বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

আমার ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যে সকল কর্ম্ম সাধিত হয়, তাহা প্রকৃতির গুণ দ্বারাই সাধিত হয়; কিন্তু আমি যে আমাকে ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা জ্ঞান করি ইহাই অহংকার। সত্ত্ব রজঃ ও তম এই তিন পদার্থের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি. পুরুষ সম্পর্কে প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হওয়ায় প্রকৃতির যে ভাবান্তর হয়, তাহার নাম মহৎতত্ত্ব অথবা বুদ্ধি।

এই বুদ্ধির বিকারে অহংকারের উৎপত্তি; ইহারা সকলেই জড়পদার্থ সাংখ্য শাস্ত্রে এইরূপ কথা আছে।

জড়পদার্থ কাহাকে বলে? যাহা পরবশ তাহাই জড়পদার্থ। বাহ্য শক্তির বশে যাহা চালিত হয়, তাহাই জড়পদার্থ। মোহিনী শক্তির বশে (mesmeric powers) মুগ্ধ ব্যক্তির কর্ম্মে প্রবৃত্তি আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যের বুদ্ধি এবং অহঙ্কার বাহ্য শক্তির বশে চালিত হইয়া থাকে। যাদুকরের ইচ্ছা শক্তির বশে মুগ্ধ ব্যক্তির মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়; এবং সেই মুগ্ধ ব্যক্তি এই শক্তির বশে কর্ম্ম করিয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকায় আপনাকেই কর্ম্মের কর্ত্তা জ্ঞান করে। কোন লোককে যাদুবিদ্যা দ্বারা মুগ্ধ করিয়া যাদুকর যদি মনে মনে তাহাকে এই কথা বলিয়া দেয় যে, "তুমি অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক ব্যক্তিকে প্রহার করিবে, ইহার যেন অন্যথা না হয়", তবে অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, সেই ব্যক্তি সেই নির্দ্ধারিত সময়ে সেই ব্যক্তিকে প্রহার করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে, এবং কর্ম্ম সমাধা করিয়া আপনাকেই কর্ম্মের কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া থাকে। সে ব্যক্তি কেন ঐ রূপ কর্ম্ম করিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কারণ কিছুই বলিতে পারে না, কেবল এই মাত্র বলে যে ঐ কর্ম্মে তাহার একটা বড় ইচ্ছা হওয়ায় সে ঐ রূপ কর্ম্ম করি-

য়াছে। সম্প্রতি ইটালীতে ঐরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে শুনিয়াছি। একটি লোক খুন অপরাধে বিচারালয়ে আনীত হয়; সে ব্যক্তি জানে যে সে খুন করিয়াছে কিন্তু শেষে প্রমাণ হইল যে যাদু বিদ্যায় পারদর্শী (mesmerist) কোন লোকের মোহিনীশক্তির বশে তাহার ঐ খুন করিবার ঝোঁক উপস্থিত হইয়াছিল। বিচারে সে ব্যক্তি খালাস পাইয়াছে।

আমরাও মানুষ মাত্রেই যে সকল নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই তাহাও একটা একটা মনের খেয়ালের বশে করিয়া থাকি। এক এক সময়ে অন্তরে এক একটা ভাব ফুটিয়া উঠে এবং তাহারাই ইন্দ্রিয় সকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। ভাবময় জগৎ আলোচনা করিয়া যিনি বুঝিয়াছেন যে প্রাকৃতিক জড়শক্তির নিয়মশৃঙ্খলা বশেই ঐ রূপ ভাব সকল প্রকাশ পায়, তিনি আর আপনাকে কর্ম্মের কর্ত্তা জ্ঞান করেন না। তখন তিনি কর্ম্মকর্ত্তা অহঙ্কারকে জড়পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারেন। তখন তাঁহার অন্তরে কোন কর্ম্ম করিবার ঝোঁক উপস্থিত হইলে তিনি ইহা বুঝিতে পারেন যে বাহিরের কোন জড়-শক্তির বশে তাঁহার এই প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে কর্ম্মকর্ত্তাকে জড়শক্তি বুঝিয়া, কর্ম্মকর্ত্তা অহঙ্কার হইতে চেতন পুরুষকে যিনি পৃথক্ ভাবে দেখিতে শিখিয়াছেন অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা পরবশ কিন্তু চেতন পুরুষ আত্মবশ এই প্রভেদ যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই অহঙ্কারশূন্য। যিনি কর্ম্মের হেতু অহঙ্কারকে জড়শক্তির বশতাপন্ন পরবশ জড়পদার্থ বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং স্বাধীন আপ-নাকে চেতনপুরুষ বলিয়া জানিয়াছেন অহঙ্কারের কর্ম্মনিবন্ধন তিনি দায়ী হন না। ধর্ম্মরাজের বিচারালয়ে নীত হইলেও তিনি খালাস পাইয়া থাকেন।

দেবীচৌধুরাণীর গ্রন্থকার প্রফুল্লকে এই নিরহঙ্কারিতা শিক্ষা দিবার জন্য পবিত্র যোগশাস্ত্র ভগবদ্গীতাগ্রন্থরহস্যবিৎ পণ্ডিত ভবানী ঠাকুরের কাছে জ্ঞান শিক্ষার্থ পাঠাইয়াছেন। কেন না, এই জ্ঞান না জন্মাইলে প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্ম নিষ্কাম হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম।

শাস্ত্রকারগণ আমাদিগকে দুই রূপ ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। এক প্রবৃত্তিধর্ম্ম আর এক নিবৃত্তিধর্ম্ম। প্রথমতঃ বেদেই এই দুইরূপ ধর্ম্মের উপদেশাদি দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "দ্বিবিধোহি বেদোক্ত ধর্ম্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।" এই দুই ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ কি তাহা এস্থলে দেখা যাউক।

শাস্ত্রে আছে, এই দুই ধর্ম্ম মনুষ্যসৃষ্ট নহে। জগতের সৃষ্টির সহিত ইহাও প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির দ্বারা ইহার প্রকৃত স্বরূপ প্রভৃতি নানা ভাবে বুঝান হইয়াছে এই মাত্র। শঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—

"স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্যচ স্থিতিং চিকীর্ষু মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তং, ততোহন্যাংশ্চ সনকসনন্দনাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্ম্মং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস।" অর্থ এই যে, ভগবান প্রথমে জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার রক্ষার জন্য প্রজাপতিদের প্রবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণ করান, আর সনক সনন্দনাদিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান ও বৈরাগ্য লক্ষণযুক্ত নিবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণ করান।

এই কথার প্রকৃত অর্থ নির্দ্দেশ করা এস্থলে সম্ভব নহে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় নবজীবনে মন্বন্তর প্রবন্ধে ইহার আভাস দিয়াছেন। এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল মাত্র।

"নিবৃত্তিধর্ম্মে তিনিই (ব্রহ্মাই) সনক সনন্দন সনাতন ও সনৎকুমাররূপী পরম আদর্শ, এবং প্রবৃত্তিধর্ম্মে তিনিই মরীচি অত্রি প্রভৃতি প্রজাপতি। মরীচ্যাদি ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহার পুরুষ ও ব্রহ্মরূপ ধাতুর আবির্ভাব; এজন্য তাঁহারা ব্রাহ্মণ-প্রজাপতি শব্দে উক্ত হন; এবং মনুগণ তাঁহার শক্তি ও ক্ষেত্র রূপ ধাতুর অংশ; এজন্য তাঁহারা ক্ষত্রিয় প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। * *। পুরাণ শাস্ত্রের এই সমস্ত অর্থ বেদার্থে পূর্ণ।

সর্ব্ব প্রাণির ভোগশক্তি ও ভোগ্য বিষয় সংযুক্ত যে সত্ত্ব রজ তমোগুণময় প্রবৃত্তিধর্ম্ম বা প্রকৃতি, তৎসম্বন্ধে পরব্রহ্মের সমষ্টি নিয়ন্তৃত্ব বা কর্তৃত্ব অংশটী ব্রহ্মা নামে অভিহিত হয়। * * । এই নিমিত্ত জীবেতে সমষ্টি ভাবে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, রিপু ও ভোগবাসনা সম্বন্ধে যত বিধি বর্ত্তমান আছে, সে সমস্তই ব্রহ্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ বলিয়া উক্ত হয়। * * * । সেই সার্ব্বভৌমিক দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট মহা মানসবীজ হইতে জীব সমষ্টির প্রবৃত্তি রাজ্যের নিয়ামক দশবিধ ধর্ম্ম ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে * * তৎসমূহই ব্রাহ্মণ প্রজাপতি শব্দে উক্ত হয়। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং নারদ এই দশজন ব্রাহ্মণ প্রজাপতি বা ব্রহ্মার মানস পুত্র।" (নবজীবন, দ্বিতীয় ভাগ, ৫১৩।১৪ পৃঃ দেখ।)

যাহা হউক, এই প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও নিবৃত্তিধর্ম্ম বুঝা বড়ই কঠিন। ইহার স্বরূপ বুঝিলে আমাদের শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর অধিক গোলযোগ থাকে না। কিন্তু এ কথা বুঝিতে হইলে প্রথমেই অনেক কথা বুঝিতে হইবে।

আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌কে এক্ষণে আর বুঝাইতে হইবে না যে কার্য্যই জগতের প্রাণ। কার্য্য হইতেই জগতের উৎপত্তি—এবং কার্য্যের দ্বারাই, জগতের পরিণতি হইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রে এই কার্য্য শক্তিকে রজোগুণ কহে। সমষ্টি ভাবে ইহাকেই পুরাণে মুখ্যকল্পে স্রষ্টা ব্রহ্মা, আর গৌণ কল্পে তাঁহা হইতে উৎপন্ন মরীচি, প্রভৃতি ঋষিকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। ইহারাই জগত স্থিতির মূল কারণ।

এই জগতের কথা বুঝিতে হইলে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। প্রাচীন ঋষিদের চিন্তাপ্রণালী ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের চিন্তাপ্রণালী ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও পরিণামে তাহা মিলিয়া যায়—উভয় প্রকার যুক্তির দ্বারাই পরিশেষে একরূপ মীমাংসায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, একথা আধুনিক পণ্ডিতগণ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা যদি আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দ্বারা শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য বুঝিতে যাই, তবে আমাদের লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই।

কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হয়, তাহার তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান সুন্দররূপে

মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। বিজ্ঞান মতে একটা উচ্চতর শক্তি থাকে, এবং তাহার নিকট আর একটা নিম্নতর শক্তি থাকে। আর এই উচ্চতর শক্তি নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। এই পরিণামের অবস্থাই ক্রিয়ার অবস্থা। এক কথায় যখন উচ্চতর শক্তি নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হইতে থাকে, তখনই কার্য্য হয়। বিজ্ঞানের কথায় যখন higher potential Energy, lower potential energyতে (সংক্ষেপতঃ lower potential এ) পরিণত হয়, তখনই Kinetic Energyর আবির্ভাব হয়, এবং তাহা হইতে সেই পরিমাণে work উৎপন্ন হয়। এই উচ্চতর শক্তি এই প্রকারে ক্রিয়ারূপে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে যখন সম্পূর্ণরূপে নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হয়, তখন আর তাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। তবেই হইল, ক্রিয়া সাধিত হইবার জন্য একটা উচ্চতর শক্তি থাকা চাই—আর একটা নিম্নতর শক্তি থাকা চাই।—যে নিম্নশক্তি অপেক্ষা নিম্নতর শক্তি আর কল্পনা করা যায় না, বিজ্ঞানে তাহাকে Zero potential বলে।

আমাদের শাস্ত্রেও শক্তির এই তিনরূপ ভাব বা অবস্থার কথা অতি বিস্তারিত রূপে উল্লিখিত আছে। শাস্ত্রমতে এই উচ্চতর শক্তির নাম সত্ত্ব শক্তি, ক্রিয়া শক্তির নাম রজঃ শক্তি, আর নিম্নতর শক্তির নাম তমঃ শক্তি। এই সত্ত্ব শক্তি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই কার্য্য সম্ভব হয় বলিয়া ইহাকে কার্য্যের স্থিতি কারণ কহে। রজঃ শক্তিকে ক্রিয়াত্মক কহে। আর তমঃ শক্তিতে কার্য্য শেষ হয়—তমঃ শক্তিতে পরিণত হইবার পর আর কার্য্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া ইহাকে আবরণ শক্তি কহে। এই সত্ত্ব শক্তি হইতে কার্য্যের প্রকাশ, রজঃ শক্তি কার্য্যের পরিণতি, ও তমঃ শক্তি হইতে কার্য্যের বিনাশ বা লয় কল্পিত হইতে থাকে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতের এই যে ব্যক্তাবস্থা ইহাই তাহার কার্য্যাবস্থা। জগত ক্রিয়াত্মক—সুতরাং রজোগুণাত্মক। বলিয়াছি ত ইহার সৃষ্টি ও পরিণতি সমুদায়ই রজোগুণের কার্য্য। তবে ইহার মূলে উচ্চতর সত্ত্ব শক্তি থাকিয়াই এই জগত কার্য্য উৎপন্ন করিতেছে, নতুবা জগতের সৃষ্টি ও পরিণতি হইত না। এবং জগতের যে অংশটার

সত্ত্ব শক্তি অত্যন্ত কমিয়া গিয়া, তাহার ক্রিয়া শক্তিরও একরূপ শেষ হইয়াছে, তাহা তমঃ রূপে পরিণত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ইহা ব্যতীত অন্যরূপ অবস্থাও হইতে পারে, তাহা এস্থলে বলা আবশ্যক। (১) সত্ত্ব শক্তি যদি রজঃ শক্তি ভাবে পরিণত না হইয়া সত্ত্ব ভাবেই থাকে, (অর্থাৎ বিজ্ঞান মতে potential energy যদি potential ভাবেই থাকে) কিম্বা যদি (২) নিম্নতর শক্তি অন্য কোন কারণে অর্থাৎ সত্ত্ব শক্তি অপেক্ষা আরও কোন উচ্চতর শক্তির (বুঝিবার স্মবিধার জন্য এক্ষণে ইহাকে শক্তি বলা হইল) সহায়ে, সত্ত্ব ভাবে উঠিতে পারে, এবং পরেও যদি সেই অবস্থাতেই থাকে, তবেও কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়।

এস্থলে সত্ত্ব শক্তি অপেক্ষা আর একটা অনির্দ্দেশ্য উচ্চতর শক্তির কথা বলা হইল। এই শক্তির সহিত জগতের পরোক্ষ ভাবে সম্বন্ধ থাকিলেও প্রত্যক্ষ ভাবে সম্বন্ধ আমরা সহজে উপলব্ধি করিতে পারি না। তবে এস্থলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, এই উচ্চতর শক্তির অনুমান না করিলে এই জগত কার্য্য আদৌ বুঝা যায় না। কেন বুঝা যায় না তাহা বলিতেছি।

আমরা পূর্ব্বে যে সত্ত্ব শক্তির কথা বলিলাম, তাহাই যদি একমাত্র উচ্চতম শক্তি হইত, অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা যদি আর কোন উচ্চতর শক্তি (?) না থাকিত—তবে যথা সময়ে সেই শক্তি নিম্নতর শক্তির সান্নিধ্য জন্য, উচ্চ সত্ত্ব শক্তি কার্য্য উৎপাদন করিতে করিতে কালসহকারে অতি সহজে নিম্ন শক্তিতে পরিণত হইয়া যাইত। আবার সেরূপ পরিণামের পক্ষেও আর কোনরূপ বাধা থাকিত না। এবং এরূপ পরিণামের পরেও আর কোনরূপ ক্রিয়া অসম্ভব হইত।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান যথেষ্ট প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, জগৎ কার্য্য বহুদিন চলিতে চলিতে এমন এক সময় আসিবে, যখন জগতের আর পরিণতি সম্ভব হইবে না। তখনই ইহার প্রলয় হইবে। কিন্তু এই প্রলয় হইয়া জগতের একেবারে শেষ হইবে না। আবার কোন অনির্দ্দেশ্য কারণ বলে সেই নিম্নতর শক্তি উচ্চতর শক্তিতে উঠিয়া যাইবে, আবার জগতের সৃষ্টিও পরিণতি হইবে। এইরূপ সৃষ্টি ও প্রলয় কতবার হইয়াছে ও কতবার হইবে তাহার পরিমাণ করা যায় না।

এখন কোন্ শক্তি বলে এই নিম্নতর শক্তি উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হয়—তাহা বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে না—কেন না তাহা বিজ্ঞানের সীমার অতীত। কেন ইহা বিজ্ঞানের সাধ্যায়ত্ব নহে তাহা বলিতেছি। বিজ্ঞান শক্তির যেরূপ তত্ত্ব বুঝিতে পারে, তদনুসারে এই উচ্চতম শক্তিকে শক্তি বলিতে পারে না। কেন না তাহা হইলে ইহারও উচ্চ অবস্থা হইতে নিম্ন অবস্থাতে পরিণতি হইত—সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ বলিয়াছি ত—উচ্চতর শক্তি যদি পরিণাম দ্বারা নিম্নতর শক্তিতে না আসে, তবে আদৌ কোন ক্রিয়া হয় না; আর ক্রিয়া হইলে—তাহার নিম্নতর শক্তিতে পরিণামও অবশ্যম্ভাবী—এবং কাল বশে তাহার উচ্চতর অবস্থা গিয়া নিম্নতর অবস্থায় পরিণত হওয়াও অনিবার্য্য।

ইহা হইতে এই বুঝা গেল যে, যাহাকে আমরা উচ্চতম শক্তি বলিতেছিলাম, যাহাকে সব শক্তি অপেক্ষা আরও উচ্চতর ধরিয়াছিলাম, তাহাকে কোন রূপেই শক্তি বলা যায় না। শক্তির যে ধর্ম্ম—সত্ব রজ ও তমঃ শক্তির যে গুণ এই উচ্চতর শক্তি সেই গুণাতীত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা এই ব্যক্ত জগতের বুঝি—কেবল শক্তি, (বিজ্ঞান পরমাণুকেও শক্তির কেন্দ্র বা তাহার ক্ষুদ্রতম সমষ্টি বলিতে আরম্ভ করিয়াছে) আধুনিক বিজ্ঞানও কেবল এই শক্তির কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে। সুতরাং যাহা শক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির—বিজ্ঞান তাহা বুঝাইতে পারে না, এবং আমরাও সহজে তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারি না।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা যে সত্যে উপনীত হইলাম, আধুনিক দর্শনশাস্ত্র মাত্র অবলম্বন করিয়াও অনেক পণ্ডিত এক্ষণে সেই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এই জগতটাকে তাঁহারা relative existence অথবা phenomenal existence বলেন, এবং যাহার অবলম্বনে এই জগতটা প্রকাশিত হইয়াছে—এই জগত কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে, তাঁহাকে ইঁহারা absolute existence বলেন। এই absolute existenceই গৌণকল্পে জগতের নিমিত্ত কারণ; এবং ইহা হইতে কোন অজ্ঞেয় উপায়ে এই যে সত্ব, রজ, তম—এই তিন শক্তির আবির্ভাব হওয়ায় এই জগত কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহাই ইহার নিমিত্ত কারণ। পণ্ডিতেরা বলেন যে

এই জগত ত সীমাবদ্ধ—আমরা ইহার অন্ত ধারণা করিতে না পারিলেও ইহা অনন্ত নহে; জগত সসীম। কিন্তু অসীম আধার ব্যতীত সসীম কল্পনা করা যায় না। অতএব সান্ত জগতের যে অনন্ত আধার—অনন্ত কারণ নাই তাহা বলিতে পার না,—কেননা তাহা আমাদের ধারণার সীমার অতীত।

যাউক, আধুনিক দর্শনের কথা এস্থলে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কেবল একটা কথা বলি যে—রূপাদি শক্তির যে অনন্ত উৎস বা আধারের কথা বলিলাম—পণ্ডিতবর স্পেন্সর তাহাকেই eternal বা inexhaustible energy বলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত কুঁজে বলিয়াছেন, "The Universe is the Deity passing into activity but not exhausted by the act." সে যাহা হউক আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ইহাকে শক্তি বলা যায় না। অনন্ত শক্তি বলিলেও বিজ্ঞান মতে তাহা ভ্রমপূর্ণ বোধ হইবে। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রে ইহাকে নির্গুণ (ত্রিগুণাতীত) অথচ গুণ ভোক্তা বলা হইয়াছে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি।"

এই বিজ্ঞান ও দর্শন হইতে যে কথার সামান্য আভাস মাত্র পাওয়া যায়, আমাদের শাস্ত্রে সেই তত্ত্ব আরও বিশদ রূপে বুঝান আছে। যে সত্ত্ব রজ ও তম শক্তি হইতে এই জগতে, উৎপত্তির সমষ্টি ভাবে তাহাদিগকেই আমাদের শাস্ত্রে মায়া বা মূল প্রকৃতি বলা হইয়াছে। আর যে অনন্ত শক্তিমানের সন্নিধি জন্য এই প্রকৃতি অনন্ত কাল, অনন্তবার জগতের সৃষ্টি প্রলয় করিতেছে, তাহাকেই শাস্ত্রে পুরুষ বলে। এই পুরুষ ও প্রকৃতি দুই—এক মূল কারণের দুইরূপ বিকাশ মাত্র। এই মূল কারণকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম কহে। তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। ইহারই কোন অজ্ঞাত শক্তি—ইচ্ছা (ঈক্ষণ) বিকশিত সৃষ্টি শক্তিই সত্ত্ব রজ তমগুণাত্মক প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত—আর সেই প্রকৃতিকে নিয়মিত করিবার জন্য সেই পরিমাণ শক্তি (?) পুরুষ রূপে অধিষ্ঠিত। এই পুরুষকে সমষ্টি ভাবে হিরণ্যগর্ভ বা বৈরাজ পুরুষ, আর ব্যষ্টি ভাবে জীবাত্মা বলে। যাহা হউক, এই সমষ্টি ও ব্যষ্টির কথা পরে বলিতেছি।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে আমরা এই বুঝিলাম যে, সত্ত্ব শক্তির ক্রমঃ

পরিণামের দ্বারা রজো বিশাল—বা কার্য্যাত্মক জগতের সৃষ্টি ও পরিণতি হয়। আর এই সত্ত্ব শক্তিই বল, আর তম শক্তিই বল, এই পুরুষের (উচ্চতম শক্তির ?) সান্নিধ্য জন্য সত্ত্বরূপে থাকিয়া বা সত্ত্বভাবে পরিণত হইয়া সেই ভাবেই থাকিতে পারে। এই সত্ত্ব শক্তির তমঃ পরিণাম অবস্থাই রজোময় সৃষ্টির অবস্থা। এই সময়কেই রজোগুণাধার ব্রহ্মার জাগ্রতাবস্থা বলে। আর তমঃ পরিণামের চরম অবস্থাই প্রলয়ের প্রথমাবস্থা—ইহাই ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থা। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,

"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥"

তাহার পর পুরুষের সান্নিধ্যে তমঃ শক্তির পুনর্ব্বার উচ্চতর সত্ত্ব শক্তিতে উন্নতিই প্রলয়ের শেষ অবস্থা। এবং তাহার পরেই সত্ত্বের তমঃ পরিণাম আরম্ভ হইলেই সৃষ্টি আরম্ভের অবস্থা। ইহাই জগৎ চক্র—অনন্ত কাল চলিয়া আসিতেছে। এস্থলে আমরা অন্যরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে পারি যে, জগতের দুইদিকে যেন দুইটী বিপরীত আকর্ষণ কেন্দ্র রহিয়াছে। এক ব্রহ্ম, আর একটী মায়া; অথবা এক পুরুষ আর এক প্রকৃতি। তমঃ শক্তির আকর্ষণ প্রাবল্যে যখন জগত ব্যক্ত রূপ ধারণ করিয়া তমঃ-প্রধান প্রকৃতি অভিমুখে আসে, তখনই জগতের সৃষ্টি অবস্থা। আর যখন পুরুষ বা ব্রহ্মের আকর্ষণ প্রাবল্য জন্য জগত তমঃ হইতে ব্রহ্মাভিমুখে আসে, তখনই ইহার প্রলয় অবস্থা। জগত রূপ দোলক যেন ব্রহ্ম ও মায়া এই দুইটীর মধ্যে অনবরত দুলিতেছে; তাই সৃষ্টি ও প্রলয় অনবরত হইতেছে। [ইহা ব্যতীত প্রাকৃত প্রলয় আছে, তাহার বিবরণ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।]

আমরা পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্বের আভাস দিলাম, একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা (যাহাকে ন্যায়ে সামান্য অনুমান বা analogy বলে, তাহার দ্বারা) এই সকল কথা বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। সাংখ্য শাস্ত্রে জগৎ কার্য্যে পুরুষের উপযোগীতা বুঝাইবার সময় উক্ত আছে,

তৎ সন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ॥ ১। ৯৬॥

অর্থাৎ স্পর্শ মণি (বা চুম্বক) নিকটে থাকিলে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ ও সেই চুম্বক গুণপ্রাপ্ত হয়—প্রকৃতিও পুরুষের নিকট থাকায় সেইরূপ ক্রিয়া

শীল হইয়াছে। আমরাও মহাজনের পথ অনুসরণ করিয়া কতকটা এই রূপ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিব।

আমরা এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটাকে এক খণ্ড বৃহৎ চুম্বকের সহিত তুলনা করিব। চুম্বকের একদিকে যেমন উত্তরমুখী চুম্বকশক্তি কেন্দ্রীভূত থাকে, আর একদিকে ঠিক তাহার বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত দক্ষিণমুখী চুম্বক শক্তি থাকে, এই ব্রহ্মাণ্ডেরও তেমনি এক সীমায় পুরুষ শক্তি (?) আর অপর সীমায় তমঃ শক্তি রহিয়াছে। দুই দিকে এই দুইটী শক্তিকেন্দ্র থাকাতেই এই জগত কার্য্য সংসাধিত হইতেছে চুম্বকের যেমন দুই দিকস্থ চুম্বক শক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত, পুরুষ ও তমশক্তিও সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত। এক নির্গুণ আর এক সগুণ; এক নিষ্ক্রিয় আর এক সক্রিয়; এক শুদ্ধ আর এক মলিন; এক চৈতন্য আর এক জড়; তবে এই দুইটীই জগতের নিত্য ও স্থায়ী ভাব—পরস্পরের মধ্যে এই মাত্র সাদৃশ্য।

এই তমই—প্রকৃতির আর এক নাম। তবে এইমাত্র বিশেষ যে সত্ত্ব রজ ও তম শক্তির সাম্যাবস্থা যে প্রকৃতি—এই তমই তাহার মূল কারণ। শ্রুতিতে আছে,

"তম এবেদমগ্র আস, তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াতত্বৈ
রজসো রূপং, তদ্রজঃ খল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ-
সত্ত্বস্য রূপমিতি।"

অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টির পূর্ব্বে, একমাত্র শক্তিই তমোরূপে বিদ্যমান ছিল। পরে বৈষম্যবশতঃ সেই তমশক্তির রজ পরিণাম, এবং রজ হইতে সত্ত্ব পরিণাম হয়।

তবেই দেখা গেল যে, এই পুরুষের অধিষ্ঠান জন্য—তমঃশক্তি উচ্চতর সত্ত্ব শক্তিতে পরিণত হয়, রজঃ বা ক্রিয়া শক্তির আবির্ভাব হয়। তাহার পর এমন এক সময় আইসে, যখন সত্ত্ব রজ ও তম তিনটীর—সমভাবে থাকায় সাম্যাবস্থা উপস্থিত হয়, উচ্চ বা নিম্ন পরিণতি বন্ধ হয়। এই অবস্থাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে মূলপ্রকৃতি বলে। এই সময়ে সত্ত্ব শক্তির চরম (উচ্চ) পরিণতি হয়। ইহার পরেই সত্ত্বের নিম্নতর রজঃ শক্তিতে পরিণাম আরম্ভ হয়—জগতেরও সৃষ্টি হইতে থাকে।

এই সৃষ্টিকার্য্য শেষ হইলে যে অবস্থা দাঁড়ায় তাহাতে দেখা যায় যে; এই সত্ত্ব শক্তি প্রধানতঃ যে স্থানে বা যে অংশে রজঃ শক্তি বা কার্য্য উৎপন্ন করিয়া তমঃশক্তিতে পরিণত হইতে থাকে, সেই রজোবিশাল অংশকে পৃথিবী কহে। যে অংশের সত্ত্ব সত্ত্ব-ভাবেই থাকে, পুরুষের অত্যন্ত সান্নিধ্য জন্য রজ তম ভাবে পরিণত হইতে পারে না, তাহাকে স্বর্গ (ছয় স্বর্গ—যথা ভুব, স্ব, মহঃ, জন, তপ, সত্য।) বা সত্ত্ববিশাল ঊর্দ্ধ লোক বলে। আর যে অংশের সত্ত্ব শক্তি রজঃ উৎপন্ন করিয়া, তম ভাবে অনেকটা পরিণত হওয়ায় তাহার কার্য্যকরী শক্তি প্রায় লোপ পাইয়াছে, তাহাকে পাতাল কহে। এই পাতালের মধ্যেই মূল তমো কেন্দ্র আছে। নিম্নলিখিত চিত্রদ্বারা ইহা আরও বিশদরূপে বুঝা যাইবে।

	সত্ত্ববিশাল ঊর্দ্ধলোক	রজোবিশাল মধ্যলোক বা কর্ম্মভূমি পৃথিবী।	তমঃ বিশাল অধঃলোক	
পরম পুরুষ	সত্যলোক তপলোক জনলোক মহলোক স্বর্লোক ভুবলোক	মনুষ্য পশু ও পক্ষী (নিম্নতর প্রাণী) উদ্ভিদ মৃত্তিকাদি inorganic substance	সপ্ত পাতাল	তমঃ প্রধানা প্রকৃতি zero potential

উল্লিখিত চিত্র হইতে চতুর্দ্দশ ভুবনবিশিষ্ট জগৎস্তর বা ব্রহ্মাণ্ডের অনেক কথা বুঝা যাইবে। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত চুম্বকের দৃষ্টান্ত ধরিয়া আমরা আরও অনেক কথা বুঝিতে পারিব। বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, একখানি বৃহৎ চুম্বকের প্রত্যেক পরমাণুই এক একটী ক্ষুদ্র চুম্বক বিশেষ। প্রত্যেক পরমাণুতেই উত্তর মুখী ও দক্ষিণমুখী উভয় প্রকার চুম্বক শক্তিরই বিকাশ হয়। সকল পরমাণুগুলিরই উত্তর মুখী চুম্বক শক্তি এক দিকে, এবং দক্ষিণমুখী চুম্বক শক্তি তাহার বিপরীত দিকে থাকে। এই সমস্ত পরমাণুর এইরূপ সমবায়েই একখানি বৃহৎ চুম্বক হয়।

সেইরূপ জগত সম্বন্ধেও বলা যায়। পূর্ব্বে যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কথা বলিয়াছি, তাহা এইবার বুঝা যাইবে। আমরা সমগ্র জগতের যে, নিয়ম উপরে বুঝাইলাম—জগতের প্রত্যেক সত্ত্বা সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। অর্থাৎ জগতের প্রত্যেক পদার্থ পৃথক ভাবে দেখিলেও সেই নিয়ম দেখা যাইবে।

শাস্ত্রে আছে, "এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ব বিজ্ঞানং ভবতি।" অতএব সমস্ত জগতের যাহা নিয়ম, তোমার আমার সম্বন্ধেও তাই নিয়ম—আর সামান্য বালুকণা সম্বন্ধেও তাহাই নিয়ম। তাই সমস্ত জগতের কথা ছাড়িয়া দিয়া, এক একটী পদার্থকে পৃথক ভাবে দেখিলেই ব্যষ্টিভাবে দেখা হইল। এইরূপ সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করাই জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য। এক্ষণে যাহাকে বিজ্ঞান বলে, তাহাতে যে সকল নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা এরূপ সাধারণ নহে। পণ্ডিত হর্বাট স্পেন্সর তাহাকে partially unified knowledge বলিয়াছেন। কেবল হিন্দু বিজ্ঞানেই সেই জ্ঞান "completely unified" হইয়াছে।

যাহা হউক সমুদায় জগৎ তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া জীব সম্বন্ধে আমরা এই বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার মধ্যেও প্রকৃতি পুরুষ রহিয়াছে। তাহার মধ্যেও প্রকৃতির সত্ত্ব রজ ও তম এই ত্রিবিধ শক্তিই রহিয়াছে। তবে এই ত্রিবিধ শক্তি কাহারও মধ্যে সমভাবে থাকিতে পারে না।

কেন পারে না, তাহা বুঝিতে হইলে আবার সেই চুম্বকের দৃষ্টান্ত লইতে হইবে। চুম্বকের ঠিক মধ্যস্থলে কোনরূপ আকর্ষণ নাই বলিলেই হয়—কেন না দুই দিকে দুই বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত শক্তি বিপরীত দিক হইতে সমান ভাবে আকর্ষণ করে বলিয়া, উভয় শক্তির কার্য্য ক্ষমতাই লোপ হয়। তাহার পর যদি দক্ষিণমুখী চুম্বকের দিকে যাও তখন দেখিবে যে দক্ষিণমুখী চুম্বকের শক্তি বাড়িতেছে—আর উত্তরমুখী চুম্বকের আকর্ষণ কমিতেছে। এক কথায় এই মধ্যস্থল হইতে উত্তরমুখী চুম্বকের দিকে যাইলে কেবল উত্তরমুখী চুম্বকের আকর্ষণই অনুভূত হইবে—আর দক্ষিণমুখী চুম্বকের দিকে যাইলে কেবল দক্ষিণমুখী চুম্বকের আকর্ষণই বোধ হইবে।

জগৎ সম্বন্ধেও প্রায় এইরূপ নিয়ম। উপরের চিত্রে পৃথিবী ও ঊর্দ্ধ লোকের মধ্যে যে রেখা আছে—তাহা হইতে যত ঊর্দ্ধ লোকে যাইবে ততই প্রত্যেক জীবে সত্ত্বের ভাগ অধিক আছে, আর সে সত্ত্ব শক্তি ক্রিয়া রূপে পরিণত হইবার অবস্থার অতীত—কারণ তাহার তমঃ আকর্ষণ কোনরূপ কার্য্যকারী নহে ইহা বেশ বুঝিতে পারিবে। তাহাদের মধ্যে আত্মা বা পরমপুরুষ অত্যন্ত নিকটস্থ (আভাষ চৈতন্য) আছে দেখিবে।

তাহার পর এই রেখার পরেই পৃথিবীর মনুষ্য। সুতরাং ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ উর্দ্ধদিকে গতি ও অধোদিকে গতি হইবার শক্তি প্রায়, সমানভাবে আছে দেখিতে পাইবে। সেই শক্তির সামান্য তারতম্য হইলেই হয় সত্ত্ব শক্তি কিম্বা তমঃ শক্তি প্রবল হইবে। তমঃশক্তি প্রবল হইলেই তাহার সত্ত্ব শক্তি কার্য্য বা রজোরূপে পরিণত হইতে থাকিবে—তাহাকে অধোভাগে লইয়া যাইতে থাকিবে। আর যদি, সত্ত্বভাগ প্রবল হয়, তবে তাঁহার পরম পুরুষের দিকে গতি হইবার উপক্রম হইবে—তাহার ক্রমে উর্দ্ধগতি হইবে। সুতরাং এই দুই শক্তির মধ্যে মনুষ্য একরূপ মধ্যস্থলে (neutral ground এ) আছে বলিতে হইবে। তবে উপরের চিত্র হইতে অনুমিত হইবে যে যাহারা সন্ধিস্থলের অতি নিকট তাহাদের পক্ষেই এই নিয়ম—যাহারা অপেক্ষাকৃত দূরস্থ, তাহাদের তমঃ আকর্ষণ অধিক, সুতরাং সেই দিকেই প্রধানতঃ তাহাদের গতি হয়।

ইহার পরেই পশু মৃগ বা ইতর প্রাণী। অবশ্য ইহাদের সত্ত্ব ভাগ মনুষ্য অপেক্ষা অনেক অল্প, এবং রজ ও তমভাগ অধিক। উদ্ভিদে সত্ত্বভাগ আরও অল্প, তমভাগ অত্যন্ত প্রবল—আর মৃত্তিকাদিতে তমঃ ভাগ অতিশয় বৃদ্ধি হয়। তাহাদের মধ্যে পুরুষ অত্যন্ত দূরস্থিত হইয়া পড়ে, অথবা কূটস্থ ভাবে থাকে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কার্য্য হইলেই উচ্চতর শক্তি নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হয়। সুতরাং যে পদার্থ বা যে জীব হইতে কার্য্য হইবার কোন সম্ভাবনা আছে, সেই পদার্থ বা সেই জীবেরই সত্ত্ব শক্তি বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রিয়ারূপে পরিণত হয়—এই ক্রিয়ার সমষ্টি হইতেই বাস্তবিক পক্ষে জগৎ কার্য্য চলিতে থাকে। জীবে সত্ত্বশক্তি উদ্ভিদাদি অপেক্ষা অনেক অধিক, তাই তাহা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্রিয়ার বিকাশ হইতে পারে। উদ্ভিদের সত্ত্ব শক্তি অল্প, তাহার ক্রিয়ার বিকাশও অল্প। আর জড় মৃত্তিকাদির সত্ত্ব শক্তি নাই বলিলেই হয়, তাই তাহাদেরও ক্রিয়া শক্তি বড় অধিক নাই। এস্থলে আরও বুঝিতে হইবে যে, সত্ত্বশক্তি ক্রিয়ারূপে পরিণত হইলে, শুধু যে সত্ত্ব শক্তির পরিমাণ কমিয়া যায় তাহা নহে, সত্ত্বশক্তিও নিম্নস্তরে আসিয়া পড়ে—অর্থাৎ সত্ত্ব শক্তিও অনেকটা হীনবীর্য্য হয়। এজন্য বৃক্ষের সত্ত্ব শক্তি আর আমার সত্ত্ব শক্তি একরূপ নহে।

এ সম্বন্ধে আরও একটা কথা বুঝা আবশ্যক। উদ্ভিদ বা জড়ে যে পরিমাণ সত্ত্ব শক্তি আছে তাহার তমপরিণাম হইবার—এবং তৎসহ কার্য্য উৎপন্ন হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কারণ বলিয়াছিত, উদ্ভিদে তম শক্তির আকর্ষণ অত্যন্ত বলবৎ, তাহার মধ্যে পুরুষ অত্যন্ত দূরে স্থিত। এই জন্য তাহার সত্ত্ব শক্তি পুরুষের সান্নিধ্যবলে নিরোধ করিবার কোনই ক্ষমতা নাই। সাধারণ পশু মৃগ প্রভৃতি জীব সম্বন্ধেও প্রায় এই নিয়ম। তাহাদের মধ্যেও যে নিম্নস্তরের সত্ত্ব শক্তি অল্প পরিমাণে আছে, তাহাও সহজে কার্য্যরূপে পরিণত হইবার পক্ষে কোন বাধা থাকে না। তাহাদেরও সেই সত্ত্ব শক্তি নিরোধ করিবার ক্ষমতা অতি অল্পই আছে। কিন্তু মনুষ্য সম্বন্ধে নিয়ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে বলিয়াছিত তাহারা অনেক পরিমাণে মধ্যভূমিতে অবস্থিত। অর্থাৎ পুরুষের আকর্ষণ ও তম শক্তির আকর্ষণ—তাহাদের মধ্যে প্রায়ই সমশক্তিসম্পন্ন। একারণ তাহাদের যে উচ্চতর সত্ত্বশক্তি আছে; সে শক্তি পুরুষের আকর্ষণে নিরুদ্ধ হইয়া উর্দ্ধদিকেও উঠিতে পারে। কিম্বা প্রকৃতির আকর্ষণে রজোরূপে বা কার্য্যরূপে বিক্ষিপ্ত হইয়া অধঃ বা তম দিকেও যাইতে পারে। এই জন্য ইহার একটীকে আমাদের শাস্ত্রে উর্দ্ধস্রোতস্বিনীবৃত্তি, আর অপরটীকে অধঃস্রোতস্বিনীবৃত্তি কহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি মনুষ্যের মধ্যে যাহারা আবার ঠিক কেন্দ্রস্থলের নিকটস্থ তাহাদেরই উর্দ্ধদিকে গমন সম্ভব ও অতি সহজ। আর যাহারা এই কেন্দ্র হইতে দূরস্থ, তাহারা অপেক্ষাকৃত তমশক্তিরর (বা প্রকৃতির) আকর্ষণে বিমোহিত—সুতরাং তাহাদিগের উর্দ্ধদিকে গমন অত্যন্ত কঠিন, তাহারাই সহজে তমঃ বা অধোদিকে গমন করিতে থাকে। আবার ইহাদের মধ্যে যাহাদের সত্ত্ব অধিক তাহাদের তমঃ পরিণামে অধিক পরিমাণে রজঃশক্তি উৎপন্ন হয়, আর যাহাদের সত্ত্ব অল্প, এবং সর্ব্বাপেক্ষা তমঃ শক্তির নিকটস্থ—তাহাদের রজশক্তি বা কার্য্য তত অধিক উৎপন্ন হয় না—এবং তাহাদের সহজেই তমঃ পরিণাম হওয়া সম্ভব। অতএব সৃষ্ট জীবের মধ্যে মনুষ্যের এই এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে যে, তাহারা চেষ্টা ও যত্ন করিলে, তাহাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বশক্তির কার্য্যরূপে পরিণাম বা বিক্ষেপ নিরুদ্ধ বা বদ্ধ করিয়া রাখিয়া, ক্রমে উর্দ্ধদিকে পুরুষের সন্নিধানে ধীরে ধীরে গমন করিতে পারে।

যাহা হউক আমরা এতক্ষণ যাহা বলিতেছিলাম, তাহা হইতে অনেক কথা বুঝা যাইবে। সম্প্রতি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মের কথা বুঝা যাউক। আমরা পূর্ব্বে যে সত্ব শক্তির বা ক্রিয়ারূপে পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছি, তাহাকেই সংক্ষেপে প্রবৃত্তি ধর্ম্ম বলা যায়। ইহাকেই আবার অন্যভাবে বিক্ষেপ শক্তি বা অধঃস্রোতস্বিনীবৃত্তি বলা যায়। বলিয়াছিত এই প্রবৃত্তি ধর্ম্ম বা বিক্ষেপ শক্তির দ্বারাই সমুদয় জগৎ কার্য্য সংসাধিত হইতেছে। এই প্রবৃত্তি ধর্ম্ম না থাকিলে, জগৎ আদৌ থাকিতে পারিত না। শুধু তাহাই নহে, সত্ব শক্তির যতক্ষণ এই রজঃ পরিণাম, বা এই প্রবৃত্তির অবস্থা থাকে, ততক্ষণই সৃষ্টি কার্য্য চলিতে থাকে। রজঃ পরিণাম বন্ধ হইলেই সৃষ্টি কার্য্য বন্ধ হয়। তখন জগতের প্রলয়াবস্থা উপস্থিত হয়।

এই ত গেল প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ইহা ব্যতীত জগতের আর এক ধর্ম্ম আছে, তাহাও আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। যখন জগতের তমঃ পরিণাম হয়, সত্বশক্তি প্রায় একেবারে লোপ পায়, সুতরাং রজঃশক্তির বিকাশ হইয়া জগৎকার্য্য চলিবার যখন আর কোন সম্ভাবনা না থাকে, তখন পুনর্ব্বার পুরুষ সান্নিধ্য জন্য তমঃ শক্তির ঊর্দ্ধ পরিণাম হইয়া সত্বশক্তির উৎপত্তি হয়। যতক্ষণ তমঃ হইতে সত্ব উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণই জগতের প্রলয়াবস্থা থাকে। ইহাকেই জগতের নিরোধ অবস্থা নিবৃত্তি অবস্থা বা ঊর্দ্ধস্রোত অবস্থা কহে। এই নিরুদ্ধ অবস্থায় ক্রিয়া বন্ধ হয়—ব্রহ্মা নিদ্রিত হন, ব্যক্তজগত অব্যক্তে বিলীন হয়। ইহাই জগতের প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম—অথবা সৃষ্টি অবস্থা ও প্রলয় অবস্থা।

এই ত গেল জগতের প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম। ইহা ব্যতীত মনুষ্য সম্বন্ধেও প্রবৃত্তি ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তি ধর্ম্ম আছে। ইহা বুঝাইবার জন্যই এত কথা বলা হইল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই জগতের সহিত আমরা লিপ্ত। আমাদের যে সত্ব শক্তি আছে, তাহার সহায়ে আর রজোগুণ দ্বারা আমরা সর্ব্বদা কার্য্য করিতে থাকি। কার্য্য করাই সাধারণতঃ মনুষ্যের ধর্ম্ম। মনুষ্যের এই কার্য্যকরী প্রবৃত্তিকেই শাস্ত্রে প্রবৃত্তিধর্ম্ম বলে। প্রাণী মাত্রেই এই প্রবৃত্তিধর্ম্মের অধীন। তবে মনুষ্যে সত্ব শক্তি অধিক থাকায়, তাঁহারও প্রবৃত্তি ধর্ম্ম অধিক

বিকশিত হইতে পারে। অতএব এই কার্য্য করাই মনুষ্যের স্বধর্ম্ম। ইহাই তাহার বিক্ষেপশক্তি। আর প্রকৃতিই এই শক্তি উত্তেজনার মুখ্য কারণ।

কিন্তু ইহা সাধারণ মনুষ্যের ধর্ম্ম হইলেও, মানুষের আর এক শক্তি আছে—তাহাকে নিরোধ শক্তি বলে। এ কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে মনুষ্যের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, যাহারা পুরুষ প্রকৃতির ঠিক সন্ধি স্থলে থাকিয়া, প্রকৃতির আকর্ষণকে প্রতিহত করিতে পারে, তাহারা তাহাদের সত্ব শক্তি নিরুদ্ধ করিয়া—তাহার রজঃ পরিণাম বন্ধ করিয়া, ক্রমেই পুরুষের সন্নিধানে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু এরূপ লোক অতি বিরল। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাংবেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

সুতরাং এরূপ লোক সহস্রের মধ্যে একজনও নাই; আর যাহারা আছে, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোক সিদ্ধ হইতে পারে। তবে অন্যান্য প্রাণীদেরও আর কথাই নাই, তাহাদের মধ্যে নিরোধ বা নিবৃত্তি ধর্ম্ম আদৌ নাই। মানুষের এই সিদ্ধির জন্য চেষ্টা এবং সত্ত্ব শক্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া তাহার রজঃ পরিণাম বন্ধ করাই আমাদের নিবৃত্তি ধর্ম্ম। ইহার মূল কথা গুলি আমরা বারান্তরে বুঝাইব।

জ্ঞান।

[এই সংখ্যায় ভগবদ্গীতার ১২ শ্লোকের টীকায় প্রমাণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। বঙ্কিম বাবুর প্রণীত অপর একটি প্রবন্ধে এই তত্ত্ব সবিস্তারে বুঝান হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধটী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, পরে পুনর্মুদ্রিত হয়। কিন্তু এক্ষণে উহা অপ্রাপ্য। প্রচারের অনেক পাঠকই বোধ হয় উহা পড়েন নাই এবং ইচ্ছা করিলেও পাইবেন না। অতএব উহা আমরা এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত করিলাম। পুনর্মুদ্রিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা গীতার দ্বাদশ শ্লোকের টীকা পড়িবেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পড়িলে প্রমাণতত্ত্ব বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন।—প্রঃ সং]

সেই জ্ঞান কি? আকাশ কুসুম বলিলেও একটি জ্ঞান হয়—কেন না আকাশ কি তাহা আমরা জানি, এবং কুসুম কি তাহাও জানি, মনের শক্তির দ্বারা উভয়ে সংযোগ করিতে পারি। কিন্তু সে জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। তাহা ভ্রমজ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা প্রমা প্রতীতি বলে। সেই যথার্থ জ্ঞান কি?

যাহা জানি তাহাই জ্ঞান। যাহা জানি তাহা কি প্রকারে জানিয়াছি?

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। ঐ গৃহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী এই পর্ব্বত, আমার সম্মুখে রহিয়াছে; তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, এজন্য জানি যে ঐ গৃহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্ব্বত আছে। অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদিগের এই জ্ঞান লব্ধ হইল। * ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ, গৃহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, মেঘ গর্জ্জিতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে; এখানে মেঘের ডাক, পক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ। এইরূপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, ত্বাচ, এবং রাসন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ। মনও একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া আর্য্য দার্শনিকেরা গণিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা মানস প্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বহিরিন্দ্রিয় নহে। অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্ব্বিষয়ের সাক্ষাৎসংযোগ অসম্ভব। অতএব মানস প্রত্যক্ষে বহির্ব্বিষয় অবগত হওয়া যায় না; কিন্তু অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে।

যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্মে, এবং তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞানও সূচিত হয়। আমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমত সময়ে মেঘের ধ্বনি শুনিলাম, ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ ধ্বনির, মেঘের নহে। মেঘ এখানে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অথচ আমরা জানিতে পারিলাম যে আকাশে মেঘ আছে। ধ্বনির প্রত্যক্ষে মেঘের অস্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে? আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আকাশে মেঘ ব্যতীত কখন ঐরূপ ধ্বনি হয় নাই। এমন কখনও ঘটে নাই যে, মেঘ নাই, অথচ ঐরূপ ধ্বনি শুনা গিয়াছে। অতএব রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে থাকিয়াও আমরা বিনাপ্রত্যক্ষে জানিলাম যে আকাশে মেঘ হইয়াছে। ইহাকে অনুমিতি বলে। মেঘধ্বনি, আমরা প্রত্যক্ষ জানিয়াছি, কিন্তু মেঘ, অনুমিতির দ্বারা।

মনে কর, ঐ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। এমত কালে তোমার দেহের সহিত মনুষ্যশরীরের স্পর্শ অনুভূত করিলে। তুমি তখন কিছু না দেখিয়া, কোন শব্দও না শুনিয়া জানিতে পারিলে যে গৃহমধ্যে মনুষ্য আসিয়াছে। সেই স্পর্শজ্ঞান, ত্বাচ প্রত্যক্ষ; কিন্তু গৃহমধ্যে মনুষ্যজ্ঞান অনুমিতি। ঐ অন্ধকার গৃহে তুমি যদি যূথিকা পুষ্পের গন্ধ পাও,

---

* গৃহ, পর্ব্বতাদি দূরে রহিয়াছে—আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইল কি প্রকারে? দৃষ্ট পদার্থ বিক্ষিপ্ত রশ্মির দ্বারা। ঐ রশ্মি আমাদিগের নয়নাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দৃষ্টি হয়।

তবে তুমি বুঝিবে, যে গৃহে যুথিকা পুষ্প আছে! এখানে গন্ধই প্রত্যক্ষের বিষয়; পুষ্প অনুমিতির বিষয়।

মনুষ্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অধিকাংশই অনুমিতির উপর নির্ভর করে। অনুমিতি সংসার চালাইতেছে। আমাদিগের অনুমানশক্তি না থাকিলে, আমরা প্রায় কোন কার্য্যই করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান, দর্শনাদি, অনুমানের উপরেই নির্ম্মিত।

কিন্তু যেমন কোন মনুষ্যই সকল বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তেমনি কোন ব্যক্তি সকলতত্ত্ব স্বয়ং অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিতে পারে না। এমন অনেক বিষয় আছে, যে তাহা অনুমান করিয়া জানিতে গেলে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা একজন মনুষ্যের জীবনকালের মধ্যে সাধ্য নহে। এমন অনেক বিষয় আছে যে তাহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যা, বা যে জ্ঞান, বা যে বুদ্ধি, বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয় তাহা অধিকাংশ লোকের নাই। অতএব এমন অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, যে তাহা অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্থলে আমরা কি করিয়া থাকি? যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বা যে স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। ইতালীর উত্তরে যে আল্প নামে পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহা তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাভ করিলে। পরমাণু মাত্র যে অন্য পরমাণু মাত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না, এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বারা সিদ্ধ করিতে পার নাই, এজন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে জ্ঞান লাভ করিলে।

ন্যায়, সাংখ্যাদি আর্য্যদর্শনশাস্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার নাম শব্দ। তাঁহাদিগের বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। আপ্তবাক্য বা গুরূপদেশ, স্থূলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য তাহার উপদেশ,—আর্য্যমতে ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। তাহারই নাম শব্দ।

কিন্তু চার্ব্বাগাদি কোন কোন আর্য্য দার্শনিক, ইহাকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না। ইউরোপীয়েরাও, ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।

দেখা যাইতেছে, সকলের কথাতে বিশ্বাস অকর্ত্তব্য। যদি একজন বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে, সে জলে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়া আসিয়াছে তবে এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। তাহার উপদেশে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যক্তিবিশেষের উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তবে, সেই জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে, আদৌ মীমাংসা আবশ্যক যে কে বিশ্বাসযোগ্য, কে নহে।

কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা করিব? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, মন্বাদির কথা আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিব, এবং রামু শ্যামুর কথা অগ্রাহ্য করিব? দেখা যাইতেছে, যে অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে হইবে। মনুর সঙ্গে পল্লীর পাদরি সাহেবের মতভেদ। তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছ, যে মনু অভ্রান্ত ঋষি. এবং পাদরি সাহেব স্বার্থপর সামান্য মনুষ্য; এজন্য তুমি অনুমান করিলে যে মনুর কথা গ্রাহ্য, পাদরির কথা অগ্রাহ্য। মনুর ন্যায় অভ্রান্ত ঋষি গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন, বলিয়া তুমি অনুমান করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। অতএব শব্দকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্গত বল না কেন?

শুধু তাহাই নহে। যে ব্যক্তির কতক গুলি উপদেশ গ্রাহ্য কর, তাহারই আর কতকগুলি অগ্রাহ্য করিয়া থাক। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা তুমি শিরোধার্য্য কর; কিন্তু আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি ক্ষুদ্রতর বুদ্ধিজীবী ইয়ঙ ও ফ্রেনেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সন্ধান করিলে, তলে অনুমিতিকেই পাওয়া যাইবে। অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ যে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত তাহা অসত্য। যদি শব্দ একটী পৃথক্ প্রমাণ হইত, তবে তাঁহার সকল মতই তুমি গ্রাহ্য করিতে।*

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমিতিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বিবেচনা করেন। বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে উপমিতি, অনুমিতির প্রকার ভেদ মাত্র, এবং সেই জন্য সাংখ্যাদি দর্শনে উপমিতি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। অতএব উপমিতির বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ, এবং অনুমানই জ্ঞানের মূল।

তাহার পর দেখিতে হইবে, যে অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় না। তুমি যদি কখন পূর্ব্বে মেঘ না দেখিতে, বা আর কেহ কখন না দেখিত, তবে তুমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া কখন মেঘানুমান করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন যূথিকা গন্ধ প্রত্যক্ষ না করিতে, তবে অন্ধকার গৃহে থাকিয়া যূথিকা ঘ্রাণ পাইয়া তুমি কখন অনুমান করিতে পারিতে না, যে গৃহমধ্যে যূথিকা আছে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে, যে একটি অনুমানের মূল, বহুতর বহুজাতীয় পূর্ব্ব-

* এই বিচারে এমত বুঝিতে হইবে না যে ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য, অর্থাৎ ঈশ্বর বাক্য, তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

প্রত্যক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহস্র সহস্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল। অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল—সকল প্রমাণের মূল।

প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, কিন্তু এই তত্ত্বের মধ্যে ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে একটী ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন, যে আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে, যে তাহার মূল প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না। যথা, কাল, আকাশ, ইত্যাদি।

কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক,—যথা, দুইটি সমান্তরাল রেখা যতদূর টানা যাউক, কখন মিলিত হইবে না, ইহা আমরা নিশ্চিত জানি। কিন্তু এ জ্ঞান আমরা কোথা পাইলাম? প্রত্যক্ষবাদী বলিলেন "প্রত্যক্ষের দ্বারা। আমরা যত সমান্তরাল রেখা দেখিয়াছি, তাহা কখন মিলিত হয় নাই।" তাহাতে বিপক্ষেরা প্রত্যুত্তর করেন, যে "জগতে যত সমান্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল তুমি দেখ নাই—তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা মিলে নাই বটে, কিন্তু তুমি কি প্রকারে জানিলে যে কোন কালে কোথায় এমন দুইটি সমান্তরাল রেখা হয় নাই, বা হইবে না, যে তাহা টানিতে টানিতে একস্থানে মিলিবে না? যাহা মনুষ্যের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা হইতে তুমি কি প্রকারে অপ্রত্যক্ষীভূতের নিশ্চয় করিলে? অথচ আমরা জানিতেছি যে তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য;—কস্মিন্ কালে কোথাও এমত দুইটি সমান্তরাল রেখা হইতে পারে না যে তাহা মিলিবে। তবে প্রত্যক্ষ ব্যতীত তোমার আর কোন জ্ঞানমূল আছে—নহিলে তুমি এই প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত জ্ঞানটুকু কোথায় পাইলে?"

এই কথা বলিয়া বিখ্যাত জর্ম্মান দার্শনিক কান্ত, লক ও হ্যুমের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন। এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল তিনি এই নির্দ্দেশ করেন, যে যেখানে বহির্ব্বিষয়ের জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে, সেখানে বহির্ব্বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের নিত্যত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও, আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতির নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের আয়ত্ত বটে। আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বহির্ব্বিষয় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থাপন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হই। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সর্ব্বত্র একরূপ, এজন্য বহির্ব্বিষয়ের তত্তৎ অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্ব্বত্র একরূপ। এই জন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদিগেতেই আছে—এজন্য কান্ত ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন।

[library stamp]

সীতারাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যে দিন রমা মরিল, সে দিন সীতারাম আর চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। এখনও ততদূর হয় নাই। যখন সীতারাম রাজা না হইয়াছিলেন, যখন আবার শ্রীকে না দেখিয়াছিলেন, তখন সীতারাম রমাকে বড় ভাল বাসিতেন—নন্দার অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন, তা বলিয়াছি। সে ভাল-বাসা গিয়াছিল। কিসে গেল, সীতারাম তাহার চিন্তা কখন করেন নাই। আজ একটু ভাবিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন,—রমার দোষ বড় বেশি নয়,—দোষ তাঁর নিজের। মনে মনে আপনার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইলেন।

কাজেই মেজাজ খারাব হইয়া উঠিল। চিত্ত প্রফুল্ল করিবার জন্য শ্রীর কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না, কেননা শ্রীর সঙ্গে এই আত্মগ্লানির বড় নিকট সম্বন্ধ; রমার প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুরাচরণের কারণই শ্রী। শ্রীর কাছে গেলে আগুন আরও বাড়িবে। তাই শ্রীর কাছে না গিয়া রাজা নন্দার কাছে গেলেন। কিন্তু নন্দা সে দিন একটা ভুল করিল। নন্দা বড় চটিয়াছিল। ডাকিনীই হউক আর মানুষীই হোক্, কোন পাপিষ্ঠার জন্য যে রাজা নন্দাকে অবহেলা করিতেন, নন্দা তাহাতে আপনার মনকে রাগিতে দেয় নাই। কিন্তু রমাকে এত অবহেলা করায়, রমা যে মরিল, তাহাতে রাজার উপর নন্দার রাগ হইল, কেননা আপনার অপমানও তাহার সঙ্গে মিশিল। রাগটা এত বেশি হইল, যে অনেক চেষ্টা করিয়াও নন্দা, সকলটুকু লুকাইতে পারিল না।

রমার প্রসঙ্গ উঠিলে, নন্দা বলিল, "মহারাজ! তুমিই রমার মৃত্যুর কারণ।"

নন্দা এইটুকু মাত্র রাগ প্রকাশ করিল, আর কিছুই না। কিন্তু তাহাতেই আগুন জ্বলিল, কেননা ইন্ধন প্রস্তুত। একেত আত্মগ্লানিতে সীতারামের মেজাজ খারাব হইয়াছিল—কোন মতে আপনার নিকটে আপনার সাফাই

করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার উপর নন্দার এই উচিত তিরস্কার শেলের মত বিঁধিল। "মহারাজ! তুমিই রমার মৃত্যুর কারণ!" শুনিয়া রাজা গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন,

"ঠিক কথা! আমিই তোমাদের মৃত্যুর কারণ। আমি প্রাণপাত করিয়া আপনার রক্তে পৃথিবী ভাসাইয়া, তোমাদিগকে রাজরাণী করিয়াছি—কাজেই এখন বল্‌বে বৈ কি, আমিই তোমাদের মৃত্যুর কারণ। যখন রমা, গঙ্গারামকে ডাকিয়া আমার মৃত্যুর কারণ হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কৈ তখন ত কেহ কিছু বল নাই?"

এই বলিয়া রাজা রাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। সেখানে চন্দ্রচূড় ঠাকুর, রাজাকে রমার জন্য শোকাকুল বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য নানা প্রকার আলাপ করিতে লাগিলেন। রাজার মেজাজ তপ্ত তেলের মত ফুটিতেছিল, রাজা তাঁহার কথার বড় উত্তর করিলেন না। চন্দ্রচূড় ঠাকুরও একটা ভুল করিলেন। তিনি মনে করিলেন, রমার মৃত্যুর জন্য রাজার অনুতাপ হইয়াছে, এই সময়ে চেষ্টা করিলে, যদি ডাকিনী হইতে মন ফিরে, তবে সে চেষ্টা করা উচিত। তাই চন্দ্রচূড় ঠাকুর ভূমিকা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি যদি ছোট রাণীর প্রতি আর একটু মনোযোগী হইতেন, তা হইলে তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেন।"

জ্বলন্ত আগুন এ ফুৎকারে আরও জ্বলিয়া উঠিল। রাজা বলিলেন, "আপনারও কি বিশ্বাস যে আমিই ছোট রাণীর মৃত্যুর কারণ?"

চন্দ্রচূড়ের সেই বিশ্বাস বটে। তিনি মনে করিলেন, "এ কথা রাজাকে স্পষ্ট করিয়া বলাই উচিত। আপনার দোষ না দেখিলে কাহারও চরিত্র শোধন হয় না। আমি ইহাঁর গুরু ও মন্ত্রী, আমি যদি বলিতে সাহস না করিব, তবে কে বলিবে।" অতএব চন্দ্রচূড় বলিলেন, "তাহা এক রকম বলা যাইতে পারে।"

রাজা। পারে বটে। বলুন। কেবল বিবেচনা করুন আমি যদি লোকের মৃত্যু কামনা করিতাম, তাহা হইলে এই রাজ্যে একজনও এতদিন টিকিত না।"

চন্দ্র। আমি বলিতেছি না, যে আপনি কাহারও মৃত্যুকামনা করেন।

কিন্তু আপনি মৃত্যু কামনা না করিলেও, যে আপনার রক্ষণীয়, তাহাকে আপনি যত্ন ও রক্ষা না করিলে, কাজেই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইবে। কেবল ছোট রাণী কেন, আপনার তত্ত্বাবধানের অভাবে বুঝি সমস্ত রাজ্য যায়। কথাটা আপনাকে বলিবার জন্য কয় দিন হইতে আমি চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আপনার অবসর অভাবে, তাহা বলিতে পারি নাই।”

রাজা মনে মনে বলিলেন, “সকল বেটাই বলে—তত্ত্বাবধানের অভাবে—বেটারা করে কি?” প্রকাশ্যে বলিলেন,

“তত্ত্বাবধানের অভাব—আপনারা করেন কি?”

চন্দ্র। যা করিতে পারি—সব করি। তবে, আমরা রাজা নহি। যেটা রাজার হুকুম নহিলে সিদ্ধ হয় না, সেইটুকু পারি না। আমার ভিক্ষা, কাল প্রাতে একবার দরবারে বসেন, আমি আপনাকে সবিশেষ অবগত করি, কাগজপত্র দেখাই; আপনি রাজাজ্ঞা প্রচার করেন।”

রাজা মনে মনে বলিলেন, “তোমার গুরুগিরির কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে—আমারও ইচ্ছা তোমায় কিছু শিখাই।” প্রকাশ্যে বলিলেন, “বিবেচনা করা যাইবে।”

চন্দ্রচূড়ের তিরস্কারে রাজার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, কেবল গুরু বলিয়া সীতারাম তাঁহাকে বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই। কিন্তু রাগে সে রাত্রি নিদ্রা গেলেন না। চন্দ্রচূড়কে কিসে শিক্ষা দিবেন সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই, প্রাতঃকৃত্য সমস্ত সমাপন করিয়া দরবারে বসিলেন। চন্দ্রচূড় খাতাপত্রের রাশি আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

যে কথাটা চন্দ্রচূড় রাজাকে জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা এই। যত বড় রাজ্য হোক না কেন, আর যত বড় রাজা হোক না কেন, টাকা নইলে কোন রাজ্যই চলে না। আমরা একালে দেখিতে পাই যেমন তোমার আমার সংসার টাকা নহিলে চলে না—তেমনি ইংরেজের এত বড় রাজ্য টাকা নহিলেও চলে না। টাকার অভাবে যেমন নফরা হাড়ি না খাইয়া

মরিল, টাকার অভাবে তেমনি রোমক সাম্রাজ্য লোপ পাইল—প্রাচীন সভ্যতা অন্ধকারে মিশাইল। সীতারামের সহসা টাকার অভাব হইল।

সীতরামের টাকার অভাব হওয়া অনুচিত, কেননা সীতারামের আয় অনেক গুণ বাড়িয়াছিল। ভূষণার ফৌজদারীর এলাকা তাঁহার করতলস্থ হইয়াছিল—বারো ভুঁইয়া তাঁহার বশে আসিয়াছিল। তচ্ছাসিত প্রদেশ সম্বন্ধে দিল্লীর বাদশাহের প্রাপ্য যে কর, সীতারামের উপর তাহার আদায়ের ভার হইয়াছিল। সীতারাম এ পর্য্যন্ত তাহার এক কড়াও মুর্শিদাবাদে পাঠান নাই—যাহা আদায় করিয়াছিলেন, তাহা নিজে ভোগ করিতেছিলেন। তবে টাকার অকুলান কেন?

লোকের আয় বাড়িলেই অকুলান হইয়া উঠে। কেননা খরচ বাড়ে। ভুষণা বশে আনিতে কিছু খরচ হইয়াছিল—বারো ভুঁইয়াকে বশে আনিতে কিছু খরচ হইয়াছিল। এখন অনেক ফৌজ রাখিতে হইত—কেননা কখন কে বিদ্রোহী হয়, কখন কে আক্রমণ করে—সে জন্যও অনেক ব্যয় হইতেছিল। অভিষেকেও কিছু ব্যয় হইয়াছিল। অতএব যেমন আয় তেমনি ব্যয় বটে।

কিন্তু যেমন আয় তেমনি ব্যয় হইলে অকুলান হয় না। অকুলানের আসল কারণ চুরি। রাজা এখন আর বড় কিছু দেখেন না—চিত্তবিশ্রামেই দিনপাত করেন। কাজেই রাজপুরুষেরা রাজভাণ্ডারের টাকা লইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করে,—কে নিষেধ করে? চন্দ্রচূড় ঠাকুর নিষেধ করেন, কিন্তু তাঁহার নিষেধ কেহ মানে না। চন্দ্রচূড় জনকত বড় বড় রাজ কর্ম্মচারীর চুরি ধরিলেন,—মনে করিলেন, এবার যে দিন রাজা দরবারে বসিবেন, সেই দিন, খাতাপত্র সকল তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিবেন। কিন্তু রাজা কিছুতেই ধরা দেন না, "কাজ যা থাকে, মহাশয় করুন্" বলিয়া কোন মতে পাশ কাটাইয়া চিত্তবিশ্রামে পলায়ন করেন। চন্দ্রচূড়, হতাশ হইয়া শেষ নিজেই সেই কয়জনের বরতরফের হুকুম জারি করিলেন। তাহারা তাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল,—বলিল, "ঠাকুর! যখন স্মৃতির ব্যবস্থা প্রয়োজন হইবে, তখন আপনার কথা শুনিব। রাজার সহি মোহরের পরওয়ানা দেখান, নহিলে ঘরে গিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করুন।"

রাজার সহি মোহর পাওয়া কিছু শক্ত কথা নহে। এখন রাজার কাছে যা হয় একখানা কাগজ ধরিয়া দিলেই তিনি সহি দেন—পড়িবার অবকাশ হয় না—চিত্তবিশ্রামে যাইতে হইবে। অতএব চন্দ্রচূড়, এই অপরাধী-দিগের বরতরফি পরওয়ানাতে রাজার সহি করাইয়া লইলেন। রাজা না পড়িয়াই সহি দিলেন।

কিন্তু তাহাতে কার্য্য সিদ্ধ হইল না। প্রধান অপরাধী খাতাঞ্জি দরবারে উপস্থিত ছিল, সে দেখিল যে রাজা না পড়িয়াই সহি দিলেন। রাজা চলিয়া গেলে সে বলিল, "ও হুকুম মানি না। ও তোমার হুকুম—রাজার নয়। রাজা কাগজ পড়িয়াও দেখেন নাই। যখন রাজা স্বয়ং বিচার করিয়া আমা-দিগকে বরতরফ করিবেন, তখন আমরা যাইব, এখন নহে।" কেহই গেল না। খুব চুরি করিতে লাগিল। ধনাগার তাহাদের হাতে, সুতরাং চন্দ্রচূড় কিছু করিতে পারিলেন না।

তাই আজ চন্দ্রচূড় রাজাকে পাকড়াও করিয়াছিলেন। রাজা দরবারে বসিলে, অপরাধীদিগের সমক্ষেই চন্দ্রচূড় কাগজপত্র সকল রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন। রাজা একে সমস্ত জগতের উপর রাগিয়াছিলেন, তাহাতে আবার চুরির বাহুল্য দেখিয়া ক্রোধে অত্যন্ত বিকৃতচিত্ত হইয়া উঠিলেন। রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন, যে অপরাধী সকলেই শূলে যাইবে।

হুকুম শুনিয়া আম দরবার শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রচূড় যেন বজ্রাহত হইলেন।

বলিলেন, "সে কি মহারাজ! লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড?"

রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "লঘু পাপ কি? চোরের শূলই ব্যবস্থা।"

চন্দ্র। ইহার মধ্যে কয়জন ব্রাহ্মণ আছে। ব্রহ্মহত্যা করিবেন কি প্রকারে?

রাজা। ব্রাহ্মণদিগের নাক কান কাটিয়া, কপালে তপ্ত লোহার দ্বারা "চোর" লিখিয়া ছাড়িয়া দিবে। আর সকলে শূলে যাইবে।"

এই হুকুম জারি করিয়া, রাজা চিত্তবিশ্রামে চলিয়া গেলেন। হুকুম মত অপরাধীদিগের দণ্ড হইল। নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। অনেক রাজ কর্ম্মচারী কর্ম্ম ছাড়িয়া পলাইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

চুরি বন্ধ হইল, কিন্তু টাকার তখু কুলান হয় না। রাজ্যের অবস্থা রাজাকে বলা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু রাজাকে পাওয়া ভার, পাইলেও কথা হয় না। চন্দ্রচূড় সন্ধানে সন্ধানে ফিরিয়া আবার এক দিন রাজাকে ধরিলেন—বলিলেন,

"মহারাজ! একবার এ কথায় কর্ণপাত না করিলে রাজ্য থাকে না।"

রাজা। থাকে থাকে, যায়, যায়। ভাল শুনিতেছি, বলুন কি হয়েছে?

চন্দ্র। শিপাহী সব দলে দলে ছাড়িয়া চলিতেছে।

রাজা। কেন?

চন্দ্র। বেতন পায় না।

রাজা। কেন পায় না?

চন্দ্র। টাকা নাই।

রাজা। এখনও কি চুরি চলিতেছে না কি?

চন্দ্র। না, চুরি বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাতে কি হইবে? যে টাকা চোরের পেটে গিয়েছে, তাত আর ফিরে নাই।

রাজা। কেন, আদায় তহশীল হইতেছে না?

চন্দ্র। এক পয়সাও না।

রাজা। কারণ কি?

চন্দ্র। যাহাদের প্রতি আদায়ের ভার, তাহারা কেহ বলে "আদায় করিয়া শেষ তহবিল গরমিল হইলে শূলে যাব না কি?"

রাজা। তাহাদের বরতরফ করুন।

চন্দ্র। নূতন লোক পাইব কোথায়? আর কেবল নূতন লোকের দ্বারা কি আদায় তহশীলের কাজ হয়?

রাজা। তবে তাহাদিগকে কয়েদ করুন।

চন্দ্র। সর্ব্বনাশ! তবে আদায় তহশীল করিবে কে?

রাজা। পনের দিনের মধ্যে যে বাকী বকেয়া সব আদায় না করিবে, তাহাকে কয়েদ করিব।

চন্দ্র। সকল তহশীলদারেরও দোষ নাই। দেনেওয়ালা অনেকে দিতেছে না।

রাজা। কেন দেয় না?

চন্দ্র। বলে "মুসলমানের রাজ্য হইলে দিব। এখন দিয়া কি দোকর দিব?"

রাজা। যে টাকা না দিবে, যাহার বাকি পড়িবে, তাহাকেও কয়েদ করিতে হইবে।

চন্দ্রচূড়, হাঁ করিয়া রহিলেন। শেষ বলিলেন, "মহারাজ কারাগারে এত স্থান কোথা?"

রাজা। বড় বড় চালা তুলিয়া দিবেন।

এই বলিয়া বাকিদার ও তহশীলদার উভয়ের কয়েদের হুকুমে স্বাক্ষর করিয়া, রাজা চিত্তবিশ্রামে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রচূড় মনে মনে শপথ করিলেন, আর কখন রাজাকে রাজকার্য্যের কোন কথা জানাইবেন না।

এই হুকুমে দেশে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। কারাগার সকল ভরিয়া গেল—চন্দ্রচূড় চালা তুলিয়া কুলাইতে পারিলেন না। বাকিদার, তহশীলদার, উভয়েই দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। যে বাকিদার নয়, সেও সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পলাইতে লাগিল।

তাই বলিতেছিলাম, যে আগে আগুণ ত জ্বলিয়াইছিল, এখন ঘর পুড়িল। যদি শ্রী না আসিত, তবে সীতারামের এতটা অবনতি হইত কি না জানিনা, কেননা সীতারাম ত মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, যে রাজ্য-শাসনে মন দিয়া শ্রীকে ভুলিবেন—সে কথা যথাস্থানে বলিয়াছি। অসময়ে আসিয়া শ্রী দেখা দিল, সে অভিপ্রায় বালির বাঁধের মত আসক্তির বেগে ভাসিয়া গেল। রাজ্যে মন দিলেই যে সব আপদ ঘুচিত, তাহা নাই বলিলাম, কিন্তু শ্রী যদি আসিয়াছিল, তবে সে যদি নন্দার মত রাজপুরী মধ্যে মহিষী হইয়া থাকিয়া, নন্দার মত রাজার রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত, তাহা হইলেও সীতারামের এতটা অবনতি হইত না বোধ হয়, কেননা কেবল ঐশ্বর্য্যমদে যে অবনতিটুকু হইতেছিল, শ্রী ও নন্দার সাহায্যে সেটুকুরও কিছু খর্ব্বতা হইত। তা শ্রী, যদি রাজপুরীতে মহিষী না থাকিয়া, চিত্তবিশ্রামে আসিয়া উপপত্নীর মত রহিল, তবে সন্ন্যাসিনীর মত না থাকিয়া, সেই মত থাকিলেই এতটা প্রমাদ ঘটিত না। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ

হইলে, তাহার মোহিনী শক্তির অনেক লাঘব হইত। কিছু দিনের পর রাজার চৈতন্য হইতে পারিত। তা, যদি শ্রী সন্ন্যাসিনী হইয়াই রহিল, তবে সোজা রকম সন্ন্যাসিনী হইলেও এ বিপদ হইত না। কিন্তু এই ইন্দ্রাণীর মত সন্ন্যাসিনী বাঘছালে বসিয়া বাক্যে মধুবৃষ্টি করিতে থাকিবে, আর সীতারাম কুকুরের মত তফাতে বসিয়া মুখপানে চাহিয়া থাকিবে—অথচ সে সীতারামের স্ত্রী! এতেইত সর্ব্বনাশ ঘটিল। আগে আগুণ লাগিয়াছিল মাত্র,—এখন ঘর পুড়িল। সীতারাম আর সহ্য করিতে না পারিয়া. মনে মনে সঙ্কল্প করিল, শ্রীর উপর বলপ্রয়োগ করিবেন।

তবে যাকে ভালবাসে, তাহার উপর বলপ্রয়োগ বড় পামরেও পারে না। শ্রীর উপর রাজার যে ভালবাসা, তাহা এখন কাজেই ইন্দ্রিয়বশ্যতায় আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভালবাসা এখনও যায় নাই। তাই বল প্রয়োগে ইচ্ছুক হইয়াও সীতারাম তাহা পারিতেছিল না। বলপ্রয়োগ করিব কি না এ কি কথার মীংমাসা করিতে সীতারামের প্রাণ বাহির হইতেছিল। যত দিন না সীতারাম একটা এদিক ওদিক স্থির করিতে পারিলেন, তত দিন সীতারাম এক প্রকার জ্ঞানশূন্যাবস্থায় ছিলেন। সেই ভয়ানক সময়ের বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে রাজপুরুষেরা শূলে গেল, আদায় তহশীলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিরা কারাগারে গেল, বাকিদারেরা আবদ্ধ হইল, প্রজা সব পালাইল, রাজ্য ছারেখারে যাইতে লাগিল।

শেষ সীতারাম স্থির করিলেন, শ্রীর প্রতি বলপ্রয়োগই করিবেন। কথাটা মনোমধ্যে স্থির হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতেই অকস্মাৎ এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড় ঠাকুর রাজাকে আর এক দিন পাকড়া করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! তীর্থপর্য্যটনে যাইব ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি অনুমতি করিলেই যাই।"

কথাটা রাজার মাথায় যেন বজ্রাঘাতের মত পড়িল। চন্দ্রচূড় গেলে নিশ্চয়ই শ্রীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে নয়, রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব রাজা চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে তীর্থযাত্রা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এখন, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের স্থিরসিদ্ধান্ত এই যে, এ পাপ রাজ্যে আর বাস করিবেন

না, এ পাপিষ্ঠ রাজার কর্ম্ম আর করিবেন না। অতএব তিনি সহজে সম্মত হইলেন না। অনেক কথাবার্ত্তা হইল। চন্দ্রচূড় অনেক তিরস্কার করিলেন। রাজাও অনেক উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেন। শেষে চন্দ্রচূড় থাকিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কথায় কথায় অনেক রাত্রি হইল। কাজেই রাজা সে দিন চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। এদিকে চিত্তবিশ্রামে সেই রাত্রে একটা কাণ্ড উপস্থিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন দৈবগতিকে চিত্তবিশ্রামের দ্বারদেশে একজন ভৈরবী আসিয়া দর্শন দিল। এখন চিত্তবিশ্রাম ক্ষুদ্র প্রমোদগৃহ হইলেও রাজগৃহ; জনকত দ্বারবানও দ্বারদেশে আছে। ভৈরবী দ্বারবানদিগের নিকট পথ ভিক্ষা করিল।

দ্বারবানেরা বলিল, "এ রাজবাড়ী—এখানে একটী রাণী থাকেন। কাহারও যাইবার হুকুম নাই।" বলা বাহুল্য যে রাজাদিগের উপরাণীরাও ভৃত্যদিগের নিকট রাণী নাম পাইয়া থাকে।

ভৈরবী বলিল, "আমার তাহা জানা আছে। রাজাও আমায় জানেন। আমার যাইবার নিষেধ নাই। তোমরা গিয়া রাজাকে জানাও।"

দ্বারবানেরা বলিল, "রাজা এখন এখানে নাই—রাজধানী গিয়াছেন।"

ভৈ। তবে যে রাণী এখানে থাকেন, তাঁকেই জানাও। তাঁর হুকুমে হইবে না?"

দ্বারবানেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল। চিত্তবিশ্রামের অন্তঃপুরে কখন কেহ প্রবেশ করিতে পায় নাই—রাজার বিশেষ নিষেধ। রাণীরও নিষেধ। রাজার অবর্ত্তমানে দুই একজন স্ত্রীলোক (নন্দার প্রেরিতা) অন্তঃপুরে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রাণীকে সম্বাদ দেওয়াতে তিনি কাহাকেও আসিতে দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তবে আবার রাণীজিকে খবর দেওয়া যাইবে কি? তবে এ ভৈরবীটার মূর্ত্তি দেখিয়া ইহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না—তাড়াইয়া দিলেও যদি কোন গোলযোগ ঘটে!

দ্বারবানেরা সাত পাঁচ ভাবিয়া পরিচারিকার দ্বারা অন্তঃপুরে সম্বাদ পাঠাইল। ভৈরবী আসিয়াছে শুনিয়া শ্রী তখনই আসিবার অনুমতি দিল। জয়ন্তী অন্তঃপুরে গেল।

দেখিয়া শ্রী বলিল, "আসিয়াছ ভাল হইয়াছে। আমার এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে, যে তোমার পরামর্শ নহিলে চলিতেছে না।"

জয়ন্তী বলিল, "আমি ত এই সময়ে তোমার সম্বাদ লইতে আসিব বলিয়া গিয়াছিলাম। এখন সম্বাদ কি, বল। নগরে শুনিলাম, রাজ্যের নাকি বড় গোলযোগ? আর তুমিই নাকি তার কারণ? টোলে টোলে শুনিয়া আসিলাম, ছাত্রেরা সব রঘুর উনবিংশের শ্লোক আওড়াইতেছে। ব্যপারটা কি?"

শ্রী বলিল, "তাই তোমায় খুঁজিতে ছিলাম।" শ্রী তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। জয়ন্তী বলিল, "তবে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতেছ না কেন?"

শ্রী। সেটা ত বুঝিতে পারিতেছি না।

জয়ন্তী। রাজধানীতে যাও। রাজপুরী মধ্যে মহিষী হইয়া বাস কর। সেখানে রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে স্বধর্ম্মে রাখ। এ তোমারই কাজ।

শ্রী। তাত জানি না। মহিষীর ধর্ম্ম ত শিখি নাই। সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম শিখাইয়াছ, তাই শিখিয়াছি। যাহা জানি না, যাহা পারি না, সেই ধর্ম্ম গ্রহন করিয়া সব গোল করিব। সন্ন্যাসিনী মহিষী হইলে কি মঙ্গল হইবে?"

জয়ন্তী ভাবিল। বলিল, "তা আমি বলিতে পারি না। তোমা হইতে সে ধর্ম্ম পালন হইবে না; বোধ হইতেছে—তাহা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কি এতদূর হয়?"

শ্রী। বুঝি সে একদিন ছিল। যে দিন আঁচল দোলাইয়া মুসলমান সেনা ধ্বংস করিয়াছিলাম—সেদিন থাকিলে বুঝি হইত। কিন্তু অদৃষ্ট সে পথে গেল না, সে শিক্ষা হইল না। অদৃষ্ট গেল ঠিক উলটা পথে—বনবাসে—সন্ন্যাসে গেল। কে জানে আবার অদৃষ্ট ফিরিবে?"

জ। এখন উপায়?

শ্রী। পলায়ন ভিন্ন ত আর উপায় দেখি না। কেবল রাজার জন্য বা রাজ্যের জন্য বলি না। আমার আপনার জন্যও বলিতেছি। রাজাকে রাত্রি দিন দেখিতে দেখিতে অনেক সময়ে মনে হয়, আমি গৃহিণী, উহার ধর্ম্মপত্নী।

জ। তাত বটেই।

শ্রী। তাতে পুরাণ কথা মনে আসে। আবার কি ভালবাসার ফাঁদে পড়িব? তাই, আগেই বলিয়াছিলাম রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাই ভাল। শত্রু, রাজা লইয়া বার জন।”

জয়ন্তী। আর এগার জন আপনার শরীরে? ভারি ত সন্ন্যাস সাধিয়াছ, দেখিতেছি! যাহা জগদীশ্বরে সমর্পণ করিয়াছিলে, তাহা আবার কাড়িয়া লইয়াছ, দেখিতেছি। আবার আপনার ভাবনাও ভাবিতে শিখিয়াছ দেখিতেছি! একে কি বলে সন্ন্যাস?

শ্রী। তাই বলিতেছিলাম, পলায়নই বিধি কি না?

জ। বিধি বটে।

শ্রী। রাজা বলেন, আমি পলাইলে তিনি আত্মঘাতী হইবেন।

জ। পুরুষমানুষের মেয়ে ভুলান কথা! পুষ্পশরাহতের প্রলাপ!

শ্রী। সে ভয় নাই?

জ। থাকিলে তোমার কি? রাজা বাঁচিল মরিল তাতে তোমার কি? তোমার স্বামী বলিয়া কি তোমার এত ব্যথা? এই কি সন্ন্যাস?

শ্রী। তা হোক না হোক—রাজা মরিলেই কোন্ সর্ব্বভূতের হিত সাধন হইল?

জ। রাজা মরিবে না ভয় নাই। ছেলে খেলানা হারাইলে কাঁদে, মরেনা। তুমি ঈশ্বরে কর্ম্মসংন্যাস করিয়া যাহাতে সংযতচিত্ত হইতে পার তাই কর।

শ্রী। তা হইলে এখান হইতে প্রস্থান করিতে হয়।

জ। এখনই।

শ্রী। কি প্রকারে যাই? দ্বারবানেরা ছাড়িবে কেন?

জ। তোমার সে গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, ত্রিশূল, সবই আছে দেখিতেছি। ভৈরবী বেশে পলাও, দ্বারবানেরা কিছু বলিবে না।”

শ্রী। মনে করিবে, তুমি যাইতেছ? তার পর তুমি যাইবে কি প্রকারে?

জয়ন্তী হাসিয়া বলিল, "একি আমার সৌভাগ্য! এতকালের পর আমার জন্য ভাবিবার একটা লোক হইয়াছে! আমি নাই যাইতে পারিলাম, তাতে ক্ষতি কি দিদি?"

শ্রী। রাজার হাতে পড়িবে—কি জানি রাজা যদি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হন!

জ। হইলে আমার কি করিবেন? এমন সম্বাদ পাইয়াছ কি, যে রাজাদিগের এমন কোন ক্ষমতা আছে, যে আমার অনিষ্ট করিতে পারে?

জয়ন্তীর উপর শ্রীর অনন্ত বিশ্বাস। সুতরাং শ্রী আর বাদানুবাদ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?"

"তুমি বরাবর—গ্রামে যাও। সেখানে রাজার পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তোমার ত্রিশূল আমাকে দাও; আমার ত্রিশূল তুমি নাও। সে গ্রামের রাজার পুরোহিত আমার মন্ত্রশিষ্য। তিনি আমার চিহ্নিত ত্রিশূল দেখিলে, তুমি যা বলিবে, তাই করিবেন। তাঁকে বলিও, তোমাকে অতি গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখেন। কেন না তোমার জন্য বিস্তর খোঁজ তল্লাস হইবে। তিনি তোমাকে রাজপুরী মধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন। সেই খানে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।

তখন শ্রী জয়ন্তীর পদধূলি গ্রহন করিয়া আবার বনবাসে নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বারবানেরা কিছু বলিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রামচাঁদ। ভয়ানক ব্যাপার! লোক অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল।

শ্যামচাঁদ। তাই ত দাদা! আর তিলার্দ্ধ এ রাজ্যে থাকা নয়।

রামচাঁদ। তা তুমি ত আজ কত দিন ধ'রে যাই যাই ক'চ্ছো—যাও নি যে?

শ্যামচাঁদ। যাওয়ারই মধ্যে, মেয়ে ছেলে সব নলডাঙ্গা পাঠ'য়ে দিয়েছি। তবে আমার কিছু লহনা পড়ে রয়েছে, সে গুলা যতদূর হয় আদায় ওসুল ক'রে নিয়ে যাই। আর আদায় ওসুল বা করবো কার আছে—দেনেওয়ালারাও সব ফেরার হয়েছে।

রামচাঁদ। আচ্ছা এ আবার নূতন ব্যাপার কি ? কেন এত হাঙ্গামা তা কিছু জান ? শুনেছি নাকি হাবুজখানায় আর কয়েদী ধরেনা, নূতন চালাগুলাতেও ধরেনা, এখন নাকি গোহালের গোরু বাহির করিয়া কয়েদী রাখছে ?

শ্যামচাঁদ। ব্যাপারটা কি জাননা ? সেই ডাকিনীটা পালিয়েছে

রাম। তা শুনেছি ! আচ্ছা, সে ডাকিনীটা ত এত যাগ যজ্ঞে কিছুতেই গেল না—এখন আপনি পালাল যে ?

শ্যাম। আপনি কি আর গিয়েছে ? (চুপি চুপি) বল্‌তে গায়েঁ কাঁটা দেয়। সে নাকি দেবতার তাড়নায় গিয়েছে।

রাম। সে কি !

শ্যাম। এই নগরে এক দেবী অধিষ্টান করেন শুন নি ? তিনি কখন কখন দেখা দেন—অনেকেই তাঁকে দেখিয়াছে। কেন, যে দিন ছোট রাণীর পরীক্ষা হয়, সেদিন তুমি ছিলে না ?

রাম। হাঁ ! হাঁ ! সেই তিনিই ! আচ্ছা, বল দেখি তিনি কে ?

শ্যাম। তা তিনি কি কারও কাছে আপনার পরিচয় দিতে গিয়েছেন ! তবে পাঁচজন লোকে পাঁচ রকম বল্‌চে।

রাম। কি বলে ?

শ্যাম। কেউ বলে তিনি এই পূরীর রাজলক্ষ্মী। কেউ বলে তিনি স্বয়ং লক্ষ্মী, লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দির হইতে কখন কখন রূপ ধারণ ক'রে বার হন, লোকে এমন দেখেছে। কেউ বলে তিনি স্বয়ং দশভুজা ; দশভুজার মন্দিরে গিয়া অন্তর্দ্ধান হ'তে তাঁকে নাকি দেখেছে।

রাম। তাই হবে। নইলে তিনি ভৈরবী বেশ ধারণ কর্‌বেন কেন ? সে সভায় ত তিনি ভৈরবীবেশে অধিষ্ঠান করেছিলেন ?

শ্যাম। তা যিনিই হন, আমাদের অনেক ভাগ্য যে আমরা তাঁকে সে দিন দর্শন করেছিলাম। কিন্তু রাজার এমনই মতিচ্ছন্ন ধরেছে যে—

রাম। হাঁ—তারপর ডাকিনীটা গেল কি ক'রে শুনি।

শ্যাম। সেই দেবী, ডাকিণী হ'তে রাজ্যের অমঙ্গল হ'চ্ছে দেখে একদিন ভৈরবীবেশে ত্রিশূল ধারণ ক'রে তাকে বধ করতে গেলেন।

রাম। ইঃ ! তারপর ?

শ্যাম। তারপর আর কি? মার রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখে, সেটা তালগাছ প্রমান বিকটাকার মূর্ত্তি ধারণ ক'রে, ঘোর গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে কোথায় যে আকাশপথে উড়ে গেল কেউ আর দেখ্‌তে পেলে না।

রাম। কে বল্‌লে?

শ্যাম। বল্‌লে আর কে? যারা দেখেছে, তারাই বলেছে। রাজা এমনই সেই ডাকিনীর মায়ায় বদ্ধ, যে সেটা গেছে বলে চিত্তবিশ্রামের যত দ্বারবান দাস দাসী সবাইকে ধরে এনে কয়েদ করেছেন। তারাই এই সব কথা প্রকাশ করেছে। তারা বলে, "মহারাজ! আমাদের অপরাধ কি? দেবতার কাছে আমরা কি কর্‌ব?"'

রাম। গল্প কথা নয় ত?

শ্যাম। একি আর গল্প কথা!

রাম। কি জানি। হয়ত ডাকিনীটা মড়া ফড়া খাবার জন্য রাত্রে কোথা বেরিয়ে গিয়েছিল, আর আসে নি। এখন রাজার পীড়াপীড়িতে তারা আপনার বাঁচন জন্য একটা রচে মচে বলচে।

শ্যাম। একি আর রচা কথা? তারা দেখেছে যে, সেটার এমন এমন মূলোর মত দাঁত, শোনের মত চুল, বারকোশের মত চোক, একটা আস্ত কুমীরের মত জিব, দুটো জালার মত দুটো স্তন, মেঘগর্জ্জনের মত নিঃশ্বাস, আর ডাকেতে একেবারে মেদিনী বিদীর্ণ!

রাম। সর্ব্বনাশ! এত বড় অদ্ভুত ব্যাপার! রাজার মতিচ্ছন্ন ধরেছে বল্‌ছিলে কি?

শ্যাম। তাই বল্‌চি শোন না। এই ত গেল নিরপরাধী বেচারাদের নাহক কয়েদ। তারপর, সেই ডাকিনীটাকে খুঁজে ধরে আন্‌বার জন্য রাজা ত দিক বিদিকে কত লোকই পাঠাচ্চেন। এখন সে আপনার স্বস্থানে চলে গেছে, মনুষ্যের সাধ্য কি যে তাকে সন্ধান ক'রে ধ'রে আনে। কেউ তা পারছে না—সবাই এসে যোড় হাত ক'রে এত্তেলা করছে যে সন্ধান করতে পারলে না।

রাম। তাতে রাজা কি বলেন?

শ্যাম। এখন যাই কেউ ফিরে এসে বল্‌চে যে পারলে না, অমনই রাজা

তাকে কয়েদে পাটাচ্চেন। এই করে ত হাবুজখানা পরিপূর্ণ। এ দিকে রাজপুরুষদের এমনই ভয় লেগেছে যে বাড়ী, ঘর, দ্বার, স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে পালাচ্চে। দেখাদেখি নগরের প্রজা দোকানদারও সব পালাচ্চে।

রাম। তা, দেবী কি করেন? তিনি কটাক্ষ করিলেই ত এই সকল নিরাপরাধী লোক রক্ষা পায়।

শ্যাম। তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী! তিনি এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ভৈরবী বেশে রাজাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "রাজা! নিরপরাধীর পীড়ন করিও না। নিরপরাধীর পীড়ন করিলে রাজার রাজ্য থাকে না। এদের কোন দোষ নাই। আমিই সেটাকে তাড়াইয়াছি—কেননা সেটা হ'তে তোমার রাজ্যের অমঙ্গল হইতেছিল। দোষ হইয়া থাকে, আমারই হইয়াছে। দণ্ড করিতে হয়, উহাদের ছাড়িয়া দিয়া আমারই দণ্ড কর।"

রাম। তারপর!

শ্যাম। তাই বল্‌ছিলাম, রাজার বড় মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে। সেটা পালান অবধি রাজার মেজাজ এমন গরম, যে কাক পক্ষী কাছে যাইতে পারিতেছে না। তর্কালঙ্কার ঠাকুর কাছে গিয়াছিলেন, বড় রাণী কাছে গিয়াছিলেন, গাল খেয়ে পালিয়ে এলেন?

রাম। সে কি! গুরুকে গালি গালাজ? নির্ব্বংশ হবেন যে।

শ্যাম। তার কি আর কথা আছে? তার পর শোন না। গরম মেজাজের প্রথম মোহাড়াতেই সেই দেবতা গিয়া দর্শন দিয়া ঐ কথা বল্‌লেন। বলতেই রাজা চক্ষু আরক্ত করিয়া তাঁকে স্বহস্তে প্রহার করিতেই উদ্যত। তা না ক'রে, যা করেছে সে ত আরও ভয়ানক!

রাম। কি করেছে!

শ্যাম। ঠাকুরাণীকে কয়েদ করেছে। আর হুকুম দিয়েছে, যে তিন দিন মধ্যে ডাকিনীকে যদি না পাওয়া যায়, তবে সমস্ত রাজ্যের লোকের সমুখে (সেই দেবীকে) উলঙ্গ ক'রে চাঁড়ালের দ্বারা বেত মারিবে।

রাম। হো! হো! হোহো! দেবতার আবার কি করবে! রাজাকে কি পাগল হয়েছে! তা, মা কি কয়েদে গিয়েছেন না কি? তাঁকে কয়েদ করে কার বাপের সাধ্য?

শ্যাম। দেবচরিত্র কার সাধ্য বুঝে! রাজার নাকি রাজ্যভোগের নির্দ্দিষ্ট কাল ফুরেয়েছে, তাই মা ছল ধরিয়া, এখন স্বধামে গমনের চেষ্টায় আছেন। রাজা কয়েদের হুকুম দিলেন, মা সচ্ছন্দে গজেন্দ্র গমনে কারাগার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। শুনতে পাই, রাত্রে কাগাগার মহা কোলাহল উপস্থিত হয়। যত দেবতারা আসিয়া স্তব পাঠ করেন—ঋষিরা আসিয়া বেদ পাঠ মন্ত্র পাঠ করেন। পাহারায়োলারা বাহির হইতে শুনিতে পায়, কিন্তু দ্বার খুলিলেই সব অন্তর্দ্ধান হয়। (বলা বাহুল্য যে জয়ন্তী নিজেই রাত্রিকালে ঈশ্বর স্তোত্র পাঠ করেন। পাহারোয়ালারা তাহাই শুনিতে পায়)

রাম। তারপর?

শ্যাম। তারপর, এখন আজ সে তিন দিন পূরিল। রাজা ঢেঁট্‌রা দিয়েছেন যে কাল একমাগী চোরকে বেইয্যৎ করিয়া বেত মারা যাইবে, যাহার ইচ্ছা হয় দেখিতে আসিতে পারে। শুন নাই?

রাম। কি দুর্ব্বুদ্ধি! তর্কালঙ্কার ঠাকুরই বা কিছু বলেন না কেন? বড় রাণী, বা কিছু বলেন না কেন? দুট্টো গালির ভয়ে কি তাঁরা তার কাছে আসিতে পারেন না?

শ্যাম। তাঁরা না কি অনেক বলেছেন। রাজা বলেন, ভাল দেবতাই যদি হয়, তবে আপনার রক্ষা আপনিই করিবে, তোমাদের কথা কহিবার প্রয়োজন কি? আর যদি মানুষ হয়, তবে আমি রাজা, চোরের দণ্ড আমি দিব, তোমাদের কথা কহিবার প্রয়োজন কি?

রাম। তা এক রকম বলেছে মন্দ নয়—ঠিক কথাই ত। তা ব্যাপারটা কি হয়, কাল দেখতে যেতে হবে। তুমি যাবে?

শ্যাম। যাব বৈ কি? সবাই যাবে। এমন কাণ্ড কেনা দেখতে যাবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ জয়ন্তীর বেত্রাঘাত হইবে। রাজ্যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে যে তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করা হইবে। প্রভাত হইতে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। বেলা অল্প হইতে দুর্গ পরিপূর্ণ হইল আর লোক ধরে না। ক্রমে

ঠেসাঁঠেসি ঘেঁষাঘেঁষি পেষাপিষি মিশামিশি হইতে লাগিল। এই দুর্গমধ্যে আর এক দিন এমনই লোকারণ্য হইয়াছিল—সে দিন রমার বিচার। আজ জয়ন্তীর দণ্ড। বিচার অপেক্ষা দণ্ড দেখিতে লোক বেশী আসিল। নন্দা বাতায়ন হইতে দেখিলেন, কালো চুল মাথার তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না; কদাচিৎ কোন স্ত্রীলোকের মাথায় আঁচল, বা কোন পুরুষের মাথা চাদর জড়ান, সেই কৃষ্ণসাগরে ফেনরাজির ন্যায় ভাসিতেছে। সেই রমার পরীক্ষা নন্দার মনে পড়িল, কিন্তু মনে পড়িল যে, সে দিন দেখিয়াছিলেন যে সেই জনার্ণব বড় চঞ্চল, সংক্ষুব্ধ, যেন বাত্যাতাড়িত; রাজপুরুষেরা কষ্টে শান্তি রক্ষা করিয়াছিল, আজ সকলেই নিস্তব্ধ। সকলেরই মনে রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা বড় জাগরূক। সকলেই মনে মনে ভয় পাইতেছিল। আজ এই লোকারণ্য সিংহব্যাঘ্রবিক্রান্ত মহারণ্য অপেক্ষাও ভয়ানক দেখাইতেছিল। সেই বৃহৎ দুর্গ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এক উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদুপরি এক কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠ গঠন বিকটদর্শন চাণ্ডাল, মূর্ত্তিমান অন্ধকারের ন্যায় দীর্ঘ বেত্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান আছে। জয়ন্তীকে তদুপরি আরোহণ করাইয়া সর্ব্বসমক্ষে বিবস্ত্রা করিয়া সেই চাণ্ডাল বেত্রাঘাত করিবে, ইহাই রাজাজ্ঞা।

জয়ন্তীকে এখনও সেখানে আনা হয় নাই। রাজা এখনো আসেন নাই— আসিলে তবে তাহাকে আনা হইবে। মঞ্চের সম্মুখে রাজার জন্য সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে। তাহা বেষ্টন করিয়া চোপদার ও সিপাহীগণ দাঁড়াইয়া আছে। অমাত্যবর্গ আজ সকলেই অনুপস্থিত। এমন কুকাণ্ড দেখিতে আসিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় নাই। রাজাও কাহাকে ডাকেন নাই।

কতক্ষণে রাজা আসিবেন, কতক্ষণে সেই দণ্ডনীয়া দেবী বা মানবী আসিবে, কতক্ষণে কি হইবে, সেই জন্য প্রত্যাশাপন্ন হইয়া লোকারণ্য ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছিল। এমন সময়ে হঠাৎ নকিব ফুকরাইল; স্তাবকেরা স্তুতিবাদ করিল। দর্শকেরা জানিল রাজা আসিতেছেন।

রাজার আজ বেশ ভূষার কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই—বৈশাখের দিনান্ত কালের মেঘের মত রাজা আজ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! আয়ত চক্ষু আরক্ত বর্ণ— বিশাল বক্ষ মধ্যে মধ্যে স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত হইতেছে। বর্ষণোন্মুখ জলধরের

উন্নমনের ন্যায় রাজা আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিলেন। কেহ বলিল না, "মহারাজাধিরাজ কি জয়!"

তখন সেই লোকারণ্য ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল—দেখিল সেই সময়ে প্রহরীগণ জয়ন্তীকে লইয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছে। প্রহরীরা তাহাকে মঞ্চোপরি স্থাপিত করিয়া চলিয়া গেল। কোন প্রাসাদ শিখরোপরে উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় জয়ন্তীর অতুলনীয় রূপরাশি সেই মঞ্চোপরে উদিত হইল। তখন সেই সহস্র সহস্র দর্শক, ঊর্দ্ধমুখে, উৎক্ষিপ্তলোচনে, গৈরিক বসনাবৃতা মঞ্চস্থা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই উন্নত, সম্পূর্ণায়ত, ললিত মধুর অথচ উজ্জ্বল জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট দেহ; তাহার দেবোপম স্থৈর্য্য—দেবদুর্ল্লভ শান্তি; সকলে বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল জয়ন্তীর নবরবিকরপ্রোদ্ভিন্ন পদ্মবৎ অপূর্ব্ব প্রফুল্ল মুখ; এখনও অধর ভরা মৃদু মধুর মন্দ স্নিগ্ধ বিনম্র হাস্য—সর্ব্ববিপদ্ সংহারিণী শক্তির পরিচয় স্বরূপসেই স্নিগ্ধ মধুর মন্দহাস্য! দেখিয়া, অনেকে দেবতা জ্ঞানে যুক্ত-করে প্রণাম করিল। যখন কতকগুলি লোক দেখিল, আর কতকগুলি লোক জয়ন্তীকে প্রণাম করিতেছে—তখন তাহাদেরও মনে সেই ভক্তিভাব প্রবেশ করিল। তখন তাহারা "জয় মায়ি কি জয়!" "জয় লছমী মায়ি কি জয়! ইত্যাদি ঘোররবে জয়ধ্বনি করিল। সেই জয়ধ্বনি ক্রমে ক্রমে প্রাঙ্গনের একভাগ হইতে, অপর ভাগে, এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গিরিশ্রেণীস্থিত বজ্রনাদের মত প্রক্ষিপ্ত ও প্রতিহত হইতে লাগিল। শেষ সেই সমবেত লোক সমারোহ এককণ্ঠ হইয়া তুমুল জয় শব্দ করিল। পুরী কম্পিতা হইল। চাণ্ডালের হস্ত হইতে বেত্র খসিয়া পড়িল। জয়ন্তী মনে মনে ডাকিতে লাগিল "জয় জগদীশ্বর! তোমারি জয়! তুমি আপনিই এই লোকারণ্য, আপনিই এই লোকের কণ্ঠে থাকিয়া, আপনার জয়বাদ আপনিই দিতেছ! জয় জগন্নাথ তোমারই জয়! আমি কে?"

ক্রুদ্ধ রাজা তখন অগ্নি মূর্ত্তি হইয়া মেঘ গম্ভীর স্বরে চাণ্ডালকে আজ্ঞা করিলেন, "কাপড় কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা!"

এই সময়ে চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার সহসা রাজসমীপে আসিয়া রাজার দুইটি হাত ধরিলেন। বলিলেন "মহারাজ! রক্ষা কর! আমি আর কখন

ভিক্ষা চাহিব না, এই বার আমায় এই ভিক্ষা দাও—ইহাঁকে ছাড়িয়া দাও।”

রাজা (ব্যঙ্গের সহিত)। কেন—দেবতার এমন সাধ্য নাই, যে আপনি ছাড়াইয়া যায়! বেটী জুয়াচোরের উচিত শাসন হইতেছে।

চন্দ্র। দেবতা না হইল—স্ত্রীলোক বটে।

রাজা। স্ত্রীলোকেরও রাজা দণ্ড করিতে পারেন।

চন্দ্র। এই জয়ধ্বনি শুনিতেছেন? এই জয়ধ্বনিতে আপনার রাজা নাম ডুবিয়া যাইতেছে।

রাজা। ঠাকুর! আপনার কাজে যাও। পুঁথি পাঁজি নাই কি?

চন্দ্রচূড় চলিয়া গেলেন। তখন চাণ্ডাল পুনরপি রাজাজ্ঞা পাইয়া আবার বেত উঠাইয়া লইল—বেত উচু করিল—জয়ন্তীর মুখ প্রতি চাহিয়া দেখিল বেত নামাইয়া—রাজার পানে চাহিল—আবার জয়ন্তীর পানে চাহিল—শেষ বেত আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

“কি!” বলিয়া রাজা বজ্রের ন্যায় শব্দ করিলেন।

চাণ্ডাল বলিল, “মহারাজ! আমা হইতে হইবে না।”

রাজা বলিলেন, “তোমাকে শূলে যাইতে হইবে।”

চাণ্ডাল, যোড়হাত করিয়া বলিল, “মহারাজের হুকুমে তা পারিব। এ পারিব না।”

তখন রাজা অনুচর বর্গকে আদেশ করিলেন, “চাণ্ডালকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ কর।”

রক্ষিবর্গ চাণ্ডালকে ধরিবার জন্য মঞ্চের উপর আরোহণ করিতে উদ্যত দেখিয়া জয়ন্তী সীতারামকে বলিলেন, “এ ব্যক্তিকে পীড়ন করিবেন না, আপনার যে আজ্ঞা আমি নিজেই পালন করিতেছি—চাণ্ডাল বা জল্লাদের প্রয়োজন নাই।” তথাপি রক্ষিবর্গ চাণ্ডালকে ধরিতে আসিতেছে দেখিয়া, জয়ন্তী তাহাকে বলিল, “বাছা! তুমি আমার জন্য কেন দুঃখ পাইবে। আমি সন্ন্যাসিনী, আমার কিছুতেই সুখ দুঃখ নাই; বেতে আমার কি হইবে? আর বিবস্ত্র—সন্ন্যাসীর পক্ষে বস্ত্র বিবস্ত্র সমান। কেন দুঃখ পাও—বেত তোল।

চাণ্ডাল বেত উঠাইল না। জয়ন্তী তখন চাণ্ডালকে বলিল, "বাছা! স্ত্রীলোকের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিলে না—এই তার প্রমাণ দেখ।" এই বলিয়া জয়ন্তী আপনি বেত উঠাইয়া লইয়া, দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে তাহা ধরিল। পরে সেই জনসমারোহ সমক্ষে, আপনার প্রফুল্লপদ্মসন্নিভ রক্ত-প্রভ ক্ষুদ্র করপল্লব পাতিয়া, সবলে তাহাতে বেত্রাঘাত করিল। বেত, মাংস কাটিয়া লইয়া উঠিল—হাতে রক্তের স্রোত বহিল। জয়ন্তীর গৈরিক বস্ত্র এবং মঞ্চতল তাহাতে প্লাবিত হইল। দেখিয়া লোকে হাহাকার করিতে লাগিল।

জয়ন্তী মৃদু হাসিয়া চাণ্ডালকে বলিল, "দেখিলে বাছা! সন্ন্যাসিনীকে কি লাগে? তোমার ভয় কি?"

চাঁণ্ডাল একবার রুধিরাক্ত ক্ষত পানে চাহিল—একবার জয়ন্তীর সহাস্য প্রফুল্ল মুখপানে চাহিয়া দেখিল—দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া, অতি ত্রস্তভাবে মঞ্চ সোপান অবরোহণ করিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। লোকারণ্য মধ্যে সে কোথায় লুকাইল, কেহ দেখিতে পাইল না।

রাজা তখন অনুচরবর্গকে আজ্ঞা করিলেন, "দোসরা লোক লইয়া আইস—মুসলমান।"

অনুচরবর্গ, কালান্তক যমের সদৃশ একজন কসাইকে লইয়া আসিল। সে মহম্মদপুরে গোরু কাটিতে পারিত না—কিন্তু নগর প্রান্তে বকরি মেড়া কাটিয়া বেচিত। সে ব্যক্তি অতিশয় বলবান ও কদাকার। সে রাজাজ্ঞা পাইয়া মঞ্চের উপর উঠিয়া, বেত হাতে লইয়া জয়ন্তীর সম্মুখে দাঁড়াইল। বেত উচু করিয়া, কসাই জয়ন্তীকে বলিল, "কাপড়া উতার—তেরি গোশ্‌ত টুক্‌রা টুক্‌রা কর্‌কে হাম দোকানমে বেচেঙ্গে।"

জয়ন্তী তখন, অপরিম্লান মুখে, জনসমারোহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের উপর বিবস্ত্র হইব। তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হইবে, সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল জন্য এখন চক্ষু আবৃত করুক। যাহার কন্যা আছে, সেই আপনার কন্যাকে মনে করিয়া, আমাকে সেই কন্যা ভাবিয়া চক্ষু আবৃত করুক। যে হিন্দু, যাহার দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে, সেই চক্ষু আবৃত করুক। যাহার মাতা অসতী, যে বেশ্যার

গর্ভে জন্মিয়াছে, সে যাহা ইচ্ছা করুক, তাহার কাছে আমার লজ্জা নাই, আমি তাহাদের মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করি না।”

লোকে এই কথা শুনিয়া চক্ষু বুজিল কিনা বুজিল, জয়ন্তী তাহা আর চাহিয়া দেখিল না। মন তখন খুব উচু সুরে বাঁধা আছে—জয়ন্তী তখন জগদীশ্বর ভিন্ন আর কাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। জয়ন্তী কেবল রাজার দিকে ফিরিয়া বলিল, “তোমার আজ্ঞায় আমি বিবস্ত্র হইব। কিন্তু তুমি চাহিয়া দেখিও না। তুমি রাজ্যেশ্বর; তোমায় পশুবৃত্ত দেখিলে প্রজারা কি না করিবে? মহারাজ! আমি বনবাসিনী, বনে থাকিতে গেলে অনেক সময়ে বিবস্ত্র হইতে হয়। একদা আমি বাঘের মুখে পড়িয়াছিলাম—বাঘের মুখ হইতে আপনার শরীর রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু বস্ত্র রক্ষা করিতে পারি নাই। তোমাকেও আমি, তোমার আচরণ দেখিয়া সেই রূপ বন্য পশু মনে করিতেছি, অতএব তোমার কাছে আমার লজ্জা হইতেছে না। কিন্তু তোমার লজ্জা হওয়া উচিত—কেননা তুমি রাজা, এবং গৃহী, তোমার মহিষী আছেন। চক্ষু বুজ।”

বৃথা বলা! তখন মহাক্রোধান্ধকারে রাজা একেবারে অন্ধ হইয়াছেন। জয়ন্তীর কথার কোন উত্তর না দিয়া, কসাইকে বলিলেন, “জবরদস্তী কাপড়া উতার লেও!”

তখন জয়ন্তী আর বৃথা কথা না কহিয়া, জানু পাতিয়া মঞ্চের উপর বসিল। জয়ন্তী আপনার কাছে, আপনি ঠকিয়াছে,—এখন বুঝি জয়ন্তীর চোখে জল আসে। জয়ন্তী মনে করিয়াছিল, “যখন পৃথিবীর সকল সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, যখন আর আমার সুখও নাই দুঃখও নাই, তখন আমার আবার লজ্জা কি? ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আমার মনের যখন কোন সম্বন্ধ নাই, তখন আমার আর বিবস্ত্র আর সবস্ত্র কি? পাপই লজ্জা, আবার কিসে লজ্জা করিব? জগদীশ্বরের নিকট ভিন্ন সুখদুঃখের অধীন মনুষ্যের কাছে লজ্জা কি? আমি কেন এই সভা মধ্যে বিবস্ত্র হইতে পারিব না?” তাই, জয়ন্তী এতক্ষণ আপনাকে বিপন্নই মনে করে নাই—বেত্রাঘাতটা ত গণ্যের মধ্যে নহে। কিন্তু এখন যখন বিবস্ত্র হইবার সময় উপস্থিত হইল—তখন কোথা হইতে পাপ লজ্জা আসিয়া সেই ইন্দ্রিয়বিজয়িনী সুখদুঃখবর্জ্জিতা জয়ন্তীকে ও

আসিয়া অভিভূত করিল। তাই নারীজন্মকে ধিক্কার দিয়া জয়ন্তী মঞ্চতলে জানু পাতিয়া বসিল। তখন যুক্তকরে, পবিত্রচিত্তে জয়ন্তী আত্মাকে সমাহিত করিয়া মনে মনে ডাকিতে লাগিল "দীনবন্ধু! আজ রক্ষা কর! মনে করিয়াছিলাম. বুঝি এ পৃথিবীর সকল সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কিন্তু হে দর্পহারী! আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, আমায় আজ রক্ষা কর! নারীদেহ কেন দিয়াছিলে, প্রভু! সব সুখদুঃখ বিসর্জ্জন করা যায়, কিন্তু নারীদেহ থাকিতে লজ্জা বিসর্জ্জন করা যায়না। তাই আজ কাতরে ডাকিতেছি, জগন্নাথ! আজ রক্ষা কর।"

যতক্ষণ জয়ন্তী জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিল, ততক্ষণ কসাই তাহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া সমস্ত জনমণ্ডলী এককণ্ঠে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল—বলিতে লাগিল, "মহারাজ! এই পাপে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে—তোমার রাজ্য গেল।" রাজা কর্ণপাতও করিলেন না। নিরুপায় জয়ন্তী. আপনার অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, ছাড়িতেছিল না। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। শ্রী থাকিলে বড় বিস্মিতা হইত—জয়ন্তীর চক্ষে আর কখন কেহ জল দেখে নাই। জয়ন্তী রুধিরাক্ত ক্ষতহস্তে আপনার অঞ্চল ধরিয়া ডাকিতে ছিল, "জগন্নাথ! রক্ষা কর!"

বুঝি জগন্নাথ সে কথা শুনিলেন। সেই অসংখ্য জনসমূহ হাহাকার করিতে করিতে সহসা আবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। "রাণী জি কি জয়! মহারাণীকি জয়! দেবী কি জয়!" এই সময়ে অধোমুখী জয়ন্তীর কর্ণে অলঙ্কারশিঞ্জিত প্রবেশ করিল। তখন জয়ন্তী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সমস্ত পৌরস্ত্রী সঙ্গে করিয়া, মহারাণী নন্দা মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছেন। জয়ন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সেই সমস্ত পৌরস্ত্রী জয়ন্তীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। মহারাণী নিজে জয়ন্তীকে আড়াল করিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দর্শকেরা সকলে করতালি দিয়া হরিবোল দিতে লাগিল। কসাই জয়ন্তীর আঁচল ছাড়িয়া দিল কিন্তু মঞ্চ হইতে নামিল না।

রাজা অত্যন্ত বিস্মিত ও রুষ্ট হইয়া অতি পরুষভাবে নন্দাকে বলিলেন, "একি এ মহারাণী?"

নন্দা বলিলেন " মহারাজ! আমি পতিপুত্রবতী। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে কখন এ পাপ করিতে দিব না। তাহা হইলে আমার কেহ থাকিবে না।"

রাজা পূর্ব্ববৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, " তোমার স্থান অন্তঃপুরে, এখানে নয়। অন্তঃপুরে যাও।"

নন্দা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, " মহারাজ! আমি যে মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়াছি, এই কসাইটা সেই মঞ্চে দাঁড়াইয়া থাকে কোন্ সাহসে? উহাকে নামিতে আজ্ঞা দিন।"

রাজা কথা কহিলেন না। তখন নন্দা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, " এই রাজপুরী মধ্যে আমার কি এমন কেহ নাই, যে এটাকে নামাইয়া দেয়।"

তখন সহস্র দর্শক এককালে " মার! মার!" শব্দ করিয়া কসাইয়ের প্রতি ধাবমান হইল। সে লম্ফ দিয়া মঞ্চ হইতে পড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দর্শকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া, মারিতে মারিতে দুর্গের বাহিরে লইয়া গেল। পরে অনেক লাঞ্ছনা করিয়া প্রাণমাত্র রাখিয়া ছাড়িয়া দিল।

নন্দা জয়ন্তীকে বলিল, " মা! দয়া করিয়া অভয় দাও! মা, আমার বড় ভয় হইতেছে, পাছে কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়া থাকেন। মা! অপরাধ লইও না। একবার অন্তঃপুরে পায়ের ধূলা দিবে চল, আমি তোমার পূজা করিব।"

তখন রাণী পৌরস্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে জয়ন্তীকে ঘেরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন। রাজা কিছু করিতে না পারিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন মহাকোলাহল পূর্ব্বক, এবং নন্দাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, দর্শক-মণ্ডলী দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অন্তঃপুরে গিয়া জয়ন্তী ক্ষণকালও অবস্থিতি করিল না। নন্দা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, স্বহস্তে গঙ্গাজলে জয়ন্তীর পা ধুয়াইয়া, সিংহাসনে বসাইতে গেলেন। কিন্তু জয়ন্তী হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বলিল, " মা! আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের মঙ্গল হউক। ক্ষণমাত্র জন্য মনে করিওনা যে আমি কোন প্রকার রাগ বা দুঃখ করিয়াছি।

ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখনও তোমার বিপদ্ পড়ে, জানিতে পারিলে, আমি আসিয়া আমার যথাসাধ্য উপকার করিব। কিন্তু রাজপুরীমধ্যে সন্ন্যাসিনীর ঠাঁই নাই। অতএব আমি চলিলাম।” নন্দা এবং পৌরবর্গ জয়ন্তীর পদধূলি লইয়া তাঁহাকে বিদায় করিল।

গোলাপ ফুল।

১

ফুল! তুমি শিখাও আমারে,
অমনি করিয়া আমি ফুটে রব সংসারে!
অমনি পবিত্র বেশে, অমনি গৌরবে ভেসে,
অমনি আনন্দে হেসে কণ্টকের মাঝারে,
অমনি সুন্দর হ'য়ে বিরাজিব সংসারে!
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

২

ফুল! তুমি শিখাও আমারে,
ওই চির-সরলতা ধরিব এ অন্তরে!
রূপ রস গন্ধ ল'য়ে, ধরায় অতুল হ'য়ে,
অমনি বিনীত র'য়ে পরিতৃপ্ত আকারে,
অমনি সন্যাসী আমি হইব এ সংসারে!
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

৩

ফুল! তুমি শিখাও আমারে,
অমনি অকূল প্রাণ ধরিব এ অন্তরে!
কোমলতা পূর্ণ বুক, মমতায় পূর্ণ সুখ,
তবু তিল নাহি দুখ তাপ বৃষ্টি প্রহারে!
সাধনার মূর্ত্তি, মরি, তুমি ইহ সংসারে!
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

৪

ফুল! তুমি শিখাও আমারে,
অমনি করিয়া আমি সেবিব এ সংসারে!
ভুলি আশা অভিমান কেবলি শিখিব দান,
জুড়াতে পরের প্রাণ বিলাইব আমারে,
উচ্চ নীচ পাপী পুণ্য সমতুল্য আচারে,
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

৫

ফুল! তুমি শিখাও আমারে;
তুষিতে অমনি ক'রে পারি যেন সবারে!
বালকের খেলিবার, প্রেমিকের কণ্ঠহার,
সাধকের অর্চ্চনার, সুধা দিয়ে ভ্রমরে,
অমনি করিয়া আমি মোহিব এ সংসারে!
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

৬

ফুল! তুমি শিখাও আমারে,
সাধিবারে ধর্ম্ম যেন পারি ওই প্রকারে!
সুখ দুখ সমুদায় সমর্পিয়ে বিধাতায়,
বিলাইয়ে আপনার সদানন্দ আকারে,
ঘুচাতে বিষাদ যেন পারি ইহ সংসারে!
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

৭

ফুল! তুমি শিখাও আমারে,
ওই বিশ্বব্যাপী-প্রেম শিখিব কি প্রকারে!
কেমন করিয়ে হায়, ছড়াইব এ হৃদয়
কণ্টক ফুটিছে গায় চারি দিকে সংসারে;
রূপ রস গন্ধে সদা অন্ধ ক'রে আমারে,
নয়ন থাকিতে অন্ধ হ'য়ে আছি সংসারে!
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

৮

ফুল! তুমি শিখাও আমারে,
ওই পরিণাম তব লভিব কি আচারে!
রূপ গন্ধ শুকাইলে পরিমল ফুরাইলে
সেবিতে অশক্ত হ'লে ধর্ম্মক্ষেত্র ধরারে
অমনি আনন্দে ঝ'রে পড়িব এ সংসারে
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

ঈশান।

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজা স্বজমানাং নমামঃ।
অজা যে তাং জুষ্মাণাং ভজন্তে
জহত্যেনাং ভুক্তভোগান্ নুমস্তান্॥

এই জগতে নিত্য পদার্থ কি এবং অনিত্য পদার্থই বা কি ইহা আলোচনা করাই হিন্দু দর্শন শাস্ত্র সমূহের প্রথম উদ্দেশ্য। সাংখ্যদর্শন মতে পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই নিত্য পদার্থ। পুরুষ চেতন এবং প্রকৃতি জড়; প্রকৃতি কথন পুরুষ ছাড়া থাকেন না এবং পুরুষও প্রকৃতি ছাড়া থাকেন না; প্রকৃতির শক্তি হইতেই জগতের স্বষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে—অর্থাৎ এই সংসার-চক্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে; পুরুষ এই প্রকৃতির লীলার দ্রষ্টা মাত্র; বদ্ধ পুরুষ, চেতন পদার্থ 'আপনা' (আত্মা) হইতে জড় প্রকৃতির প্রভেদ বুঝিতে পারেন না, সেই জন্যই দুঃখ যোগে বদ্ধ থাকেন; প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান জন্মাইলেই পুরুষ, দুঃখযোগ হইতে মুক্ত হন এবং সংসারচক্র তাঁহার পক্ষে নিবৃত্ত হয়। দেহ এবং দেহীর যে সম্বন্ধ তাহাই প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ। গীতায় যে সাংখ্যযোগ কথিত হইয়াছে তাহাতে নিত্য চেতন পদার্থ পুরুষকে 'দেহী' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দেহের জন্ম মৃত্যু পরিবর্ত্তনাদি ব্যাপার প্রকৃতির নিয়মের অধীন; যে পুরুষ এই দেহের জন্ম মৃত্যু পরিবর্ত্তনাদি নিবন্ধন 'আপনাকে' (আত্মাকে) সুখদুঃখভোগী জ্ঞান করেন তিনিই

বদ্ধ পুরুষ; যাহার প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান জন্মিয়াছে তিনি দেহ হইতে আপনাকে (দেহীকে) পৃথক বলিয়া বুঝেন এবং সেই জন্য দেহের সুখ দুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী জ্ঞান করেন না। "যিনি দুঃখে কখনও উদ্বিগ্ন হন না এবং সুখেও বিগতস্পৃহ তিনিই সাংখ্য যোগীগণ মতে মুক্ত পুরুষ।

পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃই প্রকৃতি নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। সুতরাং সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি কথার অর্থ বুঝিতে হইলে প্রকৃতিকে পুরুষের সহিত এক সঙ্গে ভাবিতে হইবে, নহিলে প্রকৃতি কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে না। জড়প্রকৃতিকে চেতনপুরুষের সহিত সম্পর্কশূন্য বলিয়া যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা সাংখ্যশাস্ত্রকথিত প্রকৃতির কার্য্য সকল বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। আজ কালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জগতের মূলকারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া যে "chaotic cosmic matter" কে জগতের আদি উপাদান বলিয়া বুঝিতেছেন, সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতি কথায় সেরূপ জড় পদার্থ বুঝায় না; তাঁহারা জড়ের যেরূপ শক্তিকে আদি শক্তি বলিয়া অনুমান করেন সাংখ্যের সত্ত্ব রজ তম শক্তি, কথায় সেরূপ শক্তি বুঝায় না। আজকালকার বিজ্ঞানবিৎগণ যে শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন আর প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন এ উভয়ের মধ্যে বড় একটি প্রভেদ আছে; এই প্রভেদটি না বুঝিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের শক্তি কথাটি আর প্রাচীন পণ্ডিতদের শক্তি কথায় এক অর্থ বুঝিলে অনেক ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। জড়ের শক্তির সহিত চেতনের যে কি সম্বন্ধ আজকালকার বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাহা ভাবেন না; পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শক্তির সহিত চেতন পুরুষের কোন সম্বন্ধই নাই; কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণ চেতনের সহিত প্রকৃতির যে সম্বন্ধসূত্র তাহাকেই শক্তি নাম দিয়া গিয়াছেন; শক্তি কথার সঙ্গে সঙ্গেই চেতন জীবের অস্তিত্ব তাঁহাদের মনে আসিত; কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞানবিদ্‌দের শক্তি কথাটিতে জড়ের সহিত জড়ের সম্বন্ধই মনে আসে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যখন তড়িৎ শক্তির কথা ভাবেন তখন তাঁহাদের মনের মধ্যে বাহ্য জড়-পদার্থের উপর তড়িৎশক্তির যেরূপ ক্রিয়া দেখা যায়, সেই সকল কথাই উদয় হয়, কিন্তু প্রাচ্য পণ্ডিতগণ তড়িৎশক্তির কথা ভাবিতে গেলে ঐ শক্তি তাঁহাদের অন্তরে সুখপ্রদ কি দুঃখপ্রদ, যদি সুখপ্রদ হয় তবে সে সুখ

কোন জাতীয়, যদি দুঃখপ্রদ হয় তবে সে দুঃখ কোন জাতীয়, এই সকল কথাই ভাবিতেন। আর একটি উদাহরণ দিলে আমার কথা অনেকটা পরিষ্কার হইবে। ইচ্ছাশক্তি বলে একটি কথা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে আছে; প্রাচীনগণ ইহা বুঝিতেন যে ইচ্ছানিবন্ধন জীবের মনের একটি অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই জন্যই ইচ্ছাকে শক্তি নাম দিয়াছেন। কিন্তু আজ-কালকার বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইচ্ছাশক্তি বলিলে জীবের ইচ্ছানিবন্ধন বাহ্যিক জড় পদার্থের উপর কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহাই ভাবিবেন। ইংরাজীর force কথার অর্থ এইরূপ—That which produces motion in matter is force. জড়ের গতির কারণের নাম foree। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকথিত শক্তি কথার অর্থ এইরূপ—জীবের সংসার চক্রে গতির কারণের নাম শক্তি। জীব নামধারী যে 'আমি' সেই আমার যে অবস্থান্তর হয় সেই পরিবর্ত্তনের কারণকেই হিন্দু শাস্ত্রে শক্তি বলা যায়। এই সমস্ত কারণে সাংখ্য-যোগীগণ বা তান্ত্রিক যোগীগণ কথিত শক্তি কথার পরিবর্ত্তে ইংরাজী force বা energy কথা ব্যবহার করিতে গেলে একটু বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

সাংখ্যশাস্ত্রে জড় প্রকৃতিকেই সৃষ্টির আদি কারণ বলিয়া কথিত থাকাতে অনেকে মনে করেন যে সাংখ্য শাস্ত্রে কথিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় কথা এবং জড়বাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে তথ্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহা একই প্রকারের। কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্রের মধ্যে একটু প্রবেশ করিয়া দেখিলে এইরূপ বিবেচনা ভুল বলিয়া বোধ হয়।

চেতন পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতির কার্য্য আরম্ভ হয়, সাংখ্যদর্শনের এই কথাটি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যতদিন না মানিবে ততদিন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞা-নিক তত্ত্বের সহিত সাংখ্য বৈজ্ঞনিক তত্ত্বের আদৌ ঐক্য হইবে না। সাংখ্যকারের মূল প্রকৃতি chaotic cosmic . matter নহে কেননা সাংখ্য-কারের মূল প্রকৃতি নিজে জড় পদার্থ হইলেও উহা চৈতন্যের আভায় আভান্বিত। মূল প্রকৃতি, প্রকৃতি-উপাধি-অভিমানী হিরণ্যগর্ভ পুরুষের দেহ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদদের chaotic cosmic matter নির্জ্জীব। আমাদের মূল প্রকৃতি জড় বটে কিন্তু সজীব। আমার সত্তানিবন্ধন আমার দেহকে যেমন সজীব বলা যায় কিন্তু বাস্তবিক দেহ জড় পদার্থ সেইরূপ

হিরণ্যগর্ভ পুরুষের সত্বানিবন্ধন প্রকৃতি সজীব পদার্থ। এই সজীব দেহ হইতেই নানাবিধ প্রজা প্রসূত হইয়াছে।

আজকালকার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণমতে এই জগত কাহারও সঙ্কল্প প্রসূত নহে কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্র আলোচনায় ইহা বুঝা যায় যে, এই যে বাহ্য-জগৎ ব্যক্তাবস্থায় দেখিতেছি, এই ব্যক্তাবস্থার বীজস্বরূপ অব্যক্ত জগৎ সেই আদি পুরুষের অন্তঃকরণে বিদ্যমান ছিল। সাখ্যদর্শন অনুসারে সৃষ্টির প্রারম্ভে আদি পুরুষের অন্তঃকরণে যে ভাবময় বীজ প্রকাশিত হয় প্রকৃতিই তাহার কারণ; চেতন পুরুষ নিজে ভাবেন না প্রকৃতিই তাঁহাকে ভাবায়। সাংখ্য দর্শনের এক কথায় পুরুষ নিজে কিছুই করেন না তিনি অপরিণামী কূটস্থ; যাহা কিছু কার্য্য এই জগতে হইতেছে তাহা প্রকৃতি হইতেই হইতেছে; কিন্তু নিত্য—পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নচেৎ প্রকৃতি কোন কার্য্য করিতে পারেনা এবং এই জন্যই প্রকৃতিকে জড় পদার্থ বলে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া সৃষ্টির প্রথমারম্ভা যখন ভাবা যায় তখন দেখি যে জড় পরমাণুর এক বিস্তৃত সমুদ্র চক্ষের সমক্ষে রহিয়াছে। পরমাণু সকল ঘুরিতেছে নড়িতেছে একটি অপরটিকে আঘাত করিতেছে, আবার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে,পরমাণু সমুদ্রে নানারূপ আবর্ত্ত ঘুরিতেছে। কিন্তু সাংখ্যদর্শন আলোচনা করিয়া যখন সেই সময়ের কথা ভাবা যায়, যে সময় মহৎতত্ব মূল প্রকৃতি হইতে প্রসূত হইয়া সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইল তখন দেখি, যে জ্যোতির্ম্ময় তেজপুঞ্জ মধ্যে চেতন পুরুষ একজন ধ্যান পরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন; প্রকৃতির গুণক্ষোভ হওয়ায় তাঁহার অন্তরে জ্ঞানময় ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে; সৃষ্টির প্রারম্ভে বুদ্ধিতত্ব প্রসূত হইয়া বুদ্ধিতত্বে লীন পুরুষকে ধ্যানে নিমগ্ন করানই তাহার শক্তির ক্রিয়া; এই ধ্যানস্থ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ বুদ্ধিতত্ব অহংকারতত্ব প্রসব করিল এবং এই রূপে সৃষ্টি কার্য্য চলিল।

এইরূপে যখনই একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা যায় তখনই ইহাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সাংখ্যকার সৃষ্টিবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎগণ সে দিক দিয়াও যান নাই।

সাংখ্যকার প্রকৃতিকে জড়পদার্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই জড় কথা আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের Inanimate Matter একার্থবোধক নহে। প্রকৃতি জড় হইলেও কখনও জীবন শূন্য নহে; পুরুষসংযোগ ব্যতীত প্রকৃতি প্রকাশ পায় না, পুরুষ প্রকৃতিকে বুঝিতে পারে কিন্তু প্রকৃতি নিজেকে বুঝিতে পারে না এই জন্যই প্রকৃতিকে জড় পদার্থ বলা যায়। কিন্তু যেমন একটি বৃক্ষ জড় পদার্থ হইলেও উহাকে সজীব বলা যায়, কেননা উহার জন্ম বর্দ্ধন অবস্থান্তর পরিণাম ইত্যাদি আছে, সেইরূপ প্রকৃতি নিত্যা হইলেও উহার ক্রমপরিণাম আছে এবং সেই ক্রমপরিণাম প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থ শক্তির বশে একটি অবশ্যম্ভাবী নিয়মানুযায়ী হইতেছে বলিয়া প্রকৃতিকে সজীব পদার্থ বলা যায়। তান্ত্রিক যোগীগণ জীবনী শক্তিকেই (কুণ্ডলিনী শক্তি) প্রকৃতির অন্তর্ব্বাহী শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। আভ্যন্তরিক শক্তির বশে যাহার উৎপত্তি বর্দ্ধন ও ক্রমপরিণাম দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই সজীব পদার্থ বলে এবং সেই আভ্যন্তরিক শক্তির নাম জীবনী শক্তি। এই অর্থে প্রকৃতিই সজীব পদার্থ কিন্তু পুরুষের জীবন নাই এবং সেই জন্য মরণও নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের Inanimate Universeকে প্রকৃতি বলা যায় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জীবভূতা প্রকৃতিকেই পরা প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। গীতা ৭।৫। ইহা হইতে বুঝা যায় যে কেবল মাত্র জীবনী শক্তিই মূল প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থা শক্তি। ইয়ুরোপে এক সময় প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা ছিল সেই সময়কার দার্শনিকগণ Animus mundi (The Universal life) অর্থে যাহা বুঝিতেন আমাদের প্রকৃতি কথারও তাহাই অর্থ। এই বিশ্বব্যাপী জীবনী শক্তি হইতে প্রথমে যে জীব উৎপন্ন হন তিনি বা তাঁহারা বুদ্ধিমান্, সংশয়রহিত বুদ্ধিরিন্দ্রিয় ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, এই কথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যবে প্রমাণ করিতে পারিবে তবেই তাঁহাদের বিজ্ঞান সাংখ্যের বিজ্ঞানের সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

প্লেটোর দর্শন শাস্ত্রের কথাসকল আমাদের দর্শন শাস্ত্রের কথাসকল অনেকটা এক রকম। প্লেটো বলেন যে বাহ্য জগতে যে সকল ঘটনা (pheno-

mena) দেখা যায় ইহারা ভাবময় জগতের ভাব সমুহ (Ideas) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এই ভাবসমষ্টিই সাংখ্য দর্শনের বুদ্ধিতত্ব। যে মূল ভাব সকল* হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে সেই ভাব সমুহের সমষ্টি ভাবের দ্রষ্টা যে পুরুষ, তাঁহাকেই হিন্দুগণ হিরণ্যগর্ভ, বিরাট পুরুষ বা ঈশ্বর নামে অভিহিত করেন। (এই পুরুষ কথায় হস্তপদমস্তক বিশিষ্ট মনুষ্য বলিয়া যেন কেহ না বুঝেন)।

চেতন পুরুষের সম্পর্ক ছাড়িয়া, জড় জগৎকে যিনি ভাবনা করিবেন তিনি সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি কথার অর্থ আদৌ বুঝিতে পারিবেন না। এই কথাটি মনে রাখিয়া তবে প্রকৃতির সত্ত্ব রজ ও তম গুণের প্রকৃত অর্থ সনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

প্রকৃতির সহিত চেতন পুরুষের যে সম্বন্ধ সেইটি আলোচনা করিয়া সত্ত্ব রজ ও তম গুণ কথাটির অর্থ বুঝিতে হইবে।

সত্ত্বং রজ স্তম ই'তি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকং অনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্ব দেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ৯

---

* এই মূল ভাব সকলই বেদবাক্য; যে পুরুষ যে ভাবের স্রষ্টা এবং প্রকাশক তিনি সেই বাক্যের ঋষি; এবং সেই বাক্যনিহিত প্রকৃতির যে যে শক্তি হইতে বাহ্য জগতীয় কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয় সেই শক্তির নাম দৈবশক্তি। বেদ কথার প্রকৃত অর্থ The book of universal life; এই স্বাভাবিক গ্রন্থের কতক কতক আমরা যাহারে বেদশাস্ত্র বলি তাহার মধ্যে আছে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃসত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিবারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহএব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

শ্রীভগবদ্গীতা ১৪ অধ্যায়।

সত্ত্ব রজ ও তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহারই অব্যয় দেহীকে (চেতন আত্মাকে) দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

তন্মধ্যে সত্ত্ব গুণপ্রকাশক এবং অনাময়; নির্ম্মলতা হেতু এই সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখসঙ্গে এবং জ্ঞানসঙ্গে বদ্ধ করে।

রজগুণ রাগাত্মক এবং তৃষ্ণা সাঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত, এই গুণ দেহীকে কর্ম্ম সঙ্গে বদ্ধ করে।

তমগুণকে অজ্ঞানজ বলিয়া জানিও, ইহা দেহী সকলকে মোহে মুগ্ধ করে এবং প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রায় আবদ্ধ করে।

সত্ত্ব দেহীগণকে সুখে আসক্ত করে. রজঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, এবং জ্ঞান আবরণ করিয়া তমগুণ প্রমাদের বশীভূত করে। সত্ত্বগুণ রজ ও তমকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে এবং তমগুণ সত্ত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে।

যখন দেহের সর্ব্ব দ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ উপস্থিত হয় তখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বুঝিও

রজগুণ বৃদ্ধি পাইলে লোভ প্রবৃত্তি কর্ম্মারম্ভ স্পৃহা ও অশান্তির উদয় হয় তমগুণ বৃদ্ধি পাইলে বিবেক ভ্রংশ অপ্রবৃত্তি প্রমাদ ও মোহ উপস্থিত হয়।

গীতা হইতে যে কথা গুলি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যে সুখ ও জ্ঞান প্রদা শক্তির নাম সত্ত্বগুণ, যে শক্তি নিবন্ধন পুরুষের চিত্তে

চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া তাঁহার কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে তাহারই নাম রজোগুণ এবং যে জন্য মোহ উপস্থিত হইয়া আলস্যের উদয় হয় তাহারই নাম তমো-গুণ। জীবজগতে জীবনী শক্তি তিন প্রকার রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পায়; যেখানে সুখের ও জ্ঞানের প্রাধান্য তাহাই সাত্ত্বিক জীবন, যেখানে কর্ম্মে প্রবৃত্তির প্রাধান্য তাহাই রাজসিক জীবন এবং যেখানে আলস্য এবং জড়তার প্রাধান্য তাহাই তামসিক জীবন। স্পেন্সর ডারুইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জীবের ক্রমাভিব্যক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া, জীবনী শক্তির আকার দেখিতে পাইয়াছেন তাহাই বোধ হয় প্রকৃতির রাজসিক আকার। এই পণ্ডিতগণ বলেন যে এই জীব জগতে জীবনের জন্য একটি যুদ্ধ অনবরত চলিতেছে এবং ইহা হইতেই জীবের ক্রমবিকাশ হইতেছে (Strugle for existence and Survival of the fittest)। জীবনের জন্য এই যুদ্ধ যেখানে প্রবর্ত্তিত হয় সেইখানে প্রকৃতির রজোগুণের লীলা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

প্রকৃতি কথাটির অর্থ এই—প্রকরোতি ইতি প্রকৃতিঃ। প্রকার যিনি করেন তাঁহারই নাম প্রকৃতি। এই 'প্রকার' কথাটিকে ইংরাজীতে বলিতে গেলে 'variation' বলা যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেহ প্রসঙ্গ করাই প্রকৃতির কাজ। আবার এই জগতে যত প্রকার জীবদেহ প্রকৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে সকল গুলির মধ্যদিয়া এক গাছি জীবন সূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জীবন সূত্রই (Thread of life) সূত্রাত্মা মুলপ্রকৃতি। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এই সূত্র চক্রাকার অর্থাৎ জীবের প্রথম আকার (সৃষ্টির প্রারম্ভে) এবং শেষ আকার (প্রলয়ের অবস্থায়) এক প্রকার, কিন্তু এ সকল সত্য পাশ্চাত্য জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এখন ও বুঝিতে পারেন নাই।

দেহিনোস্মিন্ যথা দেহে কৌমার যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র নমুহ্যতি॥ গীতা

দেহীর (পুরুষের) দেহে কৌমার যৌবন ও জরাদশা যেমন নিশ্চয় সেইরূপ দেহীর দেহান্তরপ্রাপ্তিও নিশ্চয়; ধীর ব্যক্তি এই বুঝিয়া কখনও মোহগ্রস্ত হন না। সাংখ্য দর্শনের এই কথা যাঁহারা না মানেন তাঁহাদের সৃষ্টিসম্বন্ধীয় কাল্পনিক কথা সকল (Sherry) সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত

আদৌ মিলিতে পারে না। আমি পুরুষ, আমি অমর—আমি এখন যেমন আমার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি, সৃষ্টির প্রারম্ভেও সেইরূপ আমার অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছি এবং পরেও করিব; আমি এখন আছি, পূর্ব্বেও ছিলাম, পরেও থাকিব; সুতরাং সাংখ্য দর্শনানুযায়ী সৃষ্টির কথা ভাবিতে গেলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি কি অবস্থায় ছিলাম তাহাই ভাবিয়া থাকি, সেই সময় আমি বাহ্য জগতের সত্বা কিরূপ অনুভব করিতাম তাহাই ভাবিয়া প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এ ধরণের ভাবনার দিক দিয়াও যান না সুতরাং তাঁহাদের কথা দিয়া সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতিকে জড় বলেন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও প্রকৃতিকে জড় বলে, ইহা হইতেই যাঁহারা বুঝেন যে সাংখ্য দর্শনের কথা আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা একই, তাঁহারা, আমার বোধ হয়, ভুল বুঝিয়াছেন। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতিকে জড় বলা হইয়াছে বটে কিন্তু চেতন পুরুষ সদাই যে সেই জড়ে অধিষ্ঠিত আছেন এ কথাটা যেন সকলেরই স্মরণ থাকে। আসল কথায় এই জগৎ জড় পদার্থ নহে এই জগৎ চৈতন্যময়; কিন্তু চেতন পুরুষ প্রকৃতির নানাবিধ পরিণামে বর্ত্তমান থাকিয়াও নিজে অপরিণামী, এই জন্য প্রকৃতির সহিত চেতন পুরুষের একটি ভেদ আছে। প্রকৃতি যে নানাবিধ রূপ ধারণ করে তাহা পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্য, তাহার নিজের তাহাতে কোন উপকার নাই; প্রকৃতির কার্য্য পরার্থ এই জন্যই প্রকৃতিকে জড়রূপ এবং চেতন পুরুষ হইতে ভিন্ন ভাবে দেখিতে সাংখ্য দর্শনে উপদেশ দেয়।

আমি আজি যে দেহ ধারণ করিয়া আমার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি, এই দেহ জীর্ণ হইয়া যখন নষ্ট হইয়া যাইবে তখন আমি অন্য এক দেহ ধারণ করিয়া আমার অস্তিত্ব অনুভব করিতে থাকিব, তখন আমার এই দেহ যে আমা হইতে ভিন্ন পদার্থ তাহা বুঝিতে হইবে; আবার সেই দেহ নষ্ট হইয়া যখন অন্য দেহ ধারণ করিব তখন সেই দেহ ও আমা ছাড়া তাহা বুঝিতে হইবে। সংসারচক্রে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়া আমি এইরূপ এক দেহ হইতে দেহান্তরে, আবার সেই দেহ হইতে দেহান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছি, এইরূপ পরিভ্রমণকে শাস্ত্রে যোনীভ্রমণ নাম দেওয়া আছে।

আমার যেখান হইতে উৎপত্তি, ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সেই যোনী প্রাপ্ত হইব, তখন আমার সংসার চক্রে এক পাক ঘুরা হইবে। আমি প্রকৃতির পরিণাম-চক্রের মধ্যে পড়িয়া যে নানাবিধ আকারে অবস্থিতি করি সেই সমস্ত 'আকার' শ্রেণী যেন এক গাছি মালার ন্যায়; এক গাছি জীবনসূত্রে পরস্পর গাঁথা আছে; এই সূতা গাছটির রং কোথাও সাদা, কোথাও রাঙ্গা, কোথাও কাল; ইহারাই প্রকৃতির সত্ত্ব রজ ও তম গুণ। যে দেহ আশ্রয় করিলে আমি আমাকে সদাই সুখী জ্ঞান করি এবং জ্ঞানময় ভাব সকল অন্তরে প্রকাশ পাইয়া থাকে সেই দেহের জীবনের নামই সত্ত্বগুণ; রজ ও তম গুণের অর্থও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। এই মনুষ্য দেহের মধ্যে আমি যখন মস্তিষ্কে অবস্থান করি (অর্থাৎ মস্তিষ্ক ভাগে মনঃসংযোগ করি) তখন আমার অন্তরে ভাব সকল প্রকাশ পাইতে থাকে এই জন্য মস্তিষ্কে সত্ত্বাধিক্য আছে বলা যায়। যখন মধ্যভাগে মনঃসংযোগ করা যায় তখন হৃদয়ের চাঞ্চল্য বশতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে এ জন্য দেহের মধ্যভাগে রাজসিক শক্তির আধিক্য আছে বলা যায়। যখন অধোভাগে চিত্ত ধারণা করা যায় তখন আলস্য নিদ্রা উপস্থিত হয় এই জন্য অধোভাগে তম শক্তির প্রাধান্য আছে বলা যায়। শাস্ত্রে সত্ত্বং উর্দ্ধবিশালা, রজঃ মধ্যবিশালা এবং তমো অধো-বিশালা এইরূপ যে সমস্ত কথা আছে সেই গুলির অর্থ পূর্ব্বকথিত কথা হইতে বুঝা যাইবে। ঐ কথা গুলির অন্য কোনরূপ অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না।—[ক্রমশঃ]

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

তারা।

নীরব নিথর আঁধার সাগরে
রচিয়ে আনন্দ-মেলা,
কে তোরা রূপসী, জেগে সারা নিশি,
আকাশে করিস্ খেলা?

আকাশের কোলে কতই হাসিস্—
কতই গাহিস্ গান,
আঁধারের কোলে ফুটিয়ে উঠিস্—
আঁধারে জুড়াস্ প্রাণ।
চাঁদের জোছনা নয়নে লাগিলে
মু'খানি করিয়ে নত,
মুদি আঁখি-পাতা সুনীল শয্যায়,
ঘুমায়ে পড়িস্ কত।
অনন্ত আকাশে নিশির কুসুম—
নিশির শিশিরে স্নান,
সারা নিশি জেগে আনন্দে করিস্
নিশির শিশির পান।
উজল প্রখর তপন - কিরণ
নয়নে সহেনি ব'লে,
দিবস আসিলে ঘুমায়ে পড়িস্
সুনীল নভের কোলে।
অনন্ত তোদের সুখের প্রদেশে
নড়ে না একটি শাখী,
সুখের স্বপন ভাঙ্গিতে তোদের
ডাকে না একটি পাখী।
অতি মৃদু বায় তরু-কোলে মৃদু
হেলেনা একটি লতা,
কানে কানে সেথা জনপ্রাণী এক
কহে না একটি কথা।
তোদের সুদূর সুনীল রাজ্যেতে
অবনীর কলরব,
পশিবার তরে বাসনা মাত্রেতে
ম'রে ঝ'রে পড়ে সব।

এ হেন বিজনে শয়ন রচিস্
ঘুমাতে দিনের বেলা,
স্বপনের মাঝে প্রাণে জাগে তবু
আঁধারের সনে খেলা।
সন্ধ্যার আরতি পবন বহিলে,
প্রদোষে বাজিলে বীণা,
আঁখিটি খুলিয়ে চাহিয়ে দেখিস্
তপন ডুবেছে কি না।
একে একে শেষে মেলি' কোটি আঁখি—
আঁধারে পাইয়ে বল,
ছুটোছুটি ক'রে আসিয়ে সাজাস্
সুনীল গগন - তল।
অনন্ত প্রাণের অনন্ত উছ্বাসে
আঁধারে পুরিয়ে তান,
সাগরের কূলে শয়ন রচিয়ে
অনন্তে গাহিস্ গান।
অনন্ত সঙ্গীত সুধার ক্ষরণে
অধর নাহিক নড়ে,
অনিমিখ ওই ভাবের আঁখিতে
পলক নাহিক পড়ে।
নীরবতা সেথা কান পেতে যেন
শুনে সে সঙ্গীত ব'সে,
স্তুতিবাদ - ছলে নীরবতা তা'র
মুখ হ'তে পড়ে খ'সে।
তবু সে সঙ্গীত অনন্ত অসীম
দিগন্তের কোলে ফুটে,
ভেদিয়া অনন্ত আঁধারের স্তর
অসীম অনন্তে ছুটে।

সংসারের জ্বালা অসীমে বিলা'তে
আকাশের পানে চাই,
আঁধারে তোদের সে সঙ্গীত শুনি'
কি-যেন-কি হ'য়ে যাই
আঁধারের কান্না ভেদিয়ে যে আমি
এসেছি আঁধার হ'তে,
সারা দিন রাত গেয়ে গেয়ে ভেসে
চ'লেছি আঁধার স্রোতে।
কত নদ নদী— দেশ দেশান্তর—
অচল সমুদ্র-পারে,
পৃথিবী ছাড়িয়ে সুদূর অসীমে
পৃথিবীর কোন্ ধারে—
জানিনে ত কিছু সে আবার কোন্
অজানা আঁধার দেশে,
ভাসিয়ে ভাসিয়ে গাহিয়ে গাহিয়ে
গিয়ে যে ঠেকিব শেষে।
জীবনের পথে খুঁজি আমি তাই
একটি সঙ্গীত-সাথী—
অনন্ত আঁধারে পথ দেখাইতে
একটু আলোক-ভাতি।
তোরা সে আমার আলোকের মালা—
আঁধারের ধ্যানে রত,
নিরখি তোদের প্রাণে আমি তাই
পাই সে আনন্দ কত।
আয় রে আমার সঙ্গীতের সাথী,
আমারে নে হোথা তুলে,
সংসারের মায়া— অসার বাসনা—
সব যাই আমি ভুলে।

ও অনন্ত ধ্যান— অনন্ত সমাধি—
ঢেলে দে আমার প্রাণে,
নীল নভ-কোলে বিভোর হইয়ে
পরাণ মাতা'ব গানে!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

পত্র।

ভাই, এ মূল্যহীন দুর্ব্বল দুদিনের নবীন জীবনে গোধূলি আসিয়াছে! জীবনের চারিদিকই ক্রমে ঘোর অন্ধকার হইয়া আসিতেছে! জীবন-পথে আজ আর একটিও আলো নাই—কেহ নাই! সব নীরব! ভক্তি—প্রেম—দয়া—স্নেহ—বন্ধুতা—তাহারা আজ কোথায়? হায়, আজ তাহারা—যাহারা এক সময়ে আমার জীবন ছিল—আমার এই স্ফুটিতোন্মুখ জীবন-দৃশ্যের নেপথ্যে দাঁড়াইয়া অট্টহাসি হাসিতেছে। তাহারা বলিয়া গেল জীবন—প্রহসন! তাহারা কি তবে এ প্রহসনের কেহ নয়? কেবল দর্শক মাত্র?—তবে জীবন কি একটা খেলা? শিশুর হাসি কান্না?—ফাঁকি? ভাই, সমস্ত ফাঁকি? এত সব কেবল দুটি দিনের? হায় হায়! নিমন্ত্রণ রক্ষামাত্র? অনন্ত পথ-যাত্রায় দুদণ্ডের বিশ্রাম? সেই—চির জিজ্ঞাসা—তাঁহার—কোথায় তিনি?—অর্থ শূন্য আজ্ঞাপালন? ফুলের ফোটা ছাড়া আর কিছুই নহে? দেখ মানুষ মরিবেই। আমিও মরিব। কিন্তু জীবনের অস্তিত্ব কি কিছুই থাকিবে না? পূর্ব্ব জন্মের আত্মত্যাগের—কাহার জন্য?—ফল স্বরূপ এ সাধের মনুষ্য-জন্মের চির আত্মবিস্মৃত আগমনময় এই জীবন-ভালবাসার কি কোন অস্তিত্ব নাই? আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের আলো পাইয়া—আভ্যন্তরীণ জীবন-একতা-সূত্রের অদৃশ্য নিয়মে—যে ফুল ফুটিয়াছে সেই ফুলের প্রাণের মধ্যে কি আমার জীবনের বিলুপ্ত অস্তিত্ব বীজের কার্য্য চলিতেছে না? আমার জীবন-বৃক্ষের-মৃত্যু-বারি পাইয়া, যে একটি বিভিন্ন বৃক্ষের জন্ম হইল, তাহার সেই সদ্য ফুলের গন্ধ কি আমি হইব না? তাহার সেই নবীন তরুণ স্বপ্নময় মধুর ছায়ার উপর বসিয়া কি কেহ আমার এই

আধ ফোটা জীবনের কেমন এক বিষাদময় বাতাস পাইবে না? তাহার জীবন-গৃহে ঢুকিয়া কেহ কি আমার ছবি দেখিতে পাইবে না? তাহাকে দেখিয়া কি, আমার পুরাতন কাহিনী—জীবননাট্যক—কাহার হৃদয়ের উপর দিয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাসিয়া যাইবে না? সে মানুষ—শূন্যে সময়ে সময়ে কোথাকার কোন্ অদৃশ্য পথ দিয়া আমার বাঁশীরব আসিয়া বাজিয়া যাইবে না? তাহাকে আকুল করিবে না? সুখ দুঃখের সমষ্টির সেই যে মাটির দেহ-পিঞ্জর, তাহার অন্তঃপুরে কি—আমাকে খুঁজিবার জন্য—হাহাকার রবকারী কি এক অভাব-পাখী চিরদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া বেড়াইবে না? বল না ভাই, তুমি কি জান আজ আমাকে এ কথা কে বুঝাইবে? কে বুঝাইলে আমার বিশ্বাস হইবে? কোথায় বসিলে—এ জগতের কোথায় বসিলে—এ কথার সঠিক উত্তর শুনিতে পাইব? এ জগতে ইহার উত্তর কি নাই? মনুষ্যে ইহার উত্তর কি জানে না?

দেখ, যখন প্রথম জগৎ-মহামেলার ভিতর প্রবেশ করিলাম, তখন কত আনন্দ। সুখ আর ধরে না! দেখিলাম, আমার আশার সুবর্ণ বৃক্ষের চারিদিকে সুখের হীরক-ফুল স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত! তোমার জগতের আকাশে এক চাঁদ—সেই এক চাঁদে জগৎ পূর্ণ আলোকিত! আর আমার—আকাশে শত শত চাঁদ। আমার আশে পাশে চাঁদ, মাথায় চাঁদ, চাঁদে আমি বেষ্টিত। আমার হৃদয়ের ভিতর চাঁদের অভিনয়! তখন আমি ও চাঁদ! আ মরি মরি—সে কি পুষ্পময়—চাঁদময়—নির্ম্মল বিভোর সুখ! তখন আমার সে জীবন—সে নিদ্রা—সে স্বপ্ন সকলেই চাঁদময়। সেই স্বপ্ন-মাখা ঘুম-ঘোরময় গীতি-পূর্ণ শত চাঁদময় জীবন ইহ জন্মে কি কখন ভুলিতে পারিব? সে কি ভোলা যায়? কোথাকার কেমন এক প্রাণ উদাসী স্মৃতি জাগান বাঁশী সদাই কানে বাজিত! শুনিতাম, যেন আমার আপনার কে কোন্ স্বর্গের দুয়ার খুলিয়া মধুর অধরের মধুর হাসির খেলাতে আমাকে ডাকিতেছে। যেন কি এক রাগিণীময় স্বর্গীয় কাব্যের জন্মান্তরীণ অস্পষ্ট স্মৃতি-সমীরণ আনিত। যেন আমার জীবন-বসন্তের সাধের মালঞ্চের সৌরভময় সৈকত দিয়া কি একটি স্বপ্ন-প্রবাহিনী, অতি ধীরে ধীরে দূরাগত সঙ্গীতের মত বহিয়া যাইত! আর এক সমীরণ—সে সমীরণের কথা আর কি বলিব—

বোধ হইত যেন মন্দাকিনীর সেই পরিমল বাহী কল্পনাময় কাব্য-তীর হইতে ষোড়শী রূপসী সুর-বালারা কি এক স্বর্গীয় গান গাহিতে গাহিতে আমাকে বাতাস করিতেছে!

ভাই, আমার সেই নবনীত—জ্যোৎস্নাময়—স্বপ্নময় অতি সুখের বাল্য-কালের কাহিনী তোমার মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি, দুজনের গলাগলি করিয়া আমাদের সেই—জীবনের শেষ ভাগের ন্যায়—মৃদুগামিনী শীর্ণা-স্বরস্বতী-তীরে ভ্রমণ? মনে পড়ে কি, সেই অনন্যমনা হইয়া বিলুপ্তপ্রায় স্বপ্নসম অতীত-কথা সব আলোচনা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি—এমন কত —অতিবাহন? সেই এক দিন—সেই চারিদিক ঘোর ঘন অন্ধকার করিয়া মেঘ আসিয়া ভীষণ বজ্রনাদে পৃথিবী কম্পিত করিয়া তুলিতেছে—যেন জগতে মহা প্রলয় উপস্থিত—তখন আমরা দুটি এক অতি বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে—মাঠ জন-প্রাণী-শূন্য—সেই সময়ে প্রকৃতির কি দৌরাত্ম্য! প্রকৃতির যত শক্তি তখন আমাদের উপর। যেন আমরা তাহার প্রতিবাদী। প্রকৃতি তাহার ঝড়-মেঘ বিদ্যুৎ-বৃষ্টি বজ্রাঘাত লইয়া আমাদের রসাতলে দিবার পরামর্শ করিল।—তখন সেই প্রকৃতির অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সন্দর্শনের সময় আমাদের—মনে আছে কি তোমার?—কি আনন্দ? প্রকৃতির সহিত কি মেশামিশি? মাথার উপর অনন্ত বারি-ধারা—কিন্তু আমাদের কি মাতামাতি কি উচ্চ হাস্য-লহরী? যেন মার কোল পাইয়া শিশু মাতিয়া উঠিল! আর প্রকৃতির শক্তির কাছে আমরা ক্ষুদ্র—কত ক্ষুদ্র! কার্য্য জগদ্ব্যাপী! মহতের কোন্ কার্য্য কবে ঢাকা পড়িয়াছে? প্রাকৃতিক নিয়মে যে কার্য্য-ফুল ফুটে তাহার গন্ধে জগৎ আমোদিত হইবেই! তাহা তোমার নহে, সমস্ত জগতের। তুমি তাহার কর্ম্মীমাত্র।—চাবি। মহৎ ব্যক্তি, প্রকৃতির কার্য্যের সাকার মূর্ত্তি। আর সেই বসন্ত লতা? তার কথা কিছু মনে পড়ে কি? কে সে? সৌন্দর্য্য। জগৎ তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্য্যের লয়—কোকিলের স্বর—সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার—সুনীল অনন্ত আকাশ—কাব্যের কল্পনা। সেই—সেই বসন্তের বসন্তলতা যখন ফুলের গন্ধের মতন—নিশীথ-জ্যোৎস্নায় বেহাগ সুরের ন্যায়, আমার অকূল হৃদয়-সাগরে ভাসিয়া বেড়াইত, তখন আমি তাহাকে গ্রামের কুলবধূদিগের চোকের ভিতর দিয়া দেখিতে পাইতাম।

দেখিতে-দেখিতে দেখিতাম। দেখিয়া—তাহাকে দেখিয়া কখন আমার দেখা ফুরাইতে পারি নাই। অনন্তকাল ধরিয়া দেখিয়াও তাহাকে ফুরাইতে পারিব কি? একদিন যখন সে বৃষ্টিতে ভিজিতে—ভিজিতে—ভিজিতে—ভিজিতে আমার সেই ক্ষুদ্র গৃহের জানালার সম্মুখ দিয়া—পঞ্চতালে—লজ্জায় অস্ফুট গোলাপের মত চলিয়া যাইতেছিল, তখন মনে হইল যেন একটি সৌন্দর্য্যের পুঁতুল ভিজিয়া গলিয়া—উছলিয়া—জল হইয়া পড়িতে—পড়িতে যা—ই—তে—ছে! বুঝি যেন সব সৌন্দর্য্য একেবারে ধুইয়া গেল!! প্রকৃতি যেন এত সৌন্দর্য্য চোকের উপর আর দেখিতে পারিল না।

আর তাহার সেই গৃহ, যে গৃহে বসন্ত শয্যা যাইত, সে গৃহ যেন আমার একটি স্বপ্ন—মায়াজাত ভ্রান্তি। জাগিয়া কখন আমার সেই এ জগতের অমরাবতী—সেই কি-জানি কি—শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারি নাই। অকস্মাৎ একদিন—কবে কে জানে—দেখিলাম কল্পনা-রূপিণী বসন্তলতা, শ্বেত শয্যার উপর অনন্ত কেশরাশি ছড়াইয়া—ঘন কেশের কাল চাদর পাতিয়া—তাহার চারিদিকে হাসির একরাশি জ্যোৎস্না ফুটাইয়া নিদ্রিত। সব এলোথেলো। মরি কি শোভা! সে অতুল শোভার তুলনা কি দিব। দেখিলাম, যেন অন্ধকার নিশীথের ভীম মেঘের কোলে একখানি বিদ্যুৎ। যেন কৃষ্ণবর্ণ রমণীর মুখে সুখের বিভোর হাসি-জ্যোৎস্না। যেন অন্ধকার গৃহের হৃদয়ে দূরাগত আলোর কিরণ-সম্পাত। আবার শোভার উপর শোভা!—সেই অনাবৃত চিরবসন্তময় গন্ধময় স্বপ্নময় হৃদয়-মুকুলের উপর দুইখানি সুগোল জ্যোৎস্নাময় হাত, পরস্পরকে জড়াইয়া—এক হইয়া নিদ্রামগ্ন। বিদ্যুতের উপর যেন পারিজাতের মালা—প্রকৃতির উপর কবি-কল্পনা—সৃষ্টি-কৌশল—জীবন সরোবরে—কবিতাপদ্ম—নিশীথ জ্যোৎস্নাকাশে অনন্ত জীবনের অদৃষ্ট আভাস অসীম-সসীমের চেনাচিনি—সাধাসাধি।

এইরূপে তখন জীবনের চারিদিকে নিশি দিন কত ফুল ফুটিত—কত সোহাগের হাসি ছড়াছড়ি যাইত—কত কোলাহল জমা হইত। Shelley—Keats—Swinburne—Tennyson—Ruskin—Goethe—বঙ্কিম প্রভৃতি সেই কবিগণ,—আমার চোখের সম্মুখে তাহাদের অপূর্ব্ব সৃষ্টির কল্পনাময় নীরব মধুর আদর্শ মানস-পুত্তলি ধরিয়া এবং আলো-অন্ধকার—সুখ দুঃখ—

ভয়-ভালবাসা—জন্ম-মৃত্যুর কেমন সেই স্বপ্নমাখা—কাহার কমনীয় মুখ খানির মতন—এক কি গান আঁকিয়া দিয়া নৃত্য করিত। তখন কত কি ভাল বাসিতাম। তখন নিদ্রিতা বালিকার অস্ফুট হাসিমাখা মুখের সৌন্দর্য্য বড় ভাল বাসিতাম। কখন জ্যোৎস্নালোকে একাকী ছাদের উপর বসিয়া আমার পুরাণ স্মৃতি-পুস্তক খানি খুলিয়া—নিশার প্রথম সময়কার মত হৃদয় লইয়া—নীরবে কত কালের নূতন-পুরাতন কাহিনী গুলি পড়িতাম। তখন নিশীথ-অন্ধকারে নদী-সৈকতে দাঁড়াইয়া কল্লোলিনীর মৃদু তরঙ্গ-লীলার মধ্যে কেমন গান শুনিতাম। সে গানে আরও কিছু শুনিতাম। শুনিতাম যেন সে গান কাহার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি! তখন কাননে লতা-বধূদের ঘোম্‌টা খুলিয়া দিয়া লুকাইতাম—কত রহস্য করিতাম—কত লুকাচুরী খেলিতাম। সেই খেলাতেই আমার দিন কাটিয়া যাইত। তখন ঐ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র এক একটি অপূর্ব্ব নক্ষত্রের উজ্জ্বল চোখের উপর চাহিয়া—চাহিয়া কত নিশি জাগিয়া থাকিতাম। তখন কুসুমের হাসির দর্পণের মধ্যে স্বর্গের ছায়া দেখিতে পাইতাম। তখন আকাশের চাঁদকে জগতের সমস্ত রমণীর—নিদ্রিতা রমণীর স্বপ্নজাত হাসির স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের সমবায় বলিয়া জানিতাম। যেন ঘুমন্ত শশীমুখীদের হাসির সৌন্দর্য্য অণুগুলি একত্রিত হইয়া হইয়া চাঁদ আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন আমি স্বয়ং একটি বাঁশী ছিলাম। সদাই বাজিতাম। কে যেন আমাকে—আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অমানুষী কি এক কবিত্বময় ফুঁ দিয়া বাজাইত। তখন ইচ্ছা করিয়া—তাহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াও—তাহা থামাইতে পারিতাম না।

তাহার পর, কি?—একদিন আচম্বিতে কোথাকার কোন্ এক ঘটনা-ফলের অদৃষ্ট আকাশ হইতে কি এক ঝড় আসিয়া এ জীবন-কাননের কত সাধের বৃক্ষের বিচিত্র আশা কুসুমগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া, বৃক্ষগুলি ভাঙ্গিয়া—উন্মূলিত করিয়া—চারিদিক একাকার—সমভূমি—শূন্য করিয়া দিয়া,—কালের অক্ষয় পৃষ্ঠে তাহার একটা চিহ্ন রাখিয়া—চলিয়া গেল। সেই অবধি আমার, এই নবীন জীবনে, যাতনার ঘরে বাস! এ স্রোত ফিরাইবার নহে। অদৃষ্টের অদম্য স্রোত কে কবে ফিরাইতে পারিয়াছে? জীবন-ক্ষেত্রে কার্য্য-বৃক্ষের ফল দু'টি। একটি সু, অপরটি কু। দু'টি বিপরীত

শক্তিজাত। এক শক্তির ফল নহে। যাহার যেমন কার্য্য, তাহার ফলও সেইরূপ। আমি করিব কুকার্য্য, কিন্তু তাহার ফল সু কি করিয়া আশা করিব? কার্য্যের ফল অবশ্যম্ভাবী। তা' তুমি যেরূপ কার্য্যই কর না কেন। আমিও আমার যে সাধের খেলা-ঘর একবার ভাঙ্গিয়া স্নেহের—প্রেমের পুত্তলিগুলি বিসর্জ্জন দিয়াছি, তাহা আর আজ কোথায় পাইব? আর কি তাহা গড়া যায়? আমার গড়িবার প্রাণ-বিসর্জ্জী ইচ্ছা থাকিলেও সে ভাঙ্গা জোড়া লাগে কৈ? তাহারা আসে কৈ? কৈ, তাহার নয়ন-জ্যোৎস্না ত আর আমার এ গৃহে আসে না? তাহার হাসির ফুল-হার আর ত আমার নয়ন-নদীতে ভাসে না? আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দ্বীপের চারিদিকে ত আর তাহার হৃদয়-তরঙ্গ-লীলা দেখিতে পাই না? যে অসংখ্য সোহাগ-ফুল আমার গৃহের আশে পাশে প্রতিদিন ফুটিত, এখন কেন আর ফোটে না? এত চেষ্টা করি, তবু বাঁশী বাজে না কেন? জগতের পথে সকলেই চলিয়াছে, আমি শুধু কেন দাঁড়াইয়া? কি হইল ভাই? এত যত্ন, এত সাধ, এত চিন্তা, এত ভালবাসা কি সব মিথ্যা? স্রোত কি ফিরে না? যাহা একবার অন্ধকারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা কি আর এ জীবনে—এ জীবনের সমস্ত আলো দিয়া সারিতে পারিব না? এ জগতের ত চারিদিকে গড়িতেছে—ভাঙ্গিতেছে, আবার ভাঙ্গিতেছে—গড়িতেছে। ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে আবার ফুটিতেছে। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে আবার উদিত হইতেছে। বসন্ত যাইতেছে আবার আসিতেছে। একটার পর আর একটা। এইরূপে জগতের সকল জিনিসই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু আমার এ মুহূর্ত্তের জীবন এক সূত্রবাহী কেন? যে নিয়মে ফুল ফুটিতেছে, পাখী ডাকিতেছে, চাঁদ ডুবিতেছে, সূর্য্য দেখা দিতেছে, নদী বহিয়া চলিয়াছে, সে নিয়মে কি আমি ফুটি নাই? আমি কি জগৎ-নিয়মের বাহিরে? আমার চারিদিক নীরব—শূন্য কেন? আমার জীবন-ফুল শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে কেন? এ জগতে সৎ পদার্থের ধ্বংস নাই। সৎ পদার্থ, চির-বর্দ্ধনশীল। জগতের ফুল আজিও ফুটিতেছে। জগতের যাহা অঙ্গ, তাহার তিরোধান হয় কি করিয়া? সে যে জগৎ—জগৎ জীবনের অংশ। কিন্তু আমার জগৎ তবে মরিয়া যাইতেছে কেন? হায় রে! মনুষ্য-জগতে যাহা একবার ভাঙ্গিয়া

যায় আর কি তাহার পুনর্ম্মিলন হয় না! মনুষ্য এত ক্ষুদ্র! এত দুর্ব্বল! এত মনুষ্য!! জগৎ, তাহার কল্যকার কথা ভুলিয়া আজ অনন্তের পথে অগ্রসর, আর মানুষ সে কথা না ভুলিয়া তাহার সঙ্কীর্ণতার মধ্যে চির-আবদ্ধ! মানুষ, মানুষের কারাগার! সময় বিশেষে মৃত্যুও আবার! এই মনুষ্যের এত গৌরব?

এক ত জীবনই কতকগুলি অভাবের সমষ্টি। তার উপর আবার ইহা মনুষ্য-কারাগারে আবদ্ধ। এই মনুষ্য-কারাগারে দাস-জীবন লইয়া আর ক'দিন বাঁচিব বল? অভাবের উপর অভাব। জীবন-অভাবই সব পূর্ণ হয় না। আবার কি না মানুষ-অভাবে ঘিরেছে! এত ভার, এ ক্ষুদ্র জীবনে সহিবে কেন বল? ইহা পীড়ন—অত্যাচার—মৃত্যু! হায়! এ দেবতা-দুল্লভ—মল্লিকার সৌরভের মত—কবিত্বের আলয়—সৌন্দর্য্যের আধার স্বরূপ এমন স্বাভাবিক আনন্দজীবনে প্রীতির চিরস্বাস্থ্যময় কিরণ, কয় দিনের জন্য পাইলাম? জীবনের আকাশে স্নেহের পূর্ণ চাঁদ কয় দিন উঠিয়াছে? আর সুখ? তার কথা আর কেন?—কই—কবে—মনে একটা তার ছায়া আছে মাত্র! কেবলি যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ! এ জীবনটাই যুদ্ধময়! এ যুদ্ধের অবসান কোথায় জানি না! জানি বই কি—ঐ শুন কিসের হরিধ্বনি—আমার অবসানের গান, অবসানের অদৃশ্য গৃহ-পথ দিয়া আসিয়া আমার মুখের প্রতি প্রেমের অস্পষ্ট ঘোর ঘোর নয়নে চাহিয়া অনন্ত হরিধ্বনি দিতেছে! সে আমার অনন্ত শয়নের শয্যা প্রস্তুত করিতেছে! এই দেখিতে —দেখিতে—দেখিতে একদিন দেখিবে—তাহার উপর আমি শুইয়া! এখন প্রতিদিন শুনিতে পাই, কে যেন আমাকে কোথা হইতে কি এক শব্দাতীত অনুভূতিময় স্বরে ডাকিতেছে! যেন আমার জন্য কিসের একটা সৃষ্টি অপেক্ষা করিতেছে! যেন আমি কোথায়—আমার চক্ষু-কর্ণ-স্পর্শ-শক্তির ধারণার অতীত এক অনন্ত তীরে বসিয়া—আর সেই অনন্তের তীর হইতে কি এক মৃত্যু—বাতাস আসিয়া আমার জীবন-গ্রন্থিগুলি একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিতেছে! অনন্তের আহ্বান লঙ্ঘন করিতে কে পারে? যাইতে হইবে—অতি শীঘ্রই। অনন্তের ডাক অবহেলা করিয়া থাকিতে পারি কৈ? সে ডাক ফিরাইবার শক্তি, মনুষ্যের নাই। যাইবার পূর্ব্বে

তোমার কাছে আমার চির-বিদায় লইলাম। তোমার কাছে আমার বিদায় লইতে চক্ষে জল আসে! সে কথা ভাবিতে পারি না! এ জীবনের আমার তুমিই একমাত্র আনন্দ—এ জীবন-অমাবস্যার পূর্ণ চাঁদ। তোমার অনুরাগ-বারি পাইয়াই এ জীবন-কুঁড়ি, আজ বৃক্ষে পরিণত। তুমি যদি না থাকিতে তাহা হইলে আজ, নিম্ন-স্বাক্ষরসহিত এই পত্র—লেখা, কেহই জগতে দেখিতে পাইত না! আর এ নাম কালের অনন্ত ক্রোড়ে যে কবে লয় পাইত তাহা কে বলিতে পারে!!!—হায়! তবু ছাড়িয়া যাইতে হইবে!—কোথায় যাইব!—কার কাছে!—"Who am I; what is this Me? A Voice, a Motion, an appearence?"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাংস্তাংস্তিতিক্ষস্য ভারত॥ ১৪॥

অনুবাদ।

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ,* ইহাই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখজনক। সে সকলের উৎপত্তি ও অপায় আছে, অতএব তাহা অনিত্য, অতএব হে ভারত! সে সকল সহ্য কর। ১৪॥

টীকা।

একাদশ শ্লোকে বলা হইল, যে যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ। দ্বাদশ শ্লোকে এরূপ অনুযোগ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করা হইল। সে কারণ এই যে কেহই ত মরিবে না, কেননা আত্মা অবিনাশী। তুমি কাটিয়া পাড়িলেও সে থাকিবে; কেন না তাহার আত্মা থাকিবে। একাদশ শ্লোক পাঠে জানা যায় যে যখন গীতা প্রণীত হয়, তখন জন্মান্তর জনসমাজে গৃহীত। একাদশ শ্লোকে অর্জ্জুনের আপত্তি

---

* মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ ইতি শঙ্করঃ।

আশঙ্কা করিয়া, ভগবান্ তাহারই খণ্ডন করিতেছেন। অর্জ্জুন বলিতে পারেন, আত্মা না হয় রহিল, কিন্তু যখন দেহ গেল, তখন আমার আত্মীয় ব্যক্তি যাহার জন্য শোক করিতেছি, সে আর রহিল কৈ? দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে সে ত ভিন্ন ব্যক্তি হইল। এই আপত্তির আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন, যে এ রূপ ভেদ কল্পনা করা অনুচিত, কেন না যেমন কৌমার যৌবন জরা একব্যক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র, তেমনি দেহান্তর প্রাপ্তি ও অবস্থান্তর মাত্র। ইহাতে ও অর্জ্জুন আপত্তি করিতে পারেন যে না হয় স্বীকার করা গেল যে দেহান্তরে ও দেহীর একতা থাকে—কিন্তু মৃত্যুর একটা দুঃখ কষ্ট ত আছেই? এই স্বজনগণ সেই কষ্ট পাইবে—তাহা স্মরণ করিয়া শোক করিব না কেন? তাহাদের বিরহে কাতর হইব না কেন?

তাহার উত্তরে ভগবান্ এই চতুর্দ্দশ শ্লোকে বলিতেছেন যে যে সকলকে তুমি এই দুঃখ বলিতেছ, তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ জনিত। যতক্ষণ সেই সংযোগ থাকে ততক্ষণ সেই দুঃখ থাকে, সংযোগের অভাবে আর সে দুঃখ থাকে না। যেমন যতক্ষণ ত্বগের সঙ্গে রৌদ্রাদি উত্তাপের বা হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়, ততক্ষণ উষ্ণ বা শীত স্বরূপ যে দুঃখ তাহা অনুভূত করি, রৌদ্রাদির অভাব হইলে আর তাহা থাকে না। যাহা থাকিবে না, অনিত্য, তাহা সহ্য করাই উচিত। যে দুঃখ সহ্য করিলেই ফুরাইবে, তাহার জন্য কষ্ট বিবেচনা করিব কেন?

এই সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্য গুণ থাকিলেই জীবন মধুর হয়। অভ্যাস করিলে অভ্যাস গুণে আর কোন দুঃখকেই দুঃখবোধ হয় না। তার পর এই গীতোক্ত সর্ব্বানন্দময়ী ভক্তি মনুষ্যের জীবন অপরিসীম সুখে আপ্লুত হয়। দুঃখ মাত্র থাকে না। জীবনকে সুখময় করিবার জন্য, গোড়াতে এই দুঃখ সহিষ্ণুতা আছে—তাহা ব্যতীত কিছু হইবে না। ইন্দ্রিয়গণের সহিত বহির্ব্বিষয়ের সংযোগজনিত যে সুখ—ভোগবিলাসাদি, তাহাও দুঃখের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে, কেননা তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, তাহার অভাব ও দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য "শীতোষ্ণ সুখদুঃখ" একত্রে গণনা করা হইয়াছে।*

* এখানে মূলে যে মাত্রা শব্দ ও মাত্রাস্পর্শ পদ আছে; তাহার দুই প্রকার অর্থ করা যায়। উহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বুঝাইতে পারে, এবং ইন্দ্রিয়-

যৎহি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্প্যতে॥ ১৫॥

অনুবাদ।

হে পুরুষর্ষভ! সুখদুঃখে সমভাব যে ধীর পুরুষ এ সকলে ব্যথিত হন না, তিনিই মোক্ষ লাভে সমর্থ হন।

টীকা।

সুখ দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে মোক্ষলাভের উপযোগী হয় কেন? দুঃখ হইতে মুক্তিই মুক্তি বা মোক্ষ। সংসার দুঃখময়। যাঁহারা বলেন সংসারে দুঃখের অপেক্ষা সুখ বেশী, তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে, সংসারে দুঃখ আছে। এ জন্য জন্মান্তরও দুঃখ, কেননা পুনর্ব্বার সংসারে আসিয়া আবার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অতএব পুনর্জন্ম হইতে মুক্তি লাভও মুক্তি বা মোক্ষ। স্থূলতঃ দুঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। এই জন্য সাংখ্যকারের প্রথম

গণের বিষয়কেও বুঝাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য বলেন, "মাত্রা আভির্ম্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্রাদিনীন্দ্রিয়াণি, মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাঃ।" শ্রীধরস্বামীও ঐরূপ বলেন যথা "মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়স্তাসাং স্পর্শবিষয়ৈঃসহ সম্বন্ধাঃ (মাত্রাস্পর্শাঃ)। মধুসূদন সরস্বতী ও ঠিক তাই বলেন। পক্ষান্তরে, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, "মাত্রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়াঃ।" তাতে ও বড় আসিয়া যাইত না; কিন্তু একজন ইংরেজ অনুবাদক* স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে এই মাত্রা শব্দ লাটিন ভাষায় Materia ও ইংরাজিতে matter, সুতরাং তিনি "মাত্রাস্পর্শাঃ" পদের অনুবাদে "matter—contacts লিখিয়াছেন। পরিমান জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয় বিষয়েরও যে আবশ্যকতা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ্যদর্শনের "তন্মাত্র" শব্দের তাৎপর্য্য বিচার করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য যে আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও ডেবিস সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধরস্বামীর অনুসরণ করিয়াছি।

* Davis

সূত্রেই বলিয়াছেন "ত্রিবিধদুঃখস্যাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।" এখন, দুঃখ সহ্য করিতে শিখিলেই দুঃখ হইতে মুক্তি হইল। কেননা, যে দুঃখ সহ্য করিতে শিখিয়াছে সে দুঃখকে আর দুঃখ মনে করে না। তাহার আর দুঃখ নাই বলিয়া তাহার মোক্ষলাভ হইয়াছে। অতএব মোক্ষের জন্য মরিবার প্রয়োজন নাই। দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে, অর্থাৎ দুঃখে দুঃখিত না হইলে, ইহ জীবনেই মোক্ষলাভ হইল।

নাসতোবিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। ১৬।

অনুবাদ

অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সদ্বস্তুর অভাব হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ উভয়ের অন্তদর্শন করিয়াছেন।

অস ধাতু হইতে সৎ শব্দ হইয়াছে। যাহা থাকিবে তাহাই সৎ; যাহা নাই বা থাকিবে না তাহাই অসৎ। আত্মাই সৎ; শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ অসৎ। নিত্য আত্মায় এই অনিত্য শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখাদি স্থায়ী হইতে পারে না। কেননা সৎ যে আত্মা, অসৎ শীতোষ্ণাদি তাহার ধর্ম্মবিরোধী। শ্রীধর স্বামী এইরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, "অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাৎ অবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ন ভাবঃ।" আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি।

শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সদসদ্বুদ্ধি যে প্রকার বুঝাইয়াছেন, তাহাও পাঠকদিগের বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা কর্ত্তব্য। তাহা হইতে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই সকল বিষয় কোন দিগ হইতে দেখিতেন, এবং আমরা এখন কোন দিগ হইতে দেখি, তাহার প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন। এই শ্লোকের শঙ্কর প্রণীত ভাষ্য অতিশয় দুরূহ। নিম্নে তাহার একটি অনুবাদ দেওয়া গেল।

"কারণ হইতে উৎপন্ন অতএব অসৎস্বরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি কার্য্যের অস্তিত্ব নাই। শীত উষ্ণাদি যে কারণ হইতে উৎপন্ন তাহা প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়; সুতরাং উহারা সৎ পদার্থ হইতে পারে না। কারণ উহারা বিকার মাত্র, এবং বিকারেরও সর্ব্বদা ব্যভিচার দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ কখন বিকার

থাকে কখন থাকে না)। যেমন চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেও ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু* বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ কারণ ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া উপলব্ধি না হওয়ায় সর্ব্ব প্রকার বিকার পদার্থই অসৎ। উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং ধ্বংসের পরে মৃত্তিকাদি কারণ হইতে উৎপন্ন ঘটাদি কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। সেই সকল কারণও আবার তাহাদের কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সুতরাং তাহারাও অসৎ। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, কারণ সমূহ এইরূপে অসৎ হইলে সকল পদার্থ ই অসৎ হইয়া পড়ে, (সৎ আর কিছুই থাকে না)। এরূপ আপত্তির খণ্ডন এই যে সকল স্থলেই দুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়; সৎ বলিয়া জ্ঞান ও অসৎ বলিয়া জ্ঞান। যে বস্তুর জ্ঞানের ব্যভিচার নাই অর্থাৎ যে বস্তু একবার "আছে" বলিয়া বোধ হইলে আর "নাই" বলিয়া বোধ হয় না, তাহার নাম সৎ। আর যে বস্তু একবার আছে বলিয়া বোধ হইলে পরে আবার নাই বলিয়া বোধ হয় তাহার নাম অসৎ। এইরূপে বুদ্ধিতন্ত্র সৎ ও অসৎ দুই ভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই সর্ব্বত্র, এই দুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি করেন। বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ এক বিভক্তিতে বর্ত্তমান থাকিলে তাহাদের অভেদ হয়, যেমন "নীলং উৎপলং" ইহার অর্থ উৎপল নীল হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ ঐ উৎপলের জ্ঞান হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিন্ন ভাবে নীলত্বেরও জ্ঞান হইবে। এইরূপ যখন "ঘটঃসন্" "পটঃসন্" "হস্তীসন্" ইত্যাদি জ্ঞান হয় তখন ঘট জ্ঞানের সহিত "সৎ" এই জ্ঞান অভিন্ন ভাবে উৎপন্ন হয়; সুতরাং সৎ ও অসৎ ভেদ বুদ্ধির যে কল্পনা করা হইতেছিল তাহা নিরর্থক হয়। কিন্তু লোকে এরূপ অভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করে না। এই বুদ্ধিদ্বয়ের (সৎ ও অসৎ) মধ্যে ঘটাদি বুদ্ধির ব্যভিচার হয় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; সৎ বুদ্ধির ব্যভিচার হয় না। অতএব ব্যভিচার হয় বলিয়া যে পদার্থ ঘটাদি বুদ্ধির বিষয় তাহা অসৎ, এবং অব্যভিচার হয় না বলিয়া উহা সৎ বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না।

---

* অর্থাৎ ঘটের জ্ঞান জন্মিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকার জ্ঞান জন্মায়। মৃত্তিকার জ্ঞান না জন্মাইলে ঘটের জ্ঞান জন্মায় না; সুতরাং ঘট অসৎ, উহার কারণ মৃত্তিকা সৎ।

যদি বল ঘট বিনষ্ট হইলে যখন ঘট বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সংবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক (অর্থাৎ আপত্তিকারীর মতে ঘটবুদ্ধি ও সংবুদ্ধি অভিন্ন, সুতরাং ঘট বুদ্ধির ব্যভিচার হইলে সংবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক)। এই আপত্তি খাটিতে পারে না, কারণ তৎকালে সেই সংবুদ্ধি ঘটাদিতে বর্ত্তমান থাকে (সুতরাং উহার ব্যভিচার হয় না)। সে সংবুদ্ধি বিশেষণ ভাবে অবস্থিত, সুতরাং (বিশেষ্য নাশে) বিনষ্ট হয় না।

যদি বল সংবুদ্ধি স্থলে যেরূপ যুক্তি অনুসারে একটি ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটে ত ঘটবুদ্ধি থাকে, "সুতরাং ঘটবুদ্ধি সৎ হউক," এ আপত্তি ইহাতে খাটিতে পারে না; যেহেতু সে ঘটবুদ্ধি পটাদিতে থাকে না।

যদি বল সংবুদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় না। এ কথা গুরুতর নহে। সংবুদ্ধি বিশেষণ ভাবে অবস্থিত, বিশেষ্যের অভাব হইলে বিশেষণ থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহার বিষয় কি হইবে? বিষয়ের অভাব হইলে সংবুদ্ধি থাকে না। যদি বল ঘটাদি বিশেষ্যের অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে এক বিভক্তিতে উল্লেখ করা যায় বলিয়া ঘট সৎ হইবে, তাহার উত্তর এই যে মরীচিকা প্রভৃতি স্থলেও সংবুদ্ধি এবং উদক্ উভয়ের অভাব হইলেও এক বিভক্তিতে 'সৎ ইদং উদকং' এরূপ ব্যবহার হয়, (ইহা দ্বারা এক বিভক্তিতে উল্লেখ হওয়া সৎ অথবা অসৎ এ উভয়ের কোন পক্ষেই প্রমাণ নহে).

অতএব দেহাদি দ্বন্দ্ব কারণ হইতে উৎপন্ন ও অসৎ, উহার অস্তিত্ব নাই। এবং সৎ যে আত্মা তাঁহারও কোথায় অভাব নাই, যেহেতু তাঁহার কোথায় ব্যভিচার হয় না। ইহাই সৎ এবং অসৎরূপ আত্মা এবং অনাত্মার স্বরূপ নির্ণয়। যে সৎ সে সৎই যে অসৎ সে অসৎই।*"

শঙ্করাচার্য্য যেমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, এই দার্শনিক বিচারও তাহার উপযুক্ত। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহা বড় মিশিবে না। সুখ দুঃখকে সৎই বল, আর অসৎই বল, সুখ দুঃখ আছে। থাকিবে না সত্য,

---

* শাঙ্কর ভাষ্যের এই অনুবাদ আমরা কোন বন্ধুর নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

কিন্তু নাই, এ কথা বলিবার বিষয় নাই। কিন্তু থাকিবে না, এইটাই বড় কাজের কথা। তবে, সহ্য করিতে পারিলেই, দুঃখ নষ্ট হইবে।

-The darkest day,
Wait till to-morrow, will have passed away."

এখন, ১৪।১৫।১৬, এই তিন শ্লোকে যাহা উক্ত হইল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে, কয়েকটি আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি, দুঃখ সহ্য করিতে হইবে—নিবারণ করিতে হইবে না? অর্জ্জুনের দুঃখ, জ্ঞাতি বন্ধু বধ; যুদ্ধ না করিলেই সে দুঃখ নিবারণ হইল; দুঃখ নিবারণের সহজ উপায় আছে। এ স্থলে তাঁহাকে দুঃখ নিবারণ করিতে উপদেশ না দিয়া ভগবান্ দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দিতেছেন, ইহা কিরূপ উপদেশ? রোগীর রোগের উপশমের জন্য ঔষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ না দিয়া তাহাকে রোগের দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে কি এ উপদেশ তুল্য নহে?

না। তাহা নহে। দুঃখ নিবারণের কোন নিষেধ নাই। তবে যেখানে দুঃখ নিবারণ করিতে গেলে অধর্ম্ম হয়, সেখানে দুঃখ নিবারণ না করিয়া সহ্য করিবে। যে যুদ্ধে অর্জ্জুন প্রবৃত্ত, তাহা ধর্ম্ম্য যুদ্ধ। ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম পরিত্যাগে অধর্ম্ম। অতএব এস্থলে দুঃখ সহ্য না করিয়া নিবারণ করিলে অধর্ম্ম আছে। এজন্য এখানে সহ্য করিতে হইবে, নিবারণ করা হইবে না।

দ্বিতীয় আপত্তি, এই, দুঃখই সহ্য করিবে—সুখ সহ্য করা কিরূপ? সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করিব? তবে ভগবানের কি এই আজ্ঞা, যে পৃথিবীর কোন সুখে সুখ হইবে না? তবে আর aceticism কাহাকে বলে? সুখশূন্য ধর্ম্ম লইয়া কি হইবে?

ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহা দুঃখের কারণ—তাহা দুঃখ মধ্যে গণ্য। ইন্দ্রিয়াদির অনধীন যে সুখ, যথা—জ্ঞান, ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি জনিত যে সুখ, তাহা গীতোক্ত ধর্ম্মানুসারে পরিত্যাজ্য নহে, বরং গীতোক্ত ধর্ম্মের সেই সুখই উদ্দেশ্য। আর ইন্দ্রিয়ের অধীন

যে সুখ, তাহাও প্রকৃত পক্ষে পরিত্যজ্য নহে। তৎপরিত্যাগও গীতোক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। তাহাতে অনাসক্তিই গীতোক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নহে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈ বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ২।৬৪

উক্ত চতুঃষষ্টিতম শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব।

আমরা দেখিয়াছি যে দ্বাদশ শ্লোকে হিন্দু ধর্ম্মের প্রথমতত্ত্ব সূচিত হইয়াছে, আত্মার অবিনাশিতা। ত্রয়োদশ শ্লোকে দ্বিতীয় তত্ত্ব—জন্মান্তরবাদ। এই চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, এবং ষোড়শ শ্লোকে তৃতীয় তত্ত্ব সূচিত হইতেছে—সুখদুঃখের অনাত্মধর্ম্মিতা ও অনিত্যত্ব। সাংখ্য দর্শনের ব্যাখ্যার উপলক্ষে, আত্মার সঙ্গে সুখদুঃখের সম্বন্ধ পূর্ব্বে যেরূপ বুঝাইয়াছিলাম, তাহা বুঝাইতেছি।

"শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক, শরীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই,—এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি—বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ, তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে তাহাতে তোমার দুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন দুঃখ নাই, কিন্তু প্রকৃতিঘটিত দুঃখ পুরুষে বর্ত্তে কেন? "অসঙ্গোয়ম্পুরুষঃ।" পুরুষ একা, কাহার সংসর্গ-বিশিষ্ট নহে। (১ম অধ্যায়ে ১৫ সূত্র।) অবস্থাদি, সকল শরীরের, আত্মার নহে। (ঐ ১৪ সূত্র।) "ন বাহ্যান্তরয়োরূপরজ্যোপরঞ্জকভাবোপি দেশব্যবধানাৎ স্রুঘ্নস্যপাটলিপুত্রস্যয়োরিব।" বাহ্য এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই; কেননা, তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে, দেশব্যবধানবিশিষ্ট, যেমন এক জন পাটলিপুত্র নগরে থাকে, আর একজন স্রুঘ্ন নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান। তদ্রূপ।

তবে পুরুষের দুঃখ কেন? প্রকৃতির সংযোগই দুঃখের কারণ। বাহ্যে আন্তরিকে দেশ ব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ফাটিক পাত্রের নিকট জবা কুসুম রাখিলে পাত্র পুষ্পের বর্ণ

বিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে এক প্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ। পুষ্প এবং পাত্র মধ্যে দেশ ব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে; ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে; সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই দুঃখ নিবারণের উপায়, সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ। "যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ (৬,৭।)*

কালভৈরব।

ভারতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যভূমি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, কাশীধাম। দেবাদিদেব, সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, সর্ব্বজননিয়ন্তা, অষ্টমূর্ত্তি ভোলানাথ, বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তিতে সেই পরম পুণ্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। কাশীদর্শনে জীবের পাপখণ্ডন ও স্পর্শে মুক্তিলাভ হয়। যে ব্যক্তি তথায় বাস করতঃ অন্তে সেই মহিমাময় ত্রিলোকতারণ, ত্রিশূলির ত্রিশূলাগ্রাবস্থিত রাজ্যে মানবলীলা সম্বরণ করিতে পারে, সে লোকান্তরে সাযুজ্য নামধেয় চরমমুক্তি শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভুবনসুন্দরী বারাণসীতে বাস ও বিশ্বসুন্দর বিশ্বেশ্বরের সেবা সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

পূণ্যভূমি পূণ্যাত্মার জন্য, পাপীর সেস্থানে প্রবেশের অধিকার নাই। বিশ্বেশ্বর ভোলানাথ, তাঁহার কোন বিশেষ নিষেধ বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না, তিনি সকলের প্রতিই সমভাবে কৃপাবান্; তবে কেন পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মা সমান অধিকার না পায়? সে দোষ কাশীপতি বিশ্বেশ্বরের নহে। সে দোষ তাঁহারই নিয়োজিত (নিয়োজিত হইলেও লোকটা বড় কড়া) একজন কর্ম্মকারকের, এই নিয়োজিত বা আনীত কর্ম্মকারক কাশীধামে কালভৈরব নামধারী কোতয়াল।

---

* প্রবন্ধ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

পাপীই হউন আর পুণ্যবানই হউন, কোতয়াল কালভৈরবের ভৈরবদৃষ্টি সকলকেই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, পাপী দেখিলে—পাপীকে পবিত্র কাশীধামে পাপকার্য্য করিতে দেখিলে, কালভৈরব ভীম সম্মার্জ্জনী হস্তে অবিরত ভয়ানক তাড়না করিতে থাকে, সে তাড়না সহ্য করা অসাধারণ অবিচলিত-চিত্ততা ও সহিষ্ণুতার কার্য্য। কেহবা সেই ভৈরব-তাড়নায় উৎপীড়িত হইয়া সর্ব্বসুখদায়িনী সর্ব্বসন্তাপনাশিনী বারাণসীকে অচিরে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, কেহ বা—

"ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়,
লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে তাড়ায়।"

যাহার বড় কাশীগত-প্রাণ, বিশ্বেশ্বরে একান্ত দত্তমন, সেই-ই কালভৈরবের সম্মার্জ্জনীতাড়না কোন ক্রমে সহ্য করিয়া থাকে। পাছে কোন দিন কাশী হইতে বিতাড়িত ও বিশ্বেশ্বরদর্শনে বঞ্চিত হইতে হয় এই ভয়ে সতত ভীত হইয়া অতি সঙ্গোপনে একপার্শ্বে লুক্কায়িত ভাবে কাল যাপন করিতে থাকে। বিশ্বেশ্বরের নিয়োজিত কালভৈরব, তাঁহারই আশ্রিত অনুগত চরণারবিন্দ-দর্শনে আগত নিরীহ ব্যক্তিবর্গকে উৎপীড়িত করতঃ অবশেষে তাঁহার সুখ-রাজ্য হইতে দূরীভূত করিতে থাকে, তিনি ভবতোষ ভয়ত্রাতা ভোলানাথ—তাহাতে হস্তার্পণ করিতে পারেন না। করিলে কালভৈরব বলে, "তবে আপনার এ পুণ্য সুখময় কাশীধাম, ভাক্ত; পাপাসক্ত ভক্তে পরিপূর্ণ হউক, আপনি তাহাদের লইয়া এ মঙ্গল রাজ্যে বিরাজ করুন, আমি বিশ্রাম গ্রহণ করি।"

আমি কাশী দেখি নাই, কিন্তু এই গৃহস্থাশ্রমে—এই সংসারে কাশীধামের ন্যায় অনেক দেবদেবী দেখিয়াছি। এইখানেই এই সামান্য গৃহস্থাশ্রমের ভিতরেই অনেকানেক কালভৈরব বিরাজমান দেখিয়াছি। আশ্রমের মধ্যে উপার্জ্জক, সংসারের পরিচালক বাবু আমার বিশ্বেশ্বর—আর তাঁহার গৌরবরণা, নানালঙ্কার-ভূষিতা, গবর্ণমেণ্টসিকিওরিটিলোলুপা, করতলগৃহিতভর্ত্তৃকা, আঠারআনাস্বার্থপরায়ণা গৃহিণী আমার এই পবিত্র আশ্রমকাশীর কোতয়াল। কাশীর কোতোয়াল কালভৈরব অপেক্ষা এই আশ্রমকালভৈরবগণের প্রতাপ ও দৌরাত্ম্য ভীষণ হইতে ভীষণতর। কাশীতে কষ্টে স্বষ্টে লুকাইয়াও অনেকে

বাস করিতে পারে বলিয়াছি, কিন্তু এ আশ্রমের অধিষ্ঠাতা বিশ্বেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া কোথায় লুকাইবে? এ সংসার কোতোয়ালের দৌরাত্ম্যে, তাহার অবিশ্রান্তপরিচালিত বিকট সম্মার্জ্জনীর জ্বালায়, আশ্রমের ভিতর লুকাইবার স্থান পর্য্যন্ত নাই।

ইঁহার নিকট পিত্রালয়ের সম্পর্কীয়—কি দূর, কি নিকট—সকলেই পুণ্যাত্মা, সকলেই তাঁহার জুরিসডিক্‌সন রূপ আশ্রমকাশীতে বাস করিবার ও সর্ব্ব প্রকার আব্‌দার আখচের যোল আনা অধিকারী। তাহাদের দোষ তিনি নিজে দেখিতে পান না, কখন স্পষ্টতঃ পাপ করিতে দেখিলেও তাহাকে আশ্রম হইতে বিদূরিত করা দূরে থাকুক, তাহার একটা সুবিচার জন্য সে কথা আশ্রমনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের কাণে পর্য্যন্ত তুলিতে চাহেন না। তাহাদের মানবলীলা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই আশ্রম কাশীরাজের জন্ম, আর তাহাদের প্রতিপালনে ও সন্তোষে সকলতৃপ্তি, কোতোয়াল কাল ভৈরবের তৃপ্তি ও আশ্রম কাশীরও সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি। তাহাদের অতুষ্টিতে কোতোয়াল অতুষ্ট, আশ্রমেরও ঘোর অশান্তি। পিত্রালয় সম্পর্কীয় ব্যতীত অনেক সময়ে অপরাপর অনেক লোক ভৈরবের নিকট পুণ্যাত্মার ন্যায় থাকিতে পারে, তাহারা বিশ্বেশ্বরের নিকট কোন প্রকার লাভালাভের প্রার্থী হয় না। "যাই এমন কোতোয়াল তরফে পাকা গৃহিণী এই আশ্রম কাশীর হরদম তদারক তদ্বির করিতেছেন তাই এ সংসারে কোন গোলযোগ, কোন অশান্তি নাই; এমনটি না হইলে কি হইত বলদেখি" এবংবিধ স্তুতিগুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া সর্ব্ব সময়ে কালভৈরবের সেবায় বা মনঃস্তুষ্টিতে নিযুক্ত। কখন কদাচিৎ বিশ্বেশ্বর আরাধনে মনোযোগ দিতে পারে।

আর এ কোতোয়াল ভৈরবের চক্ষে শ্বশুরালয় সম্পর্কীয় অধিকাংশই পাপাসক্ত, তজ্জন্য আশ্রম কাশীতে আসিয়া তন্নিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের সেবার অনুপযুক্ত। অক্ষম বৃদ্ধ শ্বশুর কতক, বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী সম্পূর্ণ, বিধবা ননন্দা বা তাহাদের পুত্র কন্যা থাকিলে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের পাপী। অল্পবয়স্ক পঠদ্দশাগ্রস্ত বিবাহিত দেবর তাহাদের নিম্নে, পতিপুত্রবিহীনা অনাথা সর্ব্বকর্ম্মনিপুণা ভাগ্যদোষে অল্প মাত্রায় মুখরা, ভৈরবের অত্যাচার অন্বেষণে ও তৎপ্রতিকারে তৎপরা, ননন্দাকে কখন কখন কোতোয়াল পাপীবোধে সহস্র

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্বেশ্বর্‌সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কাশীবাস করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন, সে কেবল বিশ্বেশ্বরের সেবার জন্য, তেমন লোক না থাকিলে ভোগ সেবা কিছুই চলে না। দেবতার সেবা বন্ধ হইলে কোতোয়ালেরও কষ্ট ভোগ করিতে হয়। হয় ত কোতোয়ালকেই আশ্রমের যাবতীয় কার্য্যের ভারগ্রহণ ও বিশ্বনাথের ভোগ সেবার আয়োজন কুত্রাপি বা স্বহস্তে সেবা পর্য্যন্ত করিতে হয়। ভৈরব বড় কড়া লোক। এক দিনের অধিক দুই দিন সে বিরক্তিকর, কষ্টদায়ক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না। সুতরাং তেমন পাপীকে স্থান না দিয়া কালভৈরব কি করেন! কিন্তু অপর সকলকেই তিনি ভীম সম্মার্জ্জনী ওরফে কলহের কুবচনকণ্টক প্রহারে দূরীভূত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। যিনি বড় বিশ্বেশ্বর-গতপ্রাণ; নিতান্ত কাশীবাস-লোলুপা (শ্বাশুড়ী) তিনিই সে কুবচন, কষ্ট ও বিবিধ কদাচার সহ্য করিয়াও বিশ্বেশ্বরের নিকট বাস করিতে কুণ্ঠিত হন না। যখন ভৈরব বড় বাড়াবাড়ি করেন, যখন তাঁহার উৎপীড়ন কাশীবাসিগণের অসহ্য হইয়া উঠে, শ্রেষ্ঠা পাপিষ্ঠা (শ্বাশুড়ী) মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলেন "আহা! আমার এমন ছেলের এমন বৌ" বিষ্ণুঃ "আমাদের কাশীরাজ ভোলানাথ বিশ্বেশ্বরের এমন কালভৈরব কোতোয়াল।"

যদি কখন কোন দিন কালভৈরবের নিতান্ত অনুপযুক্ত অত্যাচার দর্শনে বিশ্বেশ্বরের বড় অসহ্য বোধ হয়, ভৈরবের কৈফিয়ৎ তলব না করা বড়ই অবিচার বলিয়া মনে লাগে। অতি কোমল কৈফিয়তে কোতোয়ালকে অত্যাচারের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, সে দিন অমনি ভৈরব উত্তর দেন "আপনি তবে এ পুণ্য কাশীতে সদত পাপীসংশ্রবে ওরফে আপনার স্বসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন লইয়া বাস করুন; আমি কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করি—বাপের বাড়ী যাই।" কোতোয়ালের অভিমান বিশ্বেশ্বর সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস এই কালভৈরব হইতেই আশ্রম কাশীর যাবতীয় পুণ্য কার্য্য যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ণ রূপে নির্ব্বাহিত ও রক্ষিত হইতেছে। এই আশ্রম-কাশীর বিশ্বেশ্বর কোতোয়ালের অনুগত বশীভূত বলিয়াই সংসার কাশীবাসীর উপর এত অত্যাচার। সর্ব্বরাজ্য সর্ব্ব সময়েই কোতোয়াল রাজার বশীভূত আজ্ঞাবহ—এ আশ্রম কাশীতেও তেমন আজ্ঞাবহ কোতো-

য়াল নিতান্ত দুর্লভ নহে; কিন্তু কতকগুলি কালভৈরবের জন্য সংসার কাশীধাম বড় বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বেশ্বর একটু মেজাজটা কড়া করিবেন নাকি ?

শ্রী * * *

কৃষ্ণচরিত্র।

ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাব।

শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরবদিগের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। গমনকালে পাণ্ডবেরা ও দ্রৌপদী সকলেই তাঁহাকে কিছু কিছু বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের কথার উত্তর দিলেন। এই সকল কথোপকথন, অবশ্য ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে কবি ও ইতিহাসবেত্তা যে সকল কথা কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝা যায়, যে কৃষ্ণ কিরূপ পরিচয় তিনি অবগত ছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতা হইতে আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, "হে মহারাজ, ব্রহ্মচর্য্যাদি কার্য্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদায় আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষাচরণ নিষেধ করিয়া থাকেন। বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণ-পরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। হে অরাতিনিপাতন যুধিষ্ঠির! আপনি দীনতা অবলম্বন করিলে, কখনই স্বীয় অংশ লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করুন।"

গীতাতেও অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিয়াছেন দেখা যায়। ইহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে বুঝান গিয়াছে। পুনশ্চ ভীমের কথার উত্তর বলিতেছেন, "মনুষ্য পুরুষকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল

দৈব বা দৈব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; সে কর্ম্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত বা কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট হয় না।"

গীতাতেও এইরূপ উক্তি আছে।* অর্জ্জুনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"উর্ব্বর ক্ষেত্রে যথা নিয়মে হলচালন বীজ বপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোৎপত্তি হয় না। পুরুষ যদি পুরুষকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈব প্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে। অতএব প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।"

এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। কৃষ্ণ এখানে দেবত্ব একেবারে অস্বীকার করিলেন। কেননা তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত। ঐশী শক্তির দ্বারা কর্ম্ম সাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে না।

অন্যান্য বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এমন একটা কথা আছে, যে স্ত্রীলোকের মুখে তাহা অতি বিস্ময়কর। তিনি বলিতেছেন।

"অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।"

এই উক্তি স্ত্রীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, যে দশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদীচরিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাক্যের অত্যন্ত সুসঙ্গতি আছে। আর স্ত্রীলোকের মুখে ভাল শুনাক্ না শুনাক্, ইহা যে প্রকৃত ধর্ম্ম, এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত, ইহাও আমি জরাসন্ধ বধের সমালোচনা কালে ও অন্য সময়ে বুঝাইয়াছি।

---

* সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। ২।৪৮

দ্রৌপদীর এই বক্তৃতার উপসংহার কালে এক অপূর্ব্ব কবিত্ব কৌশল আছে। তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"অসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী এই কথা শুনিয়া, কুটিলাগ্র, পরম রমণীয়, সর্ব্বগন্ধাধিবাসিত, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, মহাভুজগসদৃশ, কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে দীন নয়নে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দ্দন, দুরাত্মা দুঃশাসন আমার এই কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল। শত্রুগণ সন্ধি স্থাপনের মত প্রকাশ করিলে তুমি এই কেশকলাপ স্মরণ করিবে। ভীমার্জ্জুন দীনের ন্যায় সন্ধি স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন, আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র অভিমন্যুরে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, ধরাতলে নিপতিত ও পাংশুলুণ্ঠিত না দেখিলে আমার শান্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধ স্থাপন পূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি তাহা উপশমিত হইবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতেছি না; আজি আবার ধর্ম্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

"নিবিড়নিতম্বিনী আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা কহিয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে কম্পিত কলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, দ্রবীভূত হুতাশনের ন্যায় অত্যুষ্ণ নেত্রজলে তাঁহার স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল, তখন মহাবাহু বাসুদেব তাঁহারে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণে! তুমি অতি অল্প দিনের মধ্যেই কৌরব মহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেমন রোদন করিতেছ, কুরুকুলকামিনীরাও তাহাদের জ্ঞাতি বান্ধবগণ নিহত হইলে এইরূপ রোদন করিবে। আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব সমভিব্যাহারে কৌরবগণের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কালপ্রেরিতের ন্যায় আমার বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিলে অচিরাৎ নিহত ও শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতলে শয়ন করিবে। যদি হিমবান্ প্রচলিত, মেদিনী উৎক্ষিপ্ত ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্র

সমূহের সহিত নিপতিত হয়; তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে কৃষ্ণে! বাষ্প সংবরণ কর; আমি তোমারে যথার্থ কহিতেছি, তুমি অচিরকাল মধ্যেই স্বীয় পতিগণকে শত্রু সংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিতে দেখিবে।"

এই উক্তি শোণিতপিপাসুর হিংসাপ্রবৃত্তি বা ক্রুদ্ধের ক্রোধাভিব্যক্তি নহে। যিনি সর্ব্বত্রগামী সর্ব্বকালব্যাপী বুদ্ধির প্রভাবে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যদুক্তি মাত্র। কৃষ্ণ বিলক্ষণ জানিতেন, যে দুর্য্যোধন রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণপূর্ব্বক সন্ধি স্থাপন করিতে কদাপি সম্মত হইবে না। ইহা জানিয়াও যে তিনি সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরব সভায় গমনের জন্য উদ্যোগী, তাহার কারণ এই যে, যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, তাহা করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার মুখবিনির্গত গীতোক্ত অমৃতময় ধর্ম্ম। তিনি নিজেই অর্জ্জুনকে শিখাইয়াছেন, যে

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

সেই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া, আদর্শযোগী, ভবিষ্যৎ জানিয়াও, সন্ধিস্থাপনের চেষ্টায় কৌরব সভায় চলিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

যাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্যবহারই মনুষ্যোপযোগী এবং কালোচিত। তিনি "রেবতী নক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিক মাসীয় দিনে মৈত্রমুহূর্ত্তে কৌরব সভায় গমন করিবার বাসনায় সুবিশস্ত ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্য পুণ্যনির্ঘোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক স্নান ও বসন ভূষণ পরিধান করিয়া সূর্য্য ও বহ্নির উপাসনা করিলেন এবং বৃষলাঙ্গুল দর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল সন্দর্শনপূর্ব্বক" যাত্রা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে তৎকালে প্রবল কাম্যকর্ম্মপরায়ণ যে বৈদিক ধর্ম্ম, তাহার নিন্দাবাদ আছে। কিন্তু তাই

বলিয়া তিনি বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে কখনও অবমাননা করিতেন না। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এই জন্য তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ব্যবহার উচিত ছিল, তিনি তাহাই করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণেরা বিদ্বান্, জ্ঞানবান, ধর্ম্মাত্মা, এবং অস্বার্থপর হইয়া সমাজের মঙ্গলসাধনে নিরত ছিলেন, এজন্য অন্য বর্ণের নিকট, পূজা তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য। কৃষ্ণও সেই জন্য তাহাদিগকে উপযুক্তরূপ পূজা করিতেন। উদাহরণস্বরূপ, পথিমধ্যে ঋষিগণের সমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি।

"মহাবাহু কেশব এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথের উভয়পার্শ্বে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান কতিপয় মহর্ষিরে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ! সমুদায় লোকের কুশল? ধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? কোথায় যাইতে বাসনা করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমারে আপনাদের কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এবং আপনারা কি নিমিত্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন?

"তখন মহাভাগ জামদগ্ন্য কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবর্ষি, কেহ কেহ বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজর্ষি এবং কেহ কেহ তপস্বী। আমরা অনেকবার দেবাসুরের সমাগম দেখিয়াছি; এক্ষণে সমুদায় ক্ষত্রিয়, সভাসদ্, ভূপতি ও আপনারে অবলোকন করিবার বাসনায় গমন করিতেছি। আমরা কৌরব সভামধ্যে আপনার মুখ-বিনির্গত ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ, ভীষ্ম দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ এবং আপনি যে সত্য ও হিতকর বাক্য কহিবেন; আমরা সেই সকল বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

"এক্ষণে আপনি সত্বরে কুরুরাজ্যে গমন করুন; আমরা তথায় আপনারে সভামণ্ডপে দিব্য আসনে আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথোপকথন করিব।"

এখানে ইহাও বক্তব্য যে এই জামদগ্ন্য পরশুরাম কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রামায়ণে আবার তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অথচ পুরাণে তিনি রাম কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্ব্বগামী বিষ্ণুর অবতারান্তর বলিয়া খ্যাত। পুরাণের দশাবতারবাদ কতদূর সঙ্গত, তাহা আমরা সময়ান্তরে বিচার করিব। আমরা বলিয়াছি যে কৃষ্ণাবতার ভিন্ন আমরা অন্য অবতারে বিশ্বাসবান নই।

এই হস্তিনা যাত্রার বর্ণনায় জানা যায়, যে কৃষ্ণ নিজেও সাধারণ প্রজার নিকটেও পূজ্য ছিলেন। হস্তিনাযাত্রার বর্ণনা, আরও কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

"দেবকীনন্দন সর্ব্বশস্যপরিপূর্ণ অতি রম্য সুখাস্পদ পরম পবিত্রশালি-ভবন এবং অতি মনোহর ও হৃদয়তোষণ বহুবিধ গ্রাম্যপশু সন্দর্শনকরতঃ বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত নিত্যপ্রহৃষ্ট অনুদ্বিগ্ন ব্যসনরহিত পুরবাসিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য নগর হইতে পথিমধ্যে আগমন করিয়া তাঁহার পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে মহাত্মা বাসুদেব সমাগত হইলে তাহারা বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

"এদিকে ভগবান্ মরীচিমালী স্বীয় কিরণজাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবর ধারণ করিলে অরাতিনিপাতন মধুসূদন বৃকস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক যথাবিধি শেষ সমাপনান্তে রথাশ্বমোচনে আদেশ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করতঃ শাস্ত্রানুসারে তাহাদের পরিচর্য্যা ও গাত্র হইতে সমুদায় যোক্ত্রাদি মোচন করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। মহাত্মা মধুসূদন সন্ধ্যা সমাপনান্তে স্বীয় সমভিব্যাহারী জনগণকে কহিলেন, হে পরিচারকবর্গ! অদ্য যুধিষ্ঠিরের কার্য্যানুরোধে এইস্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে। তখন পরিচারকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ ও বিবিধ সুমিষ্ট অন্নপান প্রস্তুত করিল। অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বী আর্য্য কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদায় অরাতিকুলকালান্তক মহাত্মা হৃষীকেশের সমীপে আগমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহারে পূজা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব ভবনে আনয়ন করিতে বাসনা

করিলেন। ভগবান্ মধুসূদন তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অর্চ্চনপূর্ব্বক তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমণ্ডপে আগমন করিলেন। পরে সেই সমুদায় ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে সুমিষ্ট দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া পরম সুখে যামিনী যাপন করিলেন।"

ইহা নিতান্তই মানুষ চরিত্র, কিন্তু আদর্শ মনুষ্যের চরিত্র।

দেখা যাইতেছে, যে দেবতা বলিয়া কেহ তাঁহাকে পূজা করিতেছে, এমন কথা নাই। তবে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য যেরূপ পূজা পাইবার সম্ভাবনা তাহাই তিনি পাইতেছেন, এবং আদর্শ মনুষ্যের লোকের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা সম্ভব, তিনি তাহাই করিতেছেন।

ভারতের ইতিহাস।

(পাশ্চাত্যদিগের ঐতিহাসিকতার উদাহরণ)

(টিসিয়স রচিত)

জীবনী। টিসিয়স নিডস নিবাসী টিসিওখসের পুত্র। নিডস একটী প্রধান সমুদ্রতীরবর্ত্তী লেসিডেমনিয় উপনিবেশ। ইহাঁরা আস্‌কেলেপিয়াডাই নামক পুরোহিতবংশসম্ভূত এবং পুরুষানুক্রমে চিকিৎসা ব্যবসায়ী। টিসিয়স হিপো-ক্রেটিসের সমসাময়িক এবং অনুমান ৪১৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে চিকিৎসা বিষয়ে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পারস্যরাজ ঐ সময়ে তাঁহাকে স্বদেশে লইয়া গিয়া রাজচিকিৎসক নিযুক্ত করেন। টিসিয়স ১৭ বৎসর কাল পারস্যে বাস করিয়া অনুমান ৩৯৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন। তার পর ইতিহাসে কিছু লেখে না।

টিসিয়স কেবল ব্যবসাতেই জীবন অতিবাহিত করেন নাই--অনেকগুলি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে পারস্যের ইতিহাসই প্রধান। ঐ গ্রন্থ এখন নাই। ভারতবর্ষের যে ইতিহাসের কথা আমরা বলিতেছি, উহাও এখন নাই। তবে ফোটিয়স ঐ গ্রন্থের একখানি চুম্বক করিয়াছেন সেই 'সংক্ষিপ্ত' হইতে আমরা পাঠককে মূল গ্রন্থের কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

ইতিহাস। সিন্ধু নদ যেখানে বড় সঙ্কীর্ণ সেখানকার বিস্তার আড়াই ক্রোশ, যেখানে অতি প্রশস্ত সেখানে দ্বাদশ ক্রোশের অধিক। নদীতে স্কোলেক্স নামক এক প্রকার পোকা জন্মে। অন্য জীবের সম্পর্ক নাই।

ভারতবর্ষের পর আর মনুষ্যের আবাস নাই। ভারতবর্ষে বৃষ্টি হয় না, নদীর জলেই সব কাজ হয়। এক প্রকার ফোয়ারা দ্রবীভূত স্বর্ণে বৎসর বৎসর পরিপূর্ণ হয়, এবং উহা হইতে একশত কলস স্বর্ণ প্রতি বৎসর পাওয়া যায়। কলসগুলি ভাঙিয়া ঐ স্বর্ণ বাহির করিয়া লইতে হয়, সুতরাং সে গুলি সব মাটির হওয়া চাই। কথিত ফোয়ারার নিম্নে এক প্রকার লৌহ পাওয়া যায় উহা অতি বিচিত্র গুণসম্পন্ন। ইতিহাস রচয়িতার নিকট ঐ লৌহের দুইখানি তরবারি ছিল—একখানি পারস্যরাজের, অপর খানি রাজমাতার দত্ত। মাটিতে

পুতিয়া রাখিলে উহা ঝড় বৃষ্টি নিবারণ করে। পারস্যরাজ দুইবার উহার পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

অপর একটী ফোয়ারার জল তুলিবামাত্র জমিয়া যায়। তখন উহার কিয়দংশ মাত্র কাহারও গলাধঃকরণ হইলে, তাহার অন্তরের সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। রাজা অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে ঐ দ্রব্য খাওয়াইয়া মনের কথা বাহির করিয়া লন।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে এক জাতি ক্ষুদ্রাকার মনুষ্য আছে। উহাদের মধ্যে দীর্ঘাকারেরা দেড়হাত মাত্র। উহারা পশ্চাদ্ভাগে কেশ আজানুলম্বিত করিয়া রাখে, এবং সম্মুখে শ্মশ্রু সেইরূপ বিলম্বিত করিয়া দেয়। জানুর নিম্নে কেশ এবং শ্মশ্রুতে একত্রে বাধিয়া দেয়—আর বস্ত্রাদি পরিধানের প্রয়োজন হয় না। উহাদের মেষ সাধারণ মেষশাবকের ন্যায় এবং বৃষ অশ্ব গর্দ্দভাদি সাধারণ মেষ অপেক্ষা ছোট। এই বামনেরা বড় ধনুর্ব্বিদ্যানিপুণ তাই ভারতবর্ষের রাজা তিন হাজার বামনসৈন্য রাখেন। উহারা পরম সত্যবাদী। শিকারী পক্ষীর সাহায্যে উহারা খরগস এবং শৃগালাদি শিকার করে। ঐ দেশে একটী হ্রদে এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে হ্রদের উপর ঐ তৈল ভাসিয়া বেড়ায়, তখন বামনেরা ছোট ছোট নৌকা করিয়া গৃহকার্য্যের নিমিত্ত ঐ তৈল লইয়া আইসে। শস্যতৈল যে উহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই এমন নহে। তবে হ্রদ তৈলই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে আর এক জাতীয় মনুষ্য আছে। উহাদের কুকুরের মত মুখ, বন্য পশুর চর্ম্ম পরিচ্ছদ এবং খাদ্য অপক্ক মাংস—মানুষের ভাষায় উহারা কথা কহিতে পারে না—কুকুরের মত ডাকে—তবে আপনা আপনি কথা বুঝিতে পারে, ভারতবর্ষীয়দিগের কথা বুঝিতে পারে, এবং আকার ইঙ্গিতে উহার উত্তর দেয়। উহাদের কুকুরের মত থাবা—একটু বেশী বড় এবং গোলাল। অন্য ভারতীয়দিগের ন্যায় ইহারাও পরম ন্যায়বান এবং আচার-সম্পন্ন।

ডুমুরের ভিতর যে প্রকার পোকা থাকে সেই জাতীয় ৭।৮ হাত লম্বা এবং দুই হাতে বেষ্টন করা যায় না এরূপ পরিধিবিশিষ্ট, এক প্রকার পোকা ভারতবর্ষের নদীতে আছে। উহার উপরে একটী এবং নিম্নে একটী দাঁত

আছে, উহাদের দ্বারা শিকার উদরস্থ করে। দিবসে নদীর নীচে মাটীর ভিতর থাকে—রাত্রে তীরে উঠিয়া বিচরণ করে। সেই সময় গরু ছাগল যাহা সুমুখে পড়ে দাঁতে টানিয়া নদীতে আনিয়া মারিয়া খায়। বড়সিতে ছাগল মেষ বাঁধিয়া মাছ ধরার মত ঐ জন্তু ধরিতে হয়। উহার এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, রাজা ভিন্ন আর কেহ সেই তৈল ব্যবহার করিতে পায় না। যেখানে পড়ে আগুনের মত তাহাই ধরিয়া উঠে এবং সেই আগুনে কাষ্ঠ পশু দগ্ধ হয়। কঠিন কর্দ্দম নিক্ষেপ না করিলে সে আগুণ নেবে না।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে আর এক প্রকার মানুষ আছে। সেখানে স্ত্রীলোকেরা জীবনে একবার মাত্র গর্ভিনী হয়। বালক বালিকাদের দাঁতগুলি বেশ সাদা হয় কিন্তু চুল ও ভ্রূও সেই বর্ণের। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর কেশ এবং ভ্রূর বর্ণ কাল হইতে আরম্ভ হয় এবং যাট বৎসর বয়সে আর এক গাছিও শাদা চুল থাকে না। হাতে পায়ে উহাদের আটটী করিয়া আঙুল হয় এবং কান কাঁধ পর্য্যন্ত লম্বা এবং পিঠের দিকে পরস্পর সংলগ্ন। যুদ্ধকার্য্যে ইহারা বিলক্ষণ পটু।

উত্তর ভারতবাসিরা ১৩।১৪ হাত লম্বা হয় এবং দুই শত বৎসরের অধিক বাঁচে।

নদীতে পন্তর্ব্ব (Pantarba) নামে এক প্রকার পাথর আছে। বাক্ট্রিয়া-নিবাসী নাবিক ৪৭৭ খানি বহুমূল্য প্রস্তরখণ্ড নদীতে নিক্ষেপ করিলে ঐ পন্তর্ব্ব সব আত্মসাৎ করিয়া লইল।

ভারতবর্ষের কুকুরদিগের আকার অতি বৃহৎ। উহারা সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়।

সিন্ধু নদের তীরে যে সকল খাকড়া জন্মে, উহাদের পরিধি দুই হাতে বেষ্টন করা যায় না এবং দৈর্ঘ্যে উহারা প্রকাণ্ড অর্ণবপোতের মাস্তুলের সমান।

সূর্য্যদেব দশগুণ বর্দ্ধিত আকারে ভারত আকাশে সদা বিরাজমান। তাঁহার অসহনীয় তেজে কতই না লোক মরে। সার্ডাস পর্ব্বত হইতে ১৫ দিনের পথে এক নির্জ্জন পবিত্র স্থান আছে। ভারতবাসীরা এই স্থানে সূর্য্য ও চন্দ্রদেবের উপাসনা করে। বৎসর বৎসর পঁয়ত্রিশ দিন এই খানে সূর্য্যকিরণ মন্দ এবং অনায়াসসহ্য থাকে—উপাসকেরা সচ্ছন্দে পূজা অর্চ্চনা সমাধা করিয়া যায়।

ভারতবর্ষে শূকর নাই—বন্যও না—পালিতও না। এক প্রকার ক্ষুদ্র বানরের আট হাত লেজ।

ভারতবাসিদিগের কখন কোন প্রকার শিরোরোগ, দন্তরোগ, চক্ষুরোগ, মুখ রোগ—কিম্বা শরীরে কোন ক্ষত হয় না। উহারা ১২০, ১৩০, ১৫০, এবং দীর্ঘজীবিরা ২০০ বৎসর বাঁচে।

ভারতবর্ষীয়দিগের সত্যনিষ্ঠা রাজানুরক্তি, এবং মৃত্যুভয়শূন্যতার বিস্তর প্রশংসা এই ইতিহাসের অনেক স্থলে আছে। লেখক মহাশয় উপসংহারে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় ইতিহাসে লেখা হইল—সব নিতান্ত সত্য—হয় তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন না হয় বিশেষ সম্ভ্রান্ত বিশ্বাসী দর্শকের মুখে শুনিয়াছেন। সেই বিচিত্র ভূমি সম্বন্ধে আরও বহুবিধ বিচিত্র কথা তাঁহার জানা আছে কিন্তু সত্যমূল ইতিহাসগ্রন্থে তাহার সন্নিবেশ কেমন করিয়া করেন? লোকে যদি গল্পই মনে করে!!!

বিবাহের ঘটকালি।

গৃহিনীরা ইদানিং সকল বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব একচেটে করিয়া লইয়াছেন—ব্যয় ভূষণ লৌকিকতা সামাজিকতা, সকলই এখন তাঁহাদের হাতে। বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহারা কর্ত্তা। পুরুষ ঘটকেরা অন্দর মহলে যায় না, সুতরাং আর ঘটকালি পায় না, কাজেই তাহাদের সে ব্যবসা ছাড়িতে হইয়াছে। তাহাদের পরিবর্ত্তে এখন স্ত্রীলোক ঘটক।

কিন্তু একটু গোল বাধিয়াছে। যেখানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত সেখানে ঘটকের কার্য্য বড় গুরুতর। সে বিষয় একটু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। বৈজিক তত্ত্ব ভাল রূপ না জানিলে ভাল ঘটক হইতে পারে না।

বংশভেদে আকার প্রকার সকলই প্রভেদ হয়, ইহা মোটামুটি অনেকেই জানেন। অনেকেই দেখিয়াছেন কোন কোন বালক গঠনে ঠিক্ তাহার পিতার মত, কেহ বা স্বরে পিতার মত, কেহ বা অঙ্গচালনায় পিতার মত। কিন্তু অল্প লোকেই ইহার হেতু অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। প্রকৃত হেতু নির্দ্দেশ

করা কঠিন। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে পিতার শারীরিক ও মানসিক দোষগুণসকল বীজবাহিত হইয়া সন্তানে যায়। এই কথা শুনিতে সামান্য কিন্তু বুঝিতে তত সামান্য নহে। বুঝিতে গেলে অবশ্য মনে ধারণা করিতে হইবে যে পিতৃবীজে পিতার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অংশ, শিরা মস্তিষ্কের অংশ, রাগ দ্বেষের অংশ, রোগের পর্য্যন্ত অংশ আছে! আশ্চর্য্য!

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন ? তাই কৌলিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাই কুলীনদিগের বিবাহ সম্বন্ধে এত বাঁধাবাঁধি হইয়াছিল। রাজ্যমধ্যে বিশেষ গুণবিশিষ্ট লোক বাছিয়া কৌলিন্যের সৃষ্টি হয়, এবং রাজ্যে সেই সকল গুণরক্ষার্থ কুলীনদের বিবাহ লইয়া আঁটাআঁটি করিতে হইয়াছিল। গুণসম্পন্নের বংশে দোষবিশিষ্ট রক্ত মিশ্রিত হইয়া গুণধ্বংস না হয় এই জন্য কুলীনের বিবাহ কুলীনের বংশে, অন্ততঃ শ্রোত্রীয় বংশে হইবে, নিয়ম করা হইয়াছিল। কুলীনেরা নবগুণবিশিষ্ট শ্রোত্রীয়রা অষ্টগুণ বিশিষ্ট। প্রভেদ গুরুতর নহে। কিন্তু সে নিয়ম রক্ষা হইল না। কুলীন অকুলীনের ঘরে বিবাহ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের কুল ধ্বংস হইতে লাগিল অর্থাৎ কুলীনসন্তানদের গুণক্ষয় হইতে লাগিল, ক্রমে তাঁহাদের অধঃপতন হইল। তাঁহারাই ভঙ্গ কুলীন, বহু পুরুষ হইলে, তাঁহাদের কুলীনবংশজ অথবা সচরাচর কেবল "বংশজ" বলে। ইংলণ্ড, ফরাসিস প্রভৃতি দেশের (Breeders) পশুপালকেরা বিশেষ জানে যে পশুদের কোন ভাল গুণ রক্ষা করিতে হইলে দোষাশ্রিত অপর বংশের সহিত নির্লেপ রাখিতে হয়, অথচ দীর্ঘকাল পুরুষানুক্রমে স্ববংশে শাবক উৎপাদন করাইলে ক্রমে সে বংশ খর্ব্ব ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে, এমন কি, কখন কখন বংশলোপ হইয়া যায়; এই জন্য মধ্যে মধ্যে অপর বংশের রক্ত মিশ্রিত করিতে হয়। আমাদের মধ্যে সেই জন্য পিতৃ মাতৃ গোত্রে বিবাহ নিষেধ আছে। কিন্তু দেবীবর ঘটকের মস্তকে বজ্রপাত হউক, তিনি পালটী ঘর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্য স্ববংশে বিবাহ করার ফল ফলিয়াছে, দুই বংশে পুরুষানুক্রমে বিবাহ হইলে উভয় বংশের রক্ত এক হইয়া যায়, সুতরাং স্ববংশে বিবাহের ফল ফলে।

এখন বোধ হয় বুঝা গেল বিশেষ বংশপরিচয় ব্যতীত সুবিবাহ হইতে পারে না। বংশপরিচয় দিবার জন্য আমাদের ঘটক ছিল; আমরা সেই ঘটকের পদ এখন এবালিস করিতে বসিয়াছি, দুর্ভাগ্য! ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অদ্যাপি ঘটক হয় নাই, কিন্তু ঐ সকল দেশের চতুস্পদের ঘটক হইয়াছে তাহারা ইংলণ্ডে ব্রিডার (Breeders) বলিয়া খ্যাত। তাহাদের যত্নেই উরোপের পশু ক্রমেই উন্নত হইতেছে। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডবাসী মনুষ্য অপেক্ষা বোধ হয় পশুর উন্নতি অধিক হইয়াছে। ইহার কারণ চতুষ্পদীদের উপযুক্ত ঘটক আছে, দ্বিপদীদের তাহা নাই।

ঐ সকল দেশের (Breeders) পশুপালকদের নিকট যাও, তাহারা কোন্ ঘোড়া কোন্ বংশোদ্ভব; কোন্ কুক্কুর কোন্ কুলজ বলিয়া দিবে, হয় ত বলিবে "অমুক ঘোটকের এই গুণ ছিল, তাহার বংশপরম্পরা সেই গুণ চলিয়া আসিতেছিল, পরে বিপরীত দোষবিশিষ্ট অন্য বংশীয় ঘোটকের রক্ত মিশ্রিত হইয়া সে গুণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। মনুষ্য সম্বন্ধে এই সকল পরিচয় দিতে পারে এরূপ ব্যবসায়ী আবশ্যক। আমাদের পুরুষ ঘটক, আবশ্যক জানাইলে, সে পরিচয় দিতে পারিত। কিন্তু এখন স্ত্রীলোক ঘটক তাহারা কেবল অলঙ্কারের পরিচয় দিতে পারে, আবশ্যকীয় বিষয়ের পরিচয় দিতে অশক্ত। আবশ্যকীয় বিষয় কি তাহা গৃহিণীরা জানেন না, সুতরাং এক্ষণে তাহার সনুসন্ধান হয় না।

কর্ত্তৃঠাকুরাণীদের সাহায্যার্থে আমরা নিম্নে কয়েকটি আবশ্যকীয় কথা লিখিলাম, ইচ্ছা হয় সন্তান সন্ততির বিবাহ দিবার সময় এইগুলি স্মরণ করিবেন।

প্রথম। রোগগ্রস্ত বংশে বিবাহ নিষেধ। সকল রোগ কুলজ নহে, কাশ কুষ্ঠ প্রভৃতি কুলজ রোগ, রাগ দ্বেষ উন্মাদ প্রভৃতি ও কুলজ রোগ। এই সকল রোগ যে সকল বংশে আছে, সে বংশ পরিত্যজ্য। পাগলের পুত্র পাগল হয়, কখন কখন পুত্র পাগল না হইয়া পৌত্র পাগল হয়। অনেক কুলজ রোগ এক পুরুষ অন্তর প্রকাশ হয়, বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগ। পিতার যে বয়সে কুলজ রোগ প্রকাশ পাইয়াছে, পুত্রের প্রায় সেই বয়সে কুলজ রোগ আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে বিবাহের বয়সে সেই রোগ নাই বলিয়া

ভবিষ্যতে হইবে না অনুভব করা ভুল। কোন কুলজ রোগ কেবল পুত্রগত থাকে ; আবার কোন কোন বংশে সেই কুলজ রোগ পুত্র কন্যা উভয় শাখা আক্রান্ত করে। এ বিষয়ের অনবধানতা হেতু কঠিন কুলজ রোগ ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। অনেক পবিত্র রক্ত অপবিত্র হইয়া যাইতেছে, সংসারের সুখ নষ্ট হইতেছে।

দ্বিতীয়। অনেক বংশের আয়ু দীর্ঘ থাকে, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সকলেই দীর্ঘজীবী হয়। অতএব বিবাহ স্থির করিবার সময় প্রথম কেবল এই সকল বংশের সন্তান সন্ততি অনুসন্ধান করা উচিত।

তৃতীয়। মৃতবংসার কন্যা প্রায়ই মৃতবংসা হয়, অতএব সে কন্যা পরিত্যাগ করিবে।

চতুর্থ। স্বল্পপুত্রীর কন্যা পরিত্যাগ করিবে। না করিলে বংশ হানি হইবার সম্ভাবনা।

পঞ্চম। কলহপ্রিয়ার কন্যা পরিত্যাগ করিবে, করিলে, সংসারে কলহ নিবৃত থাকে।

ষষ্ঠ। কন্যা অপেক্ষা বরপাত্রের বয়স ন্যূনকল্পে পাঁচ বৎসরের অধিক হওয়া উচিত।

সংসারের সুখ বিবাহের উদ্দেশ্য। সুস্থ শরীর, শান্ত স্বভাব এবং ধনোপার্জ্জন প্রায় এই তিন লইয়া সংসারের সুখ। কেবল ৪ টা পাস করিলেই যে সংসারের সুখ হইবে এমন নহে। ৪ টা পাসকরা বর পাত্র ধনোপার্জ্জন করিলে করিতে পারে, কিন্তু তাহাই বলিয়া যে সে সুস্থশরীরী কি শান্ত স্বভাবাপন্ন হইবে, এরূপ বলা যায় না। সুতরাং কেবল পাসকরা পাত্র অনুসন্ধান করিলে বিবাহ সুবিবাহ হইবে এরূপ বিবেচনা গৃহিণীরা না করিলে ভাল হয়।

ফলিত জ্যোতিষ।

জ্যোতিষশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। গণিত জ্যোতিষ এবং ফলিত জ্যোতিষ।

গণিত জ্যোতিষের দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির গতি প্রকৃতি এবং সংস্থিতি নিরূপণ করা যায়। ইংরাজী নাম Astronomy

ফলিত জ্যোতিষের দ্বারা গ্রহগণ হইতে মনুষ্যের জীবনের যে ফলাফল, তাহা নিরূপিত হয়। ইংরেজী নাম Astrology

উভয় শাস্ত্রই অতি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীতে অধীত হইতেছে। ইউরোপীয়গণ গণিত জ্যোতিষের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর, এবং অপার আনন্দের কারণ। ঈশ্বরতত্ত্ব ভিন্ন মনুষ্যের অনুশীলনীয় এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কিছুই নাই।

ফলিত জ্যোতিষের সেরূপ উন্নতি ঘটে নাই। ফলিতজ্যোতিষ প্রাচীন কালে যেমন ছিল. এখন তেমনি আছে। বরং ইহা কিয়দংশে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইউরোপে ইহার কিছুমাত্র আদর নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এবং জনসাধারণ ইহার প্রতি বিশ্বাসবান নহেন। যে দুই এক জন ইহার প্রতি কিছু আস্থা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা জনসাধারণের নিকট উপহাস প্রাপ্ত হন।

ইউরোপে এইরূপ। ভারতবর্ষে ফলিত জ্যোতিষের চর্চ্চা আজিও আছে। কিন্তু যাঁহাদিগের "কৃতবিদ্য" বলা যায়. তাঁহারা ইউরোপীয়ের শিষ্য. অতএব তাঁহারাও সচরাচর ফলিতজ্যোতিষ ঘৃণা করিয়া থাকেন। সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্র গণিতজ্যোতিষ অধ্যয়ণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ফলিত জ্যোতিষ আচার্য্য দৈবজ্ঞ ভিন্ন প্রায় কেহ অধ্যয়ন করে না। আচার্য্য দৈবজ্ঞগণ যে শ্রেনীর লোক, তাহাদিগের দ্বারা শাস্ত্রের উন্নতি সাধন সম্ভাবনা নাই।

ফলিত জ্যোতিষের প্রতি এই অনাস্থার প্রধান কারণ এই যে ইহা সত্য শাস্ত্র বলিয়া জনসাধারণের, বিশেষতঃ পণ্ডিতগণের, বিশ্বাস নাই। তাঁহারা বলেন'

যে আকাশে গ্রহ রহিল,—গ্রহটা এ দিকে না থাকিয়া ও দিগে আছে, বলিয়া কোন মনুষ্য ধনবান্ কোন মনুষ্য দরিদ্র হইবে, ইহা অসম্ভব কথা। শনি তুলায় থাকিলে জাত ব্যক্তির ইষ্ট সাধন করিবেন, এবং আকাশের বিপরীত ভাগে অর্থাৎ মেষে থাকিলে জাত ব্যক্তির অনিষ্ট সাধন করিবেন এ সকল ব্যাপারের কোন কারণ দেখা যায় না। গ্রহগণের দ্বারা মনের সুখ দুঃখ কেন সাধিত হইবে?

প্রত্যুত্তরে দুই এক জন শিক্ষিত জ্যোতির্বিদ যেরূপ বিচারের দ্বারা স্বপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেন, তাহা হৃদয়গ্রাহী হয় না। হোমিওপাথিক বটিকা বা বসন্তবীজের উপমা ঠিক সঙ্গত নহে। অমাবস্যা পূর্ণিমায় জলোচ্ছ্বাস বা মনুষ্যের রোগ বৃদ্ধি হয় বলিয়া স্থির করা যায় না, যে জড় পদার্থ ভিন্ন মনুষ্যের অদৃষ্টের উপর তাহাদের কোন আধিপত্য আছে।' পূর্ণচন্দ্র শ্লীপদীর পদস্ফীতির আধিক্য সাধন করিতে পারেন স্বীকার করিব, কিন্তু তা পারেন বলিয়া যে তিনি জন্মকালে দশম রাশিতে থাকিলে চাকরি যোটাইয়া দিবেন, এতটা কেহ স্বীকার করিবে না। রবি জ্যৈষ্ঠ মাসের কিরণজালে সকলেরই শিরঃপীড়া সমুৎপন্ন করিতে পারেন, ইহা স্বীকার করা যায়, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি জন্মকালে লগ্ন হইতে যষ্ঠ স্থানে থাকিলে আমার সব শত্রুগুলি নষ্ট করিবেন, এতটা স্বীকার করা যায় না। আর এই যে এতটুকু শারীরিক সম্বন্ধ চন্দ্র সূর্য্যের পক্ষে স্বীকার করা যায়, মঙ্গল বুধাদি গ্রহ সম্বন্ধে তাহাও স্বীকার করা যায় না।

কিন্তু ফলিত জ্যোতিষের পক্ষ হইতে আর এক উত্তর আছে। যাহারা আর সকল বিজ্ঞান শাস্ত্র অমোঘ অব্যর্থ বলিয়া স্বীকার করেন, আর ফলিত জ্যোতিষের প্রতি উপহাস করেন, তাঁহাদিগের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে আপনারা গণিত জ্যোতিষে কেন শ্রদ্ধাবান্ আর ফলিত জ্যোতিষে কেন অশ্রদ্ধাবান্, তাহা হইলে তাঁহারা যে ঠিক একটা ন্যায্য উত্তর দিতে পারিবেন এমত বোধ হয় না। তোমরা বলিতেছ শনি মঙ্গলাদির অবস্থিতি অনুসারে মনুষ্য কেন সুখী বা দুঃখী হইবে, তাহার কারণ দেখা যায় না; ভাল, তোমরা বলিতে পার কি, প্রত্যেক পরমাণু অপর সকল পরমাণুকে কেন আকৃষ্ট করিবে? জন্ম বা বর্ষলগ্ন হইতে অষ্টমে পাপগ্রহ থাকিলে রোগ হইবে কেন, তাহা বলা

যায় না বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়া লাগিলেই বা রোগ হয় কেন, তাহারই বা কোন উত্তর আছে কি? * বৃহস্পতি বা শুক্র কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে থাকিলে মনুষ্যের শুভ ঘটিবে কেন, তাহার কোন উত্তর দিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু কুইনাইনে জ্বর ভাল হয় কেন, তাহারই বা কেহ কি কোন উত্তর দিতে পারে? এ বিষয়ে ফলিত জ্যোতিষে বা বিজ্ঞান শাস্ত্রে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষের বিপক্ষীয়েরা এ কথার একটা উৎকৃষ্ট প্রত্যুত্তর করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন "কেন হয়?" ঈদৃশ প্রশ্নই অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান শাস্ত্র ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তর দেয় না। বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, "হইবার প্রকরণ কি?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। পরমাণু মাত্রকে অপর পরমাণু মাত্র কেন আকৃষ্ট করিবে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। শক্তিটা আকর্ষণী কি বিকর্ষণী, বিজ্ঞান তাহাই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু ইহা বিজ্ঞান ঠিক করিয়া বলিতে পারে, এই শক্তির বল, ব্যুৎক্রমে দূরতার বর্গানুযায়ী। ফলিতজ্যোতির্ব্বিদও বলিতে পারেন বটে, যে তুলায় শনি কেন বলবান্ এবং মেষে শনি কেন দুর্ব্বল, আমি এ কথার উত্তর দিতে পারিনা বটে, কিন্তু আমিও বলিতে পারি যে শনি ও অংশ কলানুসারে এবং মিত্রামিত্র গ্রহের দৃষ্টিযোগানুসারে ফলদান করেন। এতদূর ফলিত জ্যোতিষে এবং অন্য বিজ্ঞানে সাদৃশ্য বটে, কিন্তু অপর সকল বিজ্ঞানের মূল, ভূয়োদর্শন। দেখা গিয়াছে, যে যাহা সর্ব্বদাই ঘটে, তাহাই আবার ঘটিবে। তাহাই বিজ্ঞানের মূল। দেখাগিয়াছে-যেখানে ক

---

* ম্যালেরিয়া এক জাতীয় বিষ—ইহা রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে প্রকৃতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করে—ইত্যাদিবৎ বাক্য উত্তর নয়। বিষ, এখানে পারিভাষিক শব্দ মাত্র—রক্তের সঙ্গে মিশিলে রোগ হয়, বলিয়াই উহাকে বিষ বলিতেছ। আসল কথাটা, ম্যালেরিয়া রক্তের সঙ্গে মিশিলে রোগ হয় কেন? প্রকৃতি তাহাকে নির্গত করিবার চেষ্টা করে কেন? ইহার কোন উত্তর নাই। আদৌ, ম্যালেরিয়া বলিয়া যে কোন পদার্থ আছে, তাহারই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই।

দেখিয়াছি, সেই খানেই খ আসিয়াছে। অতএব দৃঢ়চিত্তে বলা যাইতে পারে, যে যেখানে ক থাকিবে, সেই খানে, খ-বিনাশী কারণান্তর বিদ্যমান না থাকিলে, ভবিষ্যতে অবশ্য খ উপস্থিত থাকিবে। ইহাই সত্য ভবিষ্যদুক্তি, এবং ইহাই সর্ব্ব বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূল।

"এখন তোমরা কি বলিতে পার, যে ফলিত জ্যোতিষের সিদ্ধান্তগুলি এই প্রকার প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত হইয়াছে? তোমরা বল যে জাতকের জন্মে বা বর্ষপ্রবেশ কালে তৃতীয় বা দশমে মঙ্গল থাকিলে, শুভ ফলপ্রদ। ভাল যাঁহারা এই নিয়ম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি, যাহার যাহার তৃতীয় বা দশমে মঙ্গল তাহাদের সকলের জীবনের ফল পর্য্যবেক্ষিত করিয়া এই সকল নিয়ম প্রচারিত করিয়াছিলেন? এমন কেহ কখন জন্মিয়াছে কি না, যে তাহার তৃতীয়ে বা দশমে মঙ্গল আছে; অথচ তাহার তৃতীয় বা দশম ভাবের ফল ভাল হয় নাই, এ বিষয়ের সন্ধান করিয়া, এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায় না, ইহা স্থির করিয়া, তার পর এ নিয়ম প্রচারিত করিয়াছিলেন কি? যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তবে এ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, এবং ইহার উপর নির্ভর করাও যাইতে পারে না।"

ফলিত জ্যোতিষের সপক্ষীয়েরা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে ফলিত জ্যোতিষের তত্ত্ব সকল উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা বলিবার কোন কারণ নাই। জ্যোতির্ব্বিদদিগের গ্রন্থে এমন কোন কথাই নাই, যে তাহা হইতে অনুমান করা যায়, যে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সকল প্রত্যক্ষমূলক। ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, যে আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে এমন অনেক কথা আছে তাহা কখন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, যথা পূর্ব্বজন্মজ্ঞান। কথিত আছে যে

জ্ঞানেন তীর্থরাজেষু মৃত্যোর্মৃত্যুপ্রদোগুরুঃ।
শক্রস্য সদনং নীত্বা পশ্চান্মোক্ষপ্রদো ভবেৎ॥

মৃত্যু স্থানে অর্থাৎ অষ্টম গৃহে বৃহস্পতি থাকিলে তিনি জাতককে মৃত্যুপরে ইন্দ্রলোকে লইয়া গিয়া পশ্চাৎ মোক্ষ প্রদান করেন। এ সকল কথা কি প্রত্যক্ষমূলক?

অতএব এখানে বিচারে ফলিত জ্যোতিষের পক্ষকে একটু হঠিতে হইতেছে। এ শাস্ত্রের তত্ত্বসকল প্রত্যক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। কিয়দংশ হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না। কিন্তু আর একটা কথা আছে। এ সকল তত্ত্বের উৎপত্তি যাহা হইতে হউক না কেন, কার্য্যতঃ তাহার যাথার্থ্য দেখা যায় কি ? মনে কর, তৃতীয়ে বা দশমে রবি শনি বা মঙ্গল থাকিলে, তৃতীয় বা দশমের শুভ ফল হইবে, এ কথা জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণেতৃগণ আপনার চিত্ত হইতে উদ্ভূত করিয়াছেন, বা স্বপ্নে দেখিয়াছেন, কিন্তু তা যাই হউক, বস্তুতঃ যাহার তৃতীয় বা দশমে রবি শনি বা মঙ্গল আছে, তাহার তৃতীয় বা দশমের ফল শুভ, ইহা দেখা যায় কি না? যদি দেখা যায়, তবে ফলিত জ্যোতিষের আদি যাই হউক না কেন, উহা সত্য শাস্ত্র বলিয়া মানিতে হইবে। আর যদি তাহা দেখা না যায়, তবে উহা সত্য শাস্ত্র বলিয়া কদাচ মানিব না।

এই আসল কথা, ফল মিলে কি ? সকল বিজ্ঞান শাস্ত্রেরই প্রকৃত পরীক্ষা এই, ফল মিলে কি ? তুমি বল, কুইনাইনে জ্বর ভাল হয়। ভাল জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে যথানিয়ম কুইনাইন খাওয়াইয়া দেখ। দেখিলে, জানিবে, যে হাঁ কুইনাইনে জ্বর ভাল হয়। সুতরাং চিকিৎসা শাস্ত্রের ঐ কথা মানিব। তুমি বল, জলজনে ও অম্লজনে জল হয়। যথারীতি ঐ দুই বায়ুর সংমিলন করিয়া দেখ। সংমিলন করিয়া যদি দেখি, জল হইল, তবে অবশ্য এ কথা মানিব। তেমনি দেখ, যাহার যাহার তৃতীয় বা দশমে মঙ্গল আছে, তাহাদের ইহ জীবনের তৃতীয় বা দশমের ফল শুভ হইয়াছে কি না। যদি দেখ যে হাঁ, যাহারই যাহারই তৃতীয় বা দশমে মঙ্গল তাহারই তাহারই তৃতীয়* বা দশমের শুভফল ফলিয়াছে, তবে অবশ্য মানিব, যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই তত্ত্ব সত্য বটে। এমনি যদি দেখি ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের সকল বচনের ফল মিলে, তবে আর কোন বিচারই করিব না—অবশ্য মানিব যে ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র সত্য।

---

* মঙ্গল তৃতীয়ে থাকিলে অনুজ পক্ষে শুভ হয় না। কিন্তু অন্য শুভ ফল আছে।

অতএব আসল কথা, ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের ফল মিলে কি? এই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন সকল ফলই মিলে। ইহাঁরা প্রায় এই শাস্ত্রব্যবসায়ী, অথবা তদুপজীবী, অথবা নির্ব্বোধ গোঁড়া। তাঁহাদিগকে যদি দেখাইয়া দাও, যে অমুক স্থানে ফল মিলে নাই, সেখানে তাঁহারা হয় ত বলিবেন, লগ্ন ঠিক নাই, নয় বলিবেন, গণনা ঠিক হয় নাই, নয়, আদৌ মানিবেন না যে ফল মিলিল না। গণক মহাশয় হয় ত তোমাকে গণিয়া বলিয়াছেন যে তুমি জ্যৈষ্ঠ মাসে ধনলাভ করিবে। জ্যৈষ্ঠ গেল, আষাঢ় গেল, তুমি ধন লাভ করা দূরে থাকুক, বরং ঋণগ্রস্থ হইলে। গণক ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তুমি বলিলে, "কুই মহাশয়? ধনলাভ দূরে থাক, কর্জ্জ করিতে হইল।" গণক মহাশয় অম্লান বদনে বলিলেন, "সেই লাভ। কর্জ্জ করিয়া যে টাকা ঘরে আনিয়াছ, সে টাকা কি টাকা নয়?" ইহার অপেক্ষাও নিৰ্লজ্জ জ্যোতির্ব্বিদ দেখা যায়। হয় ত তিনি বলিয়াছেন, "বৈশাখ মাসে তুমি আরোগ্য লাভ করিবে।" বৈশাখ মাসে আরোগ্য লাভ দূরে থাক, হয় ত তোমার রোগ বাড়িয়াছে। গণক ঠাকুরকে সে কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, "তুমি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি অবশ্য আরোগ্য লাভ করিয়াছ—শাস্ত্রের বচন কি মিথ্যা হয়? যদি উত্তর কর; শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয় না, কিন্তু আমি ত শয্যাগত;" গণক উত্তর করিবেন, "আরে, সেই তোমার আরোগ্য। তুমি ত মর নাই!"

অপর সম্প্রদায়ের উত্তর, আমাদের লক্ষিত দ্বিতীয় উত্তর। তাঁহারা বলেন, "ও সব পাগলামি। কই ফল মিলিতে কখন দেখা যায় না।" যদি তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দাও, যে অমুক অমুক স্থানে ফল ঠিক মিলিয়াছে, তাঁহারা বলিবেন, "ও সব Coincidence." যেখানে মিলিবে, সেইখানেই তাঁহাদের মতে Coincidence অথবা "shrewd guess." কাহারও গণনা শত করা নিরানব্বইটা মিলিলেও Coincidence বা আন্দাজ। "শিক্ষিত" সম্প্রদায়ের লোক সচরাচর এই দলভুক্ত।

দেখা যাইতেছে, যে এ উভয় উত্তরের মধ্যে কোন একটির উপরে নির্ভর করা যাইতে পারে না। যাঁহারা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া প্রাচীন কুসংস্কারের বশীভূত আছেন, কোন সংস্কৃত গ্রন্থে কোন একটা বচন

দেখিলে, তাহাই অভ্রান্ত ঋষির উক্তি বলিয়া তাহার উপর অচলা ভক্তি সংস্থাপন করেন, তাঁহারা এ বিষয়ের প্রকৃত বিচারক নহেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা নব্য কুসংস্কারের বশীভূত, দেশী জিনিষ মাত্রেরই উপর অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা করেন, পাশ্চাত্যদিগের মানসিক ক্রীতদাস স্বরূপ হইয়া আছেন, ফলিত জ্যোতিষের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কখন কোন অনুসন্ধান করেন নাই, তাঁহারা এ বিষয়ের প্রকৃত বিচারক নহেন। উভয়েরই মত অগ্রাহ্য।

তবে, ফলিত জ্যোতিষোক্ত ফল ফলে কি না? এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি? উত্তর কঠিন বটে। আমরা যথাসাধ্য একটা উত্তর দিতে পারি। পাঠকের যদি কৌতুহল দেখি, তবে বারান্তরে উত্তর দিব।

কালিদাসের উপমা।

রাক্ষসবংশের নিধন এবং সীতার উদ্ধার সাধন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সস্ত্রীক স্বীয় ভুজবলার্জ্জিত রাবণের শ্রেষ্ঠ বিমান আরোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতেছেন। পুষ্পক রথ আকাশ পথে মেঘমালা ভেদ করিয়া শূন্যে চলিতেছে। সুদূর নিম্নে অনন্ত বিস্তীর্ণ মহান্ সমুদ্র,—বিচিত্র পাদপে শোভমান বিশাল পর্ব্বত-শৃঙ্গ সমূহ মেঘ স্পর্শ করিয়া আছে,—প্রবাহিনী স্রোতস্বতী দূরতানিবন্ধন ক্ষীণ প্রতীয়মানা—নির্ম্মল সলিলে হংসশ্রেণী ক্রীড়া করিতেছে—তীরবনসকল মৃগপক্ষিসঙ্কুল বিচিত্র মনোহর,—লতাকুঞ্জ,—বনস্থলী,—রাক্ষস ভয়শূন্য জীবনময় জনপদ,—হৃদয়গ্রাহী নির্ম্মল সুপ্রচ্ছন্ন শান্ত ঋষির আশ্রম,—বিচিত্র নির্ম্মাণকৌশলসম্পন্ন সরোবরনিমগ্ন প্রমোদোচ্ছাসপূর্ণ বিলাসীর সৌধ,—রামচন্দ্র সীতাকে পুষ্পক হইতে দেখাইতেছেন। সীতার বিচ্ছেদ সময়ে এই সমস্ত সুখকর দৃশ্যাবলী কখন কিরূপ বিষাদ উৎপাদন করিয়াছিল সেই কথা সীতার নিকট বিবৃত করিতেছেন। বিপত্তি অতিবাহিত হইলে, সুখের সময়ে উহার আলোচনায় সুখ আছে। আর দুঃখের সময়ে পূর্ব্বসুখস্মৃতি কেবল যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে।

রামের সেতু মলয় হইতে সুবর্ণ লঙ্কা পর্য্যন্ত বিস্তৃত—দুই পার্শ্বে সফেণ নীল সাগরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রহিয়াছে। রাম দেখাইলেন—

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেণিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রশন্নম্
আকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥

দেখ বৈদেহি! ছায়াপথ কর্ত্তৃক শরৎকালের নির্ম্মল এবং নক্ষত্রশোভী আকাশের ন্যায়, মলয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত আমার সেতু কর্ত্তৃক সফেণ সাগর বিভক্ত হইয়াছে।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী-
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেঃ
ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

তাল, তমাল বনে নীলবর্ণ লবণ সমুদ্রের তীর, সুদূর শূন্যস্থ রামের পুষ্পক হইতে চতুর্দ্দিকে কলঙ্ক রেখাবিশিষ্ট একখানি লৌহ চক্রের ন্যায় প্রতীয়মাণ হইতেছে।

সেইরূপ

এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা
সরিদ্বিদূরান্তরভাবতন্বী।
মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে
মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ॥

দূরতানিবন্ধন ক্ষীণ প্রতীয়মানা স্থিরনির্ম্মলসলিলা ঐ মন্দাকিনী নদী, ভূমির কণ্ঠে মুক্তাহারের ন্যায়, পর্ব্বতকণ্ঠে শোভা পাইতেছে।

পূর্ব্ব পরিচিত শ্যাম বটকে দেখাইয়া রাম সীতাকে বলিতেছেন—

ত্বয়া পুরস্তাদুপযাচিতো যঃ
সোঽয়ং বটঃ শ্যাম ইতি প্রতীতঃ।
রাশির্ম্মণীনামিব গারুড়ানাম্
সপদ্মরাগঃ ফলিতো বিভাতি॥

পূর্ব্বে তুমি যাহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে, শ্যাম নামে অভিহিত এই সেই বট—ফলিত হওয়ায়, সপদ্মরাগ মরকত মণির রাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে।

চারিটী শ্লোকে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের—শ্বেত কৃষ্ণের সম্মিলনের—কেমন মনোহারিণী বর্ণনা—

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈঃ
মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানাম্
ইন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব॥

কোথাও, মাঝে মাঝে প্রভাবিলেপী ইন্দ্রনীলমণিগ্রথিত—মুক্তার মালার ন্যায়। অন্যত্র, মাঝে মাঝে ইন্দীবর খচিত—শ্বেত পদ্মের মালার ন্যায়।

ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাম্
কাদম্বসংসর্গবতীব পংক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা
ভক্তিভূর্বশ্চন্দনকল্পিতেব।

কোথাও, নীল হংসের সহিত—মানসসরোবরপ্রিয় শ্বেত হংসশ্রেণীর ন্যায়। অন্যত্র, কৃষ্ণ চন্দনে অঙ্কিত পত্রাবলীবিশিষ্ট—পৃথিবীর শ্বেত চন্দনের রচনার ন্যায়।

ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিঃ
ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা
রন্ধ্রেম্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশাঃ॥

কোথাও, ছায়াবিলীন অন্ধকারে—বিশুদ্ধ চন্দ্ররশ্মির ন্যায়। অন্যত্র, মাঝে মাঝে নীলাকাশপ্রকাশী—শারদীয় শুভ্র মেঘের ন্যায়।

ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব
ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা
ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥

কোথাও ভস্মাঙ্গরাগযুক্ত কৃষ্ণসর্পভূষিত মহাদেবের শরীরের ন্যায়। অনবদ্যাঙ্গি! যমুনার তরঙ্গে ভিন্নপ্রবাহা গঙ্গা শোভা পাইতেছে, দেখ।

সীতারাম।

দ্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের কথা বাহিরে যায় বটে, কিন্তু কখন ঠিক ঠাক যায় না। স্ত্রীলোকের মুখে মুখে যে কথা টা চালিয়া চালিয়া রটিতে থাকে, সেটা কাজেই মুখে মুখে বড় বাড়িয়া যায়। বিশেষ যেখানে একটু খানি বিস্ময়ের গন্ধ থাকে, সেখানে বড় বাড়িয়া যায়। জয়ন্তী সম্বন্ধে অতিপ্রকৃত রটনা পূর্ব্বে যথেষ্টই ছিল, নাগরিকদিগের কথাবার্ত্তায় আমরা দেখিয়াছি। এখন জয়ন্তী রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, এই সোজা কথাটা যেরূপে বাহিরে রটিল, তাহাতে লোকে বুঝিল, যে দেবী অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই অন্তর্দ্ধান হইলেন, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

কাজেই লোকের দৃঢ় প্রত্যয় হইল, যে তিনি নগরের অধিষ্ঠাত্রী এবং রক্ষা-কর্ত্রী দেবতা—রাজাকে ছলনা করিয়া, এক্ষণে ছল পাইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অতএব রাজ্য আর থাকিবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে জনরব উঠিল, যে মুর্শিদাবাদ হইতে নবাবি ফৌজ আসিতেছে। কাজেই রাজ্যধ্বংস যে অতি নিকট সে বিষয়ে বড় বেশী লোকের সন্দেহ রহিল না। তখন নগর মধ্যে বোঁচকা বাঁধিবার বড় ধুম পড়িয়া গেল। অনেকেই নগর ত্যাগ করিয়া চলিল।

সীতারাম এ সকলের কোন সম্বাদ না রাখিয়া চিত্তবিশ্রামে গিয়া একাকী বাস করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার চিত্তে ক্রোধই প্রবল—সে ক্রোধ সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বগ্রাসক। অন্যকে ছাড়িয়া ক্রোধ শ্রীর উপরেই অধিক প্রবল হইল।

উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে সীতারাম কতকগুলি নীচব্যবসায়ী নীচাশয় অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, "রাজ্যে যেখানে যেখানে যে সুন্দরী স্ত্রী আছে, আমার জন্য চিত্তবিশ্রামে লইয়া আইস।" তখন দলে দলে সেই পামরেরা চারি দিগে ছুটিল। যে অর্থের বশীভূতা তাহাকে অর্থ দিয়া লইয়া আসিল;

যে সাধ্বী তাহাকে বলপূর্ব্বক আনিতে লাগিল। রাজ্যে হাহাকারের উপর আবার হাহাকার পড়িয়া গেল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, চন্দ্রচূড়, ঠাকুর এবার কাহাকে কিছু না বলিয়া তল্পী বাঁধিয়া মুটের মাথায় দিয়া, তীর্থযাত্রা করিলেন। ইহজীবনে আর মহম্মদপুরে ফিরিলেন না।

পথে যাইতে যাইতে চাঁদশাহ ফকিরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ফকির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর জি, কোথায় যাইতেছেন?"

চন্দ্র। কাশী। আপনি কোথায় যাইতেছেন?

ফকির। মক্কা।

চন্দ্র। তীর্থযাত্রায়?

ফকির। যে দেশে হিন্দু আছে সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

জয়ন্তী, প্রসন্নমনে মহম্মদপুর হইতে নির্গত হইল। দুঃখ কিছুই নাই—মনে বড় সুখ। পথে চলিতে চলিতে মনে মনে ডাকিতে লাগিল—"জয় জগন্নাথ—তোমার দয়া অনন্ত! তোমার মহিমার পার নাই! তোমাকে যে না জানে, যে না ভাবে, সেই ভাবে বিপদ! বিপদ কাহাকে বলে, প্রভু! তাহা বলিতে পারি না, তুমি যাহাতে আমাকে ফেলিয়াছিলে, তাহা পরম সম্পদ! আমি এত দিন এমন করিয়া বুঝিতে পারি নাই, যে আমি ধর্ম্মভ্রষ্টা, কেন না বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিতা, বৃথা অভিমানে অভিমানিনী, অহঙ্কারবিমূঢ়া। অর্জ্জুন ডাকিয়াছিলেন, আমিও ডাকিতেছি প্রভু, শিখাও প্রভু! শাসন কর!

যচ্ছ্রেয়ং স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

জয়ন্তী, জগদীশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিতে শিখিয়াছিল। মনের সকল কথা খুলিয়া বিশ্বপিতার নিকট বলিতে শিখিয়াছিল। বালিকা যেমন মা বাপের নিকট আবদার করে, জয়ন্তীও তেমনি

সেই পরম পিতা-মাতার নিকট আবদার করিতে শিখিয়াছিল। এখন জয়ন্তী একটা আবদার লইল। আবদার সীতারামের জন্য। সীতারামের যে মতি গতি, সীতারাম ত উৎসন্ন যায়, বিলম্ব নাই। তার কি রক্ষা নাই? অনন্ত দয়ার আধারে তাহার জন্য কি একটু দয়া নাই? জয়ন্তী তাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, "আমি জানি, ডাকিলে তিনি অবশ্য শুনেন। সীতারাম ডাকে না—ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে—নহিলে এমন করিয়া ডুবিবে কেন? জানি, পাপির দণ্ডই এই, যে সে দয়াময়কে ডাকিতে ভুলিয়া যায়। তাই সীতারাম তাঁকে ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে. আর ডাকে না। তা, সে না ডাকুক আমি তার হইয়া জগদীশ্বরকে ডাকিলে তিনি কি শুনিবেন না? আমি যদি বাপের কাছে আবদার করি, যে এই পাপিষ্ঠ সীতারামকে পাপ হইতে মোচন কর, তবে কি তিনি শুনিবেন না? জয় জগন্নাথ, তোমার নামের জয়! সীতারামকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

তার পর জয়ন্তী ভাবিল, যে নিশ্চেষ্ট তাহার ডাক ভগবান্ শুনেন না। আমি যদি নিজে সীতারামের উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা না করি, তবে ভগবান্ কেন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন? দেখি কি করা যায়। আগে শ্রীকে চাই। শ্রী পলাইয়া, ভাল করে নাই। অথবা না পলাইলেও কি হইত বলা যায় না। আমার কি সাধ্য যে ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারণপরম্পরা বুঝিয়া উঠি।"

জয়ন্তী, তখন শ্রীর কাছে চলিল। যথাকালে শ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জয়ন্তী শ্রীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিল। শ্রী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "রাজার অধঃপতন নিকট। তাঁহার উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই?"

জয়ন্তী। উপায় ভগবান্। ভগবান্‌কে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। ভগবান্‌কে যে দিন আবার তাঁর মনে হইবে সেই দিন তাঁহার আবার উন্নতি আরম্ভ হইবে।

শ্রী। তাহার উপায় কি? আমি যখন তাঁর কাছে ছিলাম, তখন সর্ব্বদা ভগবৎপ্রসঙ্গই তাঁর কাছে কহিতাম। তিনি ত মনোযোগ দিয়া শুনিতেন।

জয়ন্তী। তোমার মুখের কথা, তাই মনোযোগ দিতেন। তোমার মুখ পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতেন, তোমার রূপে ও কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া থাকি-

তেন, ভগবৎপ্রসঙ্গ তাঁর কানে প্রবেশ করিত না। তিনি কোন দিন তোমার এ সকল কথার কিছু উত্তর করিয়াছিলেন কি? কোন দিন কোন তত্ত্বের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি? হরিনামে কোন দিন উৎসাহ দেখিয়াছিলে কি?

শ্রী। না। তা, বড় লক্ষ্য করি নাই।

জ। তবে সে মনোযোগ তোমার লাবণ্যের প্রতি—ভগবৎপ্রসঙ্গে নয়।

শ্রী। তবে, এখন কি করা কর্ত্তব্য?

জ। তুমি করিবে কি? তুমি ত বলিয়াছ যে তুমি সন্ন্যাসিনী, তোমার কর্ম্ম নাই?

শ্রী। যেমন শিখাইয়াছ।

জ। আমি কি তাই শিখাইয়াছিলাম? আমি কি শিখাই নাই যে অনুষ্ঠেয় যে কর্ম্ম, অনাসক্ত হইয়া ফলত্যাগ পূর্ব্বক তাহার নিয়ত অনুষ্ঠান করিলেই কর্ম্মত্যাগ হইল, নচেৎ হইল না?* স্বামিসেবা কি তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে?

শ্রী। তবে আমাকে পলাইতে পরামর্শ দিয়াছিলে কেন?

জ। তুমি যে বলিলে, তোমার শত্রু রাজা নিয়া বার জন। যদি ইন্দ্রিয়-গণ তোমার বশ্য নয়, তবে তোমার স্বামিসেবা সকাম হইয়া পড়িবে। অনাশক্তি ভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানে কর্ম্মত্যাগ ঘটে না। তাই তোমাকে পলাইতে বলিয়াছিলাম। যার যে ভার সয় না, তাকে সে ভার দিই না। পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং ইত্যাদি উপমা মনে আছে ত?

শ্রী বড় লজ্জিতা হইল। ভাবিয়া বলিল "কাল ইহার উত্তর দিব।"

সে দিন আর সে কথা হইল না। শ্রী সে দিন জয়ন্তীর সঙ্গে বড় দেখা সাক্ষাৎ করিল না। পরে জয়ন্তী তাহাকে ধরিল। বলিল, "আমার কথার কি উত্তর, সন্ন্যাসিনি?"

---

* কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥

গীতা ১৮।৯

শ্রী বলিল, "আমায় আর একবার পরীক্ষা কর।"

জয়ন্তী বলিল, "এ কথা ভাল। তবে মহম্মদপুর চল। তোমার আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, পথে তার পরামর্শ করিতে করিতে যাইব।"

দুই জনে তখন পুনর্ব্বার মহম্মদপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গারাম গেল, রমা গেল, শ্রী গেল, জয়ন্তী গেল, চন্দ্রচূড় গেল, চাঁদশাহ গেল। তবু সীতারামের চৈতন্য নাই।

বাকি মৃণ্ময় আর নন্দা। নন্দা এবার বড় রাগিল—আর পতিভক্তিতে রাগ থামে না। কিন্তু নন্দার আর সহায় নাই। এক মৃণ্ময় মাত্র সহায় আছে। অতএব নন্দা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য, একদিন প্রাতে মৃণ্ময়কেই ডাকিতে পাঠাইল। সে ডাক মৃণ্ময়ের নিকট পৌঁছিল না। মৃণ্ময় আর নাই। সেই দিন প্রাতে মৃণ্ময়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

প্রাতে উঠিয়াই মৃণ্ময় সম্বাদ শুনিলেন, যে মুসলমান সেনা মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে—আগতপ্রায়—প্রায় গড়ে পৌঁছিল। বজ্রাঘাতের ন্যায় এ সম্বাদ মৃণ্ময়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। মৃণ্ময়ের যুদ্ধের কোন উদ্যোগই নাই। এখন আর চন্দ্রচূড়ের সে গুপ্তচর নাই, যে পূর্ব্বাহ্নে সম্বাদ দিবে। সম্বাদ পাইবামাত্র মৃণ্ময় সবিশেষ জানিবার জন্য স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গিয়া সহসা মুসলমান সেনার সম্মুখে পড়িলেন। তিনি পলাইতে জানিতেন না। সুতরাং তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন।

মুসলমান সেনা আসিয়া সীতারামের দুর্গ বেষ্টন করিল—নগর ভাঙ্গিয়া অবশিষ্ট নাগরিকেরা পলাইয়া গেল। চিত্তবিশ্রামে যেখানে সুন্দরীমণ্ডল পরিবেষ্টিত সীতারাম লীলায় উন্মত্ত, সেইখানে সীতারামের কাছে সম্বাদ পৌঁছিল, যে "মৃণ্ময় মরিয়াছে। মুসলমান সেনা আসিয়া দুর্গ ঘেরিয়াছে।" সীতারাম মনে মনে বলিলেন, "তবে আজ শেষ। ভোগ বিলাসের শেষ; রাজ্যের শেষ; জীবনের শেষ।" তখন রাজা রমণীমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

বিলাসিনীরা বলিল, "মহারাজ কোথা যান? আমাদের ফেলিয়া কোথা যান?"

সীতারাম চোপদারকে আজ্ঞা করিলেন, "ইহাদের বেত মারিয়া তাড়াইয়া দাও।"

স্ত্রীলোকেরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া হরিবোল্ দিয়া উঠিল। তাহাদিগের থামাইয়া ভানুমতী নামে, তাহাদিগের মধ্যস্থা এক সুন্দরী রাজার সম্মুখীন হইয়া বলিল,

"মহারাজ! আজ জানিলে বোধ হয়, যে সত্য সত্যই ধর্ম্ম আছে। আমরা কুলকন্যা, আমাদের কুলনাশ, ধর্ম্মনাশ করিয়াছ, মনে করিয়াছ কি তাহার প্রতিফল নাই? আমাদের কাহারও মা কাঁদিতেছে, কাহারও বাপ কাঁদিতেছে, কাহার ও স্বামী কাঁদিতেছে, কারও শিশুসন্তান কাঁদিতেছে—মনে করিয়াছিলেন কি যে সে কান্না জগদীশ্বর শুনিতে পান না? মহারাজ, নগরে না, বনে যাও, লোকালয়ে আর মুখ দেখাইওনা; কিন্তু মনে রাখিও যে ধর্ম্ম আছে।"

রাজা এ কথার উত্তর না করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বায়ুবেগে অশ্ব সঞ্চালিত করিয়া দুর্গদ্বারে চলিলেন। যুবতীগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কেহ বলিল, "আয় ভাই, রাজার রাজধানী লুটি গিয়া চল।" "সীতারাম রায়ের সর্ব্বনাশ দেখি গিয়া চল," কেহ বলিল, "সীতারাম আল্লা ভজিবে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ভজিগে চল।" সে সকল কথা রাজার কাণে গেল না। ভানুমতীর কথায় রাজার কাণ ভরিয়াছিল। রাজা এখন স্বীকার করিলেন, "ধর্ম্ম আছে।"

রাজা গিয়া দেখিলেন, মুসলমান সেনা, এখন গড় ঘেরে নাই—সবে আসিতেছে মাত্র—তাহাদের অগ্রবর্ত্তী ধূলি, পতাকা ও অশ্বারোহী সকল নানা দিগে ধাবমান হইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিতেছে। এবং প্রধানাংশ দুর্গদ্বার সম্মুখে আসিতেছে। সীতারাম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

তখন রাজা চারিদিগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রায় শিপাহী নাই। বলা বাহুল্য যে তাহারা অনেক দিন বেতন না পাইয়া ইতি-

পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল—যে কয়জন বাকি ছিল, তাহারা মৃণ্ময়ের মৃত্যু ও মুসলমানের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। তবে দুই চারি জন ব্রাহ্মণ বা রাজপুত অত্যন্ত প্রভুভক্ত, একবার নূন খাইলে আর ভুলিতে পারে না, তাহারাই আছে। গণিয়া গাঁথিয়া তাহারা জোর পঞ্চাশ জন হইবে। রাজা মনে মনে কহিলেন, "অনেক পাপ করিয়াছি—ইহাদের প্রাণ দান করিব। ধর্ম্ম আছে।"

রাজা দেখিলেন, রাজকর্ম্মচারীরা কেহই নাই. সকলেই আপন আপন ধন প্রাণ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ভৃত্যবর্গ কেহ নাই কেবল দুই এক জন অতি পুরাতন দাস দাসী প্রভুর সঙ্গে একত্রে প্রাণপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাশ্রুলোচনে অবস্থিতি করিতেছে।

রাজা তখন অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজন যে যে পুরীমধ্যে বাস করিত, সকলেই যথাকালে আপন আপন প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। সেই বৃহৎ রাজভবন, আজ অরণ্যতুল্য, জনশূন্য, নিঃশব্দ, অন্ধকার! রাজার চক্ষে জল আসিল।

রাজা মনে জানিতেন, নন্দা কখনও যাইবে না, তাহার যাইবারও স্থান নাই। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে নন্দার সন্ধানে চলিলেন। তখন গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া মুসলমানের কামান ডাকিতে লাগিল—তাহারা আসিয়া গড় ঘেরিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। মহা কোলাহল, অন্তঃপুর হইতে শুনা যাইতে লাগিল।

রাজা নন্দার ভবনে গিয়া দেখিলেন, নন্দা ধূলায় পড়িয়া শুইয়া আছে, চারি পাশে তাহার পুত্রকন্যা এবং রমার পুত্র বসিয়া কাঁদিতেছে। রাজাকে দেখিয়া নন্দা বলিল, "হায় মহারাজ! এ কি করিলে!"

রাজা বলিলেন, "যাহা অদৃষ্টে ছিল তাই করিয়াছি। আমি প্রথমে পতিঘাতিনী বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহার কুহকে পড়িয়া এই মৃত্যুবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে—"

নন্দা। "সে কি মহারাজ? শ্রী?"

রাজা। শ্রীর কথাই বলিতেছি।

নন্দা। যাহাকে আমরা ডাকিনী বলিয়া জানিতাম, সে শ্রী? এত দিন

বল নাই কেন মহারাজ?" নন্দার মুখ সেই আসন্ন মৃত্যুকালেও প্রফুল্ল হইল।

রাজা। বলিয়াই কি হইবে? ডাকিনীই হৌক, শ্রীই হোক, ফল একই হইয়াছে। মৃত্যু উপস্থিত।

নন্দা। মহারাজ! শরীর ধারণে মৃত্যু আছেই। সে জন্য দুঃখ করি না। তবে তুমি লক্ষযোদ্ধার নায়ক হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মরিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব—তাহা অদৃষ্টে ঘটিল না কেন?

রাজা। লক্ষ যোদ্ধা আমার নাই। একশত যোদ্ধাও নাই। কিন্তু আমি যুদ্ধে মরিব, তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। আমি এখনই ফটক খুলিয়া মুসলমান সেনামধ্যে একাই প্রবেশ করিব। তোমাকে বলিতে ও হাতিয়ার লইতে আসিয়াছি।

নন্দার চক্ষে বড় ভারি বেগে স্রোত বহিতে লাগিল—কিন্তু নন্দা তাহা মুছিল। বলিল,

"মহারাজ আমি যদি ইহাতে নিষেধ করি, তবে আমি তোমার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তুমি যে প্রকৃতিস্থ হইয়াছ—ইহাই আমার বহু ভাগ্য—আর যদি দুদিন আগে হইত! তুমিও মরিবে মহারাজ! আমিও মরিব—তোমার অনুগমন করিব। কিন্তু ভাবিতেছি—এই অপোগণ্ড গুলির কি হইবে? ইহারা যে মুসলমানের হাতে পড়িবে।,,

এবার নন্দা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

রাজা বলিলেন, "তাই, তোমার মরা হইবে না। ইহাদিগের জন্য তোমাকে থাকিতে হইবে।"

নন্দা। আমি থাকিলেই বা উহারা বাঁচিবে কি প্রকারে?

রাজা। নন্দা! এত লোক পলাইল—তুমি পলাইলে না কেন? তাহা হইলে ইহারা রক্ষা পাইত?

নন্দা। তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ! তোমার পুত্রকন্যা আমি তোমাকে না বলিয়া কাহার হাতে দিব? পুত্র বল, কন্যা বল, সকলই ধর্ম্মের জন্য। আমার ধর্ম্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্র কন্যা লইয়া কোথায় যাইব?

রাজা। কিন্তু এখন উপায়!

নন্দা। এখন আর উপায় নাই। অনাথা দেখিয়া মুসলমান যদি দয়া করে। না করে, জগদীশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবে। মহারাজ, রাজার ঔরসে ইহাদের জন্ম। রাজকুলের সম্পদ বিপদ উভয়ই আছে—তজ্জন্য আমার তেমন চিন্তা নাই। পাছে, তোমায় কেহ কাপুরুষ বলে আমার সেই বড় ভাবনা।

রাজা। তবে বিধাতা যাহা করিবেন তাহাই হইবে। ইহজন্মে তোমাদের সঙ্গে এই দেখা।

এই বলিয়া আর কোন কথা না কহিয়া রাজা সজ্জার্থ অস্ত্রগৃহে গেলেন। নন্দা বালক বালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া, রাজার সঙ্গে অস্ত্রগৃহে গেলেন। রাজা রণসজ্জায় আপনাকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন, নন্দা বালক বালিকাগুলি লইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে দেখিতে লাগিল।

যোদ্ধৃবেশ পরিধান করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্র বাঁধিয়া, সীতারাম আবার সীতারামের মত শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি তখন বীরদর্পে, মৃত্যু কামনায়, একাকী দুর্গ দ্বারাভিমুখে চলিলেন। নন্দা আবার মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

একাকী দুর্গদ্বারে যাইতে দেখিলেন, যে যে বেদীতে জয়ন্তীকে বেত্রাঘাতের জন্য আরূঢ় করিয়াছিলেন, সেই বেদীতে দুইজন কে বসিয়া রহিয়াছে। সেই মৃত্যুকামী যোদ্ধারও হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইল। শশব্যস্তে নিকটে আসিয়া দেখিলেন—ত্রিশূল হস্তে, গৈরিকভস্মরুদ্রাক্ষবিভূষিতা, জয়ন্তীই পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশে, সেইরূপ ভৈরবীবেশে শ্রী!

রাজা তাহাদিগকে সেই বিষম সময়ে, তাঁহার আসন্নকালে, সেই বেশে সেই স্থানে সমাসীনা দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন। বলিলেন, "তোমরা আমার এই আসন্নকালে এখানে আসিয়া কেন বসিয়া আছ? তোমাদের এখনও কি মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই?"

জয়ন্তী ঈষৎ হাসিল। রাজা দেখিলেন, শ্রী গদ্গদ কণ্ঠ, সজললোচন—কথা কহিবে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। রাজা তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শ্রী কিছু বলিল না।

রাজা তখন বলিলেন, "শ্রি! তোমারই অদৃষ্ট ফলিয়াছে। তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। তোমাকে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী বলিয়া আগে ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছিলাম। এখন অদৃষ্ট ফলিয়াছে—আর কেন আসিয়াছ?"

শ্রী। আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে—তাহা করিতে আসিয়াছি। আজ তোমার মৃত্যু উপস্থিত, আমি তোমার সঙ্গে মরিতে আসিয়াছি।

রাজা। সন্ন্যাসিনীরা কি অনুমৃতা হয়?

শ্রী। সন্ন্যাসীই হউক, আর গৃহীই হউক, মরিবার অধিকার সকলেরই আছে।

রাজা। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নাই। তুমি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছ—তুমি আমার সঙ্গে মরিবে কেন? আমার সঙ্গে, নন্দা যাইবে, প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন কর।

শ্রী। মহারাজ! যদি এত কাল আমার উপর রাগ করেন নাই, তবে আজ আর রাগ করিবেন না। আমি আপনার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তা এই আপনার আর আমার আসন্ন মৃত্যুকালে বুঝিয়াছি। এই আপনার পায়ে মাথা দিয়া,———

এই বলিয়া শ্রী মঞ্চ হইতে নামিয়া সীতারামের চরণের উপর পড়িয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল———

এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি—আমি আর সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?"

সী। তোমায় ত বড় আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলাম—এখন আর ত গ্রহণের সময় নাই।

শ্রী। সময় আছে—আমার মরিবার সময় যথেষ্ট আছে।

সী। শ্রী, তুমিই আমার মহিষী।

শ্রী, রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। জয়ন্তী বলিল, "আমি ভিখারিণী আশীর্ব্বাদ করিতেছি—আজ হইতে অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জয়যুক্ত হইবেন।"

সী। মা! তোমার নিকট আমি বড় অপরাধী। তুমি যে আজ আমার দুর্দ্দশা দেখিতে আসিয়াছ, তাহা মনে করি না, তোমার আশীর্ব্বাদেই বুঝি-

তেছি তুমি যথার্থ দেবী। এখন আমায় বল তোমার কাছে কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে তুমি প্রসন্ন হও! ঐ শোন! মুসলমানের কামান! আমি ঐ কামানের মুখে এখনই এই দেহসমর্পন করিব। কি করিলে তুমি প্রসন্ন হও, তা এই সময়ে বল।

জয়ন্তী। আর এক দিন তুমি একাই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলে।

রাজা। আজ তাহা হয় না। জলে আর তটে অনেক প্রভেদ। পৃথিবীতে এমন মনুষ্য নাই যে আজ একা দুর্গ রক্ষা করিতে পারে।

জয়ন্তী। তোমার ত এখনও পঞ্চাশ জন সিপাহী আছে।

রাজা। ঐ কোলাহল শুনিতেছ? ঐ সেনা সকলের এই পঞ্চাশ জনে কি করিবে? আমার আপনার প্রাণ আমি যখন ইচ্ছা, যেমন করিয়া ইচ্ছা, পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু বিনাপরাধে উহাদিগের হত্যা করি কেন? পঞ্চাশ জন লইয়া এ যুদ্ধে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই।

শ্রী। মহারাজ! আমি বা নন্দা মরিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু নন্দা রমার কতকগুলি পুত্রকন্যা আছে, তাহাদের রক্ষার কিছু কি উপায় হয় না?

সীতারামের চক্ষে জলধারা ছুটিল। বলিলেন, "নিরুপায়! উপায় কি করিব?"

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ! নিরুপায়ের এক উপায় আছে—আপনি কি তাহা জানেন না? জানেন বৈ কি? জানিতেন, জানিয়া ঐশ্বর্য্যমদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—এখন কি সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়ে না?"

সীতারাম মুখ নত করিলেন। তখন অনেক দিনের পর, সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়িল। কাল কাদম্বিনী বাতাসে উড়িয়া গেল—হৃদয় মধ্যে অল্পে অল্পে, ক্রমে ক্রমে, সূর্য্যরশ্মি বিকশিত হইতে লাগিল—চিন্তা করিতে করিতে অনন্তব্রহ্মাণ্ডপ্রকাশক সেই মহাজ্যোতিঃ প্রভাসিত হইল। তখন সীতারাম মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন! "নাথ! দীননাথ! অনাথনাথ! নিরুপায়ের উপায়! অগতির গতি! পুণ্যময়ের আশ্রয়! পাপিষ্ঠের পরিত্রাণ! আমি পাপিষ্ঠ বলিয়া আমায় কি দয়া করিবে না!"

সীতারাম অনন্যমনা হইয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন দেখিয়া, শ্রীকে জয়ন্তী ইঙ্গিত করিল। তখন সহসা দুই জনে সেই মঞ্চের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাত যুক্ত করিয়া, উর্দ্ধনেত্র হইয়া, ডাকিতে লাগিল—গগণ-বিহারী গগণবিদারী কলবিহঙ্গনিন্দিত কণ্ঠে, সেই মহাদুর্গের চারি দিগ প্রতিধ্বনিত করিয়া ডাকিতে লাগিল,

ত্বমাদিদেব পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ !॥

দুর্গের বাহিরে সাগরগর্জ্জনবৎ সেই মুসলমান সেনার কোলাহল; প্রাচীর ভেদার্থ প্রক্ষিপ্ত কামানের ভীষণ নিনাদ—মাঠে মাঠে, জঙ্গলে জঙ্গলে, নদীর বাঁকে বাঁকে, প্রতিধ্বনিত হইতেছে;—দুর্গমধ্যে জনশূন্য, সেই প্রতিধ্বনিত কোলাহল ভিন্ন শব্দশূন্য—তাহার মধ্যে সেই সাক্ষাৎ জ্ঞান ও ভক্তিরূপিণী জয়ন্তী ও শ্রীর সপ্তস্বরসম্বাদী অতুলিতকণ্ঠনিঃসৃত মহাগীতি আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, সীতারামের শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল—

নমোনমোঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব !॥

শুনিতে শুনিতে সীতারাম বিমুগ্ধ হইলেন,—আসন্ন বিপদ্ ভুলিয়া গেলেন, যুক্তকরে, উর্দ্ধমুখে, বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন,—তাঁহার চিত্ত আবার বিশুদ্ধ হইল। জয়ন্তী ও শ্রী সেই আকাশবিপ্লবী কণ্ঠে আবার হরিনাম করিতে লাগিল, হরি! হরি! হরি! হরি হে! হরি! হরি! হরি! হরি হে!

এমন সময়ে দুর্গমধ্যে মহা কোলাহল হইতে লাগিল—শব্দ শুনা গেল—"জয় মহারাজ কি জয়! জয় সীতারাম কি জয়!"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাঠককে বলিতে হইবে না, যে দুর্গমধ্যেই শিপাহীরা বাস করিত। ইহাও বলা গিয়াছে, যে শিপাহী সকলই দুর্গ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, কেবল জন পঞ্চাশ নিতান্ত প্রভুভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত পলায় নাই। তাহারা বাছা বাছা লোক—বাছা বাছা লোক নহিলে এমন সময়েও বিনা বেতনে কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া থাকে না। এখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। এ দিকে মুসলমান সেনা আসিয়া পড়িয়াছে, মহা কোলাহল করিতেছে, কামানের ডাকে মেদিনী কাঁপাইতেছে—গোলার আঘাতে দুর্গ-প্রাচীর ফাটাইতেছে—তবু ইহাদিগকে সাজিতে কেহ হুকুম দেয় না! রাজা নিজে আসিয়া সব দেখিয়া গেলেন। কৈ? তাহাদের ত সাজিতে হুকুম দিলেন না! তাহারা কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া আছে, অন্য পুরস্কার কামনা করে না, কিন্তু তাও ত ঘটিয়া উঠে না—কেহ ত বলে না, "আইস! আমার জন্য মর!" তখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

তখন তাহারা সকলে মিলিয়া এক বৈঠক করিল। রঘুবীর মিশ্র তাহার মধ্যে প্রাচীন এবং উচ্চপদস্থ—রঘুবীর তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। বলিল, "ভাই সব! ঘরের ভিতর মুসলমান আসিয়া খোঁচাইয়া মারিবে, সেই কি ভাল হইবে? আইস মরিতে হয় ত মরদের মত মরি! চল, সাজিয়া গিয়া লড়াই করি। কেহ হুকুম দেয় নাই—নাই দিক্! মরিবার আবার হুকুম হাকাম কি? মহারাজের নিমক্ খাইয়াছি, মহারাজের জন্য লড়াই করিব—তা হুকুম না পাইলে কি সময়ে তাঁর জন্য হাতিয়ার ধরিব না? চল হুকুম হোক্ না হোক্, আমরা গিয়া লড়াই করি!"

এ কথায় সকলেই সম্মত হইল। তবে, গয়াদীন পাঁড়ে প্রশ্ন তুলিল যে, "লড়াই করিব কি প্রকার? এখন দুর্গ রক্ষার উপায় একমাত্র কামান। কিন্তু গোলন্দাজ ফৌজ ত সব পলাইয়াছে। আমরা ত কামানের কাজ তেমন জানি না। আমাদের কি রকম লড়াই করা উচিত?"

তখন এ বিষয়ের বিচার আরম্ভ হইল। তাহাতে দুর্ম্মদ সিংহ জমাদ্দার বলিল, "অত বিচারে কাজ কি? হাতিয়ার আছে, ঘোড়া আছে, রাজাও

গড়ে আছে। চল, আমরা হাতিয়ার বাঁধিয়া, ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া রাজার কাছে গিয়া হুকুম লই। মহারাজ যাহা বলিবেন তাহাই করা যাইবে।"

এই প্রস্তাব অতি উত্তম বলিয়া স্বীকার করিয়া সকলেই অনুমোদন করিল। অতি ত্বরা করিয়া সকলে রণসজ্জা করিল—আপন অশ্ব সকল সুসজ্জিত করিল। তখন সকলে সজ্জীভূত ও অশ্বারূঢ় হইয়া আস্ফালন পূর্ব্বক, অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা শব্দ উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল

"জয় মহারাজ কি জয়! জয় রাজা সীতারাম কি জয়!"

সেই জয়ধ্বনি সীতারামের কানে প্রবেশ করিয়াছিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

যোদ্ধৃগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যথায় মঞ্চপার্শ্বে সীতারাম, জয়ন্তী ও শ্রীর মহাগীতি শুনিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া জয়ধ্বনি করিল।

রঘুবীর মিশ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের কি হুকুম! আজ্ঞা পাইলে আমরা এই কয় জন নেড়ামুণ্ডকে হাঁকাইয়া দিই।"

সীতারাম বলিলেন, "তোমরা এইখানে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর। আমি আসিতেছি।"

এই বলিয়া রাজা অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শিপাহীরা ততক্ষণ নিবিষ্টমনা হইয়া অবিচলিত চিত্ত এবং অস্খলিতপ্রারম্ভ সেই সন্ন্যাসিনী দ্বয়ের স্বর্গীয় গান শুনিতে লাগিল।

যথাকালে রাজা এক দোলা সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। রাজভৃত্যেরা সব পলাইয়াছিল বলিয়াছি। কিন্তু দুই চারি জন প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য পলায় নাই, তাহাও বলিয়াছি। তাহারাই দোলা বহিয়া আনিতেছিল। দোলার ভিতরে নন্দা এবং বালকবালিকাগণ।

রাজা শিপাহীদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া, অতি প্রাচীন প্রথানুসারে একটি অতি ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ

রচনা করিলেন। রন্ধ্রমধ্যে নন্দার শিবিকা রক্ষা করিয়া স্বয়ং সূচীমুখে অশ্বারোহণে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি জয়ন্তী ও শ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাহিরে কেন? সূচীর রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ কর?"

জয়ন্তী ও শ্রী হাসিল। বলিল, আমরা সন্ন্যাসিনী, জীবনে ও মৃত্যুতে প্রভেদ দেখি না।"

তখন সীতারাম আর কিছু না বলিয়া, "জয় জগদীশ্বর! জয় লছমীনারায়ণ জী!" বলিয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তখন সেই সন্ন্যাসিনী অবলীলাক্রমে তাঁহার অশ্বের সম্মুখে আসিয়া, ত্রিশূলদ্বয় উন্নত করিয়া,

জয় শিব শঙ্কর! ত্রিপুরনিধনকর!
রণে ভয়ঙ্কর! জয় জয় রে!
চক্রগদাধর, কৃষ্ণ পীতাম্বর
জয় জয় হরিহর! জয় জয় রে!

ইত্যাকার জয়ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিল। সবিস্ময়ে রাজা বলিলেন,

"সে কি? এখনই পিশিয়া মরিবে যে?"

শ্রী বলিল, "মহারাজ! রাজাদিগের অপেক্ষা সন্ন্যাসীদিগের মরণে ভয় কি বেশী?" কিন্তু জয়ন্তী কিছু বলিল না। জয়ন্তী আর দর্প করে না। রাজা ও এই স্ত্রীলোকেরা কথার বাধ্য নহে বুঝিয়া, আর কিছু বলিলেন না।

তার পর দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজা স্বহস্তে তাহার চাবি খুলিয়া অর্গল মোচন করিলেন। লৌহার শিকল সকলে মহা ঝঞ্ঝনা বাজিল—সিংহদ্বারের উচ্চ গুম্বুজের ভিতরে, তাহার ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল—সেই অশ্বগণের পদধ্বনিও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন যবনসেনাসাগরের তরঙ্গাভিঘাতে সেই দুশ্চালনীয় লৌহনির্ম্মিত বৃহৎ কপাট আপনি উদ্ঘাটিত হইল—উন্মুক্ত দ্বারপথ দেখিয়া সূচীব্যূহস্থিত রণবাজিগণ নৃত্য করিতে লাগিল।

এদিগে যেমন বাঁধ ভাঙ্গিলে বন্যার জল, পার্ব্বত্য জলপ্রপাতের মত ভীষণ

বেগে প্রবাহিত হয়, মুসলমান সেনা দুর্গ দ্বারমুক্ত পাইয়া তেমনি বেগে ছুটিল। কিন্তু সম্মুখেই জয়ন্তী ও শ্রীকে দেখিয়া সেই সেনা তরঙ্গ,—সহসা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত যেন নিশ্চল হইল। যেমন বিশ্ববিমোহিনী দৈবী মূর্ত্তি, তেমনি অদ্ভুত বেশ, তেমনি অদ্ভুত, অশ্রুতপূর্ব্ব সাহস, তেমনি সর্ব্বজন-মনোমুগ্ধকরী সেই জয়গীতি!—মুসলমান সেনা তাহাদিগকে পুররক্ষাকারিণী দেবী মনে করিয়া সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। তাহারা ত্রিশূল ফলকের দ্বারা পথ পরিস্কার করিয়া, যবন সেনা ভেদ করিয়া চলিল। সেই ত্রিশূল নির্ম্মুক্ত পথে সীতারামের সূচীব্যূহ অবলীলাক্রমে মুসলমান সেনা ভেদ করিয়া চলিল। এখন সীতারামের অন্তঃকরণে জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। এখন কেবল ইচ্ছা জগদীশ্বর স্মরণ করিয়া, তাঁহার নির্দ্দেশবর্ত্তী হইয়া মরিব। তাই সীতারাম চিন্তাশূন্য, অবিচলিত, কার্য্যে অভ্রান্ত, প্রফুল্লচিত্ত, হাস্যবদন। সীতারাম ভৈরবী মুখে হরিনাম শুনিয়া, শ্রীহরি স্মরণ করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন এখন তাঁর কাছে মুসলমান জয় কোন ছার।

তাঁর প্রফুল্লকান্তি, এবং সামান্যা অথচ জয়শালিনী সেনা দেখিয়া মুসলমান সেনা মার! মার! শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। স্ত্রীলোক দুইজনকে কেহ কিছু বলিল না—সকলেই পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু সীতারাম ও তাঁহার সিপাহীগণকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সীতারামের সৈনিকেরা, তাঁহার আজ্ঞানুসারে, কোথাও তিলার্দ্ধ দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিল না—কেবল অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। অনেকে মুসলমানের আঘাতে আহত হইল—অনেকে নিহত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল, অমনি আর এক জন পশ্চাৎ হইতে তাহার স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে সীতারামের সূচীব্যূহ অভগ্ন থাকিয়া ক্রমশঃ মুসলমান সেনার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া চলিল, সম্মুখে জয়ন্তী ও শ্রী পথ করিয়া চলিল। সিপাহীদিগের উপর যে আক্রমণ হইতে লাগিল তাহা ভয়ানক, কিন্তু সীতারামের দৃষ্টান্তে, উৎসাহবাক্যে, অধ্যবসায়, এবং শিক্ষার প্রভাবে তাহারা সকল বিঘ্ন জয় করিয়া চলিল। পার্শ্বে দৃষ্টি না করিয়া, যে সম্মুখে গতিরোধ করে, তাহাকেই আহত, নিহত, অশ্বচরণবিদলিত করিয়া সম্মুখে তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, মুসলমান সেনাপতি সীতারামের গতিরোধ জন্য একটা কামান সূচীব্যূহের সম্মুখ দিকে পাঠাইলেন। ইতি পূর্ব্বেই মুসলমানেরা দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্য কামান সকল তদুপযুক্ত স্থানে পাতিয়াছিল, এজন্য সূচীব্যূহের সম্মুখে হঠাৎ কামান আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে নাই। এক্ষণে, রাজা রাণী পলাইতেছে জানিতে পারিয়া, বহু কষ্টে ও যত্নে একটা কামান তুলিয়া লইয়া সেনাপতি সূচীব্যূহের সম্মুখে পাঠাইলেন। নিজে সে দিকে যাইতে পারিলেন না, কেন না দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া অধিকাংশ সৈন্য লুঠের লোভে সেই দিকে যাইতেছে। সুতরাং তাঁহাকেও সেই দিকে যাইতে হইল—সুবাদারের প্রাপ্য রাজভাণ্ডার পাঁচ জনে লুটিয়া না আত্মসাৎ করে। কামান আসিয়া সীতারামের সূচীব্যূহের সম্মুখে পৌঁছিল। দেখিয়া, সীতারামের পক্ষের সকলে প্রমাদ গণিল। কিন্তু শ্রী প্রমাদ গণিল না। শ্রী ও জয়ন্তী দুইজনে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কামানের সম্মুখে আসিল। শ্রী, জয়ন্তীর মুখ চাহিয়া, হাসিয়া, কামানের মুখে আপনার বক্ষস্থাপন করিয়া, চারিদিক চাহিয়া ঈষৎ, মৃদু, প্রফুল্ল, জয়সূচক হাসি হাসিল। জয়ন্তীও শ্রীর মুখপানে চাহিয়া, তার পর গোলন্দাজের মুখপানে চাহিয়া, সেইরূপ হাসি হাসিল—দুই জনে যেন বলাবলি করিল —"তোপ জিতিয়া লইয়াছি।" দেখিয়া, শুনিয়া, গোলন্দাজ হাতের পলিতা ফেলিয়া দিয়া, বিনীতভাবে তোপ হইতে তফাতে দাঁড়াইল। সেই অবসরে সীতারাম লাফ দিয়া আসিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য তরবারি উঠাইলেন। জয়ন্তী অমনি চীৎকার করিল, "কি কর! কি কর! মহারাজ রক্ষা কর?" "শত্রুকে আবার রক্ষা কি?" বলিয়া সীতারাম সেই উত্থিত তরবারির আঘাতে গোলন্দাজের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া তোপ দখল করিয়া লইলেন। দখল করিয়াই, ক্ষিপ্রহস্ত, অদ্বিতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সীতারাম, সেই তোপ ফিরাইয়া আপনার সূচীব্যূহের জন্য পথ সাফ করিতে লাগিলেন। সীতারামের হাতে তোপ প্রলয়কালের মেঘের মত বিচ্ছেদশূন্য গভীর গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তদ্বর্ষিত অনন্ত লৌহপিণ্ডশ্রেণীর আঘাতে মুসলমান সেনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্মুখ ছাড়িয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। এখন সূচীব্যূহের পথ সাফ! তখন সীতারাম অনায়াসে নিজ মহিষী ও

পুত্রকন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া মুসলমান কটক কাটিয়া আপদ-শূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানেরা দুর্গ লুটিতে লাগিল।

এই রূপে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রী সন্ধ্যার পর জয়ন্তীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"জয়ন্তী! সেই গোলন্দাজ কে?"

জয়ন্তী। যাহাকে মহারাজ কাটিয়া ফেলিয়াছেন?

শ্রী। হাঁ! তুমি রাজাকে কাটিতে নিষেধ করিয়াছিলে কেন?

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর জানিয়া কি হইবে?

শ্রী। না হয় একটু চোখের জল পড়িবে। তাহাতে সন্ন্যাসধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় না।

জয়ন্তী। চক্ষের জলই বা কেন পড়িবে।

শ্রী। জীবন্তে আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার নিষেধবাক্য শুনিয়া আমি মরা মুখখানা একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম। আমার একটা সন্দেহ হইতেছে। সে ব্যক্তি যেই হউক, আমিই তার মৃত্যুর কারণ। আমি তোপের মুখে বুক না দিলে সে অবশ্য তোপ দাগিত। তাহা হইলে মহারাজা নিশ্চিত বিনষ্ট হইতেন, গোলন্দাজকে তখন আর কে মারিত?

জয়ন্তী। সে মরিয়াছে, মহারাজা বাঁচিয়াছেন, সে তোমার উপযুক্ত কাজই হইয়াছে—তবে আর কথায় কাজ কি?

শ্রী। তবু মনের সন্দেহটা ভাঙ্গিয়া রাখিতে হইবে।

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর এ উৎকণ্ঠা কেন?

শ্রী। সন্ন্যাসিনীই হউক, যেই হউক, মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে। আমি তোমাকে দেবী বলিয়াই জানি, কিন্তু যখন তুমিও লোকালয়ে লৌকিক লজ্জায় অভিভূত হইয়াছিলে, তখন আমার সন্ন্যাসবিভ্রংশের কথা কেন বল?

জয়ন্তী। তবে চল, সন্দেহ মিটাইয়া আসি। আমি সে স্থানে একটা চিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছি—রাত্রেও সে স্থানের ঠিক পাইব। কিন্তু আলো লইয়া যাইতে হইবে।

এই বলিয়া দুই জনে খড়ের মশাল তৈয়ার করিয়া তাহা জ্বালিয়া রণক্ষেত্র দেখিতে চলিল। চিহ্ন ধরিয়া জয়ন্তী অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছিল। সেখানে মশালের আলো ধরিয়া তল্লাস্ করিতে করিতে সেই গোলন্দাজের মৃত দেহ পাওয়া গেল। দেখিয়া শ্রীর সন্দেহ ভাঙ্গিল না। তখন জয়ন্তী সেই শবের রাশীকৃত পাকা চুল ধরিয়া টানিল—পরচুলা খসিয়া আসিল; শ্বেতশ্মশ্রু ধরিয়া টানিল, পরচুলা খসিয়া আসিল। তখন আর শ্রীর সন্দেহ রহিল না—গঙ্গারাম বটে।

শ্রীর চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী বলিল,

"বহিন্—যদি এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে ?"

শ্রী বলিল, "মহারাজ আমাকে বৃথা ভৎর্সনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই—আমি আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এত দিনে ফলিল।"

জয়ন্তী। বিধাতা কাহার দ্বারা কাহার দণ্ড করেন, তাহা বলা যায় না। তোমা হইতেই গঙ্গারাম দুইবার জীবন লাভ করিয়াছিল, আবার তোমা হইতেই ইহার বিনাশ হইল। যাই হউক, গঙ্গারাম পাপ করিয়াছিল, আবার পাপ করিতে আসিয়াছিল। বোধ হয় রমার মৃত্যু হইয়াছে তাহা জানে না, ছদ্মবেশে ছলনা দ্বারা তাহাকে লাভ করিবার জন্যই মুসলমান সেনার গোলন্দাজ হইয়া আসিয়াছিল সন্দেহ নাই। কেননা, রমা তাহাকে চিনিতে পারিলে কখনই তাহার সঙ্গে যাইত না। বোধ হয়, শিবিকাতে রমা ছিল মনে করিয়া তোপ লইয়া পথ রোধ করিয়াছিল। যাই হোক উহার জন্য বৃথা রোদন না করিয়া উহার দাহ করা যাক আইস।"

তখন দুই জনে ধরাধরি করিয়া গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া দাহ করিল।

জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাত্রে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশাইয়া গেল, কেহ জানিল না।

পরিশিষ্ট।

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদ্বয় রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ ইতিপূর্ব্বেই পলাইয়া নলডাঙ্গায় বাস করিতেছিলেন। সেখানে একখানি আটচালায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

রামচাঁদ। কেমন হে ভায়া! মহম্মদপুরের খবরটা শুনেছ?

শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে হাঁ—সেত জানাই ছিল। গড় টড় সব মুসলমানে দখল করে লুটপাট করে নিয়েছে।

রাম। রাজা রাণীর কি হ'লো কিছু ঠিক খবর রাখ?

শ্যাম। শোনা যাচ্চে, তাঁদের নাকি বেঁধে মুর্শিদাবাদ চালান দিয়েছে। সেখানে নাকি তাঁদের শূলে দিয়েছে।

রামচাঁদ। আমিও শুনেছি তাই বটে, তবে কি না শুন্‌তে পাই যে পথে তাঁরা বিষ খেয়ে মরেছেন। তার পর মড়া দুটো নিয়ে গিয়ে বেটারা শূলে চড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যাম। কত লোকে কত রকমই বলে! আবার কেউ কেউ বলে রাজা রাণী নাকি ধরা পড়ে নাই—সেই দেবতা এসে তাদের বার ক'রে নিয়ে গিয়েছেন! তার পর নেড়ে বেটারা জাল রাজা রাণী সাজিয়ে মুর্শিদাবাদ নিয়ে গিয়ে শূলে দিয়েছে।

শ্যাম। তুমিও যেমন! ও সব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাস মাত্র।

রাম। তা এটা উপন্যাস না ওটা উপন্যাস তার ঠিক কি? এটা না হয় মুসলমানের রচা। তা যাক্ গিয়ে—আমরা আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে কাজ কি? আপনার আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এয়েছি এই ঢের। এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক সাজিয়া খাইতে থাকুক। আমরা ততক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি। এবং সর্ব্বফলদাতার নিকট প্রার্থনা করি, যে পাঠকেরা সীতারামের দুষ্কর্ম্ম এবং শ্রীর অকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া জয়ন্তীর কর্ম্মানুকারী হউন।

রাজকৃষ্ণ।*

সখা হে, তোমার তরে, আজিকে ব্যাকুলান্তরে,
মিলিত হয়েছি সেই সাবিত্রী ভবনে,
এ নহে সে সুখমেলা, এ নহে হাসির খেলা,
—জুড়াতে হৃদয় জ্বালা গুণের কীর্ত্তনে!
হায়, কে জানিত এক দিন হইয়া এমন দীন,
—হারায়ে তোমারে মোরা আসিব হেথায়,
তোমার মুখানি স্মরি, ফেলিব শোকাশ্রু বারি,
—রহিবে না (পাশে তুমি বসন্তের প্রায়!)
তোমার সে হাসি মুখ, স্মরিলে এখনও সুখ,
পুলকে পুরিয়া উঠে হৃদয় নিলয়,
সে কি সন্তোষের ছবি, যেন প্রভাতের রবি,
—আলোকে জাগায়ে ধরা করে মধুময়!
—নয়নে অমৃত রাশি, মুখে পূত পুণ্য হাসি
একাধারে গুণ রাশি রাজকৃষ্ণ কায়,
—কেমনে ভুলিব সখা! (লইতে বিদায়!
—বিদরি যে যায় বুক কি বলিব হায়!)

হায়!

আঁধার মলিন পুরী রতন গিয়েছে চুরী!
—নিভেছে উজ্জ্বল দীপ কাল ঝড় বায়!—
—ফেলো, দুবিন্দু শোকাশ্রু বারি স্মরি সবে তাঁয়
—স্মরি সে পবিত্র মূর্ত্তি, রাজকৃষ্ণ কায়!
হায়!—বন্ধুতার প্রতিদান, বিনয়ের সসম্মান,
—থাকে যদি লোকালয়ে, থাকে মুগ্ধ মন,
(তবে আসিবে নয়নে বারি স্মরি সে আনন!)

---

* গত ২ রা ফাল্গুন সাবিত্রী লাইব্রেরীতে ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জন্য শোকপ্রকাশার্থ আহূত সভা উপলক্ষে লিখিত।

সখা,

আজি বসন্তের দিন, ফুটিছে মুকুল,
—গাঁথিছে বালকে মালা কুড়াইয়া ফুল,
—স্নেহ প্রতিদান ছলে,
—পরাবে সখার গলে;
হায়! মোরা স্মরি গুণ তব হয়েছি ব্যাকুল!
—অভাগা বঙ্গেরে বিধি সদা প্রতিকূল!
হায়! আজি এ মিলন হেন, প্রতিমা বিসর্জ্জি যেন!
—আঁধার মণ্ডপ মাঝে আনত আনন।
—লিখি তব গুণ-গাথা,
—স্মরি তব প্রেম-কথা!
—গভীর হৃদয় ব্যথা, হবে কি মোচন?
কি বলিব আর!

সখা,

—এই শত আঁখি আগে, নবীন অরুণ রাগে,
—সদা যেন রহে জেগে তোমার আনন।
হবে কি প্রসন্ন ভাল,
করেছে যে ক্ষতি কাল,
—লয়ে অসময়ে তোমা, দীন বঙ্গ হতে।
—সে ক্ষতি পুরাতে বিধি
পুনঃ কি মিলাবে নিধি,
—তোমার অভাব যাহে পারিবে পূর্ণিতে।

হায়!

"সাবিত্রী" তোমারে স্মরে,
কাঁদিবে গো চির তরে,
করিবে সতত তব গুণের কীর্ত্তন,
(রাখিবে হৃদয়ে তব মুরতি মোহন!)

হায়!
—শত আঁখি অশ্রুবারি,
—ঝরিবে তোমারে স্মরি,
—আদর্শ সে গুণ যেন সবাকারি হয়?
যশের মন্দির মাঝে
উজ্জ্বল পবিত্র সাজে,
সদা অমর হইয়া থাক সাধু সদাশয়!!

"ভারতকুসুম" রচয়িত্রী।

রাজকৃষ্ণ বাবুর জীবনী!

গোস্বামী দুর্গাপুর নিবাসী ৺ আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাইকপাড়া কন্সারন নামক নীলকুঠীর দেওয়ানী কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু অর্থ রক্ষা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি যাহা কিছু পাইতেন সমস্তই হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদিতে ব্যয় করিতেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু দুর্গাপুরের লোক এখনও তাঁহার প্রদত্ত ভোজ ভুলিতে পারে নাই। অতি অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স ১৫ বৎসর এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স নয় বৎসর মাত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধিকাপ্রসন্ন তখন কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, কনিষ্ঠ তখনও পাঠশালায়। হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় মৃত্যুকালে রাধিকাপ্রসন্ন পিতার নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার পৈতৃক যাহা কিছু ছিল তাহা তিনি পান নাই। পূর্ব্ব পুরুষের যে কিছু স্থাবর সম্পত্তি ছিল তাহা তাঁহাদিগের নাবালগ অবস্থায় অন্য লোকে উপভোগ করিত, সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর দুই ভাইয়ে বিস্তর কষ্ট পাইয়াছিলেন। পিতার

মৃত্যুতে রাধিকাপ্রসন্ন বাবু অগত্যা দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই জুনিয়র পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি উক্ত পরীক্ষায় প্রথম হইলেন এবং সেইরূপ বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। এই সামান্য বৃত্তি হইতে তাঁহাকে আপনার লেখাপড়া ভাইএর লেখাপড়া এবং পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে হইত।

১৯ বৎসর বয়সে তিনি যখন পাঠ সমাপন করিয়া চাকরী করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন ১৩ বৎসরবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কৃষ্ণনগরে আনয়ন করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ বাবু এ পর্য্যন্ত গ্রামস্থ বর্দ্ধমানীয় গুরুর নিকট অস্থিতপঞ্চক পর্য্যন্ত অঙ্ক কসা শেষ করিয়াছিলেন এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কন্যা ছিলেন সুতরাং তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়েন। কিন্তু পিতৃকুলের অভিমত না হওয়ায় রাজকৃষ্ণ বাবুর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হওয়া হইল না। বাল্যাবধিই রাজকৃষ্ণ বাবু অতি ধীর ও শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার পড়া শুনায় বড়ই অনুরাগ ছিল। এবং তিনি মাতার তৃপ্তির জন্য নানাপ্রকারে তাঁহার সেবা করিতেন। তিনি কতবার বলিয়াছেন যে বাল্যকালে মায়ের পূজার জন্য ফুল তুলিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন।

যাহা হউক কৃষ্ণনগরে গিয়া তিনি কিছু দিন দাদার বাসায় থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক মাসের মধ্যে ইংরাজী দুই একখানি পুস্তক পাঠ সমাপন করিয়া তিনি মিসনরি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভরতি হন ও ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। পরে ২ বৎসর মাত্র কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ইউনিবর্সিটির তৃতীয় হয়েন। এইরূপে এল এ পরীক্ষায় ১ম, বি এ পরীক্ষায় ২য় ও বি এল পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করেন। ফিলসফিতে এম এ লইয়া তিনি প্রথম শ্রেণীতে পাস হন। যে বৎসর তিনি এম এতে পাস হন সেই বৎসর কনবোকেসন কালীন বক্তৃতায় বাইস চানসেলার সাহেব তাঁহার বিস্তর সুখ্যাতি করেন। তিনি বলেন যে রাজকৃষ্ণ বাবুর বিদ্যাবুদ্ধি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাস হইয়া তিনি প্রথমতঃ কটক কলেজের প্রোফেসর

ও ল লেকচরর হইয়া গমন করেন। বৎসরাবধি তথায় অবস্থান করিয়া সে কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া দিন কতক তিনি কলিকাতায় বসিয়া থাকেন, পরে যখন শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর কলেজের ল লেকচারি হইতে অবসর গ্রহণ করেন তখন তথায় ল লেকচরর নিযুক্ত হন এবং তথা হইতে পাটনায় প্রোফেসর ও ল লেকচরর হইয়া যান। পাটনা হইতে আসিবার কিছু দিন পরে তিনি কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। প্রায় ৩।৪ বৎসর এই কার্য্য করিলে পর, কুমার বাহাদুর সাবালগ হয়েন ও তাঁহার কর্ম্ম যায়, তখন তিনি কিছু দিনের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রোফেসর হয়েন এবং তাহার পর রবিন্‌সন সাহেবের মৃত্যু হইলে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক নিযুক্ত হন্। ৭ বৎসর কয়েক মাস এই কার্য্য করার পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিতি কাল হইতেই তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি যখন বি এল পড়িতেছিলেন তখনই তিনি "ভগীরথের গঙ্গানয়ন" নামক কাব্য প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ কাব্য লেখার উপরই তাঁহার অধিক ঝোঁক ছিল। "ভগীরথের গঙ্গানয়ন" কখন মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার চারিখানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল কবিতা দুষ্ট প্রণয় বা হতাশ প্রণয়ের বিকাশ নহে। ইহার বিষয় সকল অতি উদার, মহান্! তাঁহার স্থষ্টি নামক কবিতা যিনিই পাঠ করিয়াছেন তিনিই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাঁহার যৌবনোদ্যান নামক রূপক অতি পরিপাটী হইয়াছে। উহা অনেক বৎসর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কোর্স ছিল।

পদ্য ছাড়িয়া তিনি একবার মাত্র গদ্য কাব্য লিখিতে প্রয়াস পান। এ কাব্যখানির নাম রাজবালা—আপনার গ্রামের উৎপত্তি লইয়া এ কাব্য আরম্ভ।

তিনি যে শুদ্ধ কাব্য সাহিত্য লইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ নহে। তাঁহার পরিমিতি ও বীজগণিত এখনও ষ্টাণ্ডার্ডওয়ার্ক বলিয়া গণ্য।

কিন্তু সাহিত্যের যে শাখায় তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা ইতিহাস। তিনি ভারতীয় ইতিহাসে এতদূর পণ্ডিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাসখানি লিখিতে ৭ দিন মাত্র সময়

লাগিয়াছিল। তাঁহার আর ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার নানা প্রবন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আছে তাহা অত্যন্ত মূল্যবান।

তিনি যে শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায়ই পুস্তক লিখিতেন এরূপ নহে। তাঁহার ইংরাজীতেও অতি উচ্চ দরের বিষয় লইয়া ৪।৫ খানি পুস্তিকা আছে যথাঃ—Origin of Language, Theory of morals, Hindu mythology, Hindu Philosophy. ইত্যাদি; ইহার মধ্যে এক খানি পাঠ করিয়া মহাত্মা লব বলিয়াছিলেন—

I am glad that like your master Hume, you pay as much attention to style as to matter.

কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবু ইংরাজী অপেক্ষা বাঙ্গালায় লিখিতে ভাল বাসিতেন। তিনি বলিতেন " নানান্ দেশে নানান্ ভাষা ;

বিনে আপন ভাষা পূরে কি আশা।"

রাজকৃষ্ণ বাবু কখন জ্ঞানোপার্জ্জনের সুবিধা পরিত্যাগ করিতেন না। কোন পণ্ডিত বা শাস্ত্রজ্ঞ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহার নিকট কোন না কোন কূট প্রশ্ন বুঝাইয়া লইতেন। তিনি যখন উড়িষ্যায় ছিলেন তখন বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। উৎকল ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। পাটনায় অবস্থিতি কালে তিনি, হিন্দী, উর্দ্দূ ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় তাঁহার এতদূর ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল যে তিনি এক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে তোতিনামা ও করীমা নামক দুইখানি পুস্তক পড়াইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে ফরাসী পুরাতত্ত্বজ্ঞ বর্ণুফ সাহেব অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এই জন্য রাজকৃষ্ণ বাবু বিশেষ যত্ন সহকারে ফরাসী ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ঐ কারণেই তিনি আর এক সময়ে বিশেষ উদ্যম সহকারে জর্ম্মান ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। তিনি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সংস্কৃত ও পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিতেন। মূলগ্রন্থ না পাইলে জর্ম্মান, ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় তাহার অনুবাদ পাঠ করিতেন। পালি ভাষায় গ্রন্থাদি প্রায় রোমন অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকে, কিন্তু রোমান অক্ষরে পালি ভাষা পড়িয়া রাজকৃষ্ণ বাবুর তৃপ্তি হইত না। সেই জন্য তিনি ব্রহ্মদেশীয়

বর্ণমালা অভ্যাস করিয়াছিলেন। সংস্কৃতমূলক বর্ণমালা সমূহের মধ্যে ব্রহ্ম বর্ণমালা যত নিকৃষ্ট এত আর কোনটীও নহে। কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবু অতিশয় যত্ন সহকারে সেই বর্ণমালা অভ্যস্ত করিয়াছিলেন। বাল্যকালে গ্রামস্থ পণ্ডিতের নিকট তিনি মুগ্ধবোধ কিছু পড়িয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ে তিনি কখন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন নাই, তাঁহার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের এত আদর ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত তিনি বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি সমস্ত উপনিষৎগুলি পাঠ করিয়াছিলেন এবং উপনিষৎ শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তিনি সংস্কৃত ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক আলোচনা করিয়াছিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আপিস হইতে ফিরিয়া গিয়াও তিনি ১২ টা ১ টা পর্য্যন্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং অঙ্ক কসিতেন। তিনি ঠিকুজি ও কোষ্ঠী প্রস্তুত ও পরীক্ষা করিতে পারিতেন। করকোষ্ঠী উদ্ধারেও তাঁহার অনেক পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল।—[ক্রমশঃ]

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

স্বপন ও মরণ।

১। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি এক দিন গাইয়াছিলেন—

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে জীবন নদে।

জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া মরণ সকলেরই পক্ষে নিশ্চিত। দুঃখভারে অবনত, সুখামোদে উল্লাসিত, ক্লেশ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত, ঐশ্বর্য্যমদে চরম গর্ব্বিত, সকলেরই জন্য সেই এক দিন আছে—যে দিন সকল ভার নামিবে, সকল উল্লাস ফুরাইবে, সকল ক্ষত আরোগ্য হইবে, সকল গর্ব্বের অবসান করিবে। সকলই ফুরায়—সকলি চলিয়া যায়—সকলেরই অবসান হয়। এই যে পঞ্চ-ভূতাত্মক দেহ—যাহাতে এত লাবণ্য, এত বল, এত যত্ন, যাহা রক্ষার জন্য

এত চেষ্টা, যাহা পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য এত আয়োজন, যাহার পোষণে এত ব্যয়, যাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এত কাণ্ড—তাহাও সেই দিন আপনার গন্তব্য পথে চলিয়া যাইবে। রোগে হৌক, শোকে হৌক, বিষে হৌক বন্ধনে হৌক, এই দেহের বিনাশ একদিন অবশ্যম্ভাবী। যাহাদের দ্বারা সে গঠিত, তাহারা আপন আপন মিশিবার জিনিস খুঁজিয়া লইবে—দুই দিনে আপনাদিগকে তাহাদের সহিত মিশাইবে—এ লাবণ্যময়, বলব্যঞ্জক, পরিপুষ্ট, যত্নে পরিমার্জ্জিত দেহের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না—কোন চিহ্ন ও কেহ কখন দেখিতে পাইবে না। সকলই যাইবে, সকলই ফুরাইবে কেবল যাইব না—কেবল ফুরাইব না—আমি। দেহ যাইবে—দেহ আমার নহে—কয়েক দিনের জন্য তাহাতে বাসা লইয়াছি মাত্র। আমি থাকিব—বাসা লইযাছিলাম বাসা গেল—আমি বাসা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইব মাত্র। এই বিনশ্বর দেহ খাঁচা ছাড়িয়া অবিনাশী আত্মাপাখী কোথায় যায়? এ কথার পাকা জবাব কেহ দিতে পারে না। পাখী একবার উড়িলে আর সে ফিরিয়া আসে না—সে কোন দেশে যায় তাহাও কেহ অনুসন্ধান করিতে পারে না।

"The undiscovered country
From whose bourne no traveller returns——"

২। হিন্দু দার্শনিকগণ এই তত্ত্বের বিশদ মীমাংসার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন--এবং তাঁহাদের সে চেষ্টা অনেকাংশে সফল ও হইয়াছিল। তান্ত্রিক যোগীগণের মতে মানব দেহে সাতটী চক্র আছে ১ ম মস্তকে, ২ য় ভ্রূমূলে, ৩ য় কণ্ঠে, ৪ র্থ বক্ষে, ৫ ম নাড়ীতে, ৬ ষ্ঠ লিঙ্গমূলে, ৭ ম লিঙ্গ ও গুহ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানে (মুলাধারে)। ইংরাজীতে এই গুলিকে Centres of Nervous forces বলা যাইতে পারে। সন্তানোৎপাদন সময়ে মনুষ্যদেহ হইতে একবিধ বীজ নিঃসৃত হয়। মূলাধার চক্র এই বীজের আধার স্থল। সেই বীজ জরায়ুতে যাইয়া অঙ্কুরিত, গঠিত, ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহা হইতে কিছু দিনে একটী নূতন জীবের উৎপত্তি হয়। এই নূতন প্রাণী যে শরীরীর বীজ হইতে উৎপন্ন, তাহার ন্যায় আকার, স্বভাব ও গুণদোষাদি প্রাপ্ত হয়! এই শরীরির প্রাণের অংশ, ঐ বীজে সঞ্চারিত হয় এবং সেই জন্যই উহা জরায়ুতে ক্রমে পরিপুষ্ট ও

বর্দ্ধিত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। ঐ বীজ নিঃসরণ কালে ঐ শরীরীর জীবনী শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে, কিন্তু ঐ শক্তি একেবারে নিঃশেষিত হয় না। এমন এক সময় আছে যে সময় কোন প্রাণীর ভিতরকার জীবনী শক্তি টুকু সমস্তই ঐ রূপ বীজস্বরূপ পদার্থ অবলম্বন করিয়া কোন না কোন চক্রস্থান (মর্ম্মস্থান) ভেদকরতঃ বাহিরে নিঃসৃত হইয়া পড়ে। এই জীবনী শক্তির নিঃসারণ ও আমার দেহবাসা ত্যাগ করণের নাম মরণ। মৃত্যু কালে যে বীজ অবলম্বনে জীবনীশক্তি টুকু সমস্ত বাহিরে নিঃসৃত হইয়া যায়, আমাদের শাস্ত্রে তাহাকে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষদেহ বা লিঙ্গদেহ নাম দেওয়া হইয়া থাকে।

৩। তান্ত্রিক যোগীগণ বলেন যে মূলাধার চক্রে পৃথ্বীবীজ, স্বাধিষ্ঠান চক্রে (লিঙ্গমূলে) জলবীজ, মণিপুর চক্রে (নাভিতে) অগ্নিবীজ, এবং অনহাত চক্রে (বক্ষে) বায়ুবীজ এবং কণ্ঠে বিশুদ্ধাখ্য চক্রে আকাশবীজ নিহিত আছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাঁহাদের মতে মূলাধারস্থ বীজ সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল এবং সেই জন্য স্থূলদেহ ধারীর জরায়ু ব্যতীত অন্য-স্থানে উহা পরিপুষ্ট হইতে পারে না। মৃত্যুর পরে লিঙ্গ শরীর বাহ্ বায়ুতে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং সন্তানোৎপাদক স্থূলবীজ যে অবয়ব গঠনের জন্য দীর্ঘকাল সময় গ্রহণ করে, লিঙ্গশরীরীর সেই কার্য্যের জন্য অতি অল্প মাত্র সময় আবশ্যক করে, অর্থাৎ বাহ্ বায়ুতে স্বল্পকাল মধ্যেই তাহার অবয়ব গঠিত হয়। এই অবয়ব সর্ব্বাংশে পরিত্যক্তাত্মা দেহধারীর আকারের অনু-রূপ। আমি যাহা ছিলাম, আমি তাহাই থাকিয়া যাই

—"রাম প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই।
তাই হবি তুই মরণ কালে॥"

৪। জরায়ুস্থ আকৃতির ন্যায় লিঙ্গ শরীরীর অবয়ব কোন পদার্থে গঠিত হয় না। এইরূপ অবয়ব প্রাপ্ত আত্মা বাহ্যবায়ুতে বিচরণ করিতে থাকে। সৃষ্টির যে সমুদয় পদার্থ বা ক্রিয়ার সহিত সে কোন না কোন আকর্ষণে বাঁধা ছিল বা আছে সেই সমুদয় ক্রিয়া বা পদার্থের সহিত সংসৃষ্ট হইবার জন্য প্রয়াস পায়। মনুষ্যে চেষ্টা করিলে সেই লিঙ্গ শরীরীর সহিত সংস্রবে আসিতে পারে। যে জীবের পরমাত্মার সহিত মিলনের জন্য একান্ত লিপ্সা, তাঁহার

সহিত নৈকট্য স্থাপনের জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা সেই জীব মৃত্যুর পর লিঙ্গ শরীর অবলম্বনে পরমাত্মায় যাইয়া মিলিত হয়। যাহার সংসারে বড় বন্ধন, পরম মায়া, সে সংসারচক্রেই পরিভ্রমণ করিতে থাকে, সংসার ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারে না। মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন, বান্ধব যিনিই স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়াছেন তিনিই স্বানুরূপ অবয়বে স্থানান্তরে অবস্থান করিতেছেন, চেষ্টা করিলে এই স্থূল দেহীও সেই সূক্ষ্ম দেহীর সহিত সংস্পৃষ্ট হইতে পারে, এ কথা মনে হইলেও যেন পুলকিত হইতে হয়। ইউরোপের অনেক স্থলে এবং আমেরিকায় যে spiritualismএর কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা কেবল সেই লিঙ্গ শরীরীর সহিত সংস্রবে আসিবার চেষ্টা মাত্র।

৫। নিদ্রা মরণের রূপান্তর বা ভাবান্তর মাত্র। নিদ্রাকালে জীব তাহার নিজের সূক্ষ্ম দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকে। স্থূল শরীরের সহিত সম্পর্ক অনেক কমিয়া যায়। স্থূল ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া স্থগিত থাকে এবং সেই সময়ে জীব যখন যে চক্রান্তস্থিত বীজে অবস্থিতি করে সেই অনুযায়ী ভাব সকল তাহার সমক্ষে প্রকৃত সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহারই নাম স্বপ্ন।

৬। সর্ব্ব জীবাত্মার স্রষ্টা ও নিয়ন্তা সেই নিরাকার চৈতন্যস্বরূপের চৈতন্যময়তার মধ্যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থেরই পূর্ণাদর্শ বিরাজমান আছে। এই সামান্য জীবাত্মা সেই অনন্ত পরমাত্মার অংশ; সেই চৈতন্যময়ের চৈতন্যময়তার অতি ক্ষুদ্রতর—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর—এতটুকু কণিকা পাইয়া এই জীবাত্মা চেতন; এই এতটুকু চেতন, তাঁহার তেজে তেজোবান্ কণিকামাত্রও সেই পরমাত্মার গুণপেত—ইহাতেও সেই পূর্ণা-দর্শের একটু সামান্য আদর্শ আছে। আত্মা ও মনোবৃত্তির পরিস্ফুরণক্রমে এই ক্ষুদ্র আদর্শের মধ্যে যখন যে ভাব যে অংশ শরীরগত চক্রান্তস্থিত হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয় সেই ভাব আমাদের মনোবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির প্রত্যক্ষীভূত হয়। জাগ্রতাবস্থায় স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) ও নির্দ্ধারণ শক্তির (Volition) ক্রিয়া প্রবল থাকে। স্বপ্নাবস্থায় নির্দ্ধারণ শক্তি বদ্ধাবস্থায় অবস্থিত হয় সেই কারণবশতঃ, এবং ভাব পরম্পরা অনবরত অসংলগ্ন ভাবে মনোমধ্যে আসিয়া উদিত হয় সেই জন্য, স্বপ্ন অনেক স্থলে অমূলক বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রা-বস্থায় নির্দ্ধারণ শক্তি আবদ্ধ থাকে বলিয়া আত্মা তৎকালে যে চক্রান্তঃস্থিত

বীজে অবস্থিত থাকে সেই চক্রবীজ সম্বন্ধীয় ভাবে মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে।* মেসমেরিজম নামক ক্রিয়াতেও নির্দ্ধারণ শক্তি এইরূপ আবদ্ধাবস্থায় থাকে কিন্তু এই ক্রিয়ায় আত্মার আদর্শস্থিত ভাব চক্রান্তর্গত বীজে আপনাপনি স্ফূরিত না হইয়া মেসমেরাইজরের কৌশল বলে বিকশিত হইয়া থাকে।†

অনেক সময়ে এমন ঘটে যে, যে স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা এত পরিস্কার, এবং উহার অংশ সকল পরস্পর এরূপ সংলগ্ন যে নিদ্রাভঙ্গের পরও উহা সত্য দেখিলাম, কি স্বপ্ন দেখিলাম তাহা নির্ব্বাচন করা কঠিন হয়। এই সকল স্বপ্ন আমার কাছে নিতান্ত অমূলক চিন্তামাত্র বলিয়া বোধ হয় না। লেখকের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার জীবনে একবার এইরূপ অতি চমৎকার ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল (সামান্য সামান্য অনেক সত্য স্বপ্ন হইতে উদ্ধার করা যায় কিন্তু এটী বড় বিস্ময় জনক) তাহার স্থূল বৃত্তান্ত পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

৮। একদিন স্বপ্নাবেশে বোধ হইল আমি আমার একটী অতি নিকট আত্মীয় ও বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুর সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। (স্বপ্ন দর্শনের প্রায় এক বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে আমার এই আত্মীয়ের মৃত্যু হইয়াছিল) ভ্রমণের প্রথম আরম্ভ শয়ন গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানেই হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষনেক পরেই যেন আমরা এমন এক স্থানে উপস্থিত হইলাম যে তাহা জীবনে ইতিপূর্ব্বে কখন নয়নগোচর হয় নাই—হওয়ারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে দৃশ্য সেই সময়েই সম্পূর্ণ নূতন দেখিলাম। স্থানটী অতি মনোরম—পরিস্কার ময়দান—গড়ের মাঠের মত—ঘাসগুলি যেন মাথায় মাথায়

* In the dreaming state, the functions of volition are suspended. In a dream we are conscious of making an effort, the effort is spontaneous. See Mansel's Metaphysics Page 176.

† In the state of Mesmerism the volition is suspended as in sleep. In dreaming the mind follows the train of associations suggested by some leading idea. In mesmeric state the leading idea is conveyed from with out by the operator, instead of arising from within in the patients own mind. See the same Page 178.

সমান করিয়া ছাটা—মাঝে মাঝে বড় গাছ—ছোট গাছ বা লতাপাতা কিছুই নাই। স্থানে স্থানে ছোট ছোট পাকা ঘর, ঘরগুলিও বেশ পরিচ্ছন্ন। এই স্থানে যাইয়া মনে যেন বড় আনন্দ হইল, অনেকক্ষণ সেখানে বেড়াইলাম। আমার সহচারী মুক্তাত্মার সহিত এই দৃশ্য সম্বন্ধেই কথালার্ত্তা চলিতে লাগিল, অনেক পরে স্বপ্ন শেষ ও নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্থানটীর চিত্র মনোমধ্যে পরিস্ফূট রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল, বহু দিন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারিলাম না (তখন স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র বলিয়াই বোধ ছিল)। এই স্বপ্ন দর্শনের প্রায় ২।৩ বৎসর পরে Bengal central Railawy line (যশোহরের রেল লাইন) খুলিল। এবং সেই রেল পথে প্রথম আরোহী হইলাম। দমদমা গোরা বাজার ষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়িয়া কয়েক শত হস্ত মাত্র আসিলে রেল পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী ময়দান দেখিতে পাইলাম। দেখিবামাত্র একেবারে চমকিত হইলাম, সমুদায় স্বপ্ন কথাগুলি পরিস্ফুট রূপে মনে আসিল। স্বপ্নে আমি আমার আত্মীয়ের মুক্তাত্মার সহিত এই স্থানেই ভ্রমণ করিয়াছিলাম। এখানে আর কখন আসি নাই। আসিবার পথ বড় ছিল না। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী দমদমার বারিকের মধ্যস্থ যে পথ দিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে যাতায়াত করিয়াছি সে পথ হইতে এ স্থান দেখা যায় না। তবে কি স্বপ্নে মুক্তাত্মার সহিত ভ্রমণ করার কথার কোন মূল আছে? অনেক সময়ে শুনা যায় যোগীগণ যোগবলে স্থূল দেহ ত্যাগ করতঃ সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন পূর্ব্বক স্থানান্তরিত হইয়া থাকেন। আধুনিক Theosophy শাস্ত্রানুশীলকগণ এরূপ বৃত্তান্ত অবিশ্বাস করেন না। যোগবলে এরূপ হওয়া কিছু মাত্র অসম্ভব নহে। কিন্তু প্রবল নৈকট্যবশতঃ আত্মার সম্পূর্ণ বেগবলে যে লিঙ্গ শরীর স্থূল দেহ পরিত্যাগ করতঃ অপর স্থানে যাইতে পারে না এরূপ কথাও নিতান্ত অসম্ভব ও অগ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালিদাসের উপমা।

রঘুবংশে নবম সর্গের এক স্থানে বসন্তের বর্ণনা আছে। কুমারসম্ভবে সংযমী-শ্রেষ্ঠ ধ্যানরত মহাদেবের ধৈর্য্যচ্যুতিসম্পাদনে উদ্‌যোগী কুসুমায়ুধের সাহায্যার্থে অকালে সমুদ্ভূত বসন্তের যে মনোহারিণী বর্ণনা আছে, রঘু-বংশের এই বসন্তবর্ণন সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী। ভাষা, লালিত্য, বাক্যবিন্যাস-নৈপুণ্য, উপমাকৌশল প্রভৃতি গুণে ইহা অতুলনীয়। অংশবিশেষ এখনকার মার্জ্জিত রুচির বিরুদ্ধ হইতে পারে—বাদসাদ দিয়া আমরা কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম—

নয়গুণোপচিতামিব ভূপতেঃ
সদুপকারফলাং শ্রিয়মর্থিনঃ।
অভিযযুঃ সরসো মধুসম্ভৃতাম্
কমলিনীমলিনীরপতত্রিনঃ॥

শৌর্য্যাদি গুণকর্ত্তৃক উপচিতা সদুপকার রূপ ফলপ্রসবিনী রাজশ্রীর প্রতি—অর্থিগণের ন্যায়, বসন্ত কর্ত্তৃক সম্যক পুষ্টা, সরোবরে প্রস্ফুটিতা, কম-লিনীর প্রতি ভ্রমর এবং হংস সকল ধাবিত হইল।

বিরচিতা মধুনোপবনশ্রীয়াম্
অভিনবা ইব পত্রবিশেষকাঃ।
মধুলিহাং মধুদানবিশারদাঃ
কুরবকা রবকারণতাং যযুঃ॥

বসন্ত কর্ত্তৃক বিরচিত, উপবনলক্ষ্মীর অভিনব পত্ররচনার-ন্যায় প্রতীয়মান, মধুদানে বিশারদ তরুসমূহ ভ্রমরগণকে রব করাইতে লাগিল। ভ্রমরগণ মধু-পানে তৃপ্ত হইয়াই যেন মধুদাতা তরুগণের গুণগান করিতে আরম্ভ করিল।

অভিনয়ান্ পরিচেতুমিবোদ্যতা
মলয়মারুতকম্পিতপল্লবা।
অমদয়ং সহকারলতা মনঃ
সকলিকা কলিকামজিতামপি॥

কলিকাবিশিষ্ট সহকারলতা অভিনয় অভ্যাসকরণ মানসেই যেন মলয়মারুত কর্তৃক কম্পিতা হইয়া জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরও মনকে মত্ত করিতে লাগিল।

শ্রুতিসুখভ্রমরস্বনগীতয়ঃ
কুসুমকোমলদন্তরুচো বভুঃ।
উপবনান্তলতাঃ পবনাহতৈঃ
কিসলয়ৈঃ সলয়ৈরিব পাণিভিঃ॥

শ্রবণসুখকর ভ্রমরঝঙ্কাররূপ সঙ্গীতকারিণী, কুসুমকোমল দন্তকান্তিবিশিষ্টা (হাস্যমুখী) উপবনান্তলতা পবনকম্পিত কিসলয়ের দ্বারা লয়যুক্ত করসঞ্চালনের শোভা দেখাইতে লাগিল।

শুশুভিরে স্মিতচারুতরাননাঃ
স্ত্রিয়ইব শ্লথশিঞ্জিতমেখলাঃ।
বিকচতামরসা গৃহদীর্ঘিকাঃ
মদকলোদকলোলবিহঙ্গমাঃ॥

বিকসিত পদ্মশোভী—অব্যক্তমধুরগায়ী উদকলোল-বিহঙ্গমসঙ্কুল গৃহদীর্ঘিকা সকল, সুন্দর হাস্যমুখী লোলশিঞ্জিত মেখলাশোভিনী রমণীর ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল।

উপযযৌ তনুতাং মধুখণ্ডিতা
হিমকরোদয়পাণ্ডুমুখচ্ছবিঃ।
সদৃশমিষ্টসমাগমনির্বৃতিম
বনিতয়ানীতয়া রজনীবধূঃ॥

বসন্তখর্ব্বা, চন্দ্রোদয়ে পাণ্ডুবর্ণমুখচ্ছবি রজনীবধূ, প্রিয়সমাগমসুখে হতাশা বনিতার ন্যায়, ঋজুতা প্রাপ্ত হইল।

উপচিতাবয়বা শুচিভিঃ কণৈঃ
অলিকদম্বযোগমুপেয়ুষী।
সদৃশকান্তিরলক্ষত মঞ্জরী—
তিলকজালকজালকমৌক্তিকৈঃ॥

শুভ্র রজঃসমূহে পুষ্টাবয়বা, অলিকদম্বযোগপ্রাপ্তা তিলকবৃক্ষোত্থিতা মঞ্জরী, রমণীগণের অলকাভরণবিশেষে মুক্তার সদৃশ শোভা ধারণ করিল।

প্রথমমন্যভৃতাভিরুদীরিতাঃ
প্রবিরলা ইব মুগ্ধবধূকথাঃ।
সুরভিগন্ধিষু শুশ্রুবিরে গিরঃ
কুসুমিতাসু মিতা বনরাজিষু॥

সুরভিগন্ধি, কুসুমিত বনস্থলীসমূহে কোকিলার পরিমিত প্রথম ঝঙ্কার, মুগ্ধবধূর প্রবিরল কথার ন্যায়, শ্রুত হইতে লাগিল।

কুমারে—

চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠঃ
পুংস্কোকিলো যন্মধুরং চুকুজ।
মনস্বিনীমানবিঘাতদক্ষম্
তদেব জাতং বচনং স্মরস্য॥

অলিভিরঞ্জনবিন্দুমনোহরৈঃ
কুসুমপংক্তিনিপাতিভিরঙ্কিতঃ।
ন খলু শোভয়তি স্ম বনস্থলীম্
ন তিলকস্তিলকঃ প্রমদামিব॥

কুসুমশ্রেণীতে পতনশীল সুন্দর কজ্জল কণার ন্যায় ভ্রমরগণ কর্তৃক চিহ্নিত তিলক বৃক্ষ, প্রমদাকে তিলক রাগের ন্যায়, বনস্থলীকে শোভিত করে নাই এমন নহে।

কুমারে—

লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনভক্তিচিত্রম্
মুখে মধুশ্রী তিলকং প্রকাশ্য।
রাগেণ বালারুণকোমলেন
চূতপ্রবালোষ্ঠমলঞ্চকার॥

বসন্তশ্রী, কজ্জল রচনার ন্যায়, উপবিষ্ট ভ্রমরগণ কর্তৃক বিচিত্রীকৃত তিলকবৃক্ষরূপ তিলকরাগ মুখে ধারণ করিয়া প্রভাত সূর্য্যের কিরণরাগে চূত প্রবালোষ্ঠ রঞ্জিত করিলেন।—

হুতহুতাশনদীপ্তি বনশ্রিয়ঃ
প্রতিনিধিঃ কনকাভরণস্য যৎ।
যুবতয়ঃ কুসুমং দধুরাহিতম্
তদলকে দলকেশরপেশলম্॥

কুমারে—

বর্ণপ্রকর্ষেসতি কর্ণিকারম্
দুনোতিনির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ।
প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাম্
পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ॥

রঘুবংশে বনশ্রীর স্বর্ণালঙ্কারের প্রতিনিধি স্বরূপ কর্ণিকার কুসুম হুতহুতাশন-দীপ্তিতে রূপের ছটা বিকাশিত করিতেছে—নায়কেরা অতি যত্নসহকারে উহা আহরণ করিয়া প্রণয়িনীগণের অলকের অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছে। আর কুমারের কর্ণিকার কুসুম কেবল বর্ণের উৎকর্ষ মাত্র দেখাইতেছে, হায়! এমন সুন্দর কুসুমে গন্ধ নাই! বিশ্বস্রষ্টা অনেক সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু একটীকেও সম্পূর্ণ গুণশালী করেন নাই। পাঠক দুইটী কবিতা তুলনা করিয়া দেখিবেন—একটী যৌবনসুলভ উচ্ছ্বাসপূর্ণ সুখসঙ্গীত—অপরটী সংসারের অসম্পূর্ণতায় অসুখী বৃদ্ধের বিষাদ গীতি।—

রাবণের দৌরাত্ম্যে পীড়িত দেবগণ বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন—

তস্মিন্নবসরে দেবাঃ পৌলস্ত্যোপপ্লুতা হরিম্।
অভিজগ্মুর্নিদাঘার্ত্তাঃ ছায়াবৃক্ষমিবাধ্যগাঃ॥

গ্রীষ্মপীড়িত পথিকেরা যেমন ছায়াবৃক্ষের নিকট গমন করে তদ্রূপ।

প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্।
দিবসং শারদমিব প্রারম্ভসুখদর্শনম্॥

এই শ্লোকে বিষ্ণুর সহিত শারদীয় দিবসের তুলনা করা হইতেছে। বিষ্ণু প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষ—বিকসিত কমললোচন, বালাতপনিভাংশুক—পীতাম্বরধর, প্রারম্ভসুখদর্শন—যোগীগণের সুখদর্শন। শারদীয় দিবসও প্রবুদ্ধ পুণ্ডরীকাক্ষ—বিকসিত কমল উহার লোচন স্বরূপ, বালাতপনিভাংশুক—বালসূর্য্যরশ্মি

উহার পরিধেয় বসনস্বরূপ; প্রারম্ভসুখদর্শন—প্রভাতে মনোহর। এরূপ সম্পূর্ণ উপমা সচরাচর দেখা যায় না।

বাহুভির্বিটপাকারৈর্দিব্যাভরণভূষিতৈঃ।
আবির্ভূতমপাং মধ্যে পারিজাতমিবাপরম্॥

দিব্যাভরণভূষিত শাখাসদৃশ বাহুচতুষ্টয়ে উপলক্ষিত (বিষ্ণু) সমুদ্রমধ্যে আবির্ভূত দ্বিতীয় পারিজাত বৃক্ষের ন্যায়।

বভৌ সদশনজ্যোৎস্না সা বিভোর্বদনোদ্গতা।
নির্যাতশেষা চরণাৎ গঙ্গেবোর্দ্ধপ্রবর্ত্তিনী॥

বিষ্ণুর মুখনিঃসৃতা দন্তকান্তিসংযুক্তা সেই (ভারতী) চরণনিঃসৃতাবশিষ্টা ঊর্দ্ধপ্রবাহিনী গঙ্গার ন্যায় শোভিতা হইল।

তেষাং দ্বয়োর্দ্বয়োরৈক্যং বিভিদে ন কদাচন।
যথা বায়ুবিভাবস্বোঃ যথা চন্দ্রসমুদ্রয়োঃ॥

উহাদের দুই দুই জনের (রামলক্ষ্মণের এবং ভরতশত্রুঘ্নের) ঐক্য, বায়ুবিভাবসুর এবং চন্দ্র-সমুদ্রের সংযোগের ন্যায়, কখন বিভিন্ন হয় নাই।

সুরগজইব দন্তৈর্ভগ্নদৈত্যাসিধারৈঃ
নয় ইব পণবন্ধব্যক্তযোগৈরুপায়ৈঃ।
হরিরিব যুগদীর্ঘৈর্দোর্ভিরংশৈস্তদীয়ৈঃ
পতিরবনিপতীনাং তৈশ্চকাশে চতুর্ভিঃ॥

দৈত্যগণের অসিধারব্যর্থকারী দন্তচতুষ্টয়ের দ্বারা—ঐরাবতের ন্যায়, ফলসিদ্ধ্যনুমিতপ্রয়োগ সামপ্রভৃতি উপায় চতুষ্টয়ের দ্বারা—নীতির ন্যায়, এবং যুগপদ্দীর্ঘ বাহুচতুষ্টয়ের দ্বারা—বিষ্ণুর ন্যায়, বিষ্ণুতেজাংশসম্ভূত সেই পুত্র চতুষ্টয়ের দ্বারা—রাজরাজ দশরথ শোভা পাইয়াছিলেন।

হরধনুর্ভঙ্গে রুষ্ট পরশুরাম মিথিলার পথে রামের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ইনি শান্ত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উগ্রস্বভাব।

পিত্র্যমংশমুপবীতলক্ষণং
মাতৃকঞ্চ ধনুরূর্জ্জিতং দধৎ।

যঃ সসোম ইব ঘর্ম্মদীধিতিঃ
সদ্বিজিহ্ব ইব চন্দনদ্রুমঃ ॥

উপবীত চিহ্নিত পিত্র্যাংশ এবং ধনুর্ব্বর্জ্জিত মাতৃকাংশ ধারণ করায় যিনি (ভার্গব) চন্দ্রসংযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় এবং সর্পবেষ্টিত চন্দনতরুর ন্যায় প্রতীয়মান।

পরশুরাম বলিলেন—

ক্ষত্রজাতমপকারবৈরি মে
তন্নিহত্য বহুশঃ শমং গতঃ।
সুপ্তসর্প ইব দণ্ডঘট্টনাৎ
রোষিতোঽস্মি তববিক্রমশ্রবাৎ ॥

ক্ষত্রিয়েরা অপকারহেতু আমার বৈরি—অনেকবার উহাদের নিধনসাধন করিয়া আমি শমতাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু সম্প্রতি তোমার বিক্রম শ্রবণে দণ্ডতাড়িত সুপ্তসর্পের ন্যায় রুষ্ট হইয়াছি।

বিদ্ধিচাত্তবলমোজসা হরেঃ
ঐশ্বরং ধনুরভাজি যত্ত্বয়া।
খাতমূলমনিলো নদীরয়ৈঃ
পাতয়ত্যপি মৃদুস্তটদ্রুমম্ ॥

জানিও, তুমি যে হরধনু ভঙ্গ করিয়াছ বিষ্ণুর তেজে উহা হৃতসার ছিল। নদীর বেগে উৎখাতমূল তটবৃক্ষকে সামান্য বায়ুও পাতিত করিতে পারে।

তাবুভাবপি পরস্পরস্থিতৌ
বর্দ্ধমান পরিহীনতেজসৌ।
পশ্যতি স্ম জনতা দিনাত্যয়ে
পার্ব্বণৌ শশিদিবাকরাবিব ॥

সেই পরস্পরাভিমুখী বর্দ্ধমানতেজসম্পন্ন (রামকে) এবং হীনপ্রভ (ভার্গবকে) লোকে পূর্ণিমার দিবাবসানে চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় দেখিল।

বসন্ত।

নীরস শীতের গৃহে আজি কে গায়িল গান,
মেলিয়া অলস আঁখি চমকি' উঠিল প্রাণ!
নব কিসলয়ে সাজি' পরাণে উছাস ব'য়ে
তরুকুল ওঠে জাগি বিচিত্র নিশান ল'য়ে;
শীতল মলয় বায়
সুধীরে বহিয়া যায়,
নিশাসে নিশাসে করে ভূতলে সুরভি দান—
নীরস শীতের গৃহে আজি কে গায়িল গান!

অলস-শয়ন ত্যজি' পাখীরা জাগিল সব,
কোথা হ'তে ভেসে এল কত-কি-যে সুধারব;
নন্দনের পথ ভুলে
সমীরণে দুলে দুলে
স্বপনে ভাসিয়ে এল কোকিলের কুহু তান—
নীরস শীতের গৃহে আজি কে গায়িল গান!

সুদূর নিকুঞ্জ হ'তে শুনিয়ে এ কা'র বাঁশী,
আলো করি' বনালয় ফোটে ফুল রাশি রাশি;
সুবাসে মোহিত অলি
ফুলে ফুলে পড়ে ঢলি',
প্রজাপতি করে সুখে ফুলে ফুলে মধুপান—
নীরস শীতের গৃহে আজি কে গায়িল গান!

তুলিল কমলমুখ, নলিনী হরষ মাখি',
নবীন তৃণের বনে হরিণী সঁপিল আঁখি;

তটিনী গায়িল ধীরে,
জোছনা হাসিল নীরে,

চাঁদের বদন হ'তে হিমছায়া অবসান—
নীরস শীতের গৃহে আজি কে গায়িল গান!

নীরস শীতের গৃহে আজি কে গায়িল গান,
মেলিয়া অলস আঁখি চমকি' উঠিল প্রাণ!

আকাশে নবীন রবি,
প্রান্তরে নবীন ছবি,

নবীন নবীন সবি, নবীনে ডুবিল প্রাণ—
নীরস শীতের গৃহে আজি কে গায়িল গান!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

শান্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিন যায়। একটি দুইটি করিয়া জীবনের কত দিনই চলিয়া গিয়াছে—আজিকার দিনও যায়। দিন যায়, আবার দিন আইসে; কিন্তু যে দিনটি যায় সেটি আর আইসে কি? সেটি আর আইসে না; এ কথা কেনা বুঝে, কেনা জানে? কিন্তু বল দেখি প্রতিদিন সূর্য্যদেবের অস্তগমন, বা সায়ংসন্ধ্যার সমাগম দৃষ্টে সংসারের কয় জন ইহা মনে করে? দিন তো যায়—আজিকার দিনও চলিল; কিন্তু বল দেখি প্রতিদিন, যাইবার সময়ে, আমাদিগকে কি বলিয়া যায়? সায়ংকালের বিহঙ্গম কূজন, অস্তোন্মুখ দিবাকরের আরক্ত লোচন, তামসী নিশার অগ্রদূতীগণের অপাঙ্গ দৃষ্টি, আমাদের বলিয়া দেয় না কি,—'হে মানব, এ ভবরঙ্গ ভূমে তুমি যে কয়দিনের জন্য লীলা খেলা করিতে আসিয়াছ তাহার একটি দিন অদ্য কমিয়া গেল।' এ চৈতন্য—এ অবশ্যম্ভাবী সহজ জ্ঞান যদি মানবের থাকিত, প্রকৃতির এই দৈনন্দিন উপদেশ যদি মানব প্রণিধান করিত, তাহা হইলে মানুষ এত দিনে দেবত্ব লাভ করিত এবং সংসার শান্তি ও পুণ্যের নিকেতন হইত।

কিন্তু আমরা বলিতে বসিয়াছি, দিন যায়। পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষ ভেদ করিয়া দেশ বিদেশের কতই নৌকা চলিতেছে। হেলিতে দুলিতে ছোট বড় কতই তরণী গঙ্গাবক্ষে ভাসিতেছে। সন্ধ্যা হইলে নৌকায় নৌকায় প্রদীপ জ্বলিল। সেই আলোকের প্রতিবিম্ব জলে পড়িয়া জলমধ্যে প্রকাণ্ড আলোক-রেখা বিরচিত হইল। নৌকা ছুটিতেছে—জলমধ্যে সঙ্গে সঙ্গে তাহার আলোকাভাও ছুটিতেছে। জলমধ্যে অগ্নি খেলিতেছে, কাঁপিতেছে, দুলিতেছে ও ছুটিতেছে। দুই বিধর্ম্মী জড়ের অদ্ভুত মিলন! ঝির ঝির করিয়া বারিকণা-সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল বসন্ত বায়ু বহিতেছে। অদ্য পূর্ণিমা। আকাশে তারা-দল-সম্বেষ্টিত শশধর, পারিষদ ও অনুচর

পরিবৃত নরপতির ন্যায় বিকসিত। সন্নিহিত গ্রামের দেবালয় হইতে সান্ধ্য দেবারতির বাদ্য-ধ্বনি সমুত্থিত ও নিবৃত্ত হইল। এমন সময়ে সুদূরস্থিত এক নৌকা হইতে দুইজন মাঝি সমস্বরে গীত ধরিল,—

"ও যে চন্দন কাঠের লা,
ডুবেও ডোবে লা,
ও সে হাল ধরে রয়েছে রে তার পরমা গোয়ালা।"

কি মধুর, কি অপূর্ব্ব, কি হৃদয়দ্রবকর! সেই অপূর্ব্ব গীত-ধ্বনি জাহ্নবীর পবিত্র বক্ষে নাচিতে নাচিতে, সেই সুস্নিগ্ধ মৃদু মন্দ বায়ু হিল্লোলের সহিত খেলিতে খেলিতে, সেই চন্দ্রমার সুনির্ম্মল কররাশির সহিত মিশিতে মিশিতে তথায় অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সংগঠিত করিল। সেই ক্ষেত্রে তখন সুন্দরে সুন্দরে সৌন্দর্য্য সমষ্টির সুন্দর সম্মিলন হইল। সুন্দর শশধর, সুন্দর নক্ষত্রপুঞ্জ, সুন্দর আলোকমালা, সুন্দর চন্দ্রকররাশি, সুন্দর নাবিকসঙ্গীত, সুন্দর জাহ্নবীজল, সুন্দর বসন্তানিল। বিধাতা সকলকে এই সকল সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিবার সমান ক্ষমতা দেন নাই। যে ভাগ্যবান তাহা ভোগ করিতে সক্ষম, তিনি আপনার চিত্ত সেই মোহকর রাজ্যে ছাড়িয়া দিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

গুর্ব্বিনী নারীর ন্যায় পণ্যভার সমাকুলিত নৌকাসমূহ মন্থর গতিতে চলিতেছে। এ জগতে যাহার বোঝাই হাল্কা তাহার চাল চলনও হাল্কা। হাল্কা নৌকা সকল ফর ফর করিয়া চলিতেছে। কিন্তু সকল নৌকার কথায় আমাদের কাজ কি? সম্মুখে ঐ যে নৌকাখানি ধীরে ধীরে যাইতেছে তাহাতে যে পুরুষ ও স্ত্রী বসিয়া আছেন, তাঁহাদের কথাই আমরা এক্ষণে বলিব। সেই নৌকার আরোহী রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার পত্নী সুকুমারী দেবী। রমাপতির বয়স ২৩।২৪ এবং সুকুমারীর বয়স অষ্টাদশ অতিক্রম করিয়াছে বোধ হয় না। কাটোয়া নামক গ্রামে রমাপতি মাসিক পঁচিশটি টাকা মাত্র বেতনে স্কুল মাষ্টারি করেন। এরূপ অবস্থার লোকে পরিবার লইয়া কর্ম্মস্থানে থাকে না। কিন্তু কোন দিকে আর কেহ আপনার লোক না থাকায় রমাপতি সুকুমারীকে ফেলিয়া বিদেশে যাইতে অক্ষম। এই যুগলে বিধাতার অপূর্ব্ব সম্মিলনকৌশল অপূর্ব্বরূপ পরিস্ফুট

হইয়াছে। পুরুষ রমাপতি পৌরুষ শোভার আদর্শ এবং নারী সুকুমারী কামিনীকুল-কমলিনী। ক্ষুদ্র নৌকা এই দুই সৌন্দর্য্যসার বক্ষে লইয়া বুক ফুলাইয়া ভাসিতেছে। সুকুমারী নিরাভরণা, তাঁহার প্রকোষ্ঠে কালো হাড়ের চুড়ি ভিন্ন অন্য ভূষণ নাই। কিন্তু কি সুন্দর! সেই সুগোল হস্তে—সেই স্বর্ণবর্ণ সুকুমারীর সুকুমার প্রকোষ্ঠে সেই কৃষ্ণভূষণ কি সুন্দরই দেখাইতেছে! আর রমাপতি? তাঁহার সেই বিশাল বক্ষে অতি শুভ্র যজ্ঞোপবীত হেলিয়া দুলিয়া কত শোভাই পাইতেছে। ভূষণ নামে বর্ত্তমান কালে যে সকল সামগ্রী ব্যবহৃত হয় তাহাতে এমন অপার্থিব সৌন্দর্য্য বাড়ায় কি কমায় তাহা বিশেষ বিচার্য্য কথা। ভূষণ শোভা ও সৌন্দর্য্যের সহায়তা করে। যাহার যাহা নাই তাহারই তাহা পাইবার জন্য সহায়তার আবশ্যক হয়। যাহাদের রূপ নাই, অথবা রূপের অভাব আছে বলিয়া যাহারা জানে, অলঙ্কার তাহাদের সহায়। কিন্তু এস্থলে—যেখানে রূপ পূর্ণিমার চাঁদের মত পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত, সেখানে ছার ভূষণের কি প্রয়োজন?

রমাপতি দরিদ্র, তাঁহার সাত রাজার ধন সুকুমারীকে লইয়া তিনি আনন্দে আপনার জন্মভূমি—পিতৃপিতামহাদির নিবাসস্থান হুগলিতে ফিরিতেছেন। নৌকামধ্যে একটী কাঠের বাক্স, দুইটী কাপড়ের মোট, কয়েক খানি লেপ ও তোষক, দুইটী বালিস এবং কিছু পিত্তল ও কাংস্যপাত্র রমাপতি ও সুকুমারীর বিষয় বিভবের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

সুকুমারী জিজ্ঞাসিলেন,

"উপর হইতে যে আরতির বাজনা শুনিতেছি, ও কোন্ গ্রাম?

রমাপতি উত্তর দিলেন,

"শান্তিপুরের নাম কখন শুনিয়াছ কি? মেয়ে মানুষ শান্তিপুরের বড় ভক্ত; কারণ শান্তিপুর তাহাদের জন্য পুরুষ ভুলাইবার ফাঁদ তৈয়ার করিয়া দেয়। শান্তিপুরের উলঙ্গিনী সাড়ী নামেও যা, কাজেও তা। যাহারা কাপড় পরিয়াও উলঙ্গ থাকিতে চাহে তাহারা, এখানকার তাঁতিদের আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, উলঙ্গিনী সাড়ী পরিয়া রূপের বাঁধন খুলিয়া দেয়। এই সেই শান্তিপুর। এখন তোমার জন্য সেই হাবুডুবু খাওয়ান, মন মজান সাড়ী একখানি সংগ্রহ করিতে হইবে কি?"

সুকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

“এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর। যদি তোমার হাবুডুবু খাওয়ার এখনও বাকী থাকে, যদি তোমার মন এখনও পূরাপূরি না মজিয়া থাকে তাহা হইলে কাজেই সে জন্য কলকৌশল সন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু কাপড়ে তাহার কি করিবে? কাপড় অলঙ্কার প্রভৃতি সামগ্রী বাহিরের শোভা বাড়ায়। কেবল বাহিরের শোভাতে কেবল বাহিরই মজে। সে মজা, সে হাবুডুবু কেবল নেশাখোরের নেশা। দুদিনেই তাহার শেষ হয়।”

রমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,

“তবে তুমি চাও কি?”

সুকুমারী সগর্ব্বে উত্তর দিলেন,—

“আমি যাহা পাইয়াছি।”

রমাপতি প্রীতিপূর্ণ হাসির সহিত বলিলেন,—

“তুমি পাইয়াছ কি? আমি তো দেখি তুমি কেবল সংসারের ক্লেশ ভুগিতে আসিয়াছ, মনের সাধে তাহাই ভোগ করিতেছ। আর আমার ভালবাসা? সত্য কথা বলিব নাকি? তুমি ছাড়া আর সকলকেই আমি খুব ভালবাসি।”

সুকুমারী বলিলেন,—

“আমার উপরে জন্ম জন্মান্তরে যেন তোমার এমনই নিগ্রহ থাকে। আমি জানি, তোমার যে ভালবাসার আমি অধিকারিণী জগতে নারীজন্ম লাভ করিয়া আর কখন কেহ তেমন প্রেম ভোগ করিতে পায় নাই। কত শত রাজরাণীর দশা দেখিয়া আমি হাসিয়া মরি। তাহারা সংসারে আসিয়া কতকগুলা সোণার ঢেলা গায়ে জড়াইয়া হাসিয়া বেড়ায়। কিন্তু যে অমূল্য সোণার শিকলে ইহলোক ও পরলোক বাঁধা আছে তাহা তাহারা জানিতেও পায় না। আমার কষ্টের কথা বলিতেছ? হে মধুসূদন, তোমার পাদপদ্মে দাসীর এই প্রার্থনা, যে যত বার আমাকে এই মর্ত্যলোকে আসিতে হইবে, তত বারই যেন আমি এইরূপ কষ্টই পাই।”

সুকুমারীর চক্ষু জলভারাকুল হইল। রমাপতি মনে মনে বলিলেন,—

"হে ভগবন্, আমি কি তপস্যার বলে, কোন্ সুকৃতির ফলে এই দেবীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছি? সার্থক আমার জন্ম, সার্থক আমার দেহ। আমি তো ঐ দেবীর দাস।" সুকুমারী আবার বলিলেন,—

"আর তোমার ভালবাসার কথা তুমি নিজে কি বুঝিবে? যে যাহা ভোগ-করে সেই তাহা বুঝে। তোমার ভালবাসা বুঝাইয়া বলিবার কথা নাই। আমার রক্ত, মাংস, মন প্রাণ তোমার ভালবাসায় ডুবিয়া রহিয়াছে। হে নারায়ণ, কি পুণ্যে আমার এ সুখ? এ অধম নারীর প্রতি তোমার এ কি অতুল কৃপা?"

নৌকা চলিতে লাগিল। চাকদহের নীচে মাঝিরা রাত্রের মত নৌকা লাগাইয়া রাখিবে স্থির করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সহসা পশ্চিম গগনে একটু কালো মেঘ দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু ঝড়ও উঠিল। রমাপতি মাঝিদিগকে নৌকা না চালাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাহারা সামান্য ঝড় বুঝিয়া নৌকা লাগাইয়া রাখিবার কোনই দরকার মনে করিল না। চাকদহের এদিকে নৌকা লাগা-ইতে তাহাদের ইচ্ছাও ছিল না। সুতরাং তাহারা রমাপতির কথা না শুনিয়া নৌকা চালাইতে লাগিল।

সুকুমারী বলিলেন, "ঝড়ও উঠিয়াছে, মেঘও হইয়াছে। চাকদহ পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে যদি ঝড় খুব বাড়িয়া উঠে তাহা হইলে কি হইবে?"

রমাপতি বলিলেন, "তাহা হইলে নৌকা ডুবিয়া যাইবে, সেটা কি বড়ই ভয়ের কথা নাকি?"

সুকুমারী বলিলেন,—"ভয়ের কথা নহে সত্য। কারণ তোমার সাক্ষাতে তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে মরিব তাহার অপেক্ষা ভাগ্য আর কি আছে? কিন্তু মরণের পর তোমার কাছে তো আর থাকিতে পাইব না।"

রমাপতি কহিলেন,—"মরণ যদি তোমার হয় তাহা হইলে আমারই কি জীবন থাকিবে পাগলিনি? আজিকার ঝড়ে যদি নৌকা ডুবিয়া যায় তাহা হইলে তোমারও যে গতি আমারও সেই গতি। আমরা জীবনে ও মরণে একই থাকিব। আজি যদি দেবতা আমাদের নৌকা ডুবাইয়া দিয়া সন্তুষ্ট হন, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি করিবার অধিকার নাই। কিন্তু এটুকু তুমি স্থির জানিও, যে আমরা উভয়ে একসঙ্গে ডুবিব, একসঙ্গে যাতনা ভোগ করিব, একসঙ্গে এই ধূলার দেহ ছাড়িব, উভয়ে একসঙ্গে ইহার অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ দেহ ধরিব, তাহার পর উভয়ে একসঙ্গে এই যন্ত্রণার রাজ্য ছাড়িয়া পরম আনন্দরাজ্যে বেড়াইব ও সকল আনন্দের যিনি মূল এবং সকল প্রেমের যিনি নিদান উভয়ে একসঙ্গে সেই সর্ব্বফল দাতার গুণ গান করিব। অতএব মরণে আমাদের দুঃখের কথা কি আছে?"

সুকুমারী কোন উত্তর দিলেন না; কিন্তু রমাপতির নিকটে আর একটু সরিয়া আসিলেন। ক্রমে ঝড় আরও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল; মেঘে সমস্ত গগন ছাইয়া গেল; সেই শোভাময় চন্দ্রতারা কোথায় লুকাইল, এবং প্রকৃতি অতি বিকট বেশে সাজিয়া দাঁড়াইল। রণরঙ্গিণী প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ ছড়াইয়া অট্টহাসি হাসিতে লাগিল। প্রবল বাত্যার শাঁ শাঁ শব্দে এবং মেঘের তীব্র গর্জ্জনে সেই রণোন্মাদিনী হুঙ্কারিতে লাগিল। মাঝিরা নৌকা স্থির রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিফল সে চেষ্টা। নদীবক্ষে বড় বড় ঢেউ উঠিল। সেই সকল তরঙ্গের জল নৌকার উপরেও উঠিতে লাগিল। মাঝিরা আগে কথা শুনে নাই, এখন নৌকা তীরে আনিবার জন্য কত চেষ্টাই করিতে লাগিল। কিন্তু নৌকাচালনা তাহাদের পক্ষে অনায়ত্ত হইয়া উঠিল। রমাপতি সকলই জানিতেছেন ও বুঝিতেছেন। তিনি মাঝিদের জিজ্ঞাসিলেন,—

"গতিক কি?"

প্রধান মাঝি বলিল,—

"ঠাকুর, গতিক বড় মন্দ। এখন যা হয় কর।"

সুকুমারীর চক্ষু বাহিয়া তখন ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। তিনি তখন দুই কর ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

"হে অনাথনাথ, হে দীনবন্ধু, আমি মরি তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু দয়াময়, এই কর যেন আমার ঐ দেবতা, আমার ঐ গুরুর গুরুর কোন বিপদ না ঘটে। আমার মত একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকার মরা বাঁচায় সংসারের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, কিন্তু ভক্তবৎসল দয়াময়, আমার ঐ দেবতা অসময়ে সংসার ত্যাগ করিলে তোমার রাজ্যের অনেক ক্ষতি হইবে। হে মধুসূদন, প্রেমে যাঁহার হৃদয় পূর্ণ তিনি যদি থাকিতে না পান তবে সংসারে থাকিবে কি? হে বিপন্নবান্ধব, এ অধম নারী তোমার চরণে আর কখন কোন ভিক্ষা চাহে নাই। তুমি কাতরের সহায়, আজি তুমি এ অধম নারীকে এ ভিক্ষা দিবে না দয়াময়? দিবে, দিবে, অবশ্যই দিবে।"

তাহার পর রমাপতির দিকে ফিরিয়া সুকুমারী তাঁহার চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—

"আমার সর্ব্বস্ব, তুমি তো মরিতে পাইবে না। যিনি এই ভবনদীর প্রধান কর্ণধার আমি সেই দয়াময় হরির চরণ ধরিয়া কাঁদিয়াছি। তিনি তোমাকে রাখিবেনই রাখিবেন। আমাকে তুমি যত ভালবাস তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। আমার কোন্ প্রার্থনা তুমি কবে না শুন? এই অন্তিমকালে হে স্বামিদেব, তোমার চরণে আমার এক প্রার্থনা আছে। তুমি তাহা রক্ষা করিবে জানিলে আমি হাসিতে হাসিতে মরি। আমি মরিয়া যাওয়ার পর তোমাকে আবার বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে হইবে।"

রমাপতি তখন সুকুমারীকে সস্নেহে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

"চল সুকুমারি, নৌকার ছাতের উপর গিয়া যাহা বলিতে হয় বলিব শুন।"

তাহার পর উভয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া বাহিরে আসিলেন। তখন রমাপতি বলিলেন,—

"শুন দেবি, তোমাকে চিরদিন দেবীই জানিয়া কায়মনোবাক্যে তোমার উপাসনা করিয়াছি। আজি যদি তোমারই মরণ হয় তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া বাঁচিতে পারিব কেন? এই তোমাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যদি এখনই নৌকা ডুবে, তাহা হইলে জানিও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দেহে শেষ নিশ্বাস বহিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে বাঁচাইতে যত্ন

করিব। কিন্তু তাহাতেও যদি তোমাকে বাঁচাইয়া উঠিতে না পারি, তাহা হইলে জানিবে তোমারও যে গতি আমারও সেই গতি।”

সুকুমারী একটা উত্তর দিবার ইচ্ছা করিলেন কিন্তু তখনই একটা অতি ভয়ানক বাত্যা আসিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিল। সুকুমারীর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

নৌকা তো ডুবিয়া গেল, কিন্তু কোথায় রমাপতি—কোথায় সুকুমারী? ঐ যে—ঐ যে রমাপতি সেই তরঙ্গায়িত জাহ্নবী-বক্ষে সুকুমারীকে পৃষ্ঠে লইয়া সাঁতার দিতেছে। কখন জল তাঁহাদের উপর দিয়া চলিতেছে, কখন তাঁহারা জলের উপর দিয়া চলিতেছেন। নিবিড় অন্ধকার চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। কোথায় কোন্ দিকে যাইতেছেন তাহা রমাপতি জানেন না। প্রবল ঝড়ে ও খর-স্রোতে কখন বা তাঁহাদিগকে ডুবাইয়া দিতেছে, কখন বা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। অনবরত জলোচ্ছ্বাস তাঁহাদের মুখে আসিয়া লাগিতেছে ও উদরস্থ হইতেছে। তথাপি রমাপতি পূর্ণ উদ্যমে সকল বিঘ্নের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে যে ভার রহিয়াছে তাহার কল্যাণকামনায় তিনি কোন বিপদকেই বিপদ বলিয়া মনে করিতেছেন না। কিন্তু সকল বিষয়েরই সীমা আছে। মানব-দেহের ক্ষমতাদিরও একটা সীমা আছে সন্দেহ নাই। বহুক্ষণ এইরূপ বিজাতীয় শ্রমে রমাপতি নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সুকুমারী তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,

“আমাকে ছাড়িয়া দেও, হয় ত আমিও সাঁতার দিতে পারিব।”

হাঁফাইতে হাঁফাইতে কাতর স্বরে রমাপতি বলিলেন,—

“কাহাকে ছাড়িয়া দিব? তোমার ঐ শরীর? মরণের পর।”

কিন্তু ক্রমশই রমাপতি অধিকতর ক্লান্ত ও অক্ষম হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তখন সুকুমারী অন্য উপায়াভাবে কৌশল করিয়া রমাপতির পৃষ্ঠাশ্রয় ত্যাগ করিলেন এবং তখনই ডুবিয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ প্রায় রুদ্ধশ্বাস রমাপতি “সুকুমারি, সুকুমারি” শব্দে চীৎকার করিয়া সেই স্থলে ডুবিয়া গেলেন। অচিরকাল মধ্যে সুকুমারীকে লইয়া রমাপতি পুনরায় ভাসিয়া উঠিলেন এবং পাছে সুকুমারী আবার ফাঁকি দেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার প্রকোষ্ঠ আপনার দন্ত

মধ্যে কঠিনরূপে ধারণ করিলেন। কোমলাঙ্গীর হস্ত দন্তাঘাতে কাটিয়া গেল এবং সেই ক্ষতমুখ হইতে দরদরিত ধারায় রুধির প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথী নীরে মিশিতে লাগিল। সুকুমারী রমাপতির পৃষ্ঠত্যাগ করিবার জন্য কোন প্রকার বল প্রয়োগ করিলেন না। তিনি বুঝিতেন, এসময়ে জোর করিলে, রমাপতির জীবনের এখনও যদি কোন আশা থাকে তাহাও আর থাকিবে না। রমাপতি ক্রমে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং সময়ে সময়ে সুকুমারীর সহিত ডুবিয়া পড়িতে লাগিলেন। শরীর আর বহে না হাত আর উঠে না, পা আর নড়ে না, নিশ্বাস আর চলে না। তিনি বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই। তখন তিনি বলিলেন,—

"সুকুমারী, আর বাঁচাইতে পারিব না। তোমারও যে গতি, আমারও—"

তিনি যেই কথা কহিতে গেলেন সেই তাঁহার দন্তমধ্য হইতে সুকুমারীর হস্ত খুলিয়া গেল। তখনই সুকুমারী আবার জলে ডুবিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া জলে ডুব দিলেন।

এদিকে ঝড় একটু থামিল; মেঘ ক্রমে ক্রমে উড়িয়া যাওয়ায় আকাশ মণ্ডল আবার পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। ক্রমে চন্দ্র ও তারা উকি দিতে দিতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং জাহ্নবী-বক্ষ আবার চন্দ্রকরোজ্জ্বল হইয়া হাসিতে লাগিল। পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতি দেবী আবার শোভাময়ী সুন্দরীর বেশ ধারণ করিলেন। আকাশ বেশ খোলসা হইয়াছে এবং আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই দেখিয়া দুই এক খানি নৌকাও লগী উঠাইয়া, কাছি খুলিয়া, গা ভাসাইয়া দিল।

রমাপতি ভাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু কোথায় সুকুমারী? রমাপতি সাধ্যমত উচ্চস্বরে ডাকিলেন,—

"সুকুমারী, সুকুমারী!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

আবার রমাপতি ডুবিলেন এবং আবার উঠিয়া ডাকিলেন,—

"সুকুমারী, সুকুমারী!"

"কিন্তু কোথায় সুকুমারী?"

তখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, মর্ম্মাহত, রুদ্ধশ্বাস রমাপতির চৈতন্য তিরোহিত হইল এবং তাঁহার শেষ নিশ্বাস শ্বাসনলী ত্যাগ করিল।

কিছু দূরে একখানি নৌকা আসিতেছিল। তদুপরিস্থিত লোকেরা তাঁহার শব্দ শুনিয়া স্থির করিল এই ঝড়ে যাহাদের নৌকা ডুবিয়াছে তাহার মধ্যে তিনিও একজন। তাহারা দ্রুত আসিয়া তাঁহাকে আপনাদের নৌকায় তুলিল এবং বহু কৌশলে সুশ্রুষায় তাঁহাকে আবার চেতন করিল। চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—

"সুকুমারী, সুকুমারী!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

তখন রমাপতি একে একে নৌকার তাবৎ লোকের মুখের দিখে চাহিলেন। দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে সুকুমারী নাই। তখন কেহ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই তিনি গঙ্গা-প্রবাহে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন নাবিকও জলে পড়িল এবং শীঘ্রই তাঁহাকে উঠাইয়া আনিল। এবার নৌকার লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া রহিল। তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন:—

"সুকুমারী, সুকুমারী!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুকুমারীকে হারাইয়াও রমাপতির মরা হইল না। তাঁহার যে অবস্থা তাহাতে বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনা এবং মৃত্যু তাহার তুলনায় পরম সুখ। অনেক শত্রু মিলিয়া তাঁহাকে সে সুখ ভোগ করিতে দিল না। যেখানে মৃত্যুর নামে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, মৃত্যু সে স্থলে অগ্রেই উপস্থিত। যেখানে মৃত্যু দেখা দিলে আত্মীয়বর্গ শোকে আকুল হইবে, রোদনে ও আর্ত্তনাদে বসুধা প্লাবিত হইবে, জীবিত স্বজনগণ যাতনায় অবসন্ন হইবে, সেখানে মৃত্যু, তস্করের ন্যায়, অলক্ষিত ভাবে সমাগত হইয়া সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর। আর যেখানে মানব মৃত্যুকে শান্তিনিকেতন বলিয়া জ্ঞান করে, মৃত্যুর

নিমিত্ত লালায়িত, সেখানে শত সাধনাতেও মৃত্যুর দেখা নাই। মৃত্যুর নিমিত্ত লালায়িত রমাপতি মরিতে পাইলেন না। সুকুমারীকে হারাইয়াও তাঁহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল। অনেক শত্রু আত্মীয়তা করিয়া যাতনা-ক্লিষ্ট রমাপতিকে মরিতে দিল না।

যে নৌকা আসিয়া রমাপতিকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিল তাহাতে রাধানাথ চট্টোপাধ্যায় নামে এক প্রভূতধনসম্পন্ন অতি অমায়িক স্বভাব ব্যক্তি আপনার দলবল সহ আরোহী ছিলেন। সেই রাধানাথ বাবু ও তাঁহার অনুগত জনেরা রমাপতিকে দুঃসহ যাতনার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে দিলেন না। তিনি অতি যত্নে রমাপতিকে সঙ্গে লইয়া হালিসহরে আসিলেন। সেখানে রাধানাথের অতি প্রকাণ্ড বাসভবনে রমাপতি অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ ও বিনোদিত করিবার নিমিত্ত রাধানাথ নানা সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার স্বভাবের কোমলতা, অবস্থার নিতান্ত হীনতা, বিপদের যৎপরোনাস্তি প্রগাঢ়তা, সংসারে স্বজনবিহীনতা প্রভৃতি তাঁহার প্রতি রাধানাথের অমিত স্নেহ আকর্ষণ করিল। রাধানাথ তাঁহাকে পুত্রবাৎসল্যে পালন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অপরিসীম শোক কথঞ্চিৎ মন্দীভূত ও প্রশমিত হইলে তাঁহাকে পুনরায় বিবাহিত করিয়া সংসারী করিয়া দিবেন সংকল্প করিলেন। নিয়ত তাঁহার সঙ্গে সমবয়স্ক সদালাপী লোক এবং শরীর রক্ষার্থ দ্বারবান ফিরিতে লাগিল, রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী, তিনি না খাইলে, আপনারা অন্নজল ত্যাগ করিবেন ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে যথাসময়ে আহার করাইতে লাগিলেন, অধ্যয়নে তাঁহার অনুরাগ ছিল জানিয়া রাশি রাশি নূতন পুস্তক তাঁহার জন্য সমানীত হইতে লাগিল, সংগীতে মানব মন মুগ্ধ হয় বিশ্বাসে তাহারও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইল, সংক্ষেপতঃ একদিনে একবারে মরিতে না দিয়া তাঁহার নিত্যমৃত্যুর বিশেষ আয়োজন করা হইল। সুকুমারী হারা হইয়াও রমাপতি বাঁচিয়া রহিলেন।

—কিন্তু তোমরা যাহাই বল, সকল কাণ্ডেই বিধাতার অতি আশ্চর্য্য বিধি আছে। শোক, যতই কেন কঠোর হউক না, তাহার নিবারণ পক্ষে সময় অমোঘ মহৌষধ। তীব্র শোক—অপরিসীম প্রেমাস্পদের বিয়োগজনিত

দুঃসহ জ্বালা হৃদয়ে যে অনপনেয় অঙ্কপাত করে তাহার বিলোপ করিতে কালের সাধ্য নাই। কিন্তু শোকের পরুষতা, দিনে না হউক মাসে, মাসে না হউক বৎসরে, অবশ্যই মন্দীভূত হইয়া আইসে। উপদেশ বা শিক্ষা সর্ব্বত্র শোকের প্রখরতা নষ্ট করিতে সক্ষম নহে। তাহা হইলে,

" জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রু´বং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥"*

স্বয়ং ভগবানের এই মহদুপদেশ বিদ্যমান থাকিতে লোকে শোকে বিহ্বল হয় কেন?

দেখিতে দেখিতে বৎসর অতীত হইল। রমাপতি সুকুমারী হারা হইয়াও এই সুদীর্ঘ কাল অবিচ্ছেদে মৃত্যুযাতনা সহিতে সহিতে জীবন বাহিয়া আসিতেছেন।

তাঁহার ব্যবহার, তাঁহার সততা, তাঁহার বিদ্যা, তাঁহার শোক, তাঁহার রূপ সকলই তাঁহাকে তাঁহার আশ্রয়দাতার পরিবার মধ্যে আত্মীয় হইতেও আত্মীয় করিয়া তুলিল। ক্রমে ক্রমে রমাপতি যেন সেই পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার স্নেহবন্ধনে সামান্য ভৃত্য হইতে গৃহস্বামি পর্য্যন্ত এবং সামান্যা দাসী হইতে গৃহিণী ঠাকুরাণী পর্য্যন্ত সকলেই বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেই বিশাল পুরীর সর্ব্ব-ভাগই তাঁহার নিমিত্ত উন্মুক্ত; সেই বিপুল বিভব তাঁহার সুখ সম্বিধানে নিয়োজিত; সেই অগণ্য দাসদাসী তাঁহার প্রীতি সমুৎপাদনে সচেষ্টিত; এবং সেই গৃহস্বামী তাঁহার সন্তোষ সংসাধনে ব্যতিব্যস্ত। হে অনাথ নাথ, ইচ্ছাময়, হরি! তোমার একি কৌশলময় ব্যবস্থা? তুমি একদিকে মারিতেছ, আর একদিকে রাখিতেছ এবং এক দিকে ভাঙ্গিতেছ, আর এক দিকে গড়িতেছ। হে নারায়ণ, তুমি রাখিলে তাহাকে মারে কে? তুমি মারিলে তাহাকে রাখে কে? হে সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম, এ সংসারে কেবল তুমিই সার ও সত্য। কবে সে দিন হইবে যখন আমরা অমেয় শোকে বা বিপদে, অসীম সুখে বা আনন্দে তোমার নাম স্মরণ করিতে ভুলিব না?

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সাংখ্যযোগ। ২৭ শ্লোক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"পোড়ামুখো পাখি! পড়িতে পারেন না, কিছু না, কেবল ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিস তো ভাল, নহিলে তোকে আজি আর ছোলা দিব না।"

একটী ইন্দীবরাননা, দ্বাদশবর্ষীয়া, পরমাসুন্দরী বালিকা আপনার সুবৃহৎ, সমুজ্জ্বল কাকাতুয়া পক্ষীর দাঁড় হাতে লইয়া তাহাকে এইরূপে তিরস্কার করিতেছিলেন। পাখী এ তিরস্কারের মর্ম্ম বুঝিল কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু সে আবার চীৎকার করিয়া উঠিল,—

"ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ।"

"মা গো, কাণ ঝালা পালা করিয়া দিল। থাক্ তুই আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া সেই সুন্দরী কাকাতুয়ার দাঁড় তাহার শিকে ঝুলাইয়া দিয়া সে দিক হইতে যেমন ফিরিলেন অমনই সম্মুখে এক দেবকান্তি যুবকমূর্ত্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। যুবককে দর্শনমাত্র বালিকা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিল। যুবক সুন্দরী বালিকাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"সুরবালা, আজি আর তবে আমার সঙ্গে বিবাদ হইবে না বোধ হয়। আজিকার ঝোঁক কেবল পাখীর উপর—কেমন?"

সুরবালা উত্তর দিল,—

"তা বই কি? রমাপতি বাবু, আজি আপনার সঙ্গে ভারী ঝগড়া করিব ঠিক করিয়া আছি।"

এই বলিয়া বালিকা অতি আদরের সহিত রমাপতি বাবুর হাত ধরিয়া তত্রত্য এক খানি সুন্দর কৌচে বসাইল এবং আপনিও তাহারই একদিকে বসিল।

এই স্থানে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে এই সুন্দরী বালিকা রাধানাথ বাবুর একমাত্র সন্তান। তাঁহার বিপুল বিভব, এবং নানা সুখৈশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারিণী। সুরবালা অবিবাহিতা। রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী যেরূপ পাত্র পাইলে কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া আছেন, তাহা সহজে মিলে

না। পাত্র অতি রূপবান, সুশীল, শান্ত ও বিদ্বান হওয়া চাই, নিঃস্ব, নিরাশ্রয়, ও নিরবলম্বন হওয়া চাই ; তাহার আর কেহ আপনার লোক না থাকে এবং সুরবালাকে কখন পিতৃগৃহ হইতে আর কোথাও লইয়া যাইতে না চাহে এমন পাত্র চাই। এরূপ অষ্টবজ্র সংমিলন সহজ নহে। সুতরাং বিবাহ-যোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হইতেছে, তথাপি সুরবালার বিবাহ হইতেছে না।

আসনে উপবেশন করিয়া রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আজি আমার এমন কি দোষ হইয়াছে যে ভারী ঝগড়া না করিলে চলিবে না ?" সুরবালা বলিলেন,—

"দোষ আজি একটা নাকি ? সারাদিন পরে বিকালে একবার দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন কি দোষ হইয়াছে ?" আজি এত দোষ হইয়াছে যে উপরি উপরি তিন দিন ঝগড়া না করিলে চলিবে না।"

রমাপতি বলিলেন,—

আরম্ভ কর তবে—দেরি কেন ? যখন ঝগড়া না করিলে চলিবে না ঠিক করিয়াছ তখন আর দেরি করিয়া কাজ কি ? আমি প্রস্তুত।'

বালিকা বলিল,—

অমন করিয়া ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না—হ্যাঁ।'

রমাপতি বলিলেন,—

"তা কি চলে ? তুমি আরম্ভ কর, আমি বাঁধন দিতেছি।"

বালিকা ঝগড়া করিতে পারিল না। এমন করিয়া কখন কি ঝগড়া করা যায় ? ঝগড়া শাস্ত্রে সুরবালা সুপণ্ডিতা হইলে যাহার সহিত ঝগড়া করিতে হইবে তাহার সহিত এমন করিয়া পরামর্শ করিতে আসিত না। তখন সুরবালা অতি চেষ্টায় মুখের সমস্ত হাসি লুকাইয়া, যতদূর সাধ্য গম্ভীর হইয়া এবং কণ্ঠস্বর বিশেষ ভারী করিয়া বলিল,—

"আচ্ছা—আচ্ছা—আজি হইতে আপনার সঙ্গে আমার আড়ি।"

বালিকা আড়ির প্রগাঢ়তা বুঝাইবার জন্য দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ আপনার চিবুকে স্পর্শ করাইয়া মুখ ফিরাইল। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে আড়ি সাব্যস্ত হইয়া গেল।

পাকাপাকি রকম আড়ি হইল দেখিয়া রমাপতি বলিলেন,—

"আমি বাঁচিলাম। অনেক দিন না কাঁদিয়া আমার প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে। এখন তুমি যদি দুই তিন দিন কিছু না বল তাহা হইলে আমি একটু কাঁদিয়া বাঁচি।"

সুরবালা ফিরিয়া বসিল। তাহার কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ধীরে ধীরে বদন হইতে তিরোহিত হইল। তখন প্রকৃত গাম্ভীর্য্যের রেখা সমূহ সেই বালিকার বদন-মণ্ডলে প্রকটিত হইল। ক্রমে তাহার চক্ষু ঈষৎ জলভারাকুল হইল। তখন সে বলিল,—

"রমাপতি বাবু, চিরকালই কি কাঁদিতে হইবে? এ কাঁদার কি শেষ নাই? আপনার যতই কষ্ট হউক, আপনাকে আমি আর কখনই কাঁদিতে দিব না। আপনি যদি আর কাঁদেন দেখিতে পাই তাহা হইলে আমি এবার জলে ডুবিয়া মরিব।"

রমাপতি সস্নেহে বলিলেন,—

"ছি সুরো, ও কথা কি বলিতে আছে? তোমার কথায়—আমি তো কান্না ছাড়িয়া দিয়াছি। আর আমি কখনই কাঁদিব না সুরো।"

সুরবালা বলিল,—

"কাঁদিবেন না যেন; কিন্তু আমি দেখিতে পাই সারাদিনই আপনি বড়ই কাতর থাকেন। আপনি খান কেবল আমাদের দায়ে, শয়ন করেন কেবল আমাদের জ্বালায়, কথাবার্ত্তা কন আমাদের কেবল দৌরাত্ম্যে, আমাকে পড়া বলিয়া দেন ছাড়িনা বলিয়া। আমি সারাদিন দেখি আর ভাবি দুঃখে আপনার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। আপনার সেই অবস্থা দেখিয়া আমি কতদিন লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদি।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বালিকার উজ্জ্বল, আয়ত লোচনদ্বয় হইতে স্থূল অশ্রুবিন্দু সমূহ ঝরিতে লাগিল। সুরবালা অঞ্চলের কাপড় দিয়া বদন আবৃত করিলেন। ধন্য সে মানব যে শোকে এরূপ সহানুভূতি পায়!

তখন অতি কোমলতার সহিত রমাপতি সুরবালার মুখের কাপড় খুলিয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিলেন এবং অতি প্রীতিময় স্বরে বলিলেন,—

"না সুরো না—আমি আগে যেমন ছিলেম এখন তো আর তেমন নাই। তোমার স্নেহ, তোমার দয়া এখন আমাকে সকল দুঃখ ভুলাইয়া দিতেছে।

আমার এখন কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা কি তুমি দেখিতে পাও না? তোমার হাসি কান্না এখন আমাকে হাসাইতে কাঁদাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমার ভালবাসা ক্রমে আমাকে সকলই ভুলাইয়া দিতেছে।”

সুরবালার মুখে হাসি আসিল। কিন্তু তিনি অন্য কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সেই সুবিস্তৃত প্রকোষ্ঠ মধ্যে আর দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। সেই দুই জনের মধ্যে যিনি পুরুষ তিনিই রাধানাথ। উজ্জ্বল ও উন্নত ললাট, পরিপুষ্ট দেহ, আয়ত লোচন, গৌর বর্ণ, তাঁহার সুপরিণত কলেবরের শ্রী প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার বয়স ৪০ ছাড়ায় নাই; কিন্তু মাথায় রজত সূত্রবৎ পক্ক-কেশের ঘটাটা খুব বেশি। সঙ্গে তাঁহার অন্ধের যষ্টি, অন্ধকারের আলো, ভবনদীর ভেলা, সাগর সেঁচা মাণিক, বুড়া বয়সের সম্বল ভুবনেশ্বরী—রাধানাথের ব্রাহ্মণী। ভুবনেশ্বরীর বয়স ৩৫ ছাড়ায় নাই। রূপে ও গুণে ভুবনেশ্বরী অতুলনীয়া। এই প্রৌঢ় প্রৌঢ়া দম্পতীর সমাগমে ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল। যাঁহারা নবীন নবীনার শোভায় বিমোহিত, তাঁহারা হয়ত এ মন্দভাগ্য গ্রন্থকারকে নিতান্ত বৃদ্ধ বলিয়া মনে করিবেন এবং যৎপরোনাস্তি অরসিক বলিয়া গালি দিবেন। কিন্তু তাহা হউক, আমি আবার বলিতেছি, সেই প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার পূর্ণাঙ্গ সমূহের যে সুপরিণত শোভা তাহার তুলনাস্থল অতি বিরল।

রাধানাথ আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন,—

“একি সুরো, তুমি কাঁদিতেছিলে নাকি?” সুরবালা দৌড়িয়া পিতার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

“দেখ দেখি বাবা, রমাপতি বাবু আজিও কাঁদিতে চাহিতেছেন। মা, তুমি তো আর কিছু বল না। তোমার কথাই কেবল উনি শুনেন।”

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—

“তুই যেমন পাগ্‌লী, তোকে তেমনই ক্ষেপায়। রমাপতি কাঁদিবে কি দুঃখে? কেন বাবা, তুমি আবার কাঁদার কথা বল?”

রমাপতি বলিলেন,—

“না মা, আপনি সুরোর কথা শুনিবেন না।”

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—

"আজি সারাদিনটি তোমাকে একবারও দেখিতে পাই নাই। কালি বৈকালে বড় মাথা ধরিয়াছিল বলিয়াছিলে, আজি কেমন আছ? তুমি এদিকে আসিয়াছ শুনিয়া তোমাকে দেখিতে আসিলাম।"

রাধানাথ বলিলেন,—

"আর আমি আসিলাম সুরোকে এক খবর দিতে। সুরো যদি সন্দেশ খাওয়ায় তবে বলি।"

সুরো ব্যস্ত হইয়া বলিল,—

"কি বাবা, কি বাবা?"

রমানাথ বলিলেন,—

"রমাপতি, সম্প্রতি তোমার, আমার, সুরোর এবং গৃহিণীর যে ছবি প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলাম, তাহা আজি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তোমরা দেখিবে চল।"

সুরবালা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসিল,—

"কোথায় আছে বাবা?"

পিতা উত্তর দিলেন,—

"তোমার জন্যই আসিয়াছে, তোমারই ঘরে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

সুরবালা মহাহ্লাদে রমাপতির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

ভুবনেশ্বরী দেবী একটু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"রমাপতি যদি আমাদের ছেলে হইত।"

রাধানাথ বলিলেন,—

"কেন রমাপতিকে কি এখনও আপনাদের ছেলে বলিয়া লওয়া যায় না?"

কালিদাসের উপমা।

সীতা গ্রহণজন্য প্রজাবর্গ রামের অপবাদ করে, রঘুকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে শুনিয়া যশোধন রাম অনুজগণকে বলিলেন ঃ—

রাজর্ষিবংশস্য রবিপ্রসূতেঃ
উপস্থিতঃ পশ্যত কীদৃশোঽয়ম্।
মত্তঃ সদাচারশুচেঃ কলঙ্কঃ
পয়োদবাতাদিব দর্পণস্য॥

মেঘ বায়ু হইতে দর্পণের ন্যায়, আমা হইতে এই শুদ্ধাচারসম্পন্ন রবিপ্রসূত রাজর্ষিবংশের কীদৃশ কলঙ্ক উপস্থিত হইল দেখ।

পৌরেষু সোঽহং বহুলীভবন্তম্
অপাং তরঙ্গেষ্বিব তৈলবিন্দুম্।
সোঢ়ুং ন তৎপূর্ব্বমবর্ণমীশে
আলানিকং স্থাণুমিব দ্বিপেন্দ্রঃ॥

হস্তী যেমন বন্ধনস্তম্ভ সহ্য করিতে পারে না তেমনি আমি জলস্রোতে একবিন্দু তৈলের ন্যায় পৌরজনসমূহে ক্রমশঃ সম্বর্দ্ধনশীল এই অপবাদ সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না।

লক্ষ্মণ সীতাকে বনে পরিত্যাগ করিবার জন্য ভাগিরথীতীরে উপস্থিত।

গুরোর্নিয়োগাদ্বনিতাং বনান্তে
সাধ্বীং সুমিত্রাতনয়ো বিহাস্যন্
অবার্য্যতেবোত্থিতবীচিহস্তৈঃ
জহ্নোর্দুহিত্রা স্থিতয়া পুরস্তাৎ॥

গুরুর নিয়োগানুযায়ী—সাধ্বী বনিতাকে বনান্তে পরিত্যাগী সুমিত্রাতনয় অগ্রেস্থিত জহ্নুর দুহিতা কর্ত্তৃক উত্থিত তরঙ্গরূপ হস্তদ্বারা যেন নিবারিত হইতে লাগিলেন।

দারুণ নির্ব্বাসনবার্ত্তা শ্রবণে সীতা মূর্চ্ছিত হইলেন।

ততোভিষঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা
প্রভ্রশ্যমানাভরণপ্রসূনা।

স্বমূর্ত্তিলাভপ্রকৃতিং ধরিত্রীম্
লতেব সীতা সহসা জগাম ॥

অনন্তর অভিষঙ্গরূপ অনিল কর্ত্তৃক অভিভূতা, আভরণরূপ প্রসূন বিকীর্ণকারিণী লতার ন্যায় সীতা স্বীয় শরীরের আকররূপিণী—ধরিত্রীতে পতিতা হইলেন।

সীতা, দুঃখকাতরা, লতা অনিলতাড়িতা। সীতার আভরণ সমূহ স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, লতার প্রসূনসমূহ বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। ধরিত্রী সীতার জননী, লতা পৃথিবী হইতে উদ্ভূতা।

মহারাজ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে বাল্মীকি নিমন্ত্রণে আসিলেন। সঙ্গে লব এবং কুশ শিষ্যদ্বয় আসিল। লবকুশের রামায়ণগানে রামের সভাসদ্গণ নিস্তব্ধ,—

তদ্গীতশ্রবণৈকাগ্রা সংসদশ্রুমুখী বভৌ।
হিমনিষ্যন্দিনী প্রাতঃ নির্ব্বাতেব বনস্থলী ॥

তাহাদিগের সঙ্গীত শ্রবণে একাগ্রচিত্তা এবং অশ্রুমুখী সভা, প্রভাতে শিশির বর্ষিণী বায়ুসঞ্চারশূন্যা বনস্থলীর ন্যায় হইল।

রামের দুই পুত্র কুশ এবং লব। কুশ কুশাবতী এবং লব শরাবতী নগরীতে রাজা হইলেন। ভরতের দুই পুত্র, পুষ্কল এবং তক্ষক, পুষ্কলাবতী এবং তক্ষশীলায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের দুই পুত্র, অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতু, কারাপথের অধীশ্বর হইলেন। এবং শত্রুঘ্নের দুই পুত্র শত্রুঘাতী এবং সুবাহু, যথাক্রমে মথুরা এবং বিদিশা শাসন করিতে লাগিলেন। অযোধ্যা নগরীতে রাজা রহিল না—শ্রীভ্রষ্ট হইয়া উহা ক্রমে জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইতে লাগিল। দেখিয়া সেই অনাথা অযোধ্যা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা একদিন কুশাবতী নিবাসী মহারাজ কুশের নিকট গমন করিলেন। নিশীথ সময়ে যখন দীপসমূহ নির্ব্বাণোন্মুখ, প্রাণীগণ নিদ্রাভিভূত, চতুর্দ্দিক নীরব, নির্জ্জন—মহারাজ কুশ প্রবুদ্ধ হইয়া শয্যাগৃহে প্রোষিতভর্ত্তৃকাবেশধারিণী অদৃষ্টপূর্ব্বা এক মনোহারিণী রমণীমূর্ত্তি দেখিলেন।——

অথানপোঢ়ার্গলমপ্যগারম্
ছায়ামিবাদর্শতলং প্রবিষ্টাম্।

সবিস্ময়ো দাশরথেস্তনুজঃ
প্রোবাচ পূর্ব্বার্দ্ধবিসৃষ্টতল্পঃ ॥

আদর্শতলে ছায়ার ন্যায় অনুদ্ঘাটিত অর্গলযুক্ত গৃহে প্রবিষ্টা সেই রমণীকে দাশরথিপুত্র শয্যা হইতে অর্দ্ধাঙ্গ উত্থিত করিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।

লব্ধান্তরা সাবরণেঽপি গেহে
যোগপ্রভাবো নচ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাম্
মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্ ॥
কা ত্বং শুভে !————

মৃণালিনী হিমকৃত উপদ্রবের ন্যায় তুমি দুঃখিতের আকার ধারণ করিতেছ, যোগপ্রভাব তোমার কিছু দেখিতেছি না, কিন্তু অর্গলবিশিষ্ট গৃহে প্রবেশ লাভ করিয়াছ ! হে শুভে ! তুমি কে ?

কুশ অযোধ্যায় আসিয়া বাস করিলে সেই পুর। পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উঠিল।

সা মন্দুরাসংশ্রয়িভিস্তুরঙ্গৈঃ
শালাবিধিস্তম্ভগতৈশ্চ নাগৈঃ।
পুরাবভাসে বিপণিস্থপণ্যা
সর্ব্বাঙ্গনদ্ধাভরণেব নারী ॥

অশ্বশালায় সংস্থিত তুরগগণে, হস্তিশালায় যথাবিধি স্থাপিত স্তম্ভে বদ্ধ হস্তিসমূহে এবং বিপণিমালায় সুসজ্জিত ক্রয়বিক্রয় দ্রব্যসমূহে শোভিতা সেই পুরী সর্ব্বাঙ্গে আভরণধারিনী নারীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

এক দিন নিদাঘ সময়ে কুশের অন্তঃপুরসুন্দরীগণ সরযুপ্রবাহে বারি-বিহারে প্রবৃত্ত। কুশ নৌকা হইতে উহাদের জলক্রীড়া দেখিতেছেন। পার্শ্ববর্ত্তিনী চামরব্যজনকারিণীকে রাজা সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

পশ্যাবরোধৈঃ শতশো মদীয়ৈঃ
বিগাহ্যমানো গলিতাঙ্গরাগৈঃ।

সন্ধ্যোদয়ঃ সাভ্র ইবৈষ বর্ণম্
পুষ্যত্যনেকং সরযূপ্রবাহঃ ॥

দেখ আমার শত শত গলিতাঙ্গরাগ অবরোধসুন্দরীগণ কর্তৃক বিলোড়িত এই সরযূপ্রবাহ সমেঘ সন্ধ্যাসমাগমের ন্যায় নানারূপ বর্ণ বিকশিত করিতেছে।

অমী শিরীষপ্রসবাবতংসাঃ
প্রভ্রংশিনো বারিবিহারিণীনাম্।
পারিপ্লবাঃ স্রোতসি নিম্নগায়াঃ
শৈবাললোলান্ ছলয়ন্তি মীনান্ ॥

এই সকল বারিবিহারিণীগণের অঙ্গভ্রষ্ট শিরীষপুষ্পের কর্ণভূষণ স্রোতে ভাসমান জলনীলীলোভী মৎস্যগণের ভ্রম সম্পাদন করিতেছে।

আবর্ত্তশোভানতনাভিকান্তেঃ
ভঙ্গো ভ্রুবাং দ্বন্দ্বচরাস্তনানাম্।
জাতানি রূপাবয়বোপমানা
ন্যদূরবর্ত্তীনি বিলাসিনীনাম্ ॥

নিম্ননাভিশ্রীর—আবর্ত্তশোভা, ভ্রুর তরঙ্গ, স্তনদ্বয়ের চক্রবাক যুগল. এইরূপে বিলাসিনীগণের রূপাবয়বসকলের উপমান বস্তুসমূহ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

অনন্তর কুশ নৌকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই সুন্দরীগণের সহিত বারিবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

স নৌবিমানাদবতীর্য্য রেমে
বিলোলহারঃ সহতাভিরপ্সু।
স্কন্ধাবলগ্নোদ্ধৃতপদ্মিনীকঃ
করেণুভির্ব্বন্য ইব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥

তিনি নৌকাবিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, করিণীগণের সহিত স্কন্ধে উৎপাটিত নলিনী সংলগ্ন বন্য হস্তীর ন্যায়, চঞ্চলহারযুক্ত হইয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

ততো নৃপেণানুগতাঃ স্ত্রিয়স্তাঃ
ভ্রাজিষ্ণুনা সাতিশয়ং বিরেজুঃ।

প্রাগেব মুক্তা নয়নাভিরামাঃ
প্রাপ্যেন্দ্রনীলং কিমুতোন্ময়ূখম্ ॥

তদনন্তর প্রকাশনশীল রাজা কর্ত্তৃক মিলিতা হইয়া সেই স্ত্রীগণ সাতিশয় শোভিতা হইল। মুক্তা সহজেই নয়ন প্রীতিকর—আবার যখন ময়ূখশালী ইন্দ্রনীলের সহিত যুক্ত হয় তখন আর কথা কি?

তেনাবরোধপ্রমদাসখেন
বিগাহমানেন সরিদ্বরাং তাম্।
আকাশগঙ্গারতিরপ্সরোভিঃ
বৃতো মরুত্বাননুযাতশীলঃ ॥

অন্তঃপুরসুন্দরীগণের সহিত নদীশ্রেষ্ঠ সরযূতে বিগাহনশীল সেই কুশ কর্ত্তৃক অপ্সরাগণ পরিবেষ্টিত, মন্দাকিনীবারিবিহারী ইন্দ্র অনুকৃতশ্রী হইয়াছিলেন।

বারিবিহারকালে কুশের হস্তস্থিত দিব্য বলয় স্খলিত হইয়া সরযূতে পতিত হয়। অনুচরবর্গ অনেক অনুসন্ধানে উহা না পাইয়া নিবেদন করিল হ্রদান্তবাসী কুমুদ নামক নাগ উহা অপহরণ করিয়াছে। নাগ বধার্থে কুশ হ্রদমধ্যে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে কুমুদ স্বীয় ভগ্নী কুমুদ্বতীকে লইয়া হ্রদ হইতে উত্থিত হইল।

তস্মাৎ সমুদ্রাদিব মথ্যমানাৎ
উদ্বৃত্তনক্রাৎ সহসোন্মমজ্জ।
লক্ষ্মোব সার্দ্ধং সুররাজবৃক্ষ
কন্যাং পুরস্কৃত্য ভুজঙ্গরাজঃ ॥

মথ্যমান সমুদ্র হইতে লক্ষ্মীর সহিত সুররাজের পারিজাত বৃক্ষের ন্যায় সেই ক্ষুভিতগ্রাহ হ্রদ হইতে কন্যাকে অগ্রে করিয়া নাগরাজ কুমুদ সহসা উত্থিত হইলেন।

কুমুদ্বতীকে কুশ বিবাহ করিলেন।

কুশ কুলোচিত প্রথানুসারে ইন্দ্রের সাহায্যার্থে এক দুর্জ্জয় দৈত্যকে সংগ্রামে বধ করেন এবং তিনিও সেই দৈত্যকর্ত্তৃক নিহত হন। কুমুদ্বতী কুশের সহমৃতা হইলেন।

তং স্বসা নাগরাজস্য কুমুদস্য কুমুদ্বতী।
অন্বগাৎ কুমুদানন্দং শশাঙ্কমিব কৌমুদী ॥

কৌমুদী, কুমুদানন্দ শশাঙ্কের ন্যায় নাগরাজ কুমুদের ভগ্নী কুমুদ্বতী তাঁহার (কুশের) অনুগমন করিলেন।

পিতার অকাল মৃত্যুপ্রযুক্ত রাজা ধ্রুবের পুত্র সুদর্শন অতি শৈশবাবস্থাতেই রাজ্যে অভিষিক্ত হন।

নবেন্দুনা তন্নভসোপমেয়ম্
শাবৈকসিংহেন চ কাননেন।
রঘোঃ কুলং কুট্মলপুষ্করেণ
তোয়েন চাপ্রৌঢ়নরেন্দ্রমাসীৎ ॥

বালকনৃপ (যুক্ত) রঘুকুল নবেন্দুশোভী আকাশের, একমাত্র সিংহশাবক শোভী কাননের, এবং কুট্মলাবস্থপঙ্কজশোভী জলাশয়ের উপমেয় হইয়াছিল।

"রঘুর উনবিংশ" বিখ্যাত জিনিষ। সেই উনবিংশ স্বর্গে "উনবিংশ শতাব্দী" সুলভ আচার সম্পন্ন রাজা অগ্নিবর্ণের কীর্ত্তিকলাপের বর্ণনা। এ বর্ণনা বড় বৈচিত্র্যময়ী, ললিত, হৃদয়স্পর্শী এবং প্রাঞ্জল—কিন্তু নিতান্ত কুরুচিসম্পন্ন। উৎকৃষ্ট উপমা ইহাতে অনেকগুলি আছে; কিন্তু একটীও উদ্ধৃত করিবার মত নহে।

স্ত্রীমদ্যব্যসনাশক্ত রাজা যৌবনাবস্থাতেই উৎকট যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

ব্যোম পশ্চিমকলাস্থিতেন্দু বা
পঙ্কশেষমিব ঘর্ম্মপল্বলম্।
রাজ্ঞি তৎকুলমভূৎ ক্ষয়াতুরে
বামনার্চ্চিরিব দীপভাজনম্ ॥

রাজা ক্ষয়াতুর হইলে সেই (রঘু) কুল স্বল্পমাত্র কলাবশিষ্ট চন্দ্রযুক্ত আকাশের ন্যায়, পঙ্কাবশিষ্ট গ্রীষ্মকালীন জলাশয়ের ন্যায় এবং অল্পশিখ দীপাধারের ন্যায় হইল।

স স্বনেকবনিতাসখোপি সন্
পাবনীমনবলোক্য সন্ততিম্।

বৈদ্যযত্নপরিভাবিনং গদম্
ন প্রদীপ ইব বায়ুমত্যগাৎ ॥

অনেক বনিতার সখা হইয়াও সেই অগ্নিবর্ণ পূতকারী সন্ততি না দেখিতে দেখিতেই—বায়ু প্রদীপের ন্যায়—বৈদ্যযত্নপরিভবকারী রোগকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না।

গিরিমূলে—সন্তাপী।

মাধুর্য্যে জড়িত তরু, মাধুর্য্যে জড়িত লতা,
ক্ষুদ্র নদী ছোটে গান গেয়ে,
তপে রত শৈল গুলি, অজ্ঞানে রয়েছে বসি;
প্রশান্ত কল্পনা সুখ পেয়ে।
ফুলের হৃদয় হ'তে শান্তির নিশ্বাস বয়,
উল্লাসে বিহঙ্গ করে গান,
স্পর্শময়ী স্তব্ধতার আনন্দে সিহরে তনু
সংগীত অমৃত করি পান।
শুষ্ক কণ্ঠে, দগ্ধ চিতে, প্রকৃতি তোমার দ্বারে
এসেছি মা শান্তির কারণ,
চরণ পরশ করি শোক তাপ গ্লানি মোহ
বহিতেছে ফাটিয়া নয়ন।
এমন সরল ভাবে এ জীবনে এক দিন
পারি নাই অশ্রু ফেলিবারে!
সরল শিশুর মত অগুরু সরল চিত্ত
অকস্মাৎ কে দিল আমারে!
দুঃখ নাই—সুখে ভরা হৃদয় আমার আজ,
দুঃখে—সুখ করে আবাহন;—
আপন সোদরে যেন না দিলে হর্ষেরি ভাগ
তাহার হরষ অকারণ।

তাই আজ এত সুখে স্মৃতির আলেখ্য পানে
অনিমিষে চাহিতেছে প্রাণ।
সুখে দুঃখে জড়াজড়ি দুঃখে সুখে গলাগলি
এ আনন্দ মরি কি মহান্ !
শীতের অন্তিম কালে সরস বসন্ত স্পর্শে
শীত যথা হয় মধুময়,
সুখের পরশে আজি মুমূর্ষু যাতনা রাশি—
মাধুর্য্যেতে ঢেকেছে হৃদয়।
গিরিশ্রেণী, পুষ্পরাজি, লতিকাবেষ্টিত তরু,
নিরমল নির্ঝর বাহিনি,
ক্ষুদ্র অঙ্গে অনন্তের পরিষ্কার সংক্ষেপনী
সুরময়ি বন বিহঙ্গিনি !
এই স্থানে হৃদয়ের অতি প্রিয় সখা মোর
কত দিন একাকী আসিয়া,
সৌন্দর্য্যের চলস্রোতে হৃদয় উচ্ছ্বাস তার
দিয়াছিল যতনে ঢালিয়া।
সেই স্বর, সেই ভাষা, সেই হাসি, সেই আশা,
তোমাদের সরস অন্তরে
লুকান যদ্যপি থাকে, শ্যামল হৃদয় খুলি
একবার দেখাও আমারে।
প্রত্যেকের মুখ পানে, যেই আঁখি ফিরাতেছি
অনুভূত হতেছে সে সব,—
সেই হাসি, সেই ভাষা, স্থির নয়নের উর্ম্মি,
ভোগযোগ্য প্রাণের বিভব।
ছায়ার ছবিটি মোরে, দেখাইয়া কাজ নাই,
শোনায়ো না স্বপনের গান।
অজানা হৃদয় রাজ্যে, কোথা সে রবির কর,
কোথা সেই স্নেহ-মাখা প্রাণ ?

হৃদয় বালির বনে, চারুতায় পরিপূর্ণ,
মমতা শিশির রাশি তার,
স্বার্থ পিপাসায় মাতি, সকলি করেছি পান,
তাই বহে নয়নের ধার।
বিবসনা প্রতিধ্বনি ! বিজন-চারিনি নদি !
স্বরপানে নিরতা সতত,
সখার কণ্ঠের স্বরে একবার গাও গান
অভিলাষ হউক জাগ্রত।
স্তরীভূত বিস্মৃতির— নাম বুঝি মৃত্যু হবে ;
স্মৃতি শুধু আবদ্ধ পরাণ,
স্মৃতির বিকৃতি সনে মৃতের আবদ্ধ প্রাণ
দিন দিন পায় পরিত্রাণ।
শান্তির চরণ স্পর্শি প্রকৃতি তোমার কাছে
কহিতেছি হৃদয়ের কথা,
প্রাণের মাঝারে মোর স্মৃতির যে জ্বালা আছে
না যায় জীবনে যেন ব্যথা।
এই প্রাণে সেই প্রাণে যে যোগ তখন ছিল,
এখনও তেমতি যেন থাকে,
পঞ্চত্বে মিশায়ে গেলে ধুলার বিগ্রহ মোর
এই প্রাণ পায় যেন তাকে।
কোন স্তরে রম্য বন সখার সুষমা লয়ে
করিয়াছ সমাধি রচনা ?—
সেই স্থানে একবার নয়ন মুদিয়া বসি,
বিশ্লেষণ করিব যাতনা।
প্রতিধ্বনি তোরে আজ মধুর যাতনা রাশি
দুঃখে সুখে করাইব পান,
আনন্দের স্মৃতি ল'য়ে এতদিন ছিলি তুই,
আজ শোন্ বিষাদের গান।

কাঁদিতে কাঁদিতে যবে চির ঘুমে হব ভোর
তোর মনে রবে স্মৃতিছায়া ;
প্রাণের সহিত তুই অবশ্যই মিশাইবি
ধরিব নূতন যবে কায়া।
মধুর লহরী লীলা শান্তির বিমল সুধা,
হৃদয়ের মাঝারে পশিয়া—
বিষাদেরে আবাহন যতনে এনেছে করি—
তাই প্রাণ উঠেছে জাগিয়া।
রম্য বন ! সৌম্য গিরি ! মিষ্ট কণ্ঠ বিহঙ্গিনি !
প্রেমময়ি তটিনি সুন্দরি !
তোমাদের কাছ হতে হতেছি বিদায় আজ
দারুণ যাতনা বুকে ধরি।
মাধুর্য্যের চলস্রোতে দুই বিন্দু প্রণয়ের
স্বার্থহীন নিরমল জল,
যখন তখন এসে বর্ষণ করিয়া যাব,
ম্লান চিত্ত হইবে উজ্জ্বল।

সিপাহিযুদ্ধে ভারতবাসীর পরোপকারকাহিনী।

ইঙ্গরেজের লিখিত ইতিহাসে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল ইঙ্গরেজের বাহুবলে ও ইঙ্গরেজের রণকৌশলে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে। ইঙ্গরেজ বিজেতা, ভারতবাসী বিজিত, এই কথাটা এখন প্রায় সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। ইঙ্গরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যখনই কোন বিষয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখনই ঐ কথার বলে ইঙ্গরেজের সর্ব্বপ্রকার প্রধান্য স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইতিহাস প্রতিপন্ন করি-

তেছে, ইঙ্গরেজ ভারতবর্ষের বিজেতা নহেন। ভারতবাসীরাই আপনাদের দেশ আপনারা অধিকার করিয়া, ইঙ্গরেজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। সুতরাং ইঙ্গরেজ বিজেতা বলিয়া, কখনও আত্মাভিমান প্রকাশ করিতে পারেন না—ভারতবাসীকে বিজিত বলিয়াও ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিতে পারেন না। আজ কাল অনেক ইঙ্গরেজ এ বিষয় স্বীকার করিয়া আপনাদের উদারতার পরিচয় দিতেছেন। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহিযুদ্ধ একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। কিরূপে ঐ যুদ্ধের উৎপত্তি হয়, কিরূপে উহার বিকাশ দেখা যায়, কিরূপে উহা সংহারিণী মূর্ত্তি বিস্তার করিয়া চারিদিক্ শোণিতে রঞ্জিত করিয়া ফেলে, শেষে ইংরেজ কিরূপে ঐ ভয়ঙ্কর বিপ্লব হইতে রক্ষা পাইয়া আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করেন, তাহা অনেক ঐতিহাসিক ঘৃণা, ক্রোধ, বিস্ময় ও প্রীতির সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলেও অনেক ইঙ্গরেজ ইতিহাসের প্রকৃত সম্মান রাখিতে পারেন নাই। অনেক ইংরেজ কোন ভয়ঙ্কর ঘটনার বর্ণনা করিতে গিয়া, ভারতবাসীদিগের পাশব প্রকৃতির চিত্রই বেশ করিয়া আঁকিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বজাতির অনেকে যে ঐরূপ কার্য্যে আপনাদের নিষ্ঠুরতার একশেষ দেখাইয়াছেন, তাহা চাপা দিতে সঙ্কুচিত হন নাই। সুখের বিষয়, সমদর্শী ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিকও এইরূপ একদেশদর্শিতার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সিপাহিযুদ্ধের সময়ে দিল্লীর ঘটনা-প্রসঙ্গে একজন সহৃদয় ইঙ্গরেজ স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, "নাম মাত্র খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী বিজেতারা ইউরোপের যুদ্ধে নগরসমূহ যেরূপে উৎসন্ন করিয়াছিলেন, তাহার যে লোমহর্ষণ চিত্র ইতিহাসে রহিয়াছে, তাহার তুলনায় দিল্লীর উপস্থিত সময়ের দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুরতার বিবরণ যে অধিকতর ভয়ঙ্কর, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।" বস্তুতঃ সে সময়ে ইঙ্গরেজ ও ভারতবাসী উভয়ই উত্তেজনার আবেগে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল, উন্মত্ত ভারতবাসী যেমন ইঙ্গরেজের বিনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছিল, কোমলপ্রকৃতি ভারতবাসী তেমনি মূর্ত্তিমান দয়া স্বরূপ হইয়া নিরাশ্রয় ইঙ্গরেজের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। এ বিষয়ে নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর ভারতবর্ষীয়গণ পর্য্যন্ত আত্মস্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া যেরূপ দয়া ও কোমলতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহার জগতে তুলনা রহিত। ভারতবাসী সহায় না হইলে ইঙ্গরেজ ভারতে আধিপত্য

স্থাপন করিতে পারিতেন না,—আর ভারতবাসীরা আশ্রয় না দিলে ইঙ্গরেজ কখনও ১৮৫৭ অব্দের ভয়ঙ্কর ঘটনা হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। এই পরোপকারকাহিনী বিবৃত করিলে অনেক লাভ আছে। আমাদের দেশের যাঁহারা কেবল ইঙ্গরেজের গ্রন্থে বিদেশীদিগের কৃত উপকারের কথা পড়িয়া আমোদিত হন, স্বদেশীয়দিগের এই জ্বলন্ত সদয় ব্যবহারের কাহিনীতে তাঁহাদের আত্মসম্মান ও আত্মাদরের আবির্ভাব হইবে। আর যাঁহারা ভারতবাসীদিগকে ক্ষুদ্র প্রাণী ভাবিয়া, নিরন্তর নিপীড়িত ও নির্জ্জীত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও বুঝিবেন যে, এক সময়ে এই ক্ষুদ্র প্রাণীর মহাপ্রাণতায় ও অনন্ত করুণায় তাঁহারা ভারতে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য ঐ সকল কাহিনী এ স্থলে ক্রমে বিবৃত হইতেছে।

উন্মত্ত সিপাহিগণ যখন দিল্লী আক্রমণ ও অধিকার করে, তখন দিল্লীর ইউরোপীয়েরা উপায়ান্তর না দেখিয়া, পলায়ন করিতে থাকে। পলায়ন সময়ে ইহাদের দুর্গতির একশেষ হয়। এই সময়ে ৩৮ গণিত পদাতিক-দলের একজন আফিসর আপনাদের পলায়ন বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিয়াছেন।—

"আমরা তাড়াতাড়ি পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। বিশ্বস্ত সিপাহিরা তাঁহাদের আফিসরদিগকে শীঘ্র শীঘ্র পলাইয়া নিরাপদ স্থানে যাইতে কহিল। এমন কি তাহারা আপনাদের কুটীরেও বিপন্ন আফিসর-দিগকে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছিল। * * আমরা দৌড়িতে লাগিলাম। অবশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া একটি বৃক্ষের তলায় বসিয়া পড়িলাম। কয়েক মিনিট বিশ্রামের পর আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে চন্দ্র উঠিয়াছিল। সৈনিকনিবাস অগ্নিশিখায় আচ্ছাদিত হইয়াছিল। জ্বলন্ত হুতাশনের প্রভাবে রাত্রিতেও দিবসের ন্যায় আলোক বিকাশ পাইয়াছিল। আমরা সমস্ত রাত্রি এইরূপে হাঁটিয়া অতিবাহিত করিলাম। কিয়দ্দূরে মাটীর একটি ভগ্ন গৃহ ছিল। আমরা সকলে সেইখানে গিয়া লুকাইলাম। এই সময় কয়েক জন ব্রাহ্মণ আপনাদের কার্য্যে যাইতেছিলেন। ইঁহারা আমাদিগকে এইরূপ কদর্য্য স্থানে লুক্কায়িত দেখিয়া, আমাদের সকলকেই তাঁহাদের পল্লীতে লইয়া আসিলেন এবং সকলকেই চপাটি ও দুগ্ধ দিয়া সন্তৃপ্ত করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা ইঁহাদের সাহায্যে পদব্রজে

যমুনার একটি শাখা পার হই। ** পথে এক দল গুজর আমাদের দুরাবস্থার একশেষ করে। শেষে কয়েকজন পরদুঃখকাতর দয়াপর ব্রাহ্মণ আমাদিগকে ভিকানামক একটি পল্লীতে লইয়া আইসেন। ইঁহারা বিশ্রামের জন্য আমাদিগকে খাটিয়া দেন এবং আহারের জন্য আমাদের সম্মুখে রুটি ও ডাল আনিয়া উপস্থিত করেন। পল্লীবাসীরা নিরক্ষর হইলেও আমাদের সহিত বড় সদয় ব্যবহার করে। ** কিন্তু একদল উত্তেজিত লোক হঠাৎ আসিয়া আমাদের দুরবস্থা ঘটায়। এই সময়ে একজন সন্ন্যাসী আমাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার গৃহে লুকাইয়া রাখেন। দিল্লী হইতে পলায়নের দুই দিন পরে একজন ভারতবর্ষীয় আমাদের সাহায্যার্থ মিরাটে সংবাদ লইয়া যাইতে উদ্যত হয়। ফরাসী ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া ঐ ব্যক্তির হস্তে দেওয়া হয়। ** এই পত্র পহুঁছিলে মিরাট হইতে দুইজন সৈনিক পুরুষ ত্রিশজন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আমাদের সাহায্যার্থ উপস্থিত হন। দিল্লী হইতে পলায়নের অষ্টম দিন রাত্রিকালে আমরা ইহাদের সঙ্গে মিরাটে উপনীত হই।"

সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলাগণও উপস্থিত সময়ে অসহায় ইউরোপীয়দিগকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। বুঁদীর রাজার ধর্ম্মপরায়ণা বনিতা এই শ্রেণীর রমণীগণের অগ্রগণ্যা। বুঁদীরাজ সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এদিকে তাঁহার দয়াশীলা পত্নী শুনিতে পাইলেন, ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত হইতেছে। যে সকল কুলকন্যা ও শিশু সন্তান এক সময়ে সুখ সৌভাগ্যে লালিত হইয়াছিল, তাহারা এখন খাদ্য বিহীন ও বস্ত্র বিহীন হইয়া, আশ্রয় স্থানের অভাবে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে। এই শোচনীয় দুর্গতির সংবাদে কামিনীর কোমল হৃদয় দারার্দ্র হইল। বুঁদীর অধীশ্বরী স্বামীর অজ্ঞাতসারে বিশ্বস্ত লোক দ্বারা নিজ ব্যয়ে অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয়দিগের নিকট আহার্য্য ও পরিধেয় পাঠাইতে লাগিলেন। ঐ সঙ্গে পাদুকা প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও প্রেরিত হইতে লাগিল। বুঁদীর অধিপতি যুদ্ধে গিয়াছিলেন; সুতরাং শত্রুপক্ষের

প্রতি পত্নীর এই সদ্ব্যবহার তাঁহার গোচর হইল না। রাজমহিষীর সাহায্যে নিরাশ্রয় ইউরোপীয়গণ সুস্থ শরীরে দিল্লীস্থিত ইঙ্গরেজ সেনানিবাসে উপস্থিত হইল। রাণী যথা সময়ে সাহায্য না করিলে ইহাদের অনেকের প্রাণ নষ্ট হইত। এইরূপ সাহায্য দানে যে, আপনার প্রাণ হানির সম্ভাবনা আছে, তাহা রাণী জানিতেন। কিন্তু তাহা জানিয়াও, তিনি হৃদয়ের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন না। হিতৈষিণী নারী বিপন্নের সাহায্য করিয়া হিতৈষিতার গৌরব রক্ষা করিলেন। কিন্তু এই হিতৈষিতা, সদাশয়তা ও উদারতাই রাণীর প্রাণনাশের কারণ হইল। বুঁদী রাজের প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরে রাণীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে রাজাও ইঙ্গরেজ সেনাপতি স্যার হিউরোজের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কি কারণে রাণীর হঠাৎ মৃত্যু হইল, তাহা ভালরূপে জানা যায় নাই। অনেকে সন্দেহ করেন, বুঁদীর অরণ্যস্থিত অসহায় ইউরোপীয়দিগের সাহায্য করাতে রাজার আদেশে রাণীকে বধ করা হয়।

সিপাহি যুদ্ধের পূর্ব্বে একটি ভারত মহিলা অযোধ্যায় একজন ইংরেজ সেনার পরিবার মধ্যে ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সেনাপতি আপনার সন্তান দিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন, কেবল একটী কুড়িমাসের শিশু তাঁহার নিকটে ছিল। যুদ্ধের সময় উক্ত ধাত্রীর প্রতি এই শিশুটির প্রতি-পালন ভার সমর্পিত হয়। একদা প্রাতঃকালে ধাত্রী শিশুটিকে লইয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময়ে চারিদিকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের ভয়ঙ্কর কলরব শুনিতে পাইল। কোলাহল শ্রবণে সে দ্রুতবেগে গৃহে আসিয়া শুনিতে পাইল, সিপাহিগণ সম্পত্তি লুঠিয়া লইতেছে এবং ইউরোপীয় বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলকেই মৃত্যুমুখে পাতিত করিতেছে। স্নেহময়ী ধাত্রী শিশুটিকে স্থানান্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিবার আর সময় পাইল না; আপনার বস্ত্রে তাড়াতাড়ি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া গৃহের এক প্রান্তে চাপিয়া রাখিল এবং সাহসে ভর করিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সিপাহিরা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ধাত্রীকে কহিল, " আমরা বিদেশী বালক, যুবক, বৃদ্ধ, সকলকেই বধ করিব, শিশুটি কোথায় অগ্রে শীঘ্র বাহির করিয়া দাও"। ধাত্রী শিশুর সম্বন্ধে বাঙনিষ্পত্তি করিল না,

কেবল নিজের সম্বন্ধে দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। সিপাহিগণ এই প্রার্থনায় সম্মত হইল না, কহিল, "বালকটিকে বাহির করিয়া না দিলে নিশ্চয়ই তোমাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে"। অসহায় ও বিপন্ন সন্তান ধাত্রীর পশ্চাদ্‌ভাগে বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল। ধাত্রী ইচ্ছা করিলেই তাহাকে সিপাহির হস্তে সমর্পণ করিয়া, আপনাকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু অনুপম হিতৈষিতা তাহাকে এই নৃশংস কার্য্য হইতে বিরত করিল। ধাত্রী শিশুর সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না, কেবল পূর্ব্বের ন্যায় আপনার জন্য করুণা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

একজন সিপাহি জিজ্ঞাস্য বিষয়ে ধাত্রীকে নিরুত্তর দেখিয়া সক্রোধে তাহার বাহুতে তরবারির আঘাত করিল। আহত স্থান হইতে রক্তধারা অনর্গল নির্গত হইতে লাগিল। ধাত্রী নীরবে এই আঘাত সহ্য করিল, রক্ষাধীন বালক কোথায় আছে, কহিল না। ঘাতকের উত্তোলিত অসি উপর্য্যুপরি তাহার দেহে পতিত হইতে লাগিল। অসহায় অবলা আপনার বাহুদ্বারা তরবারির নিদারুণ আঘাত হইতে মস্তক রক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার সমস্ত দেহ ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরে প্লাবিত হইয়া উঠিল। অবলা আর সহিতে পারিল না, হতচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িল। এ দিকে সিপাহিরা লুণ্ঠনাসয়ে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। স্নেহময়ী ধাত্রীর প্রাণাধিক স্নেহের ধন রক্ষাকারিণীর পার্শ্বে নিরাপদে বস্ত্রাচ্ছাদিত রহিল।

ধাত্রী সংজ্ঞালাভ করিয়া, শিশুটিকে লইয়া আপনার বাটীতে উপস্থিত হইল, এবং লোকে ইংরেজ বালক বলিয়া মনে করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে উহার গায়ে এক প্রকারের রঙ্গ মাখাইয়া দিল। কিছুদিন পরে সে শুনিতে পাইল, তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী, উভয়েই লক্ষ্ণৌ নগরে আছেন। এই সংবাদ শুনিয়া বিশ্বাসিনী পরিচারিকা শিশুটিকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে প্রভু ও প্রভুপত্নীর হস্তে তাহাদের হৃদয়রঞ্জন স্নেহের পুত্তলী সমর্পণ করিল। সেনাপতি ও তাহার বনিতা, আহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতার সহিত শিশুটিকে গ্রহণ পূর্ব্বক, শান্তি স্থাপিত হইলে ধাত্রীকে সমুচিত পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

আহত স্থান ভালরূপে শুষ্ক না হওয়াতে ধাত্রী লক্ষ্ণৌ হইতে আপনার

ঘাসগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হয়। যতদিন সিপাহিরা লক্ষ্ণৌ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল, ততদিন সে ঐ স্থানেই অবস্থিতি করে। ইহার পর উক্ত নগর শত্রুর আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইলে ধাত্রী অনুসন্ধান করিয়া জানিল, তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী, উভয়েই আক্রমণের সময় হত হইয়াছেন। যাহাকে সে শরীরের শোণিতপাত করিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল এবং অপরিসীম সাহস ও দৃঢ়তার সহিত লুক্কায়িত রাখিয়াছিল, সে অপরাপর অনাথ শিশু সন্তানের সহিত ইঙ্গলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে।

১৭৬৫ অব্দে এই সদাশয়া মহিলা অযোধ্যার ডেপুটি কমিশনরের গৃহে ধাত্রীর কার্য্যে নিয়োজিত ছিল। অনেকেই তাহার নিকট উক্ত ঘটনার বিবরণ শুনিয়াছেন এবং অনেকেই তাহার শরীরের ক্ষত স্থান দর্শন করিয়াছেন। ঐ ক্ষতগুলি তাহার অসীম সাহস, অবিচলিত প্রভুভক্তি, অপরিমেয় বিশ্বাস ও অলৌকিক দয়ার গৌরবসূচক অমূল্য ভূষণস্বরূপ ছিল। এই গৌরবকাহিনী বলিবার সময়ে তাহার মুখমণ্ডলে কোন প্রকার গর্ব্বের চিহ্ন লক্ষিত হইত না। জিজ্ঞাসা করিলে সে নিরতিশয় বিনয়নম্রভাবে সকলের নিকট উহা ব্যক্ত করিত।

দিল্লী হইতে যে সকল ইঙ্গরেজ ভিন্ন ভিন্ন পথে পলায়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন বল্লভগড় নামক স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। বল্লভগড়ের রাজা রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় পলাতকদিগকে কহেন যে, ৫০ জন সোয়ার তাহাদের বিরুদ্ধে আসিতেছে। তিনি ইহা কহিয়া পলাতকদিগকে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া, ভৃত্যের বেশে তাঁহার দুর্গে আসিয়া থাকিতে পরামর্শ দেন। নিরাশ্রয় ইউরোপীয়গণ এই পরামর্শ অনুসারে দুর্গে প্রবেশ করেন। দেখিতে দেখিতে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ তীর বেগে তথায় উপনীত হয়। রাজার ভৃত্যেরা তাহাদিগকে কহে যে, ইঙ্গরেজগণ সেস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে। অশ্বারোহী সৈনিকদল এই কথায় দুর্গ হইতে প্রস্থান করে। ইহার পর বিপন্ন ইঙ্গরেজগণ স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার্য্য গোযানে ৬ মাইল অতিক্রম করিয়া একটি পল্লীতে উপস্থিত হন। এই সময়ে রাজার শ্যালক তাঁহাদের রক্ষকস্বরূপ ছিলেন। উক্ত পল্লী হইতে তাঁহারা যখন প্রস্থান করেন, তখনও বল্লভগড়ের সদাশয় রাজা তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য

কয়েকটী উট দেন। একটী বিশ্বস্ত লোক রাজার আদেশে তাঁহাদের রক্ষক স্বরূপ হইয়া যাইতে প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত রাজা মিবেল নামক একজন ইঙ্গরেজকে কতকগুলি ঘোড়া এবং ঋণ স্বরূপ দুই শত টাকা দেন। হিতৈষী রাজার হিতৈষিতাগুণে বিপন্নগণ নিরাপদে অভীষ্ট স্থানে উপনীত হন। পথে ইঁহাদের পরিচালক ও রক্ষকগণ ইঁহাদের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিল। শত্রুপক্ষ নিরন্তর ভয় দেখাইলেও ইহারা নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় দিতে কাতর হয় নাই।

ইঙ্গরেজের লিখিত বিবরণে ভুক্তভোগীদিগের বর্ণিত দুঃখকাহিনীতে বল্লভ-গড়ের রাজার এইরূপ হিতৈষিতা ও পরোপকারিতার চিহ্ন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ইঙ্গরেজ বিচারকগণ শেষে রাজদ্রোহিতার সন্দেহে এই হিতৈষী ও পরোপকারী রাজার ফাঁসীর আদেশ দিয়াছিলেন। যিনি আপনাকে বিপদাপন্ন করিয়াও বিপন্ন ইঙ্গরেজদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন—ইঙ্গরেজের অধিকারে ইঙ্গরেজের আদেশে শেষে ফাঁসীকাষ্ঠে তাঁহার প্রাণ বায়ুর অবসান হইয়াছিল! [ক্রমশঃ]

মহাশক্তি।

এই জগৎ কেবল মাত্র একটী মহতী শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেছে। সে শক্তিটী কি, বা কোথা হইতে উৎপন্ন, সে বিষয়ে আমরা সবিশেষ অনুসন্ধিৎসু নই; কিন্তু তাহার ব্যাপকতা যে অত্যন্ত প্রশস্ত তাহার প্রভূত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই শক্তি কতকটা (কার্য্যকারী) Physical কতকটা জ্ঞানকারী (Psychical)। প্রথমটী বাহ্য জগৎকে, দ্বিতীয়টী অন্তর-জগৎকে শাসন করিতেছে। মনুষ্যশরীর স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়গুণ বিশিষ্ট বলিয়াই মনুষ্যদেহরাজ্যে উভয় শক্তিরই বিকাশ দৃষ্ট হয়। স্থূল শরীরের উপরে কার্য্যকারী শক্তি (Physical force) টী কার্য্য করে, সূক্ষ্ম শরীরটীর উপর জ্ঞানকারী (Psychical force) কার্য্য করে। কাজে কাজেই আমাদের দেহের যে যে স্থানে কেবলমাত্র জ্ঞানের (Consciousness) বিকাশ দেখিতে

পাই সেই সেই স্থানে যদিও উভয় শক্তিরই কার্য্য গূঢ়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি কোন অদৃষ্টনিয়মবশে কৃৎশক্তির (Physical force) কার্য্য টুকু দেহে গ্রাস করিয়া চিৎশক্তির (Psychic force) কার্য্যটুকু প্রকাশ করি, ইহাতেই আমাদের শুদ্ধ জ্ঞানের উৎপত্তি, ইহাতেই Consciousness without motionএর উৎপত্তি। তদ্রূপ যেখানে শুদ্ধ কৃৎশক্তির (Phisical force) কার্য্য বিকাশিত হয় সেই খানেই Motion without consciousness এর উৎপত্তি দেখিতে পাই। শেষোক্ত কার্য্যফলগুলিকেই মনোবিজ্ঞান reflex actions অর্থাৎ spontaneons actions কহে। বস্তুতঃ আমাদের সমস্ত জ্ঞানকৃৎ ও অজ্ঞানকৃৎ কার্য্যের কারণ এই দুইটীর একটী বা উভয়টীই হইবে। যেখানে কোনটীই বিকাশিত হয়না সেই স্থানেই উভয়শক্তির গুণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অন্যত্র নয়।

অদৃষ্ট শক্তিটী কোন অদৃষ্ট নিয়মবশে বাহ্য ও অন্তর্জগৎ উভয়কেই চালিত করিতেছে। এই শক্তিটীর কিছুতেই বিনাশ নাই কিন্তু ইহার অসংখ্য রূপান্তর ও ভাবান্তর পরিদৃষ্ট হয়। একাংশে ইহার বিনাশ দৃষ্ট হইলে অপরাংশে ইহার বিকাশ দৃষ্ট হইবে। ইহা কোন কোন স্থলে অলক্ষিতভাবে কোন কোন স্থলে প্রকাশ্যভাবে কার্য্য করে। যাহা হউক, ইহার বিনাশ নাই বলিয়াই ইংরাজিতে এই মূল সূত্রটীর নাম Conservation of Energy বা শক্তির অক্ষয়ত্ব। ইহার প্রধান আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা Newton। পরে বহুশাস্ত্রবিৎ তীক্ষ্ণবুদ্ধি Helmholtz ইহাকে বিশেষ পরিণতাবস্থায় আনয়ন করেন। তিনিই প্রথমে বলিয়াছিলেন "Conservation of energy holds not only in our own planetary system; but also in the distant double stars * * * Every great deed of which history tells us every mighty passion which art can represent, every picture of manners, of civic arrangements, of the culture of peoples of distant lands or of remote times seizes and interests us, even if there is no exact scientific connection among them."

উপরি উক্ত কথাগুলি কতদূর সত্য তাহাই প্রতিপন্ন করা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিষয়টী অতি বিস্তীর্ণ ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। এক্ষণে

প্রথম জিজ্ঞাস্য এই, এই শক্তি দ্বারা আমাদের শরীর কিরূপে চালিত হয়। শরীরের উপর মনের আধিপত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই আমরা পরিশ্রমের পর ক্লান্তি ও অঙ্গশৈথিল্য অনুভব করি, কলহের পর দৈহিক বৈকল্য অনুভব করি, ইত্যাদি। এগুলি হইবার আর কিছুই কারণ নয়, কেবল একমাত্র ঐ শক্তির অপূর্ব্ব কার্য্যকারী ক্ষমতা। শারীরিক বা দৈহিক ফলগুলি এত অনায়াসলভ্য ও অনায়াসবোধ্য যে তাহার উদাহরণ ও ব্যাখ্যা বেশী আবশ্যক করে না। কিন্তু আর এক প্রকার দৈহিক ক্রিয়া আছে যেগুলি আন্তরিক বা আভ্যন্তরিক। যেরূপ আহারের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করি, ঔষধের দ্বারা রোগের শান্তি করি, ইত্যাদি। এস্থলে বক্তব্য এই যে আমরা দৈহিক যন্ত্রাদির সমস্ত বিষয়ই অতি সামান্য বা অসম্পূর্ণ ভাবে জ্ঞাত আছি বলিয়া আভ্যন্তরিক কোন প্রয়োগেই আমাদের তাদৃশ বিশ্বাস নাই—অন্ততঃ না থাকাই উচিত। Carlyle বলিয়াছেন "A Physician is one who pours medicine, of which he knows little, into a body, of which he knows less"। বাস্তবিক আমরা আহার, পথ্য, ঔষধের বিষয়ে যে প্রকার সূক্ষ্ম বিচার করিয়া থাকি সেরূপ করা " অতি বুদ্ধির " কাজ। অর্থাৎ আমরা ঐ সমস্ত বিষয়ে এইরূপ করিয়া থাকি যেন আমরা শরীরের আভ্যন্তরিক ক্রিয়াপ্রণালী বিশেষ রূপে অবগত আছি। এরূপ করা কোন মতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আজ আমরা শুদ্ধ ঐ শক্তিটীকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিব—যেখানে দেখিব ঐ শক্তির বিপরীত ভাবে বিকাশ হইবে সেই স্থলেই এ কার্য্যে নিবৃত্ত হইব, অন্যত্র নয়। এইরূপ অনুষ্ঠানে আমাদের শরীর সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি। এস্থলে অধিক না বলিয়া পরে আমরা উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টী আলোচনা করিব। প্রত্যেক কার্য্যে ও প্রত্যেক চিন্তাবিন্দুতে ইহার কার্য্যকারিতার উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক মনোবৃত্তিতে, প্রত্যেক স্বাভাবিক প্রবণতায়, (natural tendency) প্রত্যেক হৃদয়োহিত স্বাভাবিক ভাবে ইহার আভাস পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতেও প্রতীয়মান হইতেছে বিষয়টী কত বিস্তীর্ণ, কত মহান্। সেই জন্যই ক্রমশঃ আমরা ইহার এক একটী কথা উপলক্ষ করিয়া ধীরে ধীরে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া যাইব।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই, ইহা দ্বারা মন কি প্রকারে চালিত হয়। মানুষের মানসিক বৃত্তিগুলি পরিণতির জন্য পরস্পরের সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করে। বৃত্তিগুলি একদিনে পরিণতাবস্থায় আসেনা। প্রথমতঃ অবস্থাচক্রে কিয়ৎ-পরিমাণে গঠিত হইয়া পুনরায় চঞ্চল ও তরল অবস্থা হইতে ক্রমশ দৃঢ় ও প্রকৃত পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হয়। এই মানসিক বৃত্তির সঙ্গে শারীরিক পরিণতি সম্ভবে না, তজ্জন্য শারীরিক সুখ, স্বচ্ছন্দ, অগ্রাহ্য করিয়া যে সময় মানসিক উন্নতির সময়, সেই যৌবনের প্রারম্ভেই মনের স্ফূরণ আবশ্যক। এই স্ফূরণ সহজে হয় না বলিয়াই, নানা প্রকার অবস্থাচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতে, নানা প্রকৃতির লোকের সহিত মিশিতে, মানবের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক নানা প্রকার ভাবগতিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিক্ষা করা উচিত। এই সময় বাহ্যিক দেহের সৌন্দর্য্যে মোহিত না হইয়া আন্তরিক সৌন্দর্য্য শিক্ষা করা উচিত। দেহের সুখান্বেষণে রত না হইয়া হৃদয়ের অনন্ত সুখান্বেষণে যত্নবান হওয়া উচিত। সামান্য দেহের কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া মানসিক বিকার ও ব্যাধি হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করা উচিত। দেখ রামপ্রসাদ বলিয়াছেন

মন করোনা সুখের আশা,
যদি অভয় পদে লবে বাসা।
*   *   *   *   *

ওরে সুখেই দুঃখ দুখেই সুখ ডাকের কথা আছে ভাষা,
মন ভেবেছ কপট ভক্তি কোরে পূরাইবে আশা,
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবেনা রতি মাসা।

অতএব, যখন মানসিক উন্নতিই আমাদিগের অধিকতর বাঞ্ছনীয়, তখন শারীরিক সুখেচ্ছাকে আপাততঃ তত প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। মানসিক শক্তির অদ্ভুত বিকাশ শারীরিক শক্তির বিকাশকে আচ্ছন্ন করে না। এদিকে শরীরের ক্রিয়া মনের উপর নির্ভর করে। এই দুইটী বাক্য আপাততঃ বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে একটী বড় চমৎকার সামঞ্জস্য আছে। অবশ্যই একটী আর একটীর কিয়দংশে অধীন।

একটী অপরটী কর্ত্তৃক চালিত হয়, অথচ দুইটীই স্বাধীন। যেমন অন্ধ ও খঞ্জ উভয়ে চলিতে অক্ষম হইলেও অন্ধের স্কন্ধে খঞ্জ আরোহণ করিয়া পথ-প্রদর্শন করিলে অনায়াসেই কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তদ্রূপ এই দুইটী বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও যুক্তকার্য্যে কার্য্যফলের কোন প্রকার হানি হয় না। তবেই দেখা গেল মনকে ও শরীরকে এই শক্তিটী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে শাসন করিতেছে। মনের কার্য্যগুলি Psychic force টী দ্বারা সম্পাদিত হয়, আর দেহের কার্য্যাবলী Physical force টী দ্বারা সম্পাদিত হয়। আর এই দুইয়ের পরস্পর সাহায্যে যে শক্তিতন্মাত্র উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারাই জগতের কার্য্য সম্পাদিত হয়। জগতের কতকগুলি কার্য্যের কারণ আমরা সহজবুদ্ধিতে নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম নহি। এই গুলিই অদৃষ্ট বলে হইয়া থাকে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। বাহ্য জগতের কার্য্যাবলীর ফল ও কারণ নির্দ্দেশ করা সর্ব্বকালে মানুষের সম্ভব নয়। তবে যতদূর পারা যায় ও গিয়াছে তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে এই শক্তির কার্য্য বিশ্বজনীন (Universal)। বাস্তবিক আমাদের ও ধারণা এই যে, এইরূপ একটী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কার্য্য প্রণালীর অবস্থা ও গতি নির্ণয় করিলে যখন জগতের সমস্ত কার্য্যকারণতত্ত্ব প্রাঞ্জল ও বিশদ হইয়া আসে, যখন ঈশ্বরের সত্তা বিষয়েও এতদ্দ্বারা কতকটা প্রতীতি জন্মায়, তখন তাহা স্বীকার না করিব কেন? যখন এই শক্তিটীই সমস্ত জগৎকে নিজবশে রাখিয়াছে ও স্বেচ্ছায় পরিচালিত করিতেছে, যখন ইহার ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই, যখন ইহা এক ও অদ্বিতীয়, কেবল রূপান্তর ও ভাবান্তর ভাবী মাত্র, তখন এই শক্তিকেই ঈশ্বর বলিয়া হৃদয়ে বিশ্বাস করিনা কেন? যখন স্থূল সূক্ষ্ম, গুরু লঘু, ক্ষুদ্র বৃহৎ, শারীরিক, মানসিক, পার্থিব ও অপার্থিব সমস্ত বৃত্তিকেই এই অবিনশ্বর, অক্ষয়, অচিন্ত্য শক্তি অনুশাসিত করিতেছে, যখন অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাত হই যে ঈশ্বরের কার্য্যও কতকটা এইরূপ তখন এই অদ্বিতীয় শক্তিটীকে ঈশ্বর বলিতে হানি কি? অন্ততঃ ঈশ্বর যে অলক্ষিতভাবে এই শক্তি দ্বারা জগৎ প্রণোদন করিতেছেন, কিম্বা এই শক্তিই যে ঐশ্বরিক শক্তি তাহা বলিতে হানি কি? বিশেষতঃ যৎকালে এই শক্তিটীর অসংখ্য রূপান্তর বা ভাবান্তর প্রত্যহ আমাদের সম্মুখে পরিদৃশ্য-

মান রহিয়াছে, তখন এই এক একটী রূপান্তরকেই ঐ ঈশ্বরের রূপান্তর বলিয়া মনে করিনা কেন ? কেন আমরা হিন্দুর তেত্রিশকোটী দেবতার উপর তাদৃশ শ্রদ্ধা আস্থা ও বিশ্বাস করিনা? তেত্রিশকোটীও সামান্য কথা। ইহার কোটী কোটী রূপান্তর ঈশ্বরের শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সেই সমস্তগুলি বর্ণনা করা আজ কাল আমাদের সাধ্যাতীত। প্রাচীনঋষিগণ বিশেষ বুহদশী সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা তেত্রিশ কোটী দেবতার রূপ বর্ণনা বা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তেত্রিশ কোটীর পরিবর্ত্তে কোটী কোটী রূপ হইলেও ঈশ্বরের রূপ বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। যখন অদৃষ্টবাদ, প্রায়শ্চিত্ততত্ব, প্রভৃতি গুরুতর বিষয়গুলি এই একটী মাত্র শক্তির বলেই মীমাংসিত হইতেছে, তখন এই শক্তিই যে ঈশ্বর নয় তাহা কে বলিবে ? মানুষের সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, নিরন্তর চক্রপথে পরিভ্রমণ করিতেছে। অনভ্যস্ত পাপ করিলেই শাস্তি আছে, অন্তরে অন্তরে তজ্জনিত বিষম যাতনা আছে। উচ্চ হইলেই নীচ হইতে হয় নীচ হইলেই উচ্চ হওয়া যায়। এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা যে এই একমাত্র ঐশ্বরিক শক্তিদ্বারা সংঘটিত হইতেছে ইহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে এইরূপ আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক ঘটনাগুলি কিরূপে সংঘটিত হয় তাহা আমরা নানা বিষয়ক উদাহরণ দ্বারা একে একে প্রমাণীকৃত করিব। বাস্তবিক ইহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ না হইলেও Induotion দ্বারা ইহার সত্যতা স্বীকার করিতে বাধা কি ?

আমাদের একটী ডাকের কথায় আছে "ছোট হবি ত বড় হ, বড় হবি ত ছোট হ" এটী একটী বিশেষ সারবান কথা। একদিকে আধিপত্য বা সম্পদ আকাঙ্ক্ষা করিলে অপর দিকে প্রকারান্তরে বিপদ বা স্বার্থত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। একটী গর্ত্ত পরিপূর্ণ করিতে হইলে অপর স্থানের মৃত্তিকা আবশ্যক। নিক্তির এক দিক্ ঝুলিয়া পড়িলে অপর দিকটী উচ্চ হয়। ইত্যাদি। এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়া আমরা মনে করিব যে সুখেই আমাদের এই শক্তির বিকাশ, দুঃখেই ইহার হ্রাস বা বিনাশ। আমরা পদে পদে দেখিতে পাই যে পরিশ্রমই ভাবী পুরস্কারের, ও আলস্যই যাবতীয় অনিষ্টের মূল কারণ। কারণ একটী জীবনে ঐ শক্তির যে অংশটুকু মনুষ্যের উপর কার্য্য করে তাহার কিয়-

দংশ পরিশ্রমরূপে ব্যয়িত হয়, অর্থাৎ পরিশ্রমটাই ঐ শক্তির হ্রাস ও বিনাশ, সেই হেতু পরে ইহার ফল হইবে ঐ শক্তির বিকাশ অর্থাৎ সম্পদ অথবা সুখ। তদ্রূপ আলস্য পরিশ্রমের বিপরীত ভাব বলিয়া উহার ফলও বিপরীত হইবার কথা। আমাদের মতে অহঙ্কারদমন, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি পরকালে না হইয়া ইহজন্মেই হইয়া থাকে, কারণ মৃতদেহে এই শক্তির কার্য্যকারিতা ততদূর প্রবল নয়। এমন কি কিছুই নয় বলিলেও হয়। তবে যদি প্রেতাত্মার অবিণাশিত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে জীবনান্তেও ফল অনুভূত হয়। সেই জন্যই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে পরকাল স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ নয়। তবে সমস্ত reaction গুলি যাহাদের ইহজীবনে হইয়া উঠে না তাহাদিগকেই আবার পরকালে কষ্ট ভুগিতে হয়। সেই কষ্ট ভোগ করিবার জন্যই মরণান্তে প্রেতরূপে তাহারা কখন কখন সেই যন্ত্রণাফল ভোগ করিয়া থাকে। তাই বলিয়াই কি পুণ্যাত্মা লোকের প্রেত দৃষ্ট না হইয়া পাপীর প্রেত দৃষ্ট হইয়া থাকে?

[ক্রমশঃ]

PUBLIC LI

[library stamp]

মহাশক্তি।

(২) আমাদের দেশে, এমন কি যে দেশে ভাষার প্রচলন আছে, সেই দেশেই, একটী কথায় আছে "সবুরে মেওয়া ফলে" (English version:— Patience is bitter but its fruits are sweet)। এটীর অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল ধৈর্য্যে যে পরিমাণে মানসিক বলের ও শক্তির প্রয়োজন তাহাতে পরে সেই পরিমাণে সেই বলের কার্য্য ও ফল অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। আপাততঃ কিয়ৎ পরিমাণে শারীরিক ও মানসিক ত্যাগস্বীকার করিলে, পরে তাহার ফল অতি সুস্বাদু হইবারই কথা, কারণ ঐ শক্তির অনুরূপ পরিমাণ (Equivalent) পরে সুস্বাদু ফলে পরিণত হইবে। একটী পাঠ একশত বার আবৃত্তি করিলে যে ফল হয়, একবার কাগজে কলমে করিলে ঠিক তদনুরূপ ফল হয়। ইহার অর্থ এই যে একশত বার পড়িতে যে শক্তি আবশ্যক হয় একবার মাত্র লিখিতে তত টুকুর প্রয়োজন, অতএব দুইয়েরই ফল সমান। (এস্থলে আমরা শ্রুতধরের কথা বলিতেছি না) এই জন্যই আমরা যৌবনপ্রাপ্ত লোকদিগকে বারম্বার বলিয়া আসিতেছি যেন তাঁহারা এককালে সুখপঙ্কে নিমজ্জিত না হন। এই সময় সুখাস্বাদ করিলে তাহার বিষময় ফল পরে পরিলক্ষিত হইবে। সুখের দোলায় দোলায়মান থাকিলেও, অন্ততঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক একটু কষ্টের স্বাদ গ্রহণ করিবে। মানুষ সর্ব্বদাই দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সুখান্বেষণেই রত হয় বটে, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মবশে, মনুষ্যজীবন সমভাবে সুখদুঃখময়। নিরবচ্ছিন্ন সুখ এ জীবনে মরীচিকাবৎ। এই জগতে অধিকাংশ লোকই দুঃখটুকু ছাঁকিয়া সুখটুকু আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, দুঃখকে স্বকরে আলিঙ্গন করিতে কেহই ইচ্ছা করে না। কেবলমাত্র তিনটী শ্রেণীর লোক দুঃখকে প্রধান শিক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে। কোনটী স্বাভাবিক তাহা আমরা বিশেষ যত্ন করিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। বাস্তবিক জগতে থাকিয়া ভাল আশা করা কেবল আশা মাত্র। সেই তিন শ্রেণীর লোক এই :—

(ক) যাহারা ভোগে ও ভোগাভিলাষে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, দুঃখের নানাপ্রকার

সুমিষ্ট ফলগ্রহণ ও আস্বাদন করিয়াছে, ইহার যাবতীয় আনুষঙ্গিক ব্যাপার বিশিষ্টরূপে পরীক্ষা ও নিরীক্ষণ করিয়াছে, শেষে সুখে বিতৃষ্ণ হইয়া এক্ষণে এক প্রকার বাহ্যজ্ঞান রহিত।

(খ) যাহারা সন্তোষ শিক্ষা করিয়াছে অর্থাৎ যাহাদের কিছুতেই কষ্ট নাই, বেগ নাই, চাঞ্চল্য নাই, কি সুখে কি দুঃখে, যাহারা সর্ব্বত্রই সমান আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে।

(গ) যাহারা এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া বিজাতীয় উৎকট সুখের ফল সন্দর্শন করিয়া সুখে এক প্রকার বিতৃষ্ণ হইয়াছে। ইহারা সর্ব্বদাই স্থিরনেত্র ও সূক্ষ্মদর্শী, ইহারা সর্ব্বদাই দেখিয়া শিক্ষা লাভ করে। ইহারা নিজে সুশিক্ষিত না হইলেও অপরের কথা ও বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া একপ্রকার জয়ী হইয়াছে। এইরূপ শিক্ষালাভের ফল পরে দেখান যাইবে। ইহাতে বিশেষ বুদ্ধি, তীক্ষ্ণতা, দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এক্ষণে ধৈর্য্যশিক্ষার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিব। আমাদের নবীনা যুবতীরা ও নব্য যুবকগণ অধিকাংশ সময়ই নভেল ইত্যাদি সুখ ও সহজপাঠ্য পাঠে ব্যয়িত করিয়া থাকেন। নভেল পঠন দুই প্রকার—(১) আমোদের জন্য (২) শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য। প্রথমটীতে কিছুই ফল নাই, কারণ তাহাতে ধৈর্য্যের আবশ্যক করে না। দ্বিতীয়টীর ফল অতি উত্তম ও মধুর, কারণ তাহাতে বিশিষ্ট শ্রম, শক্তি, বিবেচনা ও মস্তিষ্কচালনার আবশ্যক। প্রথমটীর ফল এক প্রকার মানসিক বিকার মাত্র। দ্বিতীয়টীতে মনঃসংযোগ, ধৈর্য্য আবশ্যক করে বলিয়াই ইহার ফল মানসিক উন্নতি ও শিক্ষালাভ। প্রথমটীতে এইগুলি প্রয়োগ করিতে হয় না বলিয়াই ঐরূপ পাঠের ফলোদয় কিছুমাত্র হয় না, পাঠের কার্য্যকারিতা বিশেষ উপলব্ধ হয় না। আবার দেখ, ধর্ম্মোপার্জ্জনের পথে কত বিঘ্ন, কত বিপত্তি, কত আশঙ্কা, কত লজ্জা, কত সংশয়, কত কষ্ট। এইগুলিকে জয় করিতে যে শক্তির প্রয়োজন ঠিক তাহার অনুরূপ শক্তির বিকাশ পুণ্য-ফলরূপে সঞ্চিত হয়। এই শক্তির এবম্বিধ স্ফূরণই জীবনের প্রধানতম ও প্রিয়তম লক্ষ্য। পাপকর্ম্মে বাধা নাই, ব্যাঘাত নাই বরং উপস্থিত আমোদ আছে ও উৎকট আকাঙ্ক্ষা আছে, এই জন্যই ইহার ভবিষ্যৎ এত শোচনীয়। এই জন্যই

অহঙ্কারের ক্ষয় হয়, গরিমার পতন হয়, কামের ফলভোগ হয়, উচ্চাশার ব্যাঘাত হয়।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্, আত্মাদর, অভিমান প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মন যৎকালে একই প্রকার নিয়মবশে বাহ্যজগতের ন্যায় চালিত হইতেছে তখন সুখ দুঃখ ইত্যাদি মনুষ্যেরই বা কতটা অধীন আর অদৃষ্টেরই বা কতটা অধীন? এ প্রশ্নের উত্তরের আমরা কিয়ৎপরিমাণে পূর্ব্বে আভাস দিয়াছি। এক্ষণে বলিব যে, যে সুখ শরীরকে সুখী করে তাহা মনুষ্যের অর্থাৎ কৃৎশক্তির (Physical-force) অধীন। আর যে সুখ মনকে সুখী করে তাহা চিৎশক্তির (Psychical-force) অধীন। এই Psychic force আমাদের জ্ঞান (Consciousness) উৎপাদন করে বলিয়াই আমরা শারীরিক কষ্টকে দূরে ঠেলিয়া মানসিক সুখের আকাঙ্ক্ষা করি। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই সুখ দুঃখ ক্রমশঃ আমাদের শরীরে অভ্যস্ত হইয়া যায়। অপরের স্বাভাবিক হৃদয়ভেদী ক্রন্দন দর্শনে আমরাও নয়নজলে অভিষিক্ত হই; আবার শিশুর স্বাভাবিক মধুর হাসি দর্শন করিয়া আমাদের মনে অপার আনন্দ আসিয়া জুটে। এরূপ হয় কেন? যখন ঐ অদ্বিতীয় শক্তিটী একবারে হঠাৎ কার্য্য না করিয়া ক্রমশঃ ধীরে ধীরে কার্য্য করে, তখনই আমাদের প্রকৃত অভ্যাস আরম্ভ হয়। আর যখন সহসা আসিয়া ইহার প্রচণ্ড কার্য্যকারিণী শক্তি দেখাইতে যায়, তখনই আমাদের হৃদয়ে এক একটী উচ্ছ্বাসের স্থজন হয়। যে শক্তি শিশুর হাসিটী উত্থিত করিতেছে তাহা এত স্বাভাবিক নিয়মে কার্য্য করিতেছে যে, তাহার এক অংশ আমাদের হৃদয়তন্ত্রীকে বাজাইয়া দেয়—তাহাতেই আমাদের ঐরূপ আনন্দ উপস্থিত হয়। যাহার হৃদয় নাই, মমতা নাই, প্রেম নাই, সহানুভূতি নাই, তাহার মন ঐ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইতে পারে না বরং বিকৃত ভাবে কার্য্য করিয়া হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তির উদ্রেক করায়। সে হৃদয় স্বাভাবিক হৃদয় নয়। আজ কাল একপ্রকার সভ্যতার গুণে এই হৃদয় ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে। আজ কালকার সভ্যতালোকে আলোকিত হৃদয়ে মমতা, দয়া শূন্য হইয়া পড়িতেছে। আজ অভ্যাগত অতিথি মুষ্টিভিক্ষা পায় না, আজ অর্থ দিয়া ভাসা ভাসা

পরোপকার হয়, কিন্তু হৃদয় দিয়া পরোপকার অতি বিরল। আজ ধনীর মানই মান, গরীবের মান ছাই—তাহারা আজ সমাজের একঘরে। তাই কি মেকলে (Macaulay) বলিয়াছেন "As civilisation gradually advances poetry begins necessarily to decline.

এইরূপ হইবার বিশেষ কারণ আছে। আমরা সচরাচর কৃৎশক্তিটী অনায়াসেই আয়ত্ত ও উন্নত করিতে পারি। এটী বাহ্যিক শক্তি বলিয়া আমরা সাধারণ বাহ্যিক নিয়মে, প্রত্যক্ষ প্রণালীমতে পরিণত করিতে সমর্থ হই। উপযুক্ত আহার দ্বারা, উপযুক্ত অভ্যাস দ্বারা, উপযুক্ত ব্যায়াম দ্বারা, উপযুক্ত সদনুষ্ঠান দ্বারা, আমরা কৃৎশক্তির অতি সহজেই উন্নতি সাধন করিতে পারি, কিন্তু চিৎশক্তির উন্নতি তত সহজে হয় না। সেটী আন্তরিক শক্তি, তাহার ভিতর অনেক গূঢ় কাণ্ড নিহিত আছে। কার্য্যদ্বারা তাহার বাহ্যিক স্ফূরণ বা বিকাশ হয় না। কি উপায়ে তাহার উন্নতি ও পরিণতি হয় আমরা সবিশেষ তাহা অবগত নই। কিন্তু ঐ সমস্ত অবক্তব্য উপায়গুলি গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষা করা বহু শ্রমসাপেক্ষ। বাস্তবিক চিৎশক্তির উন্নতিকল্পে উপযুক্ত গুরু ও দেশ কাল পাত্রের প্রয়োজন, সেই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম কৃৎশক্তির স্ফূরণ যত শীঘ্র হয়, চিৎশক্তির স্ফূরণ তত শীঘ্র হয় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাহ্যিক উন্নতিবিধান করিতে—আহারের তদ্বির, বসন ভূষণের পারিপাট্য, স্কুল, কালেজ, পাঠশালা, আশ্রম, রাস্তা ঘাট, রেল, ডাক, তার, সভা, সমিতি, সম্বাদ ও সাময়িকপত্র, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা, বক্তৃতা ইত্যাদির জন্য চিৎশক্তির কিছুই প্রয়োজন নাই। এ গুলি পার্থিব উন্নতি, এগুলি অর্থের দ্বারা বিস্তীর্ণ হয় ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার যে প্রকার উন্নতি কেবলমাত্র অর্থের দ্বারা লাভ হয় তাহাই পার্থিব উন্নতি। আজকাল নব্য বাবুরা যে উন্নতির জন্য কণ্ঠস্বর বহির্গত করিয়া থাকেন তাহা পার্থিব উন্নতির আদর্শ। স্বর্গীয় উন্নতির চরমসীমায় ভারতবর্ষ এককালে উঠিয়াছিল। সে উন্নতি অন্য দেশের পক্ষে অভিনব বোধ হইলেও ভারতের পক্ষে নয়। আজ কালের বশে ও অভ্যাসের দোষে, সে উন্নতি আর উন্নতি বলিয়া গণ্য হয় না বলিয়াই হউক, কিম্বা অন্য কারণেই হউক, ঐ উন্নতির

ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। অদ্যাপি যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্ট হয় তাহাও লোক বিশেষের মধ্যে। সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের মধ্যে সে উন্নতির আদর আমরা কই দেখিতে পাই? শেষোক্ত উন্নতির আদর নাই বলিয়া ও পূর্ব্বোক্ত উন্নতির শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়াই মেকলে বলিয়াছেন "—যে দেশে পার্থিব উন্নতি প্রবেশ করিয়াছে সে দেশ হইতে হৃদয় চলিয়া গিয়াছে, উন্নত গভীর ভাব সে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। দয়া মায়া সে দেশের বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সে দেশের অন্তঃসারবত্তা কিছুই নাই"।

(৩)। অঙ্কশাস্ত্রে বলে "Friction adapts itself to motion" অর্থাৎ গাড়ীখানি প্রথমে চালাইতে ঘোড়ার যতটুকু কষ্ট হয় শেষে তত হয় না, ক্রমশঃ গতি সহজ হইয়া আইসে। এইরূপ misery adapts itself to progressin this world অর্থাৎ সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে কষ্ট ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া যায়, যদিও প্রারম্ভে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। যাহার হৃদয় স্বাভাবিক, তাহার হৃদয় স্বাভাবিক ভাবে আবিষ্ট হইলে স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়। এই হেতু স্বাভাবিক কার্য্যাবলী অভ্যাস দ্বারা অনায়ত্ত থাকে না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য স্বাভাবিক বলিয়াই সে গুলি আয়াসসাধ্য। ঈশ্বর লোক বিশেষকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি ও প্রবৃত্তি দ্বারা ভূষিত করিয়া সৃজন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই সেই বৃত্তি গুলির সম্যক্ পরিচালনা করিলেই সেইগুলি সফলতা প্রাপ্ত হয়, নচেৎ হয় না। এই বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি স্বাভাবিক নিয়মে হয় ও সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য ঐ ঐ বৃত্তিসাপেক্ষ বলিয়াই সমস্ত ধর্ম্মই অভ্যাসদ্বারা লব্ধ হইতে পারে।

(৪) আমাদের বাহিক ও আন্তরিক ভেদে দুইটী স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে। সামাজিক কঠোরতায় ও সামাজিক নীতি পদ্ধতির (etiquette) সুদৃষ্টান্তে মানুষের অন্তরে যে ক্ষণিক ভাবমূলক প্রকৃতির উৎপত্তি হয় তাহাই বাহিক প্রকৃতি। অবশ্যই আন্তরিকের সহিত ইহার বহুল পরিমাণে সম্বন্ধ থাকিলেও ঐ সমস্ত ব্যবহারিক ক্রিয়া দ্বারা সেই সমস্ত ভাবের পরিণতি ও স্ফূর্ত্তি হয়। আন্তরিক প্রকৃতিটী স্বভাব ও কতকটা সংস্কারজাত। অবস্থাভেদে প্রথমটীর পরিবর্ত্তন আছে কিন্তু শুদ্ধ অভ্যাস

ব্যতীত, অন্য কোন শক্তিদ্বারা দ্বিতীয়টীর পরিবর্ত্তন নাই, ও সম্ভবও নয়। আন্তরিক প্রকৃতি বাহ্যিক প্রকৃতিটীকে কখন কখন চালিত করে, কিন্তু সকল সময় নয়, কারণ সময়ে সময়ে শেষোক্তটিই বেশী প্রবল হইয়া উঠে। আন্তরিক প্রকৃতিটী নিজবশে রাখিবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। বাহ্যিক ও আন্তরিক প্রয়োগভেদে শিক্ষাও আবার দ্বিবিধ—Practical ও Theoretical। মন যাহা ইচ্ছা করে, শরীর যদি তাহা সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা হইলেই শিক্ষার সম্পূর্ণতা হইল। শিশুগণ ইচ্ছাসত্বেও একটী রমণীয় দ্রব্য ধরিতে পারে না, কারণ শিশুদের উভয় শিক্ষাই অসম্পূর্ণ। শুদ্ধ theoretical শিক্ষার দোষ এই যে মনের ভাব মনেই বিলীন হইয়া যায়, বাহিরে তাহার স্ফূরণ হয় না। লোকে জানে " কখনও মিথ্যা কথা কহিওনা "—ইহাতে দোষ আছে তাহাও বিশেষরূপে জানে। কিন্তু তথাপি মিথ্যা কয় কেন? কারণ তাহাদের এ বিষয়ে Practical শিক্ষা হয় নাই। যে বালক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ অধ্যয়ন করিয়াছে, সেই ত অধিকাংশ নীতিবাক্য হৃদয়-ঙ্গম করিয়াছে, কিন্তু তাঁহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে কয় জন? যদ্যপি কাহারও একটী অসৎকার্য্যে মতি হয় তাহা হইলে তাহার সেই কুমতি শুদ্ধ শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ফিরিলে বা ফিরাইলে যত উপকার হয়, কার্য্যে (Practically) অর্থাৎ নিজের অভিজ্ঞতার বলে ও নিজে সেই অসৎকার্য্যের ফলভোগ করিয়া ফিরিলে বা ফিরাইলে তাহার অপেক্ষা শতগুণ উপকার দর্শে। সেই জন্যই ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে দেশপর্য্যটন (continental tour) শিক্ষার অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। কারণ ইহাতে কার্য্যতঃ অনেক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের বিশেষ সুবিধা আছে। আমাদের একটা কথায় আছে—

একবার যোগী, দুবার ভোগী,
তিন বার হ'লেই, হ'ল রোগী।

অর্থাৎ লোকে একবারমাত্র পাপকরিলে তাঁহাকে যোগী বলা যাইতে পারে, দুইবার পাপ করিলে পাপের ভোগ হইল বটে কিন্তু প্রকৃত পাপী নাম হইল না। তিন বার পাপ করিলেই আর নিস্তার নাই, ঐ কার্য্যটী তাহার রোগের মধ্যে হইয়া গেল—সে কখনও আর এ পাপ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না। ইহার কারণ এই যে একটী লোক একবারমাত্র পাপ করিলে সে একটী

অবৈধ শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু পরে তাহার জ্ঞানোদয় হইলে তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত যেটুকু ধৈর্য্য ও আত্মত্যাগ আবশ্যক তাহা যদি করে তাহা হইলে ঐ ধৈর্য্যের ফলস্বরূপ সে পরে ততোধিক সাধু হয়। কারণ যদি সে এককালেই অধর্ম্ম না করিত তাহা হইলে তাহাকে আর ধৈর্য্য প্রকাশ করিতে হইত না। তাহা হইলে সেই শক্তির ততটা আবশ্যক হইত না, তাহা হইলেই তাহার যোগী নাম সার্থক হইল। দুই বার প্রলোভনে পড়িয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে যোগী নামের আরও সমধিক সার্থকতা হয় বটে, কিন্তু তখন তাহাকে ভোগী বলিতে হইবে। কিন্তু তিনবার প্রলোভনে পড়িলে, মনুষ্যের এরূপ দৃঢ় মানসিক শক্তি নাই যে তদ্দ্বারা সে সেই প্রলোভন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তখন সে একবারে রোগী অর্থাৎ পাপব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। এইরূপ বারম্বার পাপ করিলে সেই শক্তিটী ধৈর্য্যশক্তিটীর উপর বিশেষরূপ আধিপত্য করিয়া বসে, তখন তাহার উদ্ধারের পথ কণ্টকাবৃত হইয়া পড়ে। তাই Shakspere বলিয়াছেন "Best men are moulded out of faults"। তাই, নিজে শিক্ষার গুণে ভাল হইলে উত্তম; অন্যের দেখিয়া চরিত্রসংস্কার করিলে উত্তমতর; নিজের ফলভোগ দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে উত্তমতম। কারণ শেষটীতেই Practical শিক্ষার চূড়ান্ত হইল। Theoretical শিক্ষার প্রয়োগ আমাদের মনোবিজ্ঞানে (Philosophy), আর Practical শিক্ষার প্রয়োগ সাহেবদের ডাক্তারী বিদ্যায় (Medical science) ও আমাদের হিন্দুর কার্য্যকলাপে। সেই হেতু Bain বলিয়াছেন "morality is a department of *practice* or it is a knowledge applied to pratice or useful ends, like medicine or politics."

(৬)। আজকাল আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকের ইহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নাই। না থাকিবারই কথা। ঔষধের ক্রমানুযায়ী তেজঃবৃদ্ধি ইহা সহজে কে বিশ্বাস করিবে? সাধারণতঃ লোকে জানে মাত্রানুসারে ঔষধ কার্য্য করে। কিন্তু আমাদের সম্প্রতি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আবিষ্কর্তা ডাক্তার হানিমান সমস্ত অঙ্কশাস্ত্রবিৎ

পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কোন দ্রব্য স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কোন শক্তির দ্বারা রূপান্তরিত হইলে তাহার তেজ বর্দ্ধিত হয় কি না? আমরা আমাদের সামান্য সূত্র (principle) ধরিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে বাস্তবিক হানিমানের ঔষধের ক্রমপ্রণালী একেবারে ভ্রান্ত নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় একটী দ্রব্যের পরমাণুগুলির মধ্যে কোন প্রকার শক্তিই বিকাশিত হয় না কিন্তু তাহার উপর বাহ্যিক কোন শক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক পরমাণুগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা করিলে সেই শক্তিটী গুপ্তভাবে ঐ বস্তুতে নিহিত থাকে, পরে তাহা দেহের ভিতর প্রকাশ পায়। এই হেতু লঙ্কা কি অন্য দ্রব্যকে যতই পরমাণুসাৎ করা যায় ততই তাহার কটু আস্বাদন বৃদ্ধি পায়। এইটীই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মূল সূত্র—ইংরাজীর strains ও stresses কতকটা এইরূপ, অন্ততঃ এই গুপ্ত শক্তির বিকাশ strain ও stress নামক অধ্যায়ের অন্তর্ভূত বলিলেও বেশী ক্ষতি হয় না।

(৭)। দৃঢ়সঙ্কল্প এত বলবান্ কেন? আমরা কতক পরিমাণে দেখাইয়াছি, মানুষ সঙ্কল্পগুণে নিজের ও পরের উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম হয়। সঙ্কল্প না থাকিলে আমরা কোন কাজই করিতে পাইতাম না। একটু বাধা দেখিলে ভীত হইতাম, একটু বিঘ্ন দেখিলে পশ্চাদ্‌পদ হইতাম, লোকের বিদ্রূপে জড় হইয়া পড়িতাম, তাহা হইলে আর আমাদের কার্য্যকারিণী শক্তি কোথায় থাকিত? অতএব Intensity of will এবং অর্থাৎ দৃঢ় সঙ্কল্পের এত ক্ষমতা কেন? আমরা এই সঙ্কল্প দ্বারা প্রবল যথেচ্ছাচারী রিপুগণকে দমন করিয়া রাখিতে পারি—এই রূপে সেইগুলি সুপ্রণালী পরিগ্রহ পূর্ব্বক, সম্মুখে ধাবমান হইয়া সঙ্কল্পরূপে অন্যদিকে পরিণত হয়। এই সঙ্কল্পের কত ক্ষমতা তাহা একটী প্রবন্ধে দেখান যায় না। তবে আমরা শুদ্ধ দেখাইব যে অন্যের বিশ্বাসটা এই সম্বন্ধে কতদূর আবশ্যকীয়। আমরা বলিয়াছি অন্যের ইচ্ছায় আর একজনকে বশীভূত করিতে গেলে শেষোক্ত ব্যক্তির বিশ্বাস (faith) আবশ্যক। যে শক্তি প্রথম- ব্যক্তিকে শাসন করিতেছে সেই শক্তিই বা তাহার কোন অংশ সঙ্কল্পরূপে অন্য দিকে চালিত হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শাসন করিতেছে। তবেই প্রথমের সঙ্কল্প যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির বিশ্বাসের বল প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ইচ্ছানুরূপ

ফল পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির বিশ্বাসরূপিণী শক্তি না থাকিলে প্রথমটীর সঙ্কল্পরূপিণী শক্তি তাহার সহায় না হইয়া তাহার কতকটা প্রতিকূলে গিয়া দাঁড়াইল। তাহা হইলেই সঙ্কল্প শক্তির একটু হ্রাস হইয়া কার্য্য পক্ষে একটু অন্তরায় হইয়া উঠে। এই রূপ বিশ্বাস থাকিতে সঙ্কল্প না থাকিলে একটু শক্তি হ্রাস হইয়া যায় তাহার ফল ও তদনুযায়ী শুভ বা ইচ্ছামত হয় না। আমাদের স্বস্ত্যয়ন, যজ্ঞ প্রভৃতি এই নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকে। যাজকের সঙ্কল্প ও যজমানের স্থির বিশ্বাস বা ভক্তি এই উভয়ে মিলিত হইয়া ঈপ্সিত ফল প্রদান করে। কিন্তু আজকাল যাজকেরও সঙ্কল্প নাই, যজমানেরও ভক্তি নাই, কাযে কাযেই ফলও তদ্রূপ হইয়া থাকে। যাহা হউক ইহাতে প্রতীয়মাণ হইতেছে যে একদিকে শুদ্ধ সঙ্কল্প কিম্বা শুদ্ধ ভক্তি থাকিলেও ঈপ্সিত ফলের অৰ্দ্ধেক লাভ করা যায়। কারণ একটী মাত্র শক্তিই যৎকালে বিভিন্নরূপ ধারণ পূর্ব্বক একজনকে ইচ্ছা রূপে এক জনকে ভক্তিরূপে শাসন করিতেছে তখন তাহার অংশের দ্বারা আংশিক ফল লাভ করিব না কেন? এই শক্তির আর একটী বিশেষ গুণ আছে। যদ্যপি সঙ্কল্পকারী ও ভক্তিদায়ী এই দুইএর মধ্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা কিম্বা অন্য কোনরূপ অবিচ্ছেদ্য বন্ধন থাকে তাহা হইলে এই শক্তি আরও বেশী কার্য্যকারী হয়; কারণ এই নূতন শক্তিটী আবার সেই দুইএর শক্তিটীকে অধিকতর সম্বদ্ধ করে। কাযেই ফল বেশী হইবার সম্ভাবনা। তাই কোন কবি বলিয়াছেন—

"আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী।"

ভক্তির আর একটী উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণংব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই, সকল ধর্ম্মের সার ভক্তি। ভক্তিতে লাভ করা যায় না এমন ধর্ম্ম জগতে দুর্ল্লভ। যাহার হৃদয়ে শুদ্ধ ভক্তিরূপা শক্তি আছে, তাহার সমস্তই আছে। সকল ধর্ম্মের মূল, সকল ধর্ম্মের সার, সকল ধর্ম্মের অন্ত যে ভক্তি—সে ভক্তি যার আছে তাহার কিসের অভাব?

আভীরা।

(১)

দূর শূন্যে নীলছবি পাহাড়ের তলে
ছেয়ে আছে শ্যামল প্রান্তর!
দূরে দূরে সারিগাঁথা তালরাজি শিরে
কাঁপিতেছে ক্ষীণ রবিকর!

(২)

দিশাহারা ভাসি চলে মেঘ-পোত গুলি
গগণের নীলিমা-সাগরে!
চমকি দেখিছে ধীরে জ্বালিতেছে দূরে
কনকাদ্রি পাহাড়ের শিরে।

(৩)

আভীরা কিশোরী বসি সপ্ত পর্ণ মূলে
কাছে বসি নওল কিশোর!
বিচরিছে কাছে কাছে গাভী বৎস গুলি
দুঁহে দোঁহা নেহারিতে ভোর।

(৪)

বালিকা মাধুরী নামে, কিশোর রাখাল,
প্রতিবেশী কুটুম্বের ছেলে—
চির সাথী-সখী সখা, শিশুকাল হতে,
দিবস কাটিছে হেসে খেলে!

(৫)

প্রীতিসরলতামাখা মাধুরীর মুখে—
ভাসিতেছে হাসির কিরণ!
মুক্ত অনিলের সখী, বনের ব্রততী,
তেমনি সে ভোলা খোলা মন।

(৬)

চাহি চাহি সে আননে সুখে ভরা বুক
সখা বলে "সইলো মাধুরি!
প্রভাতে শুনেছি আজি সুখের বারতা"
মাখা তাহে আনন্দ লহরী!

(৭)

"মাথা খাস্, কি কথাটী বল্‌না, রাখাল!"
ঝরে মধু ধীর মৃদুভাষে!
সখা হেরে নব শোভা মাধুরী-আননে
আগ্রহের আলু থালু বেশে।

(৮)

বলে সখা—"শুয়েছিনু কুটীরে যখন,
মা বাপের কথা গেল কানে!
দোঁহে বলিছেন, হবে সুখপরিণয়,
রাখালের মাধুরীর সনে!"

(৯)

পলকে শুকায়ে গেল মধুর মাধুরী,
মেখে হায় সলিল দর্পণ!
আবার ভাসিল হাসি তখনি পলকে
চাহি চাহি সখার আনন।

(১০)

"দাসী তোর পরিণয়ে হব কেন ভাই,
তেয়াগিয়ে বাপের ভবন?
ঘোমটায় মুখ তবে হবে আবরিতে—
আমা হতে হবে না তেমন!

(১১)

"এম্‌নি করে দুর্ব্বাদলে গোঠের বাতাসে
দুজনে কি ছুটিবারে পাব?

না রাখাল, ও সব কথা শুনিস্‌নে ভাই,
মা বলিলে আমি তাই কব! ”

(১২)

শ্যাম তরঙ্গের রাজি উঠিছে পড়িছে
শস্যক্ষেত্রে অনিল হিল্লোলে!
রাখালে মাধুরী ভোর অবসর বুঝি,
বুধি শনি ধায় কুতূহলে!

(১৩)

তখন চাহিয়ে বালা হেরে গোঠ পানে
অমনি সে লইল পাঁচনী!
নিথর গগণতল কাঁপাইয়ে ডাকে—
“ ফিরে আয় ওলো বুধি শনি! ”

(১৪)

ছুটি চলে তড়িতের লতিকার মত
আভীরা সে মধুর মাধুরী!
রাখাল চাহিয়ে রহে অনিমেষ আঁখি,
মরমেতে বাসনা লহরী!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সমাজ তত্ত্ব।

উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জড় জগতের যেমন বিজ্ঞান আছে, তেমনই মনুষ্য জগতের বিজ্ঞান আছে। জড় জগতের যেমন কতকগুলি শক্তি আছে, নিয়ম আছে, তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; সেইরূপ মনুষ্য জগতের শক্তি আছে, নিয়ম আছে, তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। প্রত্যেক

জড় পদার্থের যেমন কতকগুলি শক্তি বা গুণ আছে, তাহার সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ প্রাকৃতিক ঘটনার মূল, সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তর্নিহিত কতকগুলি শক্তি বা ধর্ম্মের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষই সামাজিক ঘটনা সমূহের মূল। সংক্ষেপতঃ প্রাকৃতিক ঘটনাসকলের ন্যায় সামাজিক ঘটনাসকলও নিয়মাধীন।

মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অজ্ঞাত ছিল। কোন মহান ব্যাপার দেখিলেই মনে ভয় ও বিস্ময় হইত। প্রবল বাত্যা, বৃষ্টি, জলপ্লাবন অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া ভীত ও বিস্মিত, কার্য্যকারণজ্ঞানবিহীন আদিম মনুষ্য এই সকলকে দৈব কার্য্য বিবেচনা করিত এবং ক্রোধোপশান্তির জন্য অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতিকে দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিত। ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত প্রাকৃতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। এখন আর সভ্য জাতিরা গৃহদাহে অগ্নিদেবের পূজা করে না, প্রবল বাতবিক্ষোভিত সমুদ্রে ভাসমান পোতাধ্যক্ষ পবনদেবের স্তব পাঠ করেন না। প্রাকৃতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া যেমন বাহ্য জগতের দুর্ঘটনার প্রকৃত প্রতিকার হইতেছে, সেইরূপ সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধান ও নিরূপণ হইলে সামাজিক বিশৃংখলার প্রকৃত প্রতিকার হইবে। সামাজিক দুঃখ ক্লেশের কারণ জানা যাইবে, সমাজ সভ্যতার পথে দ্রুত গতিতে যাইতে থাকিবে। জ্ঞান ও সত্য প্রচারিত হইবে, সামাজিক সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

এক্ষণে জানা আবশ্যক সমাজ কি ও তাহার প্রকৃতি কি? আমরা এ স্থলে ইহার নৈয়ায়িক সংজ্ঞা দিব না। সাধারণতঃ সমাজ কাহাকে বলে তাহা সকলেই জানেন। তবে প্রস্তাবোচিত একটি সংজ্ঞা দেওয়া আবশ্যক। বিষয় বিশেষে একতা বিশিষ্ট জনসমূহকে সমাজ বলা যাইতে পারে। যেমন দেশ বিষয়ের একতা লইয়া ইংলণ্ড দেশীয়দিগকে ইংরেজসমাজ, সমস্ত য়ুরোপবাসীদিগকে য়ুরোপীয়সমাজ, বঙ্গবাসীদিগকে বাঙ্গালীসমাজ, বলা যায় সেইরূপ ধর্ম্ম বিষয়ে একতা লইয়া খৃষ্টিয়সমাজ, হিন্দুসমাজ, মুসলমানসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে। এবং মানব জাতীয়ত্ব লইয়া সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্যকে মনুষ্য সমাজ বলা যায়।

এই মনুষ্য সমাজকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১মতঃ, অসভ্য,

বা বর্ব্বর জাতি ; ২য়তঃ, অর্দ্ধ সভ্য বা অর্দ্ধ বর্ব্বর জাতি ; ৩য়তঃ, সভ্য জাতি
পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মনুষ্যের অন্তর্নিহিত কতকগুলি শক্তি বা ধর্ম্ম আছে সেই গুলির বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগের পরিচালনা ও পরিপুষ্টি সাধন করিতে হয় এবং জড় জগতে প্রকৃতির নিয়ম ও পদার্থসকলের কার্য্যোপযোগিতা জানিতে হয়। এই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের জ্ঞান মনুষ্যের অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায়। যাহারা ইহা না জানিয়া এবং জানিতে চেষ্টা না করিয়া কেবল জীবন ধারণের জন্য পশুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদিগকে অসভ্য বা বর্ব্বর বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ আহার নিদ্রা প্রভৃতিতে মনুষ্য পশুর সহিত সমান, কেবল ধর্ম্মই মনুষ্যকে পশু হইতে বিশেষ করে; এমন ধর্ম্মে যাহারা বিহীন তাহারা পশু ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তবে যদি মনুষ্য সমাজের অন্তর্গত করা যায় তাহা হইলে যে অসভ্য শ্রেণী নিবিষ্ট করা হয় তাহাতে আর বিচিত্র কি?

যাহারা উপরোক্ত বিষয়গুলি কতকাংশে অবগত কিন্তু এরূপ অনভিজ্ঞ অনুৎসাহী ও অনৈক্যশালী যে অন্যে তাহাদিগকে বলে বা কৌশলে—যাহাতে শাসিতদিগের না হউক শাসনকর্ত্তা দিগের উপকার ও লাভ হয়—এরূপ ভাবে শাসিত ও চালিত করে, তাহাদিগকে অর্দ্ধসভ্য বলা যাইতে পারে। যে সমাজ এরূপ স্থাপিত, গঠিত ও চালিত যে যাহারা স্থাপয়িতা তাহারাই চালক ও যেখানে জাতিগত ব্যতীত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, স্বত্ব, স্বার্থ রক্ষিত হয় তাহাকে সভ্য-সমাজ বলা যায়। বলা বাহুল্য যে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের জ্ঞানে এ সমাজ জ্ঞানী এবং অধিক জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় নূতন তত্ত্বের আবিষ্করণে যত্নবান্। সেই নিমিত্ত প্রকৃতির শক্তির ও উপকরণের নানা কার্য্যে প্রয়োগ ; সময় ও শ্রম লাঘব করিবার জন্য নানা গঠন ; জলে স্থলে আরামের জন্য আশ্চর্য্য অশ্চর্য্য নানা যান, সামাজিক ও রাজনৈতিক সুশৃংখলা ও ন্যায়পরতা ; বিধি, বিজ্ঞান ও শিল্প, সাহিত্য—এ সমাজে সকলই সমুৎপন্ন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুইটী উপাদানে সমাজ সংগঠিত—একটি পুরুষ জাতি অপরটি স্ত্রীজাতি। এই দুইএর প্রকৃত সম্বন্ধ বিচার সমাজ তত্ত্ববিদের প্রধান কর্ত্তব্য—কারণ এই সম্বন্ধ সমাজসৌধের ভিত্তি।

সাম্য ও স্বাধীনতা সামাজিক নীতির মূল। পূর্ব্বে স্বাধীনতা দাতব্যের সামগ্রী ছিল। যাহাকে অনুগ্রহ করিয়া দেওয়া হইত, সেই পাইত, কাহারও তাহাতে অধিকার ছিল না। কোন কোন সম্প্রদায়ের আবার কোন কোন বিশেষ অধিকার থাকিত—যেমন শাসন করিবার অধিকার, কর নির্দ্ধারণের অধিকার, দণ্ডবিধানের অধিকার। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সকল কাহারও অধিকার নয়—অধিকারী কৃত অনধিকার।

এই অত্যাচার সকল দেশে সকল সমাজে চলিয়া আসিতেছিল—অপ্রতিহত প্রভাবে চলিয়া আসিতেছিল। সমাজতত্ত্ববিদগ্রনী সাম্যবাদী মহাত্মা রুসো ইহার প্রতিবাদ করিয়া এক নূতন তত্ত্ব প্রচার করিলেন। তিনি বলিলেন মনুষ্য জন্মিয়াই স্বাধীন। এই তত্ত্ব যে দিন জগৎ সমক্ষে প্রচারিত হইল সেই দিন যেন জগতে স্বাধীনতার সূর্য্য উঠিল। যে স্বাধীনতায় এতদিন সম্প্রদায় বিশেষের একাধিপত্য ছিল তাহা এখন জনসাধারণের হইল। ১৭৯০ খৃঃ অঃ এই সত্য য়ুরোপীয় অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। এই বৎসর আগষ্ট মাসে ফ্রান্সের জাতীয় সমিতি (National Assembly) প্রচার করিলেন যে মনুষ্য জন্মাবধিই স্বাধীন ও সমস্বত্ব। এই স্বাভাবিক স্বত্বসংরক্ষণই রাজনৈতিক সভার উদ্দেশ্য। এই সকল স্বত্ব—স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নির্ব্বিঘ্নতা ও অত্যাচারের প্রতিবিধান।

এই রূপে মনুষ্যর স্বত্ব সকল জগতে পরিচিত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে উহা এখনও বিশ্বজনীন হইল না। আজিও সমগ্র মানবজাতি ইহা পাইল না। আমরা এখানে কেবল সভ্য জাতির কথাই বলিতেছি। সভ্য জাতির মধ্যেও ইহা সকলে পান নাই। এ পর্য্যন্ত কেবল পুরুষজাতিই এই স্বত্বের অধিকারী, স্ত্রীজাতি ইহাতে বঞ্চিত।

আমরা এ প্রস্তাবে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ বিচারে প্রবৃত্ত, স্ত্রীপুরুষগত

প্রভেদই হইার বিচার্য্য। কিন্তু প্রকৃত সত্য প্রথমে নির্নীত না হইলে তুলনায় বিচার যথার্থ হইতে পারে না। এই জন্যই মূল সত্যের আলোচনায় কয়েকটি কথা সংক্ষেপেও বলা হইল। এক্ষণে দেখা যাউক স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ আপাততঃ কি রূপ অবস্থায় আছে এবং কি রূপ হওয়া উচিত।

"মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট" ইহাই সাম্যতত্ত্বের মূল সত্য। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই মনুষ্য সুতরাং উভয়েরই তুল্য অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু সভ্য সমাজেও অদ্যাপি স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এ সত্য স্বীকৃত হয় নাই। এবং যত দিন না তাহা হইবে তত দিন সমাজ স্থায়ী ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইতে পারে না। কারণ যাহা সত্য নয় তাহা স্থায়ীও হইতে পারে না।

পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে তাহাতে প্রমাণীকৃত হইবে যে স্ত্রীজাতির ও পুরুষজাতির ন্যায় সমান স্বত্ব ও সমান অধিকার আছে। পুরুষেরও যেমন স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নির্ব্বিঘ্নতা ও অত্যাচারের প্রতিবিধানের স্বত্ব আছে, স্ত্রীর ও সেই রূপ স্বাধিনতা, সম্পত্তি, নির্ব্বিঘ্নতা ও অত্যাচার প্রতিবিধানের স্বত্ব আছে। পুরুষ ও যেমন কেবল স্বকৃত অপরাধ হেতু পূর্ব্বোক্ত স্বত্বে বঞ্চিত হইতে পারে, স্ত্রীও কেবল সেইরূপ স্বকৃত অপরাধ হেতু তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে—অন্যথা নহে। যদি অন্যথা তাহাদিগকে ইহাতে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে বলিতে হয়, যে কতকগুলি মনুষ্য ব্যতীত মনুষ্যে মনুষ্যে সমনাধিকার বিশিষ্ট নহে। অথবা স্বীকার করিতে হয় যে স্ত্রীজাতি মানব জাতির অন্তর্গত নয়। স্ত্রী জাতির স্বত্ব অস্বীকৃত হইলে পুরুষজাতির স্বত্বের কোন ন্যায়ানুগত ভিত্তি থাকে না। তাহা হইলে অত্যাচার আর অন্যায় বলিয়া গণিত হইতে পারেনা, দাসত্ব আর সভ্য সমাজে ঘৃণার পদার্থ বলা যায় না। হয় সকল মনুষ্যের সমান অধিকার আছে, অথবা কাহারও কিছুই নাই।

ইহাতে অনেকে এরূপ তর্ক করেন যে যখন স্ত্রী পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে তখন অধিকারগত সাম্য থাকিবে কি প্রকারে?

আমরা বলি যাহাকে প্রকৃতিগত বৈষম্য বলা হইতেছে তাহা প্রকৃত প্রকৃতিগত বৈষম্য নহে (বলা বাহুল্য আমরা শারীরিক বৈষম্যের কথা বলিতেছি না, অনেকাংশে তাহা অভ্যাস ও শিক্ষার ফল। অভ্যাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, তাহার উপর আবার শিক্ষার দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইলে, প্রায়

প্রকৃতিই হইয়া যায়। আশৈশব একটি বালক ও একটি বালিকার শিক্ষার প্রভেদ দেখুন। বালক খেলা করিবে,—দৌড়াদৌড়ি করিয়া, ছুটাছুটি করিয়া—বালিকা গৃহপ্রাঙ্গনে খেলাঘর পাতাইয়া তখন হইতে গৃহকর্ম্ম অভ্যাস করিবে, মেয়ে ছেলের বিবাহ দিবে, রাঁধিবে, ঘর পরিষ্কার করিবে। বালক বয়োবৃদ্ধির সহিত সংসারের নানা স্থানে যাইবে, নানা লোকের নিকট যাইবে, নানা ঘটনা দেখিবে, নানা সংবাদ, নানা উপদেশ শুনিবে। আর বালিকা বয়োবৃদ্ধির সহিত বহির্বাটী হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে, আর দেখা শুনা চতুঃপ্রাচীর-বেষ্টীত প্রাঙ্গন মধ্যে যাহা হইতে পারে তাহাই হইবে। ইহাতে কি পুরুষ বলবান্ স্ত্রী অবলা, পুরুষ সাহসী স্ত্রী ভীরু, পুরুষ অভিজ্ঞ স্ত্রী অজ্ঞ, পুরুষ কঠোরতাসহিষ্ণু স্ত্রী কোমলা হইবে না? এরূপ শিক্ষায় এরূপ ফল যদি না ফলিবে ত কি হইবে বলিতে পারি না। আমরা লেখাপড়ার কথা অধিক বলিব না, কারণ প্রকৃত শিক্ষা কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিয়া হয় না। জগতের প্রকৃত ঘটনা সমূহ হইতে অন্তরিত হইয়া জগতের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হওয়া অসম্ভব। মনে করুণ একজন বহুদর্শী কৃতকর্ম্মা লোকের যে পরিমাণে জ্ঞান আছে তাহা হইতে যদি তাহার জগতের প্রকৃত ঘটনার সংস্রবে, সংঘাতে আসিয়া যে বহুদর্শিতা জন্মিয়াছে সেই বহুদর্শিতাজনিত জ্ঞান বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে যে জ্ঞানটুকু থাকে সে কতটুকু? সেই পুস্তকজ্ঞান কোন কার্য্যে লাগিতে পারে? যাঁহারা স্ত্রী শিক্ষার নিতান্ত অনিচ্ছুক নহেন কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতার নামে খড়্গহস্ত তাঁহাদিগকে আমরা বুঝাইতে ইচ্ছা করি যে প্রকৃত স্বাধীনতা না দিলে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। যদি শিক্ষা অর্থে এরূপ বুঝিতে হয় যে যাহাতে গৃহে বসিয়া উপন্যাস পাঠ করিতে পারিবে, দুই চারিটী নীরস, অর্দ্ধঅশ্লীল শ্লোক শিখিতে পারিবে এবং শব্দসাগরের বাছা বাছা রত্নগুলিন অযথা প্রয়োগ করিয়া পত্র লিখিতে পারিবে তাহা হইলে আমরা স্বীকার করি যে পিঞ্জরবদ্ধার এরূপ শিক্ষা অসম্ভব নয়। *

* প্রচারে প্রকাশিত সকল প্রবন্ধের সকল কথার সহিতই যে আমাদের মতের ঐক্য আছে এরূপ কেহ মনে না করেন। কেহ কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রচারেই করিতে পারেন।—প্রঃ-সং।

স্ত্রীস্বাধীনতার কথা অন্যত্র বলা যাইবে। স্ত্রীজাতির পুরুষোচিত কার্য্যে উপযোগিতা আমাদের অনুসরণীয় বিষয়—তাহারই প্রসঙ্গে এতদূর আসা গিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে—তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারই করা যায় যে স্ত্রীজাতির মানসিক শক্তি পুরুষজাতির মানসিক শক্তি অপেক্ষা স্বভাবতঃই নিকৃষ্ট, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল সময়ে ও সকল দেশেই এই নিকৃষ্টতা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কারণ, যাহা স্বাভাবিক প্রকৃতির নিয়মাধীন, তাহা এক সময়ে এক দেশে এক প্রকার, অন্য দেশে অন্য সময়ে অন্য প্রকার—ইহা অসম্ভব। সত্যযুগে ভারতবর্ষে যে অগ্নির দাহিকা শক্তি ছিল এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকাতে তাহার দাহিকা শক্তি আছে। প্রাকৃতিক নিয়মের বশে যাহা চলিতেছে তাহার আর দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্ত্তন ঘটে না। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় একই ভাব।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, স্ত্রীজাতির এই কথিত নিকৃষ্টতা এত প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়াছে কি না, যাহাতে ইহাকে প্রকৃতিগত বলা যাইতে পারে। এস্থলে ইহা বলা বাহুল্য যে, বৈজ্ঞানিক বিচারে বিচার্য্য বিষয়গুলি সমাবস্থাপন্ন না হইলে পরস্পর তুলনীয় হইতে পারে না। সুতরাং স্ত্রীপুরুষগত বৈষম্য বিচার করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, স্ত্রীপুরুষের সামাজিক অবস্থা সর্ব্ব বিষয়ে সমান কি না? আমাদিগের যত দূর জানা আছে তাহাতে একরূপ অসংকোচে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত অবস্থা সমান নয়। সুতরাং স্ত্রীজাতির আপাততঃ যদি কিছু বা যাহা কিছু নিকৃষ্টতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে প্রাকৃতিক বলা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। তাহার পর ইহাও বলিতে হইবে যে, সর্ব্বদেশকালপাত্র-প্রযুজ্য প্রাকৃতিক নিয়মতুল্য স্ত্রীজাতির নিকৃষ্টতাও কোথাও দেখা যায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক যাহা করিতে পারে না, বা করে না, য়ুরোপীয় স্ত্রীলোক তাহা করিতে পারে বা করে। আবার য়ুরোপীয় স্ত্রীলোক যাহা করিতে পারে না, বা করে না, আমেরিকার স্ত্রীলোক তাহা করিতে পারে বা করে। ইহার কারণ সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে উক্ত দেশ সকলের সামাজিক আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও শিক্ষা এই রূপ উপযোগি-

তার হেতু। তাহা হইলে ইহাই প্রমাণ হইতেছে ও ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, স্ত্রীজাতির যে নিকৃষ্টতা দেখা যায়, তাহা কেবল স্ত্রীলোক বলিয়া প্রকৃতিগত নহে—সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শিক্ষা ও সাধারণ অবস্থাগত। শিক্ষা ও অবস্থার প্রভাবে পুরুষজাতির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দেখা যায়, স্ত্রীজাতির মধ্যেও তাহাই। স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ যাহা কিছু দেখা যায় তাহা অবস্থা ও শিক্ষাগত প্রভেদজনিত—তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই নহে।

এক্ষণে নৈয়ায়িক তর্ক ছাড়িয়া দেখা যাউক স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা কার্য্যতঃ কোন্ কোন্ বিষয়ে নিকৃষ্ট। স্ত্রীজাতি অতীতে যাহা হইয়াছে বা বর্ত্তমানে যাহা আছে তাহাই বিবেচনা করা যাউক। কারণ ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে, যাহা তাহারা হইয়াছে তাহা তাহারা হইতে পারে—যদিই একান্ত তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু না হয়। তাহারা কালিদাস বা সেক্ষপীয়রের মত কাব্য প্রণয়ণ করিতে পারে কি না অথবা গৌতম বা মিলের মত ন্যায়-শাস্ত্র লিখিতে পারে কি না এরূপ তর্কে এই মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে, তাহা অনিশ্চিত—অন্ততঃ সে বিষয়ের মীমাংসা স্বতঃসিদ্ধ নয়—তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু তাহারা যাহা হইয়াছে ও করিয়াছে তাহা কল্পনা বা তর্কের বিষয় নহে—বাস্তব ঘটনা।

যত প্রকার কার্য্য আছে তাহার মধ্যে রাজ্যশাসন সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। রাজনৈতিক ব্যাপারে যেরূপ বুদ্ধির পরিচালনা আবশ্যক সেরূপ বোধ হয় আর কিছুতেই নয়। বৈদেশিক রাজগণের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ রক্ষা, তৎ-সম্বন্ধে যুদ্ধবিগ্রহসন্ধির বিষয় আলোচনা করা, সমগ্র দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি বিধানে চেষ্টা করা, কার্য্যবিভাগে উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করা, আরও কত সহস্র কার্য্যে দৃষ্টি রাখা—এ সকলে অসাধারণ বুদ্ধির এবং উন্নত, প্রশস্ত, দৃঢ় ও কার্য্যকুশল মনের আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য। অতীতসাক্ষী ইতিহাস বলিয়া দিতেছে এরূপ কার্য্যও স্ত্রীলোক দ্বারা নির্ব্বাহিত—অতি দক্ষতা, নিপুণতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত—নির্ব্বাহিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথ, স্পেনের ফার্ডিনেণ্ড-মহিষী মেরি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের বর্ত্তমান সময়েও সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইহার জাজ্জ্বল্যমান

উদাহরণ। জন ষ্টুয়ার্ট মিল এই কথায় বলেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই বিষয়টী বিশেষরূপে সত্য। যখনই দেখা যায় যে, কোন হিন্দুরাজ্য তেজস্বিতা, সতর্কতা ও মিতব্যয়িতার সহিত শাসিত হইতেছে, যখনই দেখা যায় বিনা পীড়নে শান্তি স্থাপিত হইতেছে, কৃষি বিস্তীর্ণ হইতেছে, প্রজা সমৃদ্ধিশালী হইতেছে, তখনই অনুমান করা যাইতে পারে এই রাজত্ব স্ত্রীলোকের দ্বারা হইতেছে, অন্ততঃ এইরূপ প্রত্যেক ৪টার মধ্যে ৩টা নিশ্চিত। মিল বলেন ইহা তাঁহার কাল্পনিক কথা নহে। দীর্ঘকাল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত কার্য্যসম্বন্ধে তাঁহার এই জ্ঞান হইয়াছে। যদিও হিন্দু নীতি অনুসারে স্ত্রীলোক রাজত্ব করিতে পারে না তথাপি অনেক সময়ে তাহাকে রাজ্যের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। আলস্যে ও ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন হইয়া অনেক রাজাই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন উত্তরাধিকারীর অপ্রাপ্তবয়স্কতার সময় রাজ্ঞীকেই রাজ্যের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। ইহার উপর বিবেচনা করিতে হইবে যে উক্ত রাজ্ঞীরা কখন প্রকাশ্য স্থানে বাহির হয়েন না, পর্দ্দার অন্তরাল ব্যতীত কখন কাহারও সহিত কথা কহেন না, রীতিমত লেখা পড়া জানেন না, জানিলেও ভাষায় রাজনীতিবিষয়ক এমন কোন পুস্তক নাই যাহা হইতে উপদেশ পাইতে পারেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে আরও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, রাজ্যশাসনে স্ত্রীলোকের এক রূপ স্বাভাবিক ক্ষমতাই আছে।* (১)—[ক্রমশঃ।]

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

---

(১) "Especially is this true if we take into consideration Asia as well as Europe. If a Hindoo principality is strongly, vigilantly, and economically governed, if order is preserved without oppression, if cultivation is extending, and the people prosperous, in three cases out of four that principality is under a woman's rule. This fact, to me an entirely unexpected one, I have collected from a long official knowledge of Hindoo Governments. There are many instances: for though, by Hindoo institutions, a woman can not reign, she is the legal regent of a kingdom during the minority of the heir; and minorities are frequent, the lives of the male rulers being so often prematurely terminated through the effect of inactivity and sensual excesses. When we consider that these princesses have never been seen in public, have never conversed with any man not

রুদ্ধপ্রাণ।

ধর মা ধরারাণি তুলেনে কোলে ছেলে,
বিদেশে কত আর রাখিবি একা ফেলে!
অচেনা ঠাঁই এ যে অচেনা লোক জন,
ধূ ধূ ধূ চারি ধার মরভূ বিভীষণ।
কেহ না ডাকে কারে কেহ না কহে কথা,
চাহিয়ে চ'লে যায় চাপিয়ে মনোব্যথা।
আপন কেহ নাই—জানি না থাকে যদি,
চিনিতে দেয় নাক মাঝেতে মহানদী।
কেবলি ঝরে বারি কেবলি বহে শ্বাস,
কেবলি দুখ-গান এমনি বার মাস।
এমনি দিন রাত কাটিছে কেঁদে কেঁদে,
বল মা কত আর রাখিবি হেথা বেঁধে!
সহে না এত আর কঠোর এত এরা,
দুখের নাগপাশে জীবন এত ঘেরা।
এতই বিভীষিকা এতই হা হুতাশ,
এতই ভুরুকুটি অপ্রেম উপহাস।
এতই পরভাব এতই ছাড়াছাড়ি,
তুচ্ছ কথা নিয়ে এতই বাড়াবাড়ি।
তুচ্ছ ধন-আশে এতই উনমাদ,
তুচ্ছ ধন নিয়ে এতই দুরবাদ!
তুচ্ছ যার আশা তুচ্ছ তার প্রাণ,
সহে না আর মাগো প্রাণের অপমান।

---

of their own family except from behind a curtain, that they do not read, and if they did, there is no book in their languages which can give them the smallest instruction on political affairs; the example they afford of the natural capacity of woman for government is striking."—*Subjection of Women.* By J. S. MILL, page 103.

সহে না অবিচার জীবন অপচয়,
কথারি কোলাহল কাজে ত কিছু নয়।
যেখানে যাব ভাবি সে পথ নাহি পাই,
আলোর আশা ক'রে আঁধারে ডুবে যাই।
নে না মা কোলে তুলে দিন ত ব'য়ে গেল,
প্রাণের চারি ধারে আঁধার ঘিরে এল।
হাসি ত ডুবে এল ভাঙ্গিল ধূলাখেলা,
কেবলি মিছামিছি কেটেছি সারাবেলা।
মিছা এ দেহ ব'য়ে কেবলি ঘুরে মরি,
ধাঁধাঁয় বাঁধা প্রাণ আধার পরিহরি।
বেঁধো না বাঁধা প্রাণে বাঁধন সয় কত?
শরীর দুরবল অবশ গতিহত।
বাসনা জাগে শুধু জীবন করি জয়,
তোমাতে জনমি মা তোমাতে হই লয়।
তোমাতে মিশে গিয়ে তোমারি কাজ করি,
মিছা এ বাঁধা প্রাণে আঁধারে ঘুরে মরি।
প্রাণ ত সঙ্কোপ আঁধার কারাগারে,
রহিতে নারে আর বদ্ধ চারি ধারে!

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

সিপাহিযুদ্ধে ভারতবাসীর পরোপকারকাহিনী।

সিপাহিযুদ্ধের সময় যখন সকলে আপন আপন সম্পত্তি রক্ষায় ব্য ছিল, ভয়ঙ্কর বিপ্লবে উদ্ভ্রান্ত হইয়া যখন সকলে আপনাদের বহুমূল্য দ্রব্য নির্জ্জন স্থানে গোপনে রাখিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছিল, তখন এ দরিদ্রা মহিলা এ বিষয়ে যেরূপ অটল বিশ্বাস ও প্রভুভক্তির পরিচয় দেয়, ত সুনীতি, সদভিপ্রায় ও সাধু চরিত্রের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। সেই দুঃসময়ে য

সকলেই আপনার বিষয় লইয়া বিব্রত ছিল, তখন বিশ্বাসিনী বামনী পরের বিষয়ের জন্য যত্নবতী হইয়া উঠেন।

বামনী একজন ইঙ্গরেজ ডাক্তারের পরিচারিকা। সিপাহিযুদ্ধের সময় ডাক্তার অযোধ্যাস্থিত সৈনিক নিবাসে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা নিশীথ সময়ে সংবাদ আসিল অযোধ্যার সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার কার্য্যানুরোধে স্বয়ং পলাইতে পারিলেন না, কেবল তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে তিনটী শিশু সন্তানের সহিত অবিলম্বে শকটারোহণে লক্ষ্নৌ যাইতে পরামর্শ দিলেন। চিকিৎসক-পত্নী সম্মুখে যাহা পাইলেন, তৎসমুদায় তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠাইয়া তিনটি সন্তানের সহিত লক্ষ্নৌ নগরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে ডাক্তার অপরাপর ইঙ্গরেজেরা যেখানে সজ্জিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সিপাহিদিগের ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল, ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল, গভীর নিশীথে ভয়ঙ্করী অগ্নিশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল। চিকিৎসক-রমণী এই ভয়ঙ্কর সময়ে তিনটি শিশু সন্তান ও দুইটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত সভয়ে রাজপথ অতিবাহন করিয়া লক্ষ্নৌ গমন করিলেন। চিকিৎসক দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু আর গৃহে ফিরিলেন না। অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের সহিত সিপাহিদিগের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এ দিকে বামনী প্রভুর পরিত্যক্ত গৃহে নিষ্কর্ম্মা ছিল না। তাহার প্রভু-পত্নী যেখানে অলঙ্কারাদি বহুমূল্য সম্পত্তি রাখিতেন তাহা সে জানিত। এখন কালবিলম্ব না করিয়া সেই সমস্ত মূল্যবান্ আভরণরাশি লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সিপাহিগণ আসিয়া সেই গৃহে অগ্নি দিল। চিকিৎসক দূর হইতে দেখিলেন তাঁহার গৃহ করাল অনলশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বামনী যে সমস্ত অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করিয়াছে তাহা কেহই জানিতে পারে নাই; সুতরাং সে ইচ্ছা করিলেই ঐ সমস্ত মহামূল্য দ্রব্য আত্মসাৎ করিতে পারিত। আভরণ গুলি বিক্রয় করিলে যে টাকা লাভ হইত, তাহা বামনী আপনার জীবিতকাল মধ্যে কখনই উপার্জ্জন করিতে

পারিত না; কিন্তু প্রভুপরায়ণা বিশ্বস্তা অবলা এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল না। সাধুতা ও প্রভুভক্তির সম্মান তাহার নিকট উচ্চতর বোধ হইল। দরিদ্রা বামনী অনায়াসে, লোভ সংবরণ করিয়া প্রভুপত্নীর সমস্ত দ্রব্য সযত্নে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

নগরের নিকটে একটি সামান্য পল্লীতে বামনীর আবাসগৃহ ছিল। বামনী আপনার গৃহে আসিয়া এক খানি ফ্লানেলের কাপড়ে অলঙ্কার গুলি জড়াইয়া মাটীতে পুঁতিয়া রাখিল। সে কেবল আপনার উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, আপনার ন্যায় আত্মীয়দিগকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই; সুতরাং তাহাদিগের নিকট ঘুণাক্ষরেও এ বিষয় প্রকাশ করিল না। এক বৎসরের অধিক কাল এই ভাবে অতিবাহিত হইল, এক বৎসরের অধিক কাল চিকিৎসক পত্নীর বহুমূল্য সম্পত্তি বিশ্বস্তা বামনীর কুটীরে মৃত্তিকার নীচে রহিল। শেষে লক্ষ্ণৌ শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইল, শান্তি পুনস্থাপিত হইল এবং সুখ সমৃদ্ধিতে অযোধ্যা পুনর্ব্বার শোভিতা হইয়া উঠিল। চিকিৎসক আর এক সেনানিবাসে চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বামনী এই সংবাদ শুনিয়া তথায় গমন করিল এবং প্রভু ও প্রভুপত্নীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য অন্তরাল হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল। যখন আর কোনও সন্দেহ রহিল না, তখন সে নীরবে স্বীয় আলয়ে ফিরিয়া আসিল, নীরবে মৃত্তিকা হইতে সমস্ত আভরণ বাহির করিল ও নীরবে সাবধানে তৎসমুদায় সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার প্রভু ও প্রভুপত্নীর নিকটে সমাগত হইল। বামনী অক্ষত শরীরে প্রত্যাগত হইয়াছে দেখিয়া চিকিৎসক ও তাঁহার পত্নী বিস্মিত হইলেন। ইহার পর যখন তাঁহারা দেখিলেন বামনী তাঁহাদের পরিত্যক্ত সমুদয় আভরণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। দরিদ্র পরিচারিকা বিনম্রভাবে একে একে সমুদায় অলঙ্কার বুঝাইয়া দিল। চিকিৎসক ও তাঁহার স্ত্রী দেখিলেন অলঙ্কারাদি কিছুই অপহৃত হয় নাই। তাঁহারা পরিচারিকার এই অসাধারণ সাধুতার পুরস্কারস্বরূপ দ্বিগুণ বেতনে তাহাকে পুনর্ব্বার কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। বামনী এই রূপে প্রভুপরিবারের বিশ্বাসভাজন হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

যখন সিপাহিরা কানপুর অবরোধ করে, তখন একটি নীচজাতীয় দরিদ্রা হিন্দু রমণীর প্রতি দুই বৎসরের একটি ফিরিঙ্গী সন্তানের রক্ষার ভার ছিল। সন্তানের পিতা মাতা উভয়েই অবরোধের সময় নিহত হইয়াছিল। এই দরিদ্রা নারীই শিশুর একমাত্র অভিভাবক ছিল। দুঃখিনী ধাত্রী শিশুটিকে তাহার জন্মাবধি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিল, সুতরাং সে তাহাকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত। পিতৃমাতৃহীন দুঃখী সন্তান কেবল এই দুঃখিনী নারীর অনুপম স্নেহে রক্ষিত হইতেছিল।

ক্রমে কানপুরের অবরোধকার্য্য শেষ হইয়া আসিল। সিপাহিদিগকে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া জুন মাসের শেষে ইঙ্গরেজ সেনাপতি এই নিয়মে নানা সাহেবের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন যে, ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকাদিগের সহিত তাঁহার সৈন্যগণ নৌকারোহণে স্থানান্তরে গমন করিবে, সিপাহিরা তাহাদের কোনও বিঘ্ন জন্মাইবে না। নানা সাহেব ইহাতে সম্মত হইলেন। অবরুদ্ধ কামিনীগণ বিমুক্তির সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া নৌকায় আরোহণ করিবার জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন।

ফিরিঙ্গী সন্তানের প্রতিপালিকা ধাত্রীও সজ্জিত হইল এবং হৃষ্টচিত্তে শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া, আপনার পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া নদীকূলে গমন করিল। সকলেই নৌকায় আরোহণ করিয়াছে, এমন সময় সিপাহিরা তটদেশ হইতে আরোহীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। দুইটি কামান নদীতটে লুক্কায়িত ছিল, এখন উহা বাহির করিয়া নৌকার সম্মুখবর্ত্তী করা হইল। ধাত্রী উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিশু সন্তানটিকে বক্ষস্থলে চাপিয়া রাখিয়া পুত্রের সহিত সিঁড়িতে নামিল এবং ঐ সিঁড়ি দিয়া সবেগে তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীষণ কামানধ্বনি ও কৃতান্তসহচর সিপাহিদিগের কলরবমধ্যে অসহায়া রমণী দুইটি সন্তান লইয়া তটদেশ লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুঃখিনী পরিত্রাণ পাইল না। তীরে সিপাহিগণ নিষ্কোশিত অসি হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। ধাত্রী যেই তটদেশে উপনীত হইয়াছে, অমনি তাহাদের একজন দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া ফিরিঙ্গী সন্তানকে ধরিবার জন্য

বাম হস্ত প্রসারণ করিল। স্নেহময়ী নারী নরঘাতকের হস্তে শিশুটিকে সমর্পণ করিল না। নিজের অঙ্গাচ্ছাদন মধ্যে তাহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া বাহুদেশমধ্যে চাপিয়া রাখিল।

নরহন্তা সিপাহি অসি আস্ফালন করিয়া তীব্রভাবে কহিল—"বালকটিকে হাতে দাও, তোমার শরীর অক্ষত থাকিবে।"

তেজস্বিনী নারী গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—"আমি কখনই আমার সন্তানকে তোমার হাতে দিব না, ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া আমাদের উভয়কেই দয়া কর।"

"বালককে সমর্পণ না করিলে দয়ার প্রত্যাশা নাই" সিপাহি সরোষে ইহা কহিয়া পুনর্ব্বার হস্ত প্রসারণ করিল। কিন্তু ধাত্রী দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, ছাড়িয়া দিল না।

ধাত্রীর পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র নিকটে ছিল। সে কাতরস্বরে কহিল—"মা, শিশুটিকে দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর।"

পুত্রের কাতর প্রার্থনায়ও দয়াবতী রমণী আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইল না। নির্ভয়ে অটল সাহসে উত্তর করিল—"না, তাহা কখনই হইবে না।"

এই কথা বলিবামাত্র ঘাতকের উত্তোলিত অসি সবেগে তাহার মস্তকে নিপতিত হইল। দারুণ আঘাতে মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। ধাত্রী অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়িনী হইল, আর তাহার চৈতন্য হইল না। অভাগিনী অবলা পিতৃমাতৃহীন শিশুর জন্য নীরবে ধীরভাবে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

নিষ্ঠুর সিপাহি ফিরিঙ্গী শিশুটিকে বধ করিল। কেবল একমাত্র ধাত্রীর পুত্রের প্রাণ রক্ষা পাইল, সিপাহি তাহার উপর কোনও অত্যাচার করিল না।

এই ঘটনার চারি বৎসর পরে পূর্ব্বোক্ত ধাত্রীর পুত্র অযোধ্যায় উপনীত হয়। জননীর মৃত্যুর কথা উপস্থিত হইলে সে কহিত—"মা আমার কথা শুনিলে প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেন, ফিরিঙ্গী শিশুকে বাঁচাইতে গিয়া উভয়েই হত হইলেন।"

১৮৫৭ অব্দের ৩রা জুলাই রাত্রিতে ১৭ গণিত ভারতীয় পদাতিকসৈন্য গোরক্ষপুরের সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া আজিমগড়ের নিকট উপস্থিত হয়। ইহারা যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া একজন ইঙ্গরেজ আফিসরকে হত্যা করে, আজিমগড়ের জেলের সমুদায় কয়েদীকে খালাস দেয় এবং কালেক্টরী হইতে সমস্ত টাকাকড়ি লইয়া অযোধ্যার অভিমুখে যাইতে থাকে। পথেও ইহারা অনেক স্থান লুণ্ঠন করিতে নিরস্ত হয় নাই। ৪ঠা জুলাই রাত্রি ১১টার সময় কতিপয় ইউরোপীয় পুরুষ ও স্ত্রী ভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, এমন সময়ে উন্মত্ত সিপাহিদিগের আক্রমণবার্ত্তা তাঁহারা শুনিতে পাইলেন। তাঁহাদের আর ভোজন হইল না, তাঁহারা টেবিলের দ্রব্যাদি ফেলিয়া তাড়াতাড়ি পলাইতে লাগিলেন। তিনটী ছোট বস্তায় কতকগুলি কাপড় ছিল, অসময়ে ঐ কাপড়গুলি তাঁহাদের অনেক কাজে লাগিতে পারিত, কিন্তু ব্যস্ত সমস্ত হওয়ায় তাঁহারা ঐ গুলিও লইয়া যাইতে পারিলেন না।

এই সঙ্কটকালে বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা উক্ত পলাতক ইউরোপীয়দিগের উপকারে নিরস্ত থাকে নাই। তাহারা পলাতকদিগের চারিপার্শ্বে থাকিয়া সকলকে নিকটবর্ত্তী একটি পল্লীতে আনয়ন করে। ইউরোপীয়েরা এই খানে তাঁহাদের এক দল খিদ্‌মদ্‌গারের আলয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। এই স্থানে একটি বিস্ময়কর দৃশ্যে তাঁহারা মোহিত হইলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি লইয়া তথায় উপস্থিত হইতেছে। এক কি দুই ঘণ্টার পর তাঁহারা অধিকতর নিরাপদ হইবার জন্য আর একটি গৃহে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য দুই খানি খাটিয়া ও পানের জন্য এক ঘড়া জল দেওয়া হইল। তিন দিন ও দুই রাত্রি বিপন্ন ইউরোপীয়েরা ঐ আশ্রয়স্থানে নিরাপদে অবস্থিতি করেন। বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা এই খানে তাঁহাদিগকে চপাটি দিয়া পরিতৃপ্ত করিতে বিমুখ হয় নাই। তাঁহাদের আবাসগৃহ বিলুণ্ঠিত ও দগ্ধ হইয়াছিল।

গৃহস্থিত দ্রব্যাদি আক্রমণকারীদিগের হস্তগত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরোপকারী ভারতবাসীর দয়া ও সৌজন্যে

তাঁহাদিগের জীবন সংশয়াপন্ন হয় নাই। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহাদিগের নিকট হৃদয়ভেদী দুঃসংবাদ উপস্থিত হইতেছিল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহারা মৃত্যুর বিকট রূপ আগতপ্রায় বলিয়া মনে করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এরূপ বিপদাপন্ন হইলেও দয়ার কোমল ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহারা যে স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই স্থানের অতি নিকটে কতকগুলা বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ ছিল, ঐ ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাবলির নীচে আক্রমণকারীরা একটি টাকার বাক্স লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পলাতকেরা আপনাদের নিকটে ঐ সমস্ত কালান্তক যম দেখিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিলেন। এ সময়ও, দয়াপর ভারতবাসীরা আপনাদিগকে বিপন্ন বোধ করিলেও, ইউরোপীয়দিগের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত বিপন্নদিগের পলায়নের দুই দিন পরে হঠাৎ একদা প্রাতঃকালে জনরব উঠিল যে, পলাতকেরা মৃত্যুমুখে পাতিত হইবে। উপস্থিত জনরবে পলাতকগণ হতজ্ঞান হইয়া পড়েন, কিন্তু এ সময়েও তাঁহাদের জীবনের কোনও অনিষ্ট হয় নাই। একজন হিন্দু অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে আর একটি পল্লীতে আনিয়া রক্ষা করেন। রক্ষাকারীর পরামর্শে ইউরোপীয়গণ আর একটি পল্লীতে উপনীত হন। ইহা একটি রাজপুত-পল্লী, বহুসংখ্যক রাজপুত এই পল্লীতে অবস্থিতি করিতেন। আশ্রিতের প্রাণ রক্ষা করা রাজপুতের চিরন্তন ধর্ম্ম। উপস্থিত সময়ে রাজপুতেরা এই চিরন্তন ধর্ম্ম হইতে অণুমাত্রও বিচ্যুত হন নাই। এই পল্লীর ২০০০ দুই হাজার রাজপুত উন্মত্ত মুসলমানদিগের করাল আক্রমণ হইতে বিপন্ন অসহায় ইউরোপীয়দিগকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইউরোপীয়েরা ১৪ দিন এই খানে অবস্থিতি করেন। যে সকল ঘরে গরু রাখা হইত, ইউরোপীয়েরা সেই সকল ঘরে লুকাইয়া থাকিতেন। অবশেষে তাঁহাদের সমস্ত কষ্টের অবসান হয়। ১৪ দিন পরে বারাণসীর কমিশনর তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য কতকগুলি হস্তী, ২২ জন দেহরক্ষক অশ্বারোহী ও কতিপয় পদাতিক সৈন্য পাঠাইয়া দেন। বিপন্নগণ হাতীতে চড়িয়া ঐ সকল সৈন্যের সহিত নিরাপদ স্থানে উপনীত হন।

দিল্লীতে যখন যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহিদিগের পরাক্রমে ইউরোপীয়দিগের পরা-

জয় হয়, তখন ইউরোপীয়েরা ঘোরতর বিপদাপন্ন হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে থাকেন। এই সঙ্কটকালে ইঁহাদের দুর্গতির একশেষ হয়। ইঁহারা কিরূপে জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, কিরূপে ভগ্ন বাড়ী প্রভৃতি আশ্রয় লইয়াছিলেন, কিরূপে নানা সঙ্কটপূর্ণ স্থলপথ ও জলপথ অতিক্রম করিয়া ছিলেন, খাদ্যবিহীন ও বস্ত্রবিহীন হইয়া কিরূপে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিম মাথায় লইয়াছিলেন, ইঁহাদের কোমলাঙ্গী কুলনারীগণ আপনাদের স্বামিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপ কষ্টে পড়িয়াছিলেন এবং ইঁহাদের কোমলপ্রাণ শিশুসন্তান সকল পিতা মাতা হইতে বিযুক্ত হইয়া কিরূপ যাতনা ভোগ করিয়াছিল, তাহা অনেকে নিদারুণ অনুশোচনার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। পলাতকগণ নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া কেহ কেহ মিরাটে, কেহ কেহ কর্ণালে ও কেহ কেহ বা অম্বালায় যাইয়া উপস্থিত হন। পথিমধ্যে পল্লীবাসিগণ ইঁহাদের সহিত যথোচিত সদয় ব্যবহার করিয়াছিল। পল্লীবাসীদিগের সাহায্য না পাইলে, বোধ হয়, কেহই আপনাদের প্রাণ লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পহুঁছিতে পারিতেন না।

৩৮ গণিত সিপাহিদলের চিকিৎসক উড্ সাহেব আপনার স্ত্রী ও অপর একটি ইউরোপীয় মহিলার (ইনি লেপ্টেন্যাণ্ট পিলি নামক একজন সৈনিক কর্ম্মচারীর স্ত্রী) সহিত ঐ সময়ে পলায়ন করেন। ডাক্তার উডের মুখে গুলির আঘাত লাগিয়াছিল, ঐ আঘাতে তাঁহার চিবুক ভাঙ্গিয়া যায়। ডাক্তার এই অবস্থায় মহিলা দুইটিকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে দিল্লীর কোম্পানির বাগানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাগানের লোকে তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য খাটিয়া দেয় এবং আপনাদের কুটীরে লুকাইয়া রাখে। বাগান রক্ষকগণ তাঁহাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে কোনও রূপ ত্রুটি করে নাই। রাত্রি ৩টার সময় ইঁহারা একটি পল্লীতে উপস্থিত হন। পল্লীবাসিগণ ইঁহাদিগকে খাইবার জন্য দুগ্ধ রুটি ও শুইবার জন্য খাটিয়া দেয়। একজন প্রাচীন হিন্দু এই পল্লীর মোড়ল ছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, বিপন্নগণ তখন খোলা জায়গায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিপাহিরা আসিয়া পাছে ইঁহাদের কোনও অনিষ্ট করে এই আশঙ্কায় গ্রামাধ্যক্ষ ইঁহাদিগকে গোশালায় লুকাইয়া থাকিতে পরামর্শ দেন এবং গোশালা হইতে গরু গুলি বাহির করিয়া লন।

পলাতকেরা ঐ স্থানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবিলম্বে গ্রামের একটি মহিলা আসিয়া ইঁহাদিগকে নীরবে থাকিতে কহে, যেহেতু কয়েকজন সিপাহি তখন গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল।' ইঁহারা প্রথমে ভাবিলেন মহিলাটি বুঝি অনর্থক ভয় দেখাইতেছে, কিন্তু শেষে উক্ত মহিলার কথা ঠিক হইল। ইঁহারা যেখানে লুক্কায়িত ছিলেন, সেই খানেই এক জন সিপাহি আসিয়া দাঁড়াইল। এই সিপাহি আপনাদের দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিবার জন্য গাড়ী ও গরু লইতে আসিয়াছিল। সদাশয় প্রাচীন গ্রামাধ্যক্ষ কালবিলম্ব না করিয়া সিপাহিকে গরু ও গাড়ী দিলেন, সিপাহি অভীষ্ট বিষয় পাইয়া চলিয়া গেল। গ্রামাধ্যক্ষ সিপাহিকে গ্রাম হইতে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দিবার ইচ্ছা করিয়াই, তাহার আবশ্যক গরু ও গাড়ী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি জানিতেন যে সিপাহি গ্রামে কিছুক্ষণ থাকিলে বিপন্ন ইঙ্গরেজদিগের সন্ধান পাইবে। ডাক্তার উড্ ও দুইটি কুলনারী এইরূপে বর্ষীয়ান্ গ্রামাধ্যক্ষের দয়ায় আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। যাইবার সময় গ্রামের লোকে ইঁহাদিগকে আহারের জন্য কয়েক খানি রুটি এবং পানের জন্য পাত্র ভরিয়া জল দিলেন। ইহাঁরা পথ চিনিতেন না, এজন্য গ্রামের একটি যুবক ইহাঁদের সঙ্গে কিছু দূর যাইয়া পথ দেখাইয়া দিয়া আসিল। অনেক বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া রাত্রি ৪ টার সময় ইঁহারা আর একটি গ্রামে আসিয়া পহুঁছিলেন এবং গ্রামের প্রান্তভাগস্থিত একটি বৃক্ষের তলায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাত্রি শেষ হইল। প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ আপনাদের কার্য্যে যাইতে লাগিল। ইহা একটি হিন্দু পল্লী। একজন প্রাচীন হিন্দু পলাতকগণকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া আপনাদের গ্রামে লইয়া আইসেন এবং দুগ্ধ ও রুটি দিয়া ইঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করেন। ডাক্তারের আহত স্থান পরিষ্কার করিবার জন্য এই দয়াপর আশ্রয়দাতা জল গরম করিয়া আনিয়া দিতেও ত্রুটি করেন নাই। নিকটবর্ত্তী আর একটি পল্লীতে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি, বিপন্ন ইঙ্গরেজ ও ইঙ্গরেজ মহিলারা গ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া, স্বগ্রামের অনেকগুলি লোক লইয়া ইঁহাদিগকে দেখিতে আইসেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গুলির আঘাতে ডাক্তার উডের মুখের নিম্নভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; এজন্য ডাক্তার

দুগ্ধ পান করিতে পারিতেন না। উক্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া ডাক্তারকে কাঠের নল দ্বারা দুগ্ধ টানিয়া পান করিতে কহেন এবং এই জন্য নিজে একটি কাঠের নল প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দেন। দয়ালু ব্রাহ্মণের সৎপরামর্শে ডাক্তার উডের অনেক উপকার হয়। ডাক্তার উড্ নলদ্বারা দুগ্ধ পান করিয়া অনেক সুস্থ হন। বিপন্ন ইঙ্গরেজ ও ইঙ্গরেজ মহিলারা এই রূপে প্রাচীন পল্লীবাসীর আশ্রয়ে সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন। শেষে আশ্রয়দাতার আশঙ্কা বাড়িয়া উঠে। ইঙ্গরেজেরা তাহাদিগের গ্রামে লুক্কায়িত রহিয়াছে ইহা জানিতে পারিলেই, দিল্লীর সিপাহিরা তাড়াতাড়ি আসিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে, এই জন্য উক্ত প্রাচীন ব্যক্তি ডাক্তার উড্ প্রভৃতিকে স্থানান্তরে যাইতে কহেন। আশ্রিত ইঙ্গরেজেরা অধিকতর বিপন্ন হন, ইহা উক্ত আশ্রয়দাতার অভিপ্রেত ছিল না। আশ্রয়দাতা উন্মত্ত সিপাহিদিগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশেই আশ্রিত দিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে যাইতে কহিয়াছিলেন। এই সময় প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে চতুর্দ্দিক দগ্ধ হইতেছিল, উত্তপ্ত বায়ু প্রবল বেগে বহিতেছিল; সুতরাং ইঙ্গরেজ মহিলাদ্বয় আহত ডাক্তারকে লইয়া অন্যত্র যাইতে সাহসী হইলেন না। এই বিপত্তিকালে গ্রামের আর এক ব্যক্তি ইহাঁদিগকে একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া আইসে এবং দুইটি বিছানা আনিয়া দিয়া ইঁহাদিগকে ঘুমাইতে কহে। নিদারুণ গ্রীষ্মকালে যখন প্রচণ্ড সূর্য্য অনলকণা বিকীর্ণ করিতেছিল, তখন বিপত্তিগ্রস্ত পলাতকগণ দরিদ্র পল্লীবাসীর অসীম করুণায় ও অনুগ্রহে আশ্রয় পাইয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতে থাকেন। ক্রমে বেলা শেষ হইল। রাত্রি সমাগত হইয়া দিবসের প্রচণ্ড উত্তাপ অল্পতর করিয়া তুলিল। ডাক্তার উড্ ও দুইটি কুলনারী আপনাদিগের আশ্রয় স্থান হইতে বাহির হইয়া পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচ দিন হইল, ইঁহারা দিল্লী হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তথাপি দশ মাইলের অধিক আসিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পরদিন বেলা ২ টার সময় ইঁহারা আর একটি পল্লীগ্রামে উপস্থিত হন। এই গ্রামের অধিবাসিগণ ইঁহাদিগের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করে। উপস্থিত সময়ে বিপন্নদিগের প্রতি যত-দূর-সম্ভব দয়া ও অনুগ্রহ দেখাইতে ইহারা কাতর হয় নাই। পলায়িতেরা যাহা প্রার্থনা করেন, পল্লীর মহিলারা অবি-

কারচিত্তে ও সরলভাবে তাহাই আনিয়া দেয়। ইহাদের প্রদত্ত শীতল জলে পলায়িতদিগের তৃষ্ণা শান্তি হয়। ডাক্তারের মুখ ধৌত করার জন্য ইঙ্গরেজ কুলনারীগণ একটি পাত্র চাহেন, পল্লীবাসিনীরা সন্তুষ্টচিত্তে তাহা আনিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত তাহারা ইঁহাদের আহারের জন্য নানাবিধ শাক শবজীতে ভাল তরকারি রাঁধিয়া আনে। ইঙ্গরেজমহিলাদ্বয়ের একটি কহিয়াছেন যে, দিল্লী পরিত্যাগ করা অবধি এরূপ সুস্বাদু দ্রব্য আর তাঁহারা কখনও আহার করেন নাই। পল্লীবাসিনীগণ এই রূপে বিপন্নদিগকে আহার ও পানীয় দিয়া সন্তৃপ্ত করে। পলাতকগণ পরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বলগড় নামক আর এক খানি গ্রামে উপনীত হন। রাজপুতবংশীয়া একটি রাণী এইস্থানে কর্তৃত্ব করিতেন। বলগড়ের রাণী বিপন্নদিগের কষ্ট দেখিয়া তাহাদিগকে আপনার গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিলেন। তাঁহার আদেশে বিপন্নদিগের আহারের জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইল। ডাক্তার উড্ ও তাঁহার সঙ্গিনী মহিলাদ্বয় রাণীর এইরূপ অনুগ্রহে আহার পানে পরিতুষ্ট হইয়া সে রাত্রি সেইখানে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন মেজর পটর্সন নামক একজন সৈনিকপুরুষ অতর্কিত ভাবে বলগড়ে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে লেপ্টেনেণ্ট পিলিও আর একদিক হইতে সেই স্থানে পহুঁ-ছিলেন। পিলি আপনার সহধর্ম্মিণীকে অক্ষতশরীর দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্য-বাদ দিলেন। সকলে এখন আশান্বিত হৃদয়ে বলগড় হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে ডাক্তার উড়ের চলিবার শক্তি ছিল না। গুরুতর আঘাতে ডাক্তার উড্ বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে পথের কয়েক জন দরিদ্র মজুর আপনাদের সদাশয়তা ও দয়ার এক শেষ দেখায়। ইহারা চলৎশক্তিহীন ইঙ্গরেজ চিকিৎসককে বহন করিয়া এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে লইয়া যায়। দরিদ্র নিরক্ষর লোকেও পথে বিপন্নদিগের দুর্গতি দেখিয়া সাহায্যদানে বিমুখ হয় নাই। এইরূপ সাহায্য করিলে যে উন্মত্ত সিপাহিদিগের কোপে পতিত হইতে হইবে তাহা ইহারা জানিত, তথাপি ইহাদের করুণা ইহাদের সমবেদনা এবং ইহাদের উপকারের ইচ্ছা কিছুতেই অন্তর্হিত হয় নাই। ইঙ্গরেজেরা আপনাদের কুলনারীদিগকে লইয়া এই রূপে দরিদ্র গ্রামবাসীদের অসীম

দয়ায় নিরাপদে ও অক্ষত শরীরে কর্ণালের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাতিয়ালার মহারাজ ইহাঁদের দুর্গতির সংবাদ পাইয়া সাহায্যার্থ ৪০ জন সুসজ্জিত অশ্বারোহী পাঠাইয়া দেন। এই অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষেরা ১৮৫৭ অব্দের ২০শে মে বিপন্নদিগকে কর্ণালে পহুঁছাইয়া দেয়।

উপস্থিত সময়ে, দিল্লীর বৃদ্ধ বাদশাহ বাহাদুর শাহের পত্নী পরমসুন্দরী জেন্নত মহলের উপর ইঙ্গরেজগণ বড় বিরক্ত ছিলেন। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নানা রূপে অসন্তুষ্ট করিতেও ত্রুটি করেন নাই। দিল্লীর গোলযোগের সময় জেন্নত মহল প্রায় ৫০ জন ইউরোপীয়কে লুকাইয়া রাখেন। তিনি লুক্কায়িত ইউরোপীয়দিগের প্রাণরক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। যতক্ষণ তাঁহার ক্ষমতা ছিল, ততক্ষণ বিপন্নগণ আশ্রয়দাত্রী জেন্নত মহলের করুণায় নিরাপদ থাকেন। ইঙ্গরেজের বিচারে শেষে এই জেন্নত মহলকে বৃদ্ধ বাহাদুরের সহিত রেঙ্গুণে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল।

এই সময়ে দিল্লী হইতে যাঁহারা পলায়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে ৭৪ গণিত সিপাহিদলের ডাক্তার ওয়াট্‌সন নামক একজন ইঙ্গরেজ চিকিৎসক ছিলেন। হিন্দুস্থানী ভাষায় ডাক্তারের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। একজন সন্ন্যাসী ডাক্তারের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া তাঁহাকে দাদুপন্থী যোগীর বেশে সজ্জিত করেন। উক্ত যোগী তাঁহার কাপড় রং করিয়া দেন এবং তাঁহার গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা সমর্পণ করেন। দয়াশীল সন্ন্যাসী বিপন্ন ডাক্তারের জীবন রক্ষার জন্যই তাঁহাকে এইরূপ ভিন্নবেশ পরিগ্রহ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ডাক্তার এইরূপ সন্ন্যাসীর বেশে ২৫ দিন এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ান। কখনও বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে, কখনও বা লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদা কয়েকজন হিন্দু সন্ন্যাসী বেশধারী ওয়াট্‌সনকে দেখিয়া কহেন—"আপনি কখনও সন্ন্যাসী নহেন, আপনার কটা চক্ষুই আপনাকে ভিন্ন জাতি বলিয়া পরিচিত করিতেছে। আপনি নিশ্চিতই ফিরিঙ্গি।" কিন্তু এই সকল হিন্দু, ডাক্তারকে ইঙ্গরেজ বলিয়া চিনিতে পারিলেও, তাঁহার সহিত কোনও রূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই।

আর একটি প্রাচীন লোক একটি অসহায়া ইঙ্গরেজ মহিলা ও তাঁহার

সন্তানকে অনেক দিন রক্ষা করে। আশ্রয়দাতা ইহাঁদিগকে, সিপাহিদিগের ভয়ে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে লইয়া যায় এবং অপরের অগোচরে গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখে। ইহাদের আশ্রয় স্থান যখনই উন্মত্ত লোকের সন্দেহের বিষয় হইয়াছে, তখনই বৃদ্ধ আশ্রয়দাতা ইহাঁদিগকে সে স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়াছে। মিরাটের কমিশনর গ্রিথেড্ সাহেব এই সময়ে লিখিয়াছিলেন—"দিল্লী হইতে যাঁহারা পলাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, অনেক লোকে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, এবং তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখাইয়াছে। একজন সন্ন্যাসী যমুনায় একটি ইউরোপীয় শিশু সন্তান পাইয়া এখানে লইয়া আইসে। তাহাকে পরিতোষিক দিতে চাহিলে সে উহা লইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কহে যে, যদি কোনও পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যেন তাহার এই কার্য্যের জন্য তাহার নামে একটী কূপ খনন করিয়া দেওয়া হয়। আমি তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হই।"

পলাতকদিগের মধ্যে কাপ্তেন হল্যাণ্ড নামক এক জন সৈনিক পুরুষ কহিয়াছেন—"আমি যে গ্রামে উপস্থিত হই, সে গ্রামে দুধ না পাওয়াতে পণ্টু নামক একজন ঝাড়ুদার ও তাহার পরিবারের কয়েক ব্যক্তি প্রত্যহ নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে দুধ আনিয়া দিত।" ইহার পর তিনি লিখিয়াছেন "আমি যমুনাদাস নামক একজন ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে ৬ দিন থাকি। বাড়ীর যে ঘরটী সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, ব্রাহ্মণ তাহাই আমার বাসের জন্য ছাড়িয়া দেন এবং তিনি যত ভাল খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহাই দিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করেন।"

এক জন ইঙ্গরেজ ডেপুটি কালেক্টরের স্ত্রী যখন দিল্লী হইতে পলায়ন করেন, তখন দুইজন বিশ্বস্ত চাপরাসি তাঁহার বিশেষ সহায়তা করে। ইহাদের একজন দিল্লীর আজমীরতোরণ অতিক্রম সময়ে উত্তেজিত লোকের হাতে পড়িয়া নিহত হয়, অপর জন ডেপুটি কালেক্টরের স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইয়া তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া আইসে।

যে সকল ইঙ্গরেজ মিরটের পরিবর্ত্তে অম্বালার অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে কর্ণালের নবাবের সদাশয়তায় বিশেষ

উপকৃত হন। দিল্লীর জজ্ বস্ সাহেব কর্ণালে আসিলে নবাব তাঁহাকে কহেন—"উপস্থিত গোলযোগের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় নাই। এখন আমি আপনাদিগের পক্ষ সমর্থনে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছি। আমার তরবারি, আমার সম্পত্তি এবং আমার অনুচরবর্গ এখন সমস্তই আপনাদের জন্য অর্পিত হইতেছে।" নবাব কেবল এই কথা বলিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই। ইঙ্গরেজদিগের সাহায্যের জন্য তিনি পঞ্জাবী পুলিস সৈন্যের অনুকরণে ১০০শত অশ্বারোহী সেনা প্রস্তুত করেন। দিল্লীর গোলযোগের সময়ে এইরূপে অনেকেই ইঙ্গরেজের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। অনেকেই অনুকম্পা ও অনুগ্রহ দেখাইয়া বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। দরিদ্র পল্লীবাসী হইতে সম্ভ্রান্ত ধনী সম্প্রদায়, নিম্ন শ্রেণীর নিরক্ষর লোক হইতে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ—সংক্ষেপে প্রধান প্রধান ভূস্বামী হইতে সামান্য ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই বিপন্ন ইঙ্গরেজদিগের উদ্ধার সাধনে উদ্যত হইয়াছিল। ইহারা আপনাদের সম্পত্তি, আপনাদের আবাসপল্লী, অধিক কি আপনাদের জীবন পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করিয়াও নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, বিপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কাতর হয় নাই। এই ভয়ঙ্কর সময়ে এইরূপ দয়া ও এইরূপ সদাশয়তা প্রদর্শিত না হইলে, নিরুপায় নিরাশ্রয় ইঙ্গরেজগণ কখনও নিরাপদ স্থানে উপনীত হইতে পারিতেন না। যখন ইঙ্গরেজেরা কোমলমতি শিশুসন্তান ও কোমলাঙ্গী মহিলাগণকে লইয়া ইতস্তত পলায়ন করেন, কেহ কেহ আহত হইয়া রুধিরাক্ত শরীরে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হন, আপনাদের গাড়ী পাল্‌কী সমস্তই ফেলিয়া কখনও বিজন জঙ্গলে, কখনও সঙ্কীর্ণ লোকালয়ে, কখনও বা অপরিষ্কৃত গহ্বরে আত্মগোপন করেন, এবং প্রাণের দায়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া নিম্নতর হইতে নিম্নতম শ্রেণীর লোকের নিকটে কাতরভাবে করুণা প্রার্থনা করেন, তখন ঐ সকল সদাশয় ভূস্বামী এবং ঐ সকল উচ্চশ্রেণীর দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর লোক ইহাঁদিগকে আশ্রয় না দিলে, ইঁহারা নিঃসন্দেহ দুর্গম পথপ্রান্তে বা নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। (ক্রমশঃ।)

কালিদাসের উপমা।

গিরিপত্নী মেনা সৌন্দর্য্যশালিনী কন্যার সংযোগে সাতিশয় শোভাময়ী হইলেন।

তয়া দুহিত্রা সুতরাং সবিত্রী
স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলয়া চকাশে।
বিদূরভূমির্নবমেঘশব্দা
দুদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব ॥

স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলবিশিষ্টা সেই দুহিতা কর্ত্তৃক জনয়িত্রী (মেনা) নবমেঘ-শব্দে বিকাশপ্রাপ্তা, রত্নশলাকা কর্ত্তৃক শোভিতা পর্ব্বতের প্রান্তভূমির ন্যায় অতিশয় শোভিতা হইলেন।

কন্যাটী দিন দিন বাড়িতে লাগিল—

দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা
লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্
জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি ॥

উদিতা এবং পরিবর্দ্ধমানা চন্দ্রলেখা যেমন জ্যোৎস্নায় অন্তর্দ্ধানশীল কান্তি-মান কলাসমূহে দিন দিন পুষ্ট হইতে থাকে সেই রূপ উৎপন্না এবং পরিবর্দ্ধন-শীলা সেই বালা কান্তিবিশিষ্ট অবয়বসমূহে পুষ্ট হইতে লাগিল।

কন্যাটীর উপর গিরিরাজের বড়ই মায়া জন্মিল।

মহীভৃতঃ পুত্রবতোপি দৃষ্টি
স্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্।
অনন্তপুষ্পস্য মধোর্হিচুতে
দ্বিরেফমালা সবিশেষসঙ্গা ॥

অনেক পুত্র কন্যা থাকিলেও হিমাদ্রির চক্ষু সেই অপত্যে (উমায়) তৃপ্তিলাভ করিত না, (উমাকে দেখিয়া আশ মিটিত না)। বসন্তে নানা-বিধ কুসুম সত্বেও ভ্রমরশ্রেণী চুতকুসুমেই বিশেষ রূপে সঙ্গত হয়।

প্রভামহত্যা শিখয়েব দীপ
স্ত্রিমার্গয়েব ত্রিদিবস্য মার্গঃ।
সংস্কারবত্যেব গিরা মনীষী
তয়া স পূতশ্চ বিভূষিতশ্চ ॥

মহতী প্রভাযুক্ত শিখা কর্ত্তৃক দীপের ন্যায়, ত্রিপথগা মন্দাকিনী কর্ত্তৃক স্বর্গের পথের ন্যায়, বিশুদ্ধ বচন কর্ত্তৃক বিদ্বানের ন্যায় সেই কন্যা কর্ত্তৃক হিমালয় পবিত্র এবং বিভূষিতও হইয়াছিলেন।

অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখপ্রভাভি-
র্নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্গিরন্তৌ।
আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাম্
স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্।

পার্ব্বতীর চরণদ্বয় সম্পূর্ণরূপে ভূমিতে সংন্যস্ত হওয়ায় অভ্যুন্নত অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের নখপ্রভাচ্ছলে উহাদের অন্তর্নিহিত চিরলৌহিত্য বাহিরে নিঃসরণ করিতে করিতেই যেন পৃথিবীতে সঞ্চারিণী স্থলকমলিনীর শোভা আহরণ করিত।

সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী
গতেষু লীলাঞ্চিতবিক্রমেষু।
ব্যনীয়ত প্রত্যুপদেশলুব্ধৈ-
রাদিৎসুভির্নূপুরশিঞ্জিতানি ॥

সেই সন্নতাঙ্গী উমা বোধ হয় নূপুরশিঞ্জিত শিক্ষার জন্য প্রত্যুপদেশপ্রার্থী রাজহংসগণের নিকট বিলাস বিশিষ্ট পাদবিন্যাসযুক্ত গমন শিক্ষা করিয়াছিলেন।

স্বরেণ তস্যামমৃতস্রুতেব
প্রজল্পিতায়ামভিজাতবাচি।
অপ্যন্যপুষ্টা প্রতিকূলশব্দা
শ্রোতুর্বিতন্ত্রীরিব তাড্যমানা ॥

সেই মধুরভাষিণী উমা যখন অমৃতস্রাবী স্বরে কথা কহিতেন, তখন কোকিলার শব্দও বেসুরা বীণার মত লোকের শ্রুতিকঠোর বোধ হইত।

সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন
যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্না-
দেকস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব ॥

এক স্থানে সমস্ত সৌন্দর্য্য দেখাইবার অভিপ্রায়েই যেন বিধাতা যথাক্রম স্থাপিত সমস্ত উপমাদ্রব্যের সমষ্টির দ্বারা উমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তারকাসুর পীড়িত দেবগণ ব্রহ্মার নিকট দুঃখ করিতেছেন—

তস্মিন্নুপায়াঃ সর্ব্বে নঃ ক্রূরে প্রতিহত ক্রিয়াঃ।
বীর্য্যবন্তোষধানীব বিকারে সান্নিপাতিকে ॥

সান্নিপাতিক বিকারে বীর্য্যবান ঔষধ সমূহের ন্যায় সেই ক্রূর অসুর সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত উপায়ের বিফল প্রয়োগ হইতেছে।

ব্রহ্মা বলিলেন—

ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রীর্নৈত এবার্হতি ক্ষয়ম্।
বিষবৃক্ষোহপি সম্বর্দ্ধ্য স্বয়ং চ্ছেত্তুমসাম্প্রতম্ ॥

আমা হইতেই সেই দৈত্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, অতএব আবার আমা হইতেই সে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সম্যক রূপে বর্দ্ধিত করিয়া বিষবৃক্ষকেও স্বয়ং ছেদন করা যায় না।

উমারূপেণ তে যূয়ং সংযমস্তিমিতং মনঃ।
শম্ভোর্যতধ্বমাক্রষ্টুময়স্কান্তেন লৌহবৎ ॥

সেই (কার্য্যার্থী) তোমরা অয়স্কান্ত মণির দ্বারা লৌহের ন্যায় উমার সৌন্দর্য্যের দ্বারা মহাদেবের সমাধিনিশ্চল মনকে আকর্ষণ করিতে যত্নবান হও।

এই কঠিন কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য দেবরাজ মদনকে স্মরণ করিলেন—

অথ স ললিতযোষিদ্ভ্রূলতাচারুশৃঙ্গম্
রতিবলয়পদাঙ্কে চাপমাসজ্য কণ্ঠে।
সহচরমধুহস্তন্যস্তচূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ
শতমখমুপতস্থে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা ॥

অনন্তর মদন রতির কঙ্কণচিহ্নযুক্ত স্বীয় কণ্ঠে সুন্দরী রমণীগণের ভ্রূলতার সদৃশ মনোহর শৃঙ্গবিশিষ্ট ধনু আরোপিত করিয়া, সহচর বসন্তের হস্তে চূতাঙ্কুরাস্ত্র স্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইন্দ্রের নিকট আগমন করিল।

ইন্দ্র মদনকে বলিলেন, উৎকট শত্রুপীড়িত দেবগণ মহাদেব হইতে একজন সেনাপতির উৎপত্তি প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু সেই সংযমিশ্রেষ্ঠ শম্ভূ এখন হিমালয়ে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত। তাঁহাকে সমাধি হইতে বিচ্যুত করিতে হইবে। তোমার পুষ্পধনু একা এ কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিবে না। নগেন্দ্র-কন্যা পার্ব্বতীর সৌন্দর্য্যকে সহায় করিয়া এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। সুকেশী উমা পিতার আদেশক্রমে নিত্যই তপস্বী গিরিশের শুশ্রূষা করিতে আইসে—আমার গুপ্তচর অপ্সরাগণের মুখে শুনিয়াছে।

তদ্গচ্ছ সিদ্ধৈ কুরু দেবকার্য্য
মর্থোঽয়মর্থান্তরভাব্য এব।
আপেক্ষ্যতে প্রত্যয়মুত্তমং ত্বাম্
বীজাঙ্কুরঃ প্রাগুদয়াদিবাম্ভঃ॥

অতএব কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত গমন কর। দেবতাদের কার্য্য কর। এই কার্য্য কারণান্তরসাপেক্ষ; তথাপি বীজসাধ্য অঙ্কুর তাহার উৎপত্তির পূর্ব্বে বারির ন্যায়, চরমকারণস্বরূপ তোমার অপেক্ষা করিতেছে।

মধুশ্চ তে মন্মথ সাহচর্য্যা-
দসাবনুক্তোঽপি সহায় এব।
সমীরণশ্চোদয়িতা ভবেতি
ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য॥

হে মন্মথ! বসন্ত তোমার সহচর; অতএব অনুরোধ না করিলেও সে তোমার সহায় হইবে। হুতাশনের সাহায্য করিতে সমীরণকে কে আদেশ করে বল?

হিমালয়ে আসিয়া মদন তপশ্চারী মহাদেবকে দেখিল—

পর্য্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্ব্বকায়-
মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংশম্।

উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ
প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥

বীরাসনবন্ধ প্রযুক্ত তাঁহার শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ নিশ্চল; তিনি ঋজু এবং আয়ত; তাঁহার অংশদ্বয় সন্নমিত। ঊর্দ্ধতল পাণিদ্বয়ের সংস্থান হইতে যেন অঙ্কমধ্যে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে।

সেই সংযমিশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া কামের শর এবং শরাসন হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময়ে উমা সেই খানে উপস্থিত হইলেন।

নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্য্যম্
সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন।
অনুপ্রযাতা বনদেবতাভ্যা
মদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা ॥

মদনের নষ্টপ্রায় বীর্য্যকে শরীরের সৌন্দর্য্যের দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিতে করিতেই যেন, সখীভূতা বনদেবতাদ্বয় কর্ত্তৃক অনুযাতা পর্ব্বতরাজদুহিতা পার্ব্বতী দেখা দিলেন।

অশোকনির্ভৎসিতপদ্মরাগ-
মাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারম্
বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী ॥

উমা বসন্তপুষ্পের আভরণধারিণী—অশোক কুসুম পদ্মরাগের শোভাকে তিরস্কার করিতেছে, কর্ণিকারপুষ্প স্বর্ণাভরণের বর্ণ আহরণ করিতেছে, এবং সিন্ধুবারকুসুমসমূহ মুক্তাকলাপের স্থান অধিকার করিয়াছে।

কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য
পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।
উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ
শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ ॥

কামও বাণসন্ধানের অবসর বুঝিয়া, হুতাশনে প্রবেশেচ্ছু পতঙ্গের ন্যায় উমার সমক্ষে হরে বদ্ধলক্ষ্য হইয়া শরাসনের মৌর্ব্বী বারম্বার আমর্শন করিতে লাগিল।

বসন্তকে দেখিয়া রতির মদনবিয়োগদুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

তমবেক্ষ্য রুরোদ সা ভৃশম্‌

স্তনসম্বাধমুরো জঘান চ।

স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো

বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে॥

মধুকে দেখিয়া রতি অতিশয় কাঁদিতে লাগিল এবং স্তনদ্বয় পীড়িত করিয়া স্বীয় বক্ষস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। আত্মীয় জনের নিকট দুঃখ যেন মুক্তদ্বার হইয়া উঠে।

মদন পুনর্জ্জীবিত হইবে, অতএব শরীর রক্ষা করিতে মরণনিশ্চয়া রতির প্রতি আকাশবাণী হইল।

তদিদং পরিরক্ষ শোভনে

ভবিতব্যপ্রিয়সঙ্গমংবপুঃ।

রবিপীতজলা তপাত্যয়ে

পুনরোঘেন হি যুজ্যতে নদী॥

অতএব হে সুন্দরি,—এই শরীর রক্ষা কর, ইহার প্রিয়সঙ্গম পুনর্ব্বার ঘটিবে। রবি কর্ত্তৃক একবার জল পীত হইলে নদী পুনরায় বর্ষাকালে প্রবাহের সহিত যুক্ত হয়।

অথ মদনবধূরুপপ্লবান্তম্‌

ব্যসনকৃশা পরিপালয়াম্বভূব।

শশিন ইব দিবাতনস্য লেখা

কিরণপরিক্ষয়ধূসরা প্রদোষম্‌।

অনন্তর রজনীর আশায় কিরণক্ষয়মলিনা দিবসভবা চন্দ্রলেখার ন্যায় দুঃখক্লিষ্টা রতি বিপদের অবসান প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মেনা অনেক বুঝাইয়াও উমাকে তপস্যার ইচ্ছা হইতে বিরত করিতে পারিলেন না।

ইতি ধ্রুবেচ্ছামনুশাসতী সুতাম্‌

শশাক মেনা ন নিয়ন্তুমুদ্যমাৎ।

ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ংমনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥

এইরূপ নানা উপদেশ দিয়াও মেনা স্থিরপ্রতিজ্ঞা তনয়াকে তাহার উদ্যম হইতে নিবারিত করিতে পারিলেন না। ইষ্ট বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় মনকে এবং নিম্নমুখাভিগামী পয়ঃপ্রবাহকে কে প্রতিবর্ত্তিত করিতে পারে?

পুনর্গ্রহীতুং নিয়মস্থয়া তয়া
দ্বয়েঽপি নিক্ষেপ ইবার্পিতং দ্বয়ম্।
লতাসু তন্বীষু বিলাসচেষ্টিতম্
বিলোলদৃষ্টং হরিণাঙ্গনাসু চ ॥

ব্রতচারিণী উমা ব্রতাবসানে গ্রহণ করিবার মানসে দুইটী বস্তু দুইটী স্থানে এখন রাখিয়া দিয়াছেন—লতাসমূহে বিলাসবিভ্রম এবং হরিণীগণের নয়নে বিলোল দৃষ্টি।

এইরূপ রঘুতে—

ফলমন্থভৃতাসু ভাষিতম্
কলহংসীষু মদালসং গতম্।
পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতম্
পবনাধূতলতাসু বিভ্রমাঃ ॥

কোকিলায় মধুর বাক্য, কলহংসীতে মন্থর গমন, হরিণীতে বিলোলদৃষ্টি এবং অনিলকর্ত্তৃক ঈষৎ কম্পিত লতায় বিলাস।

মেঘদূতে—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥

প্রিয়ঙ্গু লতায় তোমার অঙ্গসাদৃশ্য, চকিত হরিণীর নয়নে তোমার বিলোল-দৃষ্টি, চন্দ্রে তোমার বদনচ্ছায়া, শিখিগণের পুচ্ছভারে তোমার কেশানুকৃতি এবং স্বল্পবিক্ষোভিত নদীর তরঙ্গে তোমার ভ্রূবিলাসভঙ্গী আছে মনে করিয়া দেখি; কিন্তু দুঃখের বিষয় একটী বস্তুতেও তোমার সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ক্লমং যযৌ কন্দুকলীলয়াপি যা
তয়া মুনীনাং চরিতং ব্যগাহ্যত।
ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনির্ম্মিতম্
মৃদু প্রকৃত্যা চ সসারমেব চ॥

কন্দুকক্রীড়তেও যে উমার ক্লান্তি বোধ হইত, সেই উমা এখন মুনিগণের কঠোর তপ আরম্ভ করিলেন। নিশ্চিত বোধ হয়, তাঁহার শরীর, সুবর্ণকমল গঠিত—কমলের ন্যায় সুকুমার, অথচ স্বর্ণের ন্যায় সারবান।

মুখেন সা পদ্মসুগন্ধিনা নিশি
প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা।
তুষারবৃষ্টিক্ষতপদ্মসম্পদাম্
সরোজসন্ধানমিবাকরোদপাম্॥

শীত কালের রাত্রে কমলসুরভি ও কম্পমান অধরপত্রশোভী মুখের দ্বারা উপলক্ষিতা সেই উমা তুহিনবর্ষণে নষ্টপদ্ম জলাশয়ের সরোজসমষ্টি বলিয়া অনুমিতা হইতেন।

তুষারপাতে জলাশয়ের অন্যান্য সমস্ত পদ্ম ক্ষত বিক্ষত ছিন্ন ভিন্নহইয়া যাইত। উমার মুখপদ্ম সচ্ছন্দে তুষারবর্ষণ সহ্য করিত—অধরপত্র কম্পিত হইত মাত্র।

অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্ভবাক্
জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনম্
শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা॥

অনন্তর মৃগচর্ম্ম ও পলাশদণ্ডধারী, ব্রহ্মময় তেজে জাজ্বল্যমান এবং মূর্ত্তিমান ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ন্যায় একজন জটাবান ব্রহ্মচারী উমার তপোবনে প্রবেশ করিলেন।

শান্তি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আরও এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কার্ত্তিক মাস, বেলা সার্দ্ধদ্বিপ্রহর। হালিসহরে রাধানাথ বাবুর রাজপ্রাসাদসদৃশ সুবিস্তৃত ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে রমাপতি একাকী উপবিষ্ট। প্রকোষ্ঠ সুসজ্জিত। তলে সুন্দর গালিচা বিস্তৃত, তদুপরি সাটিনাবৃত নানাবিধ কৌচ ও চেয়ার এবং মর্ম্মর প্রস্তর ও কাষ্ঠনির্ম্মিত টেবিল, আলমায়রা ইত্যাদি। আলমায়রা সকল স্বর্ণবর্ণাবরণাবৃত গ্রন্থভারে প্রপীড়িত; যেন রত্ন ব্যবসায়ীর বিপণি। ভিত্তি গাত্রে মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহের সুরঞ্জিত চিত্রাবলী। এই বহ্বায়ত প্রকোষ্ঠ ভবনের যে ভাগে সংস্থিত, ইচ্ছা করিলে বা আবশ্যক হইলে, পুরমহিলারাও, অপর লোকের অলক্ষিত ভাবে, তাহাতে যাতায়াত করিতে পারেন। এই প্রকোষ্ঠ রমাপতি বাবুর পঠনালয়।

প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ একতম কৌচে রমাপতি বাবু অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় উপবিষ্ট। তাঁহার হস্তে একখানি স্বর্ণসীমাবদ্ধ ফটোগ্রাফ। সেই চিত্র এক নারীমূর্ত্তির প্রতিকৃতি। রমাপতি এক একবার সেই আলেখ্য দর্শন করিতেছেন, আবার তাহা নয়ন হইতে অন্তরিত করিতেছেন। কাহার এ চিত্র? কোন্ নারীর প্রতিকৃতি আজি রমাপতির নয়ন মন আকর্ষণ করিয়া বিরাজ করিতেছে? অবশ্যই সুকুমারীর। যে সুকুমারীর জন্য রমাপতি আত্ম জীবন অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান করেন; যে সুকুমারীর কল্যাণার্থ রমাপতি ঘোর বিপদকেও বিপদ বলিয়া মনে করেন না; যে সুকুমারীর অভাবে রমাপতি মৃতকল্প হইয়া দুঃসহ যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন এবং যে সুকুমারীকে রমাপতি দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন; রমাপতির হস্তে অধুনা যে নারীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে তাহা সেই সুকুমারীর প্রতিকৃতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু হায়! কি বলিয়া বলিব? কেমন করিয়া মানবমনের এতাদৃশ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের কথা বুঝাইব? মানব হৃদয়ের এরূপ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের কথা কেই বা সহজে বিশ্বাস করিবে? রমাপতির হস্তে সুকুমারীর

ফটোগ্রাফ নহে। সুকুমারী সর্ব্ব সমক্ষে বিপুল নীররাশির মধ্যে সমাহিত হইয়াছেন। তিনি যে সময়ে রমাপতির হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন, রমাপতির তদানীন্তন অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ ব্যয়সাধ্য বিলাস তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে এ চিত্র কাহার? তাহাও কি ছাই আমার না বলিলে চলিবে না? এ চিত্র—এ চিত্র সুন্দরী-শিরোমণি, রাধানাথ-তনয়া সুরবালার প্রতিকৃতি।

সুকুমারি, আজ তুমি কোথায়? আইস, যদি সম্ভব হয় তোমার সেই সলিল-সমাধি হইতে সমুত্থিত হইয়া আজি একবার আইস। দেখ তোমার যিনি গুরুর গুরু, তোমার যিনি দেবতা, তিনি আজি তোমার কে? আর দেখ যিনি তোমার মর্ম্মভেদী অনুরোধেও তোমাছাড়া হইয়া জীবনের অন্য পত্নি পরিগ্রহ করিতে সম্মত হন নাই, সেই তিনি আজি বিরলে বসিয়া আর এক সুন্দরীর প্রতিকৃতি পর্য্যালোচনা করিতেছেন। ধন্য কাল! ধন্য তোমার সর্ব্বস্মৃতিবিলোপকারী মহৌষধ!

রমাপতি চিত্র দেখিতেছেন ও আবার তাহা নয়নসম্মুখ হইতে অপসারিত করিতেছেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও কাতর। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। চিত্র সেই কৌচেই পড়িয়া রহিল। নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে সেই গৃহমধ্যে দুই তিনবার পরিভ্রমণ করিয়া তিনি আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইলেন এবং সেই চিত্র আবার হস্তে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার মনে, না জানি, তখন কি প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল। মনের ভাব মনে মনে পোষণ করা যেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি তখন অতি অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"সুরবালা, এ দুরাশা আমার হৃদয়ে কেন স্থান পাইল? আমি অভাগা, আমি দীনহীন। আমার হৃদয় কখনই তোমার উপযুক্ত আসন নহে। তাহা জানিয়াও কেন আমি এ দুরাশায় ঝাঁপ দিয়াছি? কেন আমি অন্তরে ও বাহিরে কেবল তোমাকেই দেখিতেছি?"

সেই চিত্র হস্তে করিয়াই রমাপতি একবার সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে পরিক্রমণ করিয়া আসিলেন। আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"কিন্তু না। তোমাকে পাওয়া যদি আমার পক্ষে কখন সম্ভব হয়, তাহা হইলেও আমি তোমাকে কখনই গ্রহণ করিব না। আমার হৃদয় বহ্নিচর্ব্বিত, আমার হৃদয় মরুভূমি। তুমি যে আদরের—যে সোহাগের সামগ্রী, তাহা আমি কোথায় পাইব? তোমাকে তাহা কেমন করিয়া দিব? তুমি দেবী। স্বর্গীয় সুখে তোমার অধিকার। এ অভাগা সে সুখের কণিকাও তোমাকে দিতে পারিবে না। তবে কেন, সুরবালা, আমি তোমাকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইব? না দেবি, তোমার আমার হইয়া কাজ নাই।"

রমাপতি চিত্র ত্যাগ করিয়া আর একবার গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিলেন এবং আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইয়া চিত্র গ্রহণ করিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—

"কিন্তু সুরবালা, আমি চিরদিনই এমন ছিলাম না। একদিন জগতে আমার মত ভাগ্যবান আর কেহই ছিল কি না সন্দেহ। আমার এই হৃদয় তখন নন্দন কাননের ন্যায় আনন্দধাম ছিল। সুখ ও শান্তি তখন এ হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়া থাকিত, সন্তোষ ও সৌভাগ্য তখন এ হৃদয় ছাড়িত না। তখন এ হৃদয়ে এক দেবীর রাজসিংহাসন ছিল; কিন্তু সে দেবী আজি কোথায়? সুকুমারি, সুকুমারি তুমি আজি কোথায়? তোমার জন্য, তোমার অভাবে আজি আমার জীবন শুষ্ক, আজি আমি অভাগা। আইস আমার দেবী, আইস করুণাময়ী, আমাকে দেখা দিয়া বাঁচাও—আমাকে আবার ভাগ্যবান কর। দুই বৎসর—দুই সুদীর্ঘ বৎসর আমি তোমাছাড়া হইয়া রহিয়াছি। যদি নিতান্তই দেখা না দেও, যদি তুমি এমনই নিষ্ঠুর হইয়া থাক, যদি নিতান্তই আর না আইস, তবে আমাকেও তোমার সঙ্গী করিয়া লও।"

রমাপতি সেই কৌচের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বস্থ একটা দ্বার খুলিয়া গেল। তখন সেই উন্মুক্ত দ্বার দিয়া নানা রত্নালঙ্কার বিভূষিতা, সমুজ্জ্বলস্বর্ণসূত্রবিনির্ম্মিত বসনাবৃতা পরম শোভাময়ী সুরবালা সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অলঙ্কারশিঞ্জিত শ্রবণ করিয়া রমাপতি ব্যস্ততাসহ সেই প্রতিকৃতি

প্রচ্ছন্ন করিলেন। সুরবালা তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি রমাপতির সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—

"একি! একি রমাপতি বাবু! তুমি কাঁদিতেছ নাকি?"

তখন রমাপতি মুখের বসন অপসারিত করিয়া বলিলেন,—

"যাও দেবি, যাও সুরবালা, আমার নিকট তুমি আর আসিও না। আমি অধম, আমি অভাগা, আমি দীনহীন। আমার হৃদয় শুষ্ক, নীরস, মরুভূমি। তুমি দেবী, আমার নিকটে তোমার স্থান হইবে না।"

সুরবালা রমাপতির কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণ অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিয়া উঠিলেন,—

"তোমার নিকট যদি আমার স্থান না হয়, রমাপতি, তবে ইহজগতে আমার আর স্থান নাই। তুমিই আমার দেবতা, তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার সন্তোষ। যদি তোমার হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি হয়, তাহা হইলে তাহাই আমার স্বর্গ। তোমাকে ছাড়িয়া আমি অন্য স্বর্গে যাইব না।"

এই বলিয়া বালিকা লজ্জায় অধোবদন হইল। তখন রমাপতি বলিলেন,—

"কিন্তু দেবি, তোমাকে আমি কি দিব? তোমার এ অনুগ্রহের কি প্রতিশোধ আমি দিতে পারি? আমার আছে কি?"

সুরবালা তাঁহাকে আর কথা বলিতে না দিয়া স্বয়ং বলিয়া উঠিলেন,—

"তুমি আমাকে আর কি দিবে তাহা আমি জানি না। তোমার কিছু আছে কি না তাহা আমার জানিবার কোন আবশ্যক নাই। আমি এই মাত্র জানি তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ মনুষ্য মনুষ্যকে তাহা দিতে পারে না। তোমার মত স্নেহ, তোমার মত ভালবাসা, তোমার মত গুণ কোন্ মানুষের আছে? তুমি মানুষের মধ্যে দেবতা। আমি ক্ষুদ্র বালিকা, তোমার মত দেবতার কেমন করিয়া পূজা করিতে হয় তাহা আমি জানি না। কিন্তু তোমার দাসী হইয়া থাকিতে পাওয়ায় যে কত সুখ তাহা আমি বেশ জানি। আমি তোমার দাসী; দাসীকে তুমি পায়ে ঠেলিবে কেমন করিয়া? কিন্তু তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

"কাঁদিতেছি যে কেন তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বলিব। কিন্তু তাহা না বলিয়াও আর থাকা যায় না। শুন সুরবালা, তুমি আমার আপন হইতেও

আপন, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ। এই দেখ সুরবালা, আমি এই নির্জ্জনে তোমারই ছবি বুকে ধরিয়া বসিয়া আছি।”

রমাপতি ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া দেখাইলেন। সুরবালার বদন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রমাপতি বলিতে লাগিলেন,—

“সুরবালা, তুমি আমার অন্তরে ও বাহিরে; তুমিই আমার ধ্যান ও জ্ঞান। কিন্তু সুরবালা, তোমাকে আমি সকল কথাই জানাইব, কোন কথাই আমি লুকাইব না। সুরবালা, আমি বড়ই অভাগা, কিন্তু আমি চিরদিন এমন অভাগা ছিলাম না। আমার এই হৃদয়ের এক রাণী ছিলেন। সে দেবী আজি নাই। আজি দুই বৎসর হইল আমার সেই দেবী আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আমি সেই অবধি অভাগা দীনহীন হইয়াছি। সত্য কথা তোমায় বলিব। সেই দেবীর স্মৃতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ। আমার হৃদয় সেই দেবীর অভাবে মরুভূমি হইয়াছে। সুরবালা, তুমি স্বর্গের দেবতা। আমি তোমাকে লইয়া কোথায় রাখিব? আমার এ পোড়া হৃদয়ে আর তোমার আসন পাতিব না। তাই বলিতেছি দেবি, আমার নিকটে তোমার স্থান হইবে না।”

রমাপতি নীরব হইলেন। সুরবালা অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না। তাহার পর সহসা রমাপতির চরণদ্বয় উভয় বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া সেই চরণেই মুখ রাখিয়া বলিলেন,—

“তোমার এই গুণে, তোমার এই দেবত্ব দেখিয়া আমি তোমার দাসী হইয়াছি। তোমার এই যে সরলতা, তোমার এই যে ভালবাসার স্থায়িত্ব, বল দেবতা, তুমিই কি আর কোথায় এমন দেখিয়াছ? তোমার এই গুণে জগৎ তোমার বশ, আমি তো কোন্ ছার কীট। তোমার চরণ আমি ছাড়িব না। দাসীকে তোমার চরণে স্থান দিতেই হইবে।”

রমাপতি অতি যত্নে সুরবালাকে উঠাইলেন এবং বলিলেন,—

“আমি যে আজিও বাঁচিয়া আছি, সুরবালা, সে কেবল তোমারই কৃপায়। তোমার স্নেহ, তোমার মমতা, তোমার রূপ এবং তোমার গুণ আমাকে বড় দুরাশা সাগরে ভাসাইয়াছে। এখন যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে তোমাকে না পাইলে আর বাঁচিতে পারিব না। এ জীবন রাখিয়াছ তুমি—

ইহা তোমারই সম্পত্তি। তুমিই এখন আমার সুখের কেন্দ্র। তোমার সন্তোষের জন্যই এখন আমার জীবনে মায়া। তোমাকে পাইলে আমার দগ্ধ জীবন পুনর্জীবিত হইবে; কিন্তু বল সুরবালা, আমাকে লইয়া তোমার কি হইবে?"

সুরবালা উত্তর দিলেন—

"আমার যে কি হইবে, তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? তোমাকে যদি আমি সুখী করিতে পারি, তোমাকে যদি আমি হাসাইতে পারি, তোমাকে যদি আমি আনন্দিত করিতে পারি তাহা হইলেই আমার আশার পূর্ণ তৃপ্তি হইবে, আমার সুখের সীমা থাকিবে না। তোমার সুখেই আমার সুখ, তদ্ভিন্ন অন্য সুখের কামনা এ দাসীর নাই।"

তখন সস্নেহে রমাপতি সুরবালাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

"ধন্য এ জীবন। সুরবালা, যে অভাগা ছিল, সে আজি তোমার কৃপায় পরম ভাগ্যবান। এ অধম আজি হইতে তোমারই দাস।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বড়ই সমারোহে রমাপতি ও সুরবালার বিবাহ হইল। এমন সমারোহ, এত ধূমধাম ইহার পূর্ব্বে সে অঞ্চলের লোকেরা আর কখন দেখে নাই। নানাবিধ বাদ্য, নৃত্য, গীত, ভোজ, আলোক, দানাদি উৎসব ব্যাপারে কয়দিন নগর মহোচ্ছ্বাসময় হইল। প্রায় লক্ষ মুদ্রা এই বিবাহকাণ্ডে ব্যয়িত হইল এবং সমস্ত নগর এক পক্ষ কাল মহানন্দে মগ্ন রহিল।

অদ্য ফুলশয্যা। যে প্রকোষ্ঠে নব দম্পতীর পুষ্পবাসর হইবে তাহার শোভার সীমা নাই। তথায় নানাবিধ সুরম্য স্ফাটিক আধারে আলোকমালা জ্বলিতেছে। সর্ব্ববিধ গন্ধময় পুষ্পরাশিতে সে গৃহ সুন্দররূপে সমাচ্ছন্ন। ভিত্তিগাত্রে মনোহর ফুলমালাসমূহ সুচারুরূপে সুসজ্জিত। দ্বার ও বাতায়ন সমূহে পুষ্পের যবনিকাসমূহ বিলম্বিত। প্রকোষ্ঠের স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব-পাত্রে সুদৃশ্য পুষ্পগুচ্ছসমূহ সংস্থাপিত। প্রকোষ্ঠমধ্যে এক অতি শোভাময় পর্য্যঙ্ক। তাহার উপর স্বর্ণসূত্রসমন্বিত শয্যা, তাহার আস্তরণপ্রান্তে

মুক্তামালার ঝালর। সেই পর্য্যঙ্কে সর্ব্বভূষণসমাচ্ছন্নকায়া সুরবালা এবং রমাপতি সমাসীন।

বিধাতঃ! তোমার অচিন্ত্য লীলার রহস্যোদ্ভেদ করিবার ক্ষমতা ক্ষুদ্র মানবের নাই। তোমারই কৃপায়, যে রমাপতি নিতান্ত দীনহীন ছিল, সে আজি এই বিপুল বিভবের সর্ব্বেশ্বর। যে ব্যক্তি কিছু দিন পূর্ব্বে আপনাকে নিতান্ত দীনহীন বলিয়া মনে করিত সে আজি আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে অতি সামান্য দাসত্ব যাহার জীবিকা ছিল, আজি শত জনে তাহার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে; সে আজি অচিন্ত্যপূর্ব্ব সুখ সৌভাগ্য সম্বেষ্টিত। বিজ্ঞান আমাদিগকে শিখাইতেছে, যে স্থানে একদা সুবিস্তৃত সাগর-সলিল লহরীলীলা বিকাশ করিত, তথায় এক্ষণে সমুন্নত, সুকঠিন, শুষ্ককায় গিরিরাজ দণ্ডায়মান। যে স্থান এক কালে মকর কুম্ভীরাদি জীবের লীলা-ক্ষেত্র ছিল, তাহা এক্ষণে সিংহ তরক্ষু ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ-সঙ্কুল হইয়াছে। হে বিধাতঃ! এরূপ অচিন্তনীয় বিপর্য্যয় যদি তুমি ঘটাইয়া থাক তাহা হইলে তোমার হস্তে মানবের এতাদৃশী দশা পরিবর্ত্তনে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। ভাগ্যবান রমাপতি আজি সর্ব্ব সৌভাগ্যের সম্পূর্ণ অধীশ্বর। আজি হইতে রমানাথের বিপুল বিভব তাঁহার বাসনার অধীন। সর্ব্বোপরি আজি হইতে সুন্দরীকুলকমলিনী, সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপিনী, রমাপতির প্রেমের কেন্দ্র, আনন্দের আধার, সুরবালা তাঁহার আপনার।

কিন্তু এ সময়ে, সুকুমারী, তুমি কোথায়? দেখ তোমার সেই রমাপতির আজি একি বিস্ময়াবহ পরিবর্ত্তন। দেখ তোমার সেই চিরাধিকৃত স্থানে আজি আর এক নবীনা বিরাজ করিতেছেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু নবদম্পতী এখনও নিদ্রার অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এরূপ দিনে কে কোথায় তাহা করিয়াছে? যদি কেহ তাহা করিয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহাদের বিবাহই অসিদ্ধ। দম্পতী নিদ্রাগত হন নাই বটে, কিন্তু অলসিত ও অবসিত হইয়াছেন। প্রেমের অনর্থক বাক্য, এক কথার শত পুনরুক্তি, আশার আশ্বাস, আনন্দের অসীমতা, হৃদয়ের পূর্ণতা প্রভৃতি প্রেমারম্ভকালে যেমন যেমন বিধান আছে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনই ত্রুটী হয় নাই।

তবে এতক্ষণ কথাবার্ত্তা যেরূপ খরস্রোতে ও সমুৎসাহে চলিতেছিল, তাহা এখন অনেক মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। শেষ রাত্রিকালে পক্ষী-কূজনের যেমন এক নূতনবিধ ধ্বনি হয় এখন তাহাই হইতেছে। গৃহ-মধ্যস্থ আলোকসমূহ কেমন সাদা সাদা হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ সময়ে সুরবালার একটু নিদ্রাবেশ হইল।

তখন রমাপতি ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! কি করিলাম? ইচ্ছা করিয়া এ সাধের শিকল কেন পায়ে পরিলাম? আজি আমি কাহার জিনিষ কাহাকে দিলাম? ইহাতে কি আমি সুখী হইব?" ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—'সুখী হইব যে তাহার আর সন্দেহ কি? আজি আমার যে সুখ, জগতে এমন সুখ আর কাহার আছে? আমি তো আজ ধন্য হইলাম। সুরবালা যাহার স্ত্রী হইল ইহ জগতে সে তো স্বর্গসুখ ভোগ করিবে। এত রূপ, এত গুণ, এত ভালবাসা আর কোথায় কেহ দেখিয়াছে কি? সেই সুরবালা আজি হইতে আমার!" আবার কিছুকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু আমার যে ছিল, সে আজি কোথায়? সে সুকুমারী আমার কোথায় গেল? আমি তো তাহাকে ভিন্ন জানিতাম না, তাহাকেই ত প্রাণ লুটাইয়া ভাল বাসিয়াছিলাম। এ দেহ, এ প্রাণ তো তাহারই। তাহার সে ভালবাসার আদি নাই অন্ত নাই।" তখন একে একে অমূল্য পূর্ব্বকথা মনে পড়িতে লাগিল। সুকুমারীর সহিত বিবাহ; বিবাহের পর ফুলবাসরে সুকুমারীর সহিত প্রথম পরিচয়; তাঁহার হৃদয়ের অপার্থিব উদারতা, তাঁহার প্রেমের অমেয় গম্ভীরতা, তাঁহার পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য, সকল কথাই ক্রমে ক্রমে মনে পড়িল। আর মনে পড়িল তাঁহার সেই দুরবস্থার কথা। ছিন্ন কন্থা-বিস্তৃত তৈলাক্ত মলিন উপাধানযুক্ত শয্যায় তাঁহারা শয়ন করিতেন; সুকুমারী রন্ধন করিতেন, ঘর ঝাঁইট দিতেন, বাসন মাজিতেন, কূয়া হইতে কলসী করিয়া জল তুলিতেন; পরিতে হইবে বলিয়া ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিতেন, না করিতেন কি? স্বর্ণ ও রৌপ্যভূষণ কখন সুকুমারীর অঙ্গে উঠে নাই, ছিন্নভিন্ন কার্পাসবস্ত্র কথঞ্চিৎ রূপে তাঁহার দেহাভরণ করিত মাত্র। আর আজি? আজি যে নবীনা

সুকুমারীর স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার দেহের সর্ব্বত্র মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার; গৃহকর্ম্ম স্বহস্তে সম্পন্ন করা দূরে থাকুক, কিরূপ প্রণালীতে তাহা নিষ্পন্ন হয় তাহাও সে জানে না। সুকুমারীর শত বস্ত্রের মূল্য একত্রিত হইলে যত হয়, তদপেক্ষাও তাহার পরিধানবস্ত্র অধিক মূল্যবান। দশজন দাসী তাহার আজ্ঞাপালনে ব্যস্ত, অতুল ঐশ্বর্য্য তাহার সুখ সম্বিধানে নিযুক্ত। তখন রমাপতি ভাবিতে লাগিলেন,—আমার সেই সুকুমারী, আমার সেই দুঃখিনী সুকুমারী আর নাই। এত কাঁদিয়া এত দেহপাত করিয়াও আর তাহার দেখা পাইলাম না। সে আর ইহ জগতে নাই। ইহজগতে নাই, কিন্তু আর কোথাও সে নাই কি? আমার তো ধ্বংস নাই। তাহার দেহলয়ের সহিত তাহার আত্মার লয় কখনই হয় নাই। তবে সুকুমারী, দেবি, তুমি দেখিতেছ কি ঐ স্বর্গধাম, তোমার বাসস্থান ঐ স্বর্গধাম হইতে দেখিতেছ কি, তোমার সেই রমাপতি কেমন শঠ, কেমন প্রবঞ্চক, কেমন বিশ্বাসঘাতক!"

সহসা সেই প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ নিষ্প্রভ আলোকে রমাপতি দেখিলেন যেন গৃহের ভিত্তিতে একটী অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তির ছায়া পড়িল। সেই সুরক্ষিত পুরীর রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে আবার মনুষ্যের ছায়া! রমাপতি মনে করিলেন, হয় ত কোন দাসী, যাহারা পরিহাস করিতে পারে এমন কোন পরিচারিকা গৃহমধ্যে আসিয়া থাকিবে। তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং চীৎকার করিলেন,—

"কে? কে ওখানে?"

কেহ উত্তর দিল না। তাঁহার নেত্র সম্মুখস্থ ছায়া সরিয়া গেল না, কেবল একটু নড়িল মাত্র। সুরবালার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"কি কি? ভয় পাইয়াছ নাকি?"

রমাপতি বলিলেন,—

"ভয় নহে, ঐ দেখ কাহার ছায়া।"

সুরবালা বলিলেন,—

"কই, কই?"

ছায়া এবার সরিতে লাগিল। যে ছায়া ভিত্তিগাত্রে লাগিয়াছিল, তাহা ক্রমে হর্ম্ম্যতলসংলগ্ন হইল।

রমাপতি বলিলেন,—

"এই যে! ঐ যায়!"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি শয্যাত্যাগ করিলেন এবং যে দিকে লোক থাকিলে এরূপ ছায়াপাত হইতে পারে সেই দিকে চলিলেন। এই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বে আর একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল। সেই প্রকোষ্ঠে একটী সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। উভয় প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী দ্বার উন্মুক্ত ছিল। সেই দিকেই মনুষ্য থাকা সম্ভব মনে করিয়া রমাপতি সেই দিকেই আসিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইতে না হইতে তাঁহার সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি 'সুকুমারি, সুকুমারি!' শব্দে চীৎকার করিয়া সেই হর্ম্ম্যতলে পতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরবালাও আসিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু কিছুই দেখিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। তখন অতি যত্নে তিনি রমাপতির শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

অচিরে রমাপতি সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,

"সুকুমারি, সুকুমারি! এতদিন পরে তোমার আমার কথা মনে পড়িল? না না, তুমি সুরবালা। সুরবালা, সুরবালা, আমার সুকুমারী কোথায় গেল?"

সুরবালা বলিলেন,

"তুমি কি বলিতেছ? সুকুমারী তো আমার দিদির নাম। তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ, এ কথা কি সম্ভব?"

রমাপতি বলিলেন,

"তাহা আর বলিতে? তুমি আমার সম্মুখে রহিয়াছ তাহা যেমন সত্য আমার সুকুমারীকে দেখাও তেমনই সত্য। কিন্তু কোথায় সুকুমারী? সুরবালা, সন্ধান কর, বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিবে, দেখ কোথায় সুকুমারী!"

সেই রাত্রিশেষে সেই সুবিস্তৃত ভবনের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল। যাহা হইবার নহে তাহা হইল না, সুকুমারীর কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। কেবল দেখা গেল সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের

একটী দ্বার উন্মুক্ত আছে। সে পথ দিয়া কেহ আসিয়াছিল বলিয়া কেহই মনে করিল না। সকলই রমাপতির মনের বিকার বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

তখন সুরবালা রমাপতিকে বলিলেন,

"তুমি সারাদিন সারারাত দিদির কথাই ভাব। রাত্রে শুইয়া শুইয়াও হয় ত তাই ভাবিতেছিলে; তাহাতেই হয় ত এ ভ্রম হইয়া থাকিবে।"

রমাপতি এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু প্রাতে সকলে দেখিল রমাপতি বাবুর মূর্ত্তির ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাধানাথ বাবুর সুবিস্তৃত সৌধমালার অনতিদূরে একটী পুষ্করিণী ছিল। সেই সরোবরে কোন সময়ে দুইটী বালক বালিকা ডুবিয়া মরিয়াছিল। সেই শোকাবহ ঘটনার পর হইতে লোকে ইহাকে 'মরার পুকুর' নাম দিয়াছে। নাম যাহাই হউক, এই দুর্ঘটনার পর হইতে সন্নিহিত জনসাধারণের মনে একটা বড় ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং পরম্পরাগত স্ত্রীরসনাসৃষ্ট বিবিধ ভয়াবহ কাহিনী সেই ভীতি আরও সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিল। এ জন্য সেই পুষ্করিণীতে মনুষ্য যাতায়াত করিত না। কাজেই একদা যাহা পরম শোভাময় ও নয়নরঞ্জন ছিল তাহা এক্ষণে পরিত্যক্ত, সুতরাং শ্রীভ্রষ্ট ও বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। পুষ্করিণীর সোপানাবলী এক্ষণে ভগ্ন, তাহার চারিদিক নানা-বিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরু গুল্মে পরিপূর্ণ। সেই সকল বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পুষ্করিণীর ভূরিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তীরের কোন কোন লতা মুখ বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমে জলের উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বকালে যাহাই থাকুক, বর্ত্তমান কালে যে এই পুষ্করিণীর অবস্থা বিশেষ ভীতিজনক তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই পুষ্করিণীতে লোকজন আসিত না। কিন্তু আজি এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে, এই জনহীন ও ভয়সমাকুল সরোবরের

মধ্যভাগে অবগাহন করিয়া এক শ্যামাঙ্গী যুবতী গাত্র ধৌত করিতেছে। যুবতীর বয়স ২৪।২৫ হইতে পারে। তাহার বদনে উৎসাহ ও দৃঢ়তার রেখাসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত। তাহার দেহ মাংসল কিন্তু কোমলতাবর্জ্জিত। তাহার নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল ও পাপবাসনাব্যঞ্জক। যুবতী নানা ভঙ্গীতে অঙ্গমার্জ্জনী লইয়া দেহের সর্ব্বস্থান সযত্নে সংঘর্ষণ করিতেছে। অবিশ্রান্ত ঘর্ষণেও যে দেহের কৃষ্ণত্ব বিদূরিত হইবার নহে, এ কথা হয় ত যুবতী বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না। আশ্চর্য্য ভীতিহীনতার সহিত যুবতী বহুক্ষণ বিবিধবিধানে আপনার শ্যামকায়া ও পরিধানবস্ত্র তত্রত্য সলিলে বিধৌত করিল। তাহার পর তীরসন্নিধানে আসিয়া তথায় যে পিত্তল কলস পড়িয়া ছিল তাহা উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিল। পরে আবক্ষ জলে অবতরণ করিয়া তাহা জলপূর্ণ করিল। তাহার পর বামকক্ষে কলস গ্রহণ করিয়া এবং আপনার পরিধানবস্ত্রের নিম্নভাগ সুবিন্যস্ত করিয়া দিয়া যুবতী ধীরে ধীরে সেই ভগ্ন সোপানে অতি সাবধানতার সহিত আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর কিয়ৎকাল যেরূপ গাঢ় ও মলিন অন্ধকার দেখা দেয়, এখন তাহা দেখা দিয়াছে। সর্ব্বাশঙ্কাবিরহিতা যুবতী অন্ধকার, জনহীনতা, বন, ভয়জনক কিম্বদন্তী সকলই উপেক্ষা করিয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে এক মনুষ্যমূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং বলিল,—

"কেও, রামলাল? কতক্ষণ?"

পুরুষ বলিল,—

"আধ ঘণ্টারও উপর। বাপরে; এমন গা ধোওয়ার ঘটা কখন দেখি নাই; তোমার যে রূপের নেশায় এ গোলাম পাগল তা আর অমন করিয়া ঘসিয়া মাজিয়া বাড়াইও না ভাই; তোমার পায়ে পড়ি।"

যুবতী বলিল,—

"পাগল এখনও হও নাই বলিয়া আমার এমন ঘসা মাজা করিতে হইতেছে। ছিঃ, তোমার কেবল কথা!"

রামলাল বলিল,—

"কালি, এতেও তোমার মন পাইলাম না। হয় ত তোমার পায়ে প্রাণ

না দিলে তুমি বুঝিবে না আমি তোমার জন্য কেমন পাগল। ভাল এবার তাহাই করিয়া দেখাইব।"

যুবতীর নাম কালীমতী, কি কালীতারা, কি কালিদাসী, কি এমনই একটা কিছু হইবে। আমরা তাহার নিগূঢ় সংবাদ জানি না।

কালী বলিল,—

"কেমন করিয়া তোমার কথা শুনিব? যে কাজটা চোখ কাণ বুজিয়া একবার সারিয়া ফেলিতে পারিলে আমাদের সুখের পথে আর কাঁটা থাকে না, আমাদের আর এমন করিয়া অন্ধকার বনে প্রাণ হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, তাহার জন্য তোমাকে এতদিন বলিতেছি, তুমি আজিও তাহার উপায় করিয়া উঠিতে পারিলে না। কেমন করিয়া বলিব তুমি আমার জন্য পাগল? পাগল অনেক দূরের কথা, তুমি যদি আমাকে একটুও ভাল বাসিতে তাহা হইলে কোন্ দিন সে কাজ শেষ করিয়া ফেলিতে।"

রামলাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—

"তুমি বুঝিতেছ না, কালি, কাজটা বড় শক্ত। একটা মানুষ নিকাশ করা আজিকার দিনে সোজা কথা নয়। ঐ শত্রুটাকে সরাইয়া না দিলে যে আমাদের মঙ্গল নাই, তা আমি বেশ জানি, কিন্তু করি কি বল দেখি?"

কালী নিতান্ত রাগতস্বরে বলিল,—

"করিবে তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু! অমি বুঝিয়াছি তুমি কোন কর্ম্মের নও। অমি যদি তোমার মত পুরুষ মানুষ হইতাম, তাহা হইলে, কোন্ কালে সকল কাজ শেষ করিয়া দিতাম। কি বলিব আমি মেয়ে মানুষ, তাতেই তোমাকে এত সাধাসাধি। বুঝিয়াছি তোমাকে দিয়া কোন কাজ হইবে না; এখন তোমাকে আমি দেখাইব, তোমার মত পুরুষের চেয়ে মেয়ে মানুষও ঢের ভাল। এ জ্বালা আমার আর সহে না। আমি আজিই এদিক ওদিক যা হয় একটা করিয়া ফেলিব স্থির করিয়াছি। সকল কাজই আমি করিব, কেবল সময়কালে তুমি একটু সাহায্য করিবে কি না আমি জানিতে চাই। তাও বোধ করি তোমাকে দিয়া হইয়া উঠিবে না—কেমন?"

রামলাল একটু থতমত খাইয়া বলিল,—

"তা—তা আর পারিব না? আমাকে যা করিতে বলিবে, আমি তাই

করিব। বালাইটাকে যেমন করিয়া হউক দূর করিতে পারিলেই বাঁচা যায়। কিন্তু আমি বলিতেছিলাম কি—বলি এত তাড়াতাড়ি না করিয়া একটু দেরি করিলে চলে না কি ?"

কালী অতিশয় বিরক্তির সহিত বলিল,—

"না, তা চলে না। তুমি ভেড়াকান্ত, তাই এখনও এ কথা বলিতেছ। দেরি—একাজে আবার দেরি ? এখনই যদি সুযোগ হয় তা হলে আমি এখনই কাজ সারিতে রাজি আছি। কিছু দেরি নয় ; আজি রাত্রেই আমি যেমন করিয়া পারি কাজ ফরষা করিব। আমি নিজে সব করিব, তোমাকে কেবল কাজ শেষ হওয়ার পর আমার একটু সাহায্য করিতে হইবে। তাও কি ছাই তোমাকে দিয়া হবে না ? তোমার যদি এতটুকু ভরসা নাই তবে তুমি এ কাজে নামিয়াছিলে কেন ? আর আমাকেই বা এমন করিয়া মজাইলে কেন ?"

রামলাল বলিল,—

"তা তুমি যা বলিবে তাই আমি শুনিব। তুমি আমাকে যে দিকে চালাইবে আমি সেই দিকেই চলিব ; তাতে আমার অদৃষ্টে যা হয় হউক। তা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কি, বলি বিষ টিষ খাওয়াইয়া কাজ শেষ করা হবে তো ?"

কালী অতি ক্রোধের সহিত বলিল,—

"তোমার মাথা, আহম্মক, ভেড়াকান্ত, সে ভাবনা তোমায় ভাবিতে হইবে না। এখন যা যা বলি শুন। ঠিক সেই রকম কাজ চাই। না যদি পার, ভাই, তা হলে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।"

রামলাল বলিল,—

"কেন ভাই, এত শক্ত কথা বলিতেছ ? বল কি বলিবে। যা বলিবে তাই আমি করিব।"

তখন কালী ও রামলাল খুব কাছাকাছি হইয়া ফুস্‌ফুস্ করিয়া অনেক কথা কহিল। তাহার পর রামলাল বলিল,—

"তোমার ভিজে কাপড় গায়ে শুকাইয়া গেল, এখন বাড়ী যাও। আমি ঠিক সময়ে হাজির হইব।"

কালী বলিল,—

"দেখিও, সাবধান। একটু এদিক ওদিক হয় না যেন।"

রামলাল বলিল,—

"সে জন্য ভয় নাই। আমি ঠিক সময়ে আসিব।"

তাহার পর এক দিকে রামলাল ও অপর দিকে কালী প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শশী ভট্টাচার্য্য যাজক ব্রাহ্মণ। লোকটীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দেখিতে কৃষ্ণকায়, উচ্চদন্ত, ক্ষুদ্রনেত্র, সুতরাং, সুপুরুষ নহেন। ব্রাহ্মণের শাস্ত্রাদি কিছু দেখা শুনা আছে; বিশেষতঃ দশকর্ম্মে তিনি বিশেষ নিপুণ। তাঁহার অবস্থা বড় মন্দ। বাসগৃহ একখানি সামান্য খড়ের ঘর, ঘরের সম্মুখে একটু ছোট উঠান, সেই উঠানের এদিকে ওদিকে কয়েকটী লাউ কুমড়ার গাছ, তাহার চারিদিকে কঞ্চির বেড়া। অবস্থা মন্দ হইলেও গ্রামের লোকেরা ব্রাহ্মণকে বড় শ্রদ্ধা করে ও ভাল বাসে। তাঁহার স্বভাব চরিত্র বড় ভাল। তাঁহার কোন দোষের কথা কেহ কখন শুনে নাই ও বলে নাই। কালী নাম্নী যে যুবতী স্ত্রীলোকের কথা এখনই হইতেছিল, সে এই ব্রাহ্মণের স্ত্রী। ব্রাহ্মণের ফাটা পা, গুম্ফহীন বদন, শিখাশোভিত শির, নস্যপূর্ণ নাসা, পুণ্ড্রযুক্ত ললাট ইত্যাদি কুলক্ষণে কালী বড় নারাজ ছিল। এ সকল কুলক্ষণ ছাড়া তাঁহার আরও কিছু মহৎ দোষ ছিল। তিনি বড় ধার্ম্মিক এবং নিয়ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। এ মহৎ দোষ কালী মোটেই পছন্দ করিত না। কাজেই সতত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর মনান্তর চলিত। ব্রাহ্মণ বড় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ; এজন্য তিনি আপনার পত্নীকেও ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণা দেখিতে ইচ্ছা করিতেন। কালী এরূপ ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের কোন ধার ধারিত না; সুতরাং সময়ে সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালীর উপর নিতান্ত বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কালীরও বড় বাড়াবাড়ি ছিল। কালী বেলা ৪টার সময় ঘাটে যাইত, রাত্রি নয়টা বাজাইয়া বাটী ফিরিত। কালী সময় নাই,

অসময় নাই, ঘরকন্নার কাজ নাই, অকাজ নাই, যখন তখন বাহিরে যাইত এবং দুই তিন ঘণ্টা কাটাইয়া আসিত। ব্রাহ্মণ এ সকল কারণে সদাই খিট্ খিট্ করিতেন। কালী তাহাতে বড় জ্বালাতন হইত এবং কখন মাথা কুটিয়া কখন বা কাঁদিয়া জিতিত।

আজি কালী সন্ধ্যার অনেক আগে গা ধুইবার ওজরে বাহির হইয়াছে, এত রাত্রি হইল এখনও বাটী ফিরিল না। ভট্টাচার্য্য চটিয়া লাল হইয়া বসিয়া আছেন এবং সকল জ্বালার শেষ হইবে মনে করিয়া ঘন ঘন নস্য লইতেছেন। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছেন যে আজি কালীরই একদিন কি তাঁহারই একদিন। আজি ব্রাহ্মণ কালীকে বিলক্ষণ শিক্ষা না দিয়া ছাড়িবেন না। কপালে যাই থাকুক, তিনি আজি কালীর খাতির রাখিবেন না। কিন্তু এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক, কালী যতই অন্যায় কাজ করুক এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালীর উপর যতই রাগ করুন, তিনি কালীকে বেজায় ভাল বাসিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। সেটা কালী মোটেই জানিত না এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেও তাহা অনেক সময়ে বুঝিতে পারিতেন না। কিসে কালী সুখে থাকিবে, কিসে কালীর খাওয়া পরার কষ্ট হইবে না, কিসে কালীর গায়ে দুই এক খানা সোণা রূপার অলঙ্কার উঠিবে, কিসে নিজের পাতের মাছখানা না খাইয়া কালীর জন্য রাখিয়া যাইবেন, কিসে যজমানের বাড়ী, ফলাহারে বসিয়া নিজে না খাইয়াও বিলক্ষণ এক পাত্র কালীর জন্য আনিতে পারিবেন, ইত্যাদি ভাবনা তিনি সর্ব্বদাই করিতেন। তিনি জানিতেন এরূপ ব্যবহার না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন না বলিয়াই করেন। ইহার মূলে যে বিলক্ষণ ভালবাসা আছে তাহা তিনি বড় একটা মনে করিতেন না। কালী ভাবিত, হতভাগা, মড়িপোড়া, পোড়ারমুখো বামুন, ওর আবার ভালবাসা। আমার পোড়া কপাল তাই ওর হাতে পড়েছি।

রাত্রি ঢের হইয়া গিয়াছে। তখন হেলিতে দুলিতে, ঘড়ার জল থকাস্ থকাস্ করিয়া নাচাইতে নাচাইতে ভট্টাচার্য্য-সীমন্তিনী গৃহাগতা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শশি ঠাকুরের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

"বেরো কালামুখী, বেরো আমার বাড়ী হইতে।"

অন্য দিন হইলে কালী বিলক্ষণ মাত্রা চড়াইয়া কাপ্তিনি মহাজনদের হিসাবে সুদ ও কমিশন সমেত হিসাব করিয়া জবাব দিয়া তবে ছাড়িত। কিন্তু আজি ভট্টাচার্য্যের কোন অজ্ঞাত পুণ্যফলে কালী বিলক্ষণ দয়া করিয়া উত্তর দিল,—

"এত রাগ করা কেন? সারাদিন ঘরের কাজ কর্ম্ম করিয়া একবার বাহিরে যাই; দুটা মেয়ে ছেলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, কাজেই দুটা কথা কহিতে দেরি হইয়া যায়।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবাক হইলেন। কালীর মুখে এমন উত্তর! তিনি রাগভরে শাসন করিবার জন্য খড়ম দেখাইলে যে কালী সত্য সত্যই খেঙরা বাহির করে, দুটা তিরস্কার করিলে যে কালী বাপান্ত করিয়া ছাড়ে, মারিব বলিয়া ভয় দেখাইলে যে কালী তাঁহার সটীক শিরে লাথি মারিতে আইসে, সেই কালীর মুখে আজি এই উত্তর শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেবারে অবাক্ হইলেন। ভাবিলেন এতদিনে মধুসূদন আমার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এতদিনে দীনবন্ধু আমার এই দুঃখের সংসার সুখের করিয়া দিলেন। ভগবানের ইচ্ছা না হইলে কালীর মতি গতি এমন ফিরিবে কেন? তিনি না পারেন কি? কালীর উত্তর সত্য ও সম্ভব কি না, ব্রাহ্মণ আহ্লাদে সে বিচার করিতে ভুলিয়া গেলেন। তিনি স্নেহস্বরে বলিলেন,—

"ব্রাহ্মণি, তা তো হতেই পারে। সারাদিন সংসারের কাজকর্ম্ম বন্ধ করাইয়া যদি তোমাকে কখন সুখী করিতে পারি, তবেই তো আমার জীবন সার্থক। তোমার উপর রাগ করিয়া কি আমি সুখ পাই? তোমাকে দুটা রাগের কথা বলিলে আমার যে কষ্ট হয় তাহা আর কি বলিয়া বুঝাইব? তবে মানুষের নাকি শত্রু অনেক, এই জন্যই সকল কাজে সাবধান হওয়া আবশ্যক। তুমি ছেলে মানুষ; পাছে সকল কথা সকল সময়ে ভাল করিয়া বুঝিতে না পার, এই জন্য এই একটা সাবধানের কথা সময়ে সময়ে তোমাকে বলিয়া দিতে হয়। তা তুমি এখন কাপড় ছাড়। দেখ দেখি সন্ধ্যার আগে তুমি গা ধুইয়াছ, সেই ভিজে কাপড় এখনও তোমার গায়ে রহিয়াছে; এতে অসুখ হবারই কথা। এ কথা যদি তোমাকে আমি না বুঝাই তবে কে বুঝাইবে বল?"

কালী তখন দড়ীদ্বারা লম্বিত এক বাঁশের আলনা হইতে এক খানি কাপড় হাতে লইয়া একটু অভিমানের হাসি হাসিয়া বলিল,—

"আমি কি তোমার চেয়ে পণ্ডিত যে তুমি যেমন বুঝাইবে, আমিও তেমন বুঝিব? তোমার মত পণ্ডিত আমাদের এদেশে আর কেহ নাই। আমি যেখানে যাই সেখানেই আমাকে ভট্টাচার্য্য ঠাকুরুণ বলিয়া লোকে কত মান্য করে। তোমার মত পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া কোন কথা বুঝিতে হইলে আমাকে কি রামা হাড়ির কাছে যাইতে হইবে?"

ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন কি সৌভাগ্য! আমার কালীর এমনই দেব প্রকৃতিই বটে; তবে ছেলে মানুষ; এতদিন সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। ভগবান কৃপা করিয়া এত দিনে আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, ইহা আমার অশেষ ভাগ্য। বলিলেন,—

"লোকে আমাকে মান্য করে সত্য, কিন্তু লোকে আপন আপন পরিবারকে যেমন করিয়া খাওয়ায় পরায়, যেমন করিয়া সুখসচ্ছন্দে রাখে, আমি যে তোমাকে তাহার কিছুই করিতে পারি না, এ দুঃখ আমার মরিলেও যাইবে না।"

সত্যই ব্রাহ্মণের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তখন কালী বলিল,—

ছিঃ ছিঃ! এজন্য তুমি মনে দুঃখ করিতেছ! তোমার স্ত্রী হইতে পাওয়ায় আমার যে সুখ, বোধ করি, রাজরাণীরও তাহা নাই। দেশের মধ্যে তোমার মত ধার্ম্মিক, তোমার মত মানী আর কে আছে? অনেক সুকৃতি ফলে এ জন্মে তোমাকে পাইয়াছি; নারায়ণ করুন যেন জন্মে জন্মে তোমাকেই পাই।"

এবার ব্রাহ্মণ সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। সুখের আশায় কালীর সহিত ঘর পাতিয়া অবধি ভট্টাচার্য্যের কপালে এমন সুখ একদিনও ঘটে নাই। তাঁহার চক্ষে জল দেখিয়া কালী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল এবং আপনার বস্ত্রাঞ্চল দিয়া অতি যত্নে তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল,—

"রাত্রি অনেক হইল, খাওয়া দাওয়া কর। আজি মল্লিকদের বাড়ী থেকে দই চিড়া ও সন্দেশ ফলারের জন্য দিয়া গিয়াছে। তুমি খাবে বলিয়া তুলিয়া রাখিয়াছি। ওঠ এখন, বেশী রাত্রে খাওয়া তোমার অভ্যাস নয়; আর দেরি করিলে অসুখ হইবে।"

কালী উঠিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আহারের উদ্যোগ করিতে গেল। উদ্যোগ ঠিক হইলে কালী ভট্টাচার্য্যকে উঠিয়া আসিবার জন্য সাদরে ডাকিল। ভট্টাচার্য্য পিঁড়েতে বসিয়া আহারে নিযুক্ত হইলেন। চিরদিনই তো তিনি দধি চিনি টক আহার করিয়া থাকেন, কিন্তু আজি কি মিষ্ট! আজি তাঁহার ঘরের ক্ষীণ প্রদীপ কি উজ্জ্বল, আজি তাঁহার পর্ণকুটীর কিরূপ সর্ব্বসুখময়, আজি তাঁহার গৃহসজ্জা কি চমৎকার, আজি তিনি নিজে কি আনন্দময় এবং সর্ব্বোপরি আজি তাঁহার ব্রাহ্মণী কি সুন্দরী, মধুরভাষিণী, এবং লক্ষ্মীস্বরূপিণী। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, যাহার গৃহে এমন ধন, সে আবার দরিদ্র কিসে?"

আহারাদি শেষ হইলে তাঁহার সাধের ব্রাহ্মণী তাঁহাকে একটা পান দিলেন। তিনি কালীকে আহার করিতে অনুরোধ করিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন। কালী স্বামীর পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিয়া ও আবশ্যক কর্ম্ম সমস্ত করিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া শয়ন করিল। সে রাত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যেমন নিদ্রা হইল, তেমন সুখে তেমন সুনিদ্রা তাঁহার জীবনে আর কখন হয় নাই।

সমালোচন বিভ্রাট।

জগু বাবু খাতা মুখস্থ করণে গাঢ় নিবিষ্ট।

জগু। (ঢুলিতে ঢুলিতে) মেকলে, জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল, হার্বার্ট্ স্পেন্সার; মেকলে, জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল, হার্বার্ট্ স্পেন্সার; মেকলে, হার্বার্ট্ মিল, জন্ ষ্টুয়ার্ট্ স্পেন্স্—আ-হা-হা-হা! দূ-র হোক্ গে ছাই—বেটাদের নাম গুলো এমন বদ্ যে মুখস্থ কর্ত্তে না কর্ত্তে উল্টে পাল্টে একাকার হয়ে যায়! আর পোড়া কালও এমন পড়েছে যে, এমন লিখ্‌তে পারি, এমন কইতে পারি, এমন সমালোচনা কর্ত্তে পারি—এমন স-ব পারি, তবু সে-ই ইংরেজি দু একটা বোল, দু এক খান বইএর নাম, দু একটা মানুষের নাম, এ না কর্ত্তে পার্‌লে লোকে বাহবা দিতেই চায় না।

(রঘুর প্রবেশ।)

আস্‌তে আজ্ঞা হয়, রঘু বাবু! কবির সঙ্গে তিন তিনটা দিন দেখা না হওয়া আমি বড় দুর্লক্ষণ মনে কচ্ছিলেম।

রঘু। (উপবেশনান্তে) মনে করলে দুর্লক্ষণের হাত এড়াতে না পার্‌তেন এমন বোধ হয় না।

(কানাইএর প্রবেশ)

কানাই। বেশ হয়েছে আজ আপনারা দু জনে উপস্থিত আছেন; দেখে শুনে আমার বইএর যা হয়, একটা এস্‌পার ওস্‌পার ক'রে দিন।

জগু। তাই ত, আপনাকে আজ আস্‌তে বলেছিলেম বটে, কিন্তু আমার হয়েচে কি জানেন, অবকাশ আজ কাল বড় কম। অনেক লিখ্‌তে হয়, ভাব্‌তে হয়, মেলা ইংরেজি বই পড়তে হয়, কখন্ আপনার বই দেখি?

রঘু। (কানাইএর প্রতি) কি বই? সে দিন যে উপন্যাস খানি এনেছিলেন সেই খানি নাকি?

কানাই। আজ্ঞে হঁা, সেই খানি। তা দেখুন, আজ আপনারা দুজনেই আছেন, এমন সুবিধে সব দিন হবে না।

জগু। তা আচ্ছা, আজ যতটা হয় হোক্। তা আপনিই পড়ুন, আমরা শুনে যাই।

কানাই। (পুস্তক খুলিয়া) "বিজয়গ্রামের একটি পর্ণকুটীরে জনৈক বৃদ্ধা বাস করিতেন—

জগু। ও হ'ল না, উপন্যাস ধরাই হ'ল না।

রঘু। ও হ'ল না, হ'ল না।

কানাই। তবে কি ক'রে ধরবো বলুন!

জগু। উপন্যাস লেখা কি আপনি সহজ মনে করেন, মশায়? আপনি মেকলের এ-টা পড়েন নি?

কানাই। কি টা বলুন দেখি?

জগু। ঐ-যে এ-টা, বেশ নামটি, মনে পড়্‌চে না। তা যাই হোক, সে-টা কি আপনি পড়েন নি?

কানাই। কি-টা বল্‌চেন ভাল বুঝতে পাচ্ছিনে। তা উপস্থিত স্থলে কি দোষটা হয়েছে সেইটাই বলুন না কেন?

জগু। দোষ-টা কি হয়েছে জানেন, ও উপন্যাস ধরাই হয় নি। (একটু ভাবিয়া) ভাল, ঐ বুড়ী বই কি ওদের ঘরে আর কেউ ছিল না?

কানাই। হাঁ—ছিল, তা এর পরেই জান্‌তে পার্‌বেন।

জগু। কে ছিল?

কানাই। একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী কন্যা—দুঃখের সময়ে বৃদ্ধার একমাত্র অবলম্বন।

জগু। বেশ ছিল। আপনার উপন্যাসে জিনিস আছে, কিন্তু আপনি তা সাজাতে পারেন না।

কানাই। তা ভাল, কি ক'র্‌লে সাজে তাই না-হয় বলুন?

রঘু। ঐ খান থেকেই উপন্যাস ধরুন।

কানাই। কোন্ খান থেকে?

রঘু। ঐ-যে ঐ দুঃখের সময়ে এক মাত্র অবলম্বন—

কানাই। তা এখন কি ক'রে হবে?

জগু। কেন? ধরুন—"বিজয় গ্রামের একটি অট্টালিকার বাতায়নে জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া অষ্টাদশবর্ষীয়া বালিকা আজ কি ভাবিতেছিল—"

কানাই। অট্টালিকা ত ছিল না—অট্টালিকা কোথা পাবে? আপনাকে ত বল্লুম একটি পর্ণকুটীরে—

রঘু। ছি ছি ছি, আপনি কবি হ'য়ে এমন কথা বল্‌চেন? অট্টালিকা সে ত আপনার হাত—বিশেষ তাতে যখন খরচ-পত্র কিছুই নেই, তখন আপনি কুণ্ঠিত হচ্চেন কেন?

কানাই। কুণ্ঠিত কি জানেন, বই খান লিখে শেষ করেছি; মিছামিছি মাঝখানটা তুলে নিয়ে এসে গোড়ায় লাগিয়ে দিয়ে—সে আবার এখন একটা কি হবে?

জগু। ঐ! ঐ-টি বোঝেননি ব'লেই ত এত গোল। সামান্য গল্প আরম্ভ করার চেয়ে উপন্যাস আরম্ভ করার যে একটু কৌশল, একটু কারদানি আছে, সে টুকু সকলে জানে না।

কানাই। বল্লেও কি বুঝ্‌তে পারব না?

জগু। আমি বুঝিয়ে দিচ্চি! আপনি আইভ্যানহো—আচ্ছা তার দরকার নেই, আপনাকে একটা ছোট বই থেকেই বুঝিয়ে দিচ্চি, গল্প কি রকম জানেন? যেমন—

"যাদব নামে একটি বালক ছিল। তার বয়ক্রম নয় বৎসর। সে পথে পথে খেলিয়া বেড়াইত। স্কুল হইতে সমপাঠীদের কাগজ কলম চুরি করিয়া আনিত। শিক্ষক মহাশয় এই দোষে তাহার নাম কাটিয়া তাড়াইয়া দিলেন।"—বুঝ্‌তে পাল্লেন?

কানাই। তা বুঝ্‌লেম। এখন একে নিয়ে উপন্যাস আরম্ভ ক'রতে হবে কি রকম কারদানি ক'রে বলুন।

জগু। উপন্যাসের বেলা পৈত্রিক নিয়মানুবায়ী 'যাদব নামে' ব'লে গোড়া থেকে আরম্ভ করলে চলবে না।

কানাই। তবে কি করতে হবে?

জগু। তখন আপনাকে ঐ 'চুরি করা' থেকে ধরতে হবে। তার পর তাকে নিয়ে পথে পথে খেলিয়ে বেড়াতে হবে; তার পর তার বয়ক্রম নয় বৎসর হবে; তার পরে, সে যাদব হবে। শেষে যখন দেখ্‌বেন সে যাদব হ'ল, তখন উপসংহারে যেমন আছে—নাম কেটে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলেই উত্তম উপন্যাস হবে।

রঘু। এই ত জানি! (একটু চিন্তা করিয়া মৃদুস্বরে) কিন্তু, জগু বাবু! যাদব চুরি করার দরুন দণ্ডটা পাবে কি? তা হ'লে উপন্যাসে ধর্ম্মভাবটা এসে পড়ে না?

জগু। হঁা হঁা, ভাল মনে ক'রে দিয়েছেন। বটে বটে, নাম কেটে তাড়ালে চলবে না!

কানাই। তবে কি তাকে কোলে ক'রে নিয়ে নাচ্‌তে হবে?

জগু। অ্যাঁ-অ্যাঁ, কোলে ক'রে নিয়ে নাচ্‌বেন?—না, তা কেন? কি বল হে, রঘুবাবু!

রঘু। ভাল, তার জন্য আটকাচ্চে না, ও কিছু কঠিন কথা নয়, ওটা আপনাকে এখনি ব'লে দিচ্চি।

কানাই। কি বলুন ?

রঘু। আচ্ছা, তার জন্য ব্যস্ত কি ? ততক্ষণ আর একটা জায়গাই পড়ুন না শুনি।

কানাই। (কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে একটা জায়গা খুলিয়া) শুনুন—"নিদাঘ-রজনীর নিশীথ জ্যোৎস্নালোকে পৃথিবী হাসিতেছে ; মলয়ানিল ধীরে ধীরে বহিতেছে ; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ. কেবল কুটীরের সম্মুখে তেঁতুল গাছের তলায় একটা পলায়িত গাভী রোমন্থন করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে হম্বা রব করিয়া যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে"—.

জগু। ঐ দেখুন, হল না !

রঘু। ঐ দেখুন, আপনি কি করতে গিয়ে কি ক'রে ফেল্লেন !

কানাই। কেন মহাশয় ! এতে কি দোষ হ'ল আবার ?

জগু। আগেই ত ব'লেছি আপনি সব জিনিস ধ'রে টান দেন, কিন্তু সাজাতে পারেন না।

কানাই। কি করলে তবে সাজ্‌তো বলুন ?

জগু। সাজ্‌তো ?—বলি, গাভীটে ওখানে কেন ? ঐ বিজয়গ্রামে কোকিল কি ছিল না ?

কানাই। তা কেন থাকবে না ?

জগু। তবে কি ম'রেছিল ?

রঘু। এমন জ্যোৎস্নালোকে যদি তাকে পাওয়া না গেল, ত সে থাকায় ফল কি ? তেমন কোকিলের বাপ নির্ব্বংশ হোক্ না ?

কানাই। সে যা হোক্, এই—না আর কিছু ভুল আছে ?

জগু। ভুল ভুল কি ? ঐ ত এক বিষম ভুল—গাভী ওখানে থাক্‌তেই পারে না।

রঘু। ওর বাবার সাধ্য কি 'কুহু কুহু' রব করে ?

কানাই। তা এখন করতে বলেন কি ?

জগু। এখনি ও গাভীটে কেটে দিয়ে ওখানে 'কোকিল' ক'রে দিন।

রঘু। 'হম্বা' টা কেটে 'কুহু কুহু' ক'রে দিন।

কানাই। ভাল, তা হল, আর কিছু কর্ত্তে হবে ?

রঘু। ও গাছটা বদ্‌লাতে হবে।

কানাই। বদ্‌লে কি করব? .

রঘু। 'তমাল' ক'রে দিন।

কানাই। তাও হ'ল।

জগু। এ বার একবার পড়ুন দেখি?

কানাই। "নিদাঘ-রজনীর নিশীথ জ্যোৎস্নালোকে পৃথিবী হাসিতেছে; মলয়ানিল ধীরে ধীরে বহিতেছে; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবল কুটীরের সম্মুখে তমাল গাছের তলায় একটা পলায়িত কোকিল রোমন্থন করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে কুহু কুহু রব করিয়া যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।"

জগু। হাঁ, অনেকটা হ'য়ে এসেছে।

রঘু। অনেকটা; কিন্তু কোকিল কি যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে?

জগু। হাঁ হাঁ, ঐ টা 'নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে না' ক'রে দিতে হবে।

কানাই। আজ্ঞে, আজ তবে এই অবধিই ভাল, আবশ্যক হয় ত আর এক দিন তখন এসে ভাল ক'রে সব জেনে যাব।

রঘু। না না, তা হয় কি—কোথা যাবেন—বসুন বসুন! ঐ যে কবিতার মতন ও একটা কি দেখা যাচ্চে?

জগু। হাঁ হাঁ, বসুন বসুন—আজ আমরা দুজনেই আছি—ঐ যে ও একটা কি দেখা যাচ্চে?

কানাই। ও একটা ঐ উপন্যাসেরই কবিতার মত কয়েক ছত্র।

রঘু। ভাল ওটা পড়ুন দেখি?

কানাই। আচ্ছা—তবে না হয় শুনুন :—

উৎসবের হাসি গিয়াছে ফুরায়ে,
হাহা রব শুধু নিশিদিন,
শ্যাম বিনে আজ আঁধার সকল,
গোকুল যেন প্রাণহীন।

রঘু। থাক্ থাক্, ও আর ব'ল্‌তে হবে না, বোঝা গেছে—বোঝা গেছে!

কানাই। কেন কি হ'ল ম'শায়! শেষ হতেই দিন—এর মধ্যেই কি বুঝলেন?

জগু। কবিতার ও রকম নিয়ম নয়, (রঘু বাবুর দিকে ফিরিয়া) কি বল রঘু বাবু?

রঘু। ও ত কবিতাই হল না—'সজনি' নেই, 'জোছনা' নেই, 'বাঁশী' নেই, 'স্বপন' নেই, 'কি-যেন-কি' নেই—আর ওর সব্‌ই ত বুঝ্‌তে পাল্লেম।

কানাই। বুঝ্‌তে পাল্লেন—তাতে দোষ হ'ল কি? সে টা ত বোধ হয় ভালই হ'ল।

রঘু। আজ্ঞে, না মহাশয়! প্রকৃত কবিতা—হৃদয়ের কবিতা যে কি তা আপনারা মোটেই বোঝেন না, তাই এমন কথা বল্‌চেন।

কানাই। তবে কি আপনি বল্‌তে চান, যা বুঝ্‌তে না পারা যায় সে গুলোই ভাল কবিতা?

জগু। অনেকটা তাই বটে, (রঘু বাবুর প্রতি) কি বল রঘু বাবু?

রঘু। নিশ্চয়ই তাই। আপনি বোধ হয় ইংরেজি কবিতা বেশি পড়েন না? ইংরেজিতে এমন ঢের ভাল কবিতা আছে, আমরা ত এখনও তা বুঝ্‌তে পারিই নাই, তা ছাড়া মাষ্টার মশাই ব'লেছিলেন যে, ইংরেজদের ত জাতিভাষা—তারাও বুঝ্‌তে পারে না।

কানাই। ভাল যদি তাই-ই হয়, তা হ'লেই কি এমন প্রমাণ হ'চ্চে যে সরল হলে, বোঝা গেলে, সেটা কবিতা হবে না?

রঘু। হাঁ তা-ই বটে, তবে ঠিক তা-ই নয়। ইংরেজি ভাষায় এমন অনেক সরল কবিতা আছে যে পড়্‌লে বা শুন্‌লে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে হয়। আমার এমন সহস্র সহস্র কবিতা মুখস্থ আছে।

কানাই। একটা শুন্‌তে পাই নে?

রঘু। তা এখনি বল্‌তে পারি, আজ পারি, কাল পারি, আপনার যে দিন—যখন ইচ্ছা শুন্‌তে পারেন।

কানাই। তা একটা এখনি বলুন না?

রঘু। তা কেন বল্‌তে পার্‌বো না? এখনি পারি, আজ পারি, কাল পারি—আপনি কি মিথ্যা কথা মনে কচ্চেন?

কানাই। এ আপনি কেমন বল্‌চেন? মিথ্যা মনে করবো কেন—আমি একটা শুন্‌বো ব'লেই ত আপনাকে ব'ল্‌তে বল্‌চি?

রঘু। আচ্ছা, বলচি। আপনি ড্যান্‌টিস্ এ-টা পড়েচেন?

কানাই। কি টা?

রঘু। আচ্ছা, তায় আর কাজ নাই, আপনাকে সামান্য বই থেকেই একটা শোনাচ্চি, কবিতাটা কেমন চমৎকার দেখুন দেখি! কবিতা আছে—

Thirty days have September,
April, June and November;
February hath twenty-eight alone,
And all the rest have thirty-one.

কানাই। (একটু হাসিয়া) এটা কি বড়ই সুন্দর কবিতা?

রঘু। আপনি বুঝতে পাচ্চেন না?

জগু। (কানাইএর প্রতি) বলেন কি মশাই, একি কম কবিতা! আপনি এতে কবিত্ব দেখ্‌তে পাচ্চেন না? এর যে অক্ষরে অক্ষরে কবিত্ব, বিশেষতঃ ৩য় পংক্তিটা পড়ুন দেখি—"Februry hath twenty-eight alone".—উঃ, কি গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাস! এই অসার সংসারে—এই ক্ষণভঙ্গুর মানব জীবনে ফেব্রুয়ারির কি অল্প পরমায়ু! আমি যখনি ফেব্রুয়ারির কথা মনে করি, তখনি অবসন্ন হ'য়ে পড়ি! উঃ, আপনি এখন ভেবে দেখুন দেখি, এতে কি কম কবিত্ব—কম উচ্ছ্বাস—কম আধ্যাত্মিক ভাব! এ লিখ্‌তে কি কম ফিলজফির দরকার?

কানাই। তা ভাল, এবার থেকে না হয় ঐ রকম লিখ্‌তে চেষ্টা করবো। আজ এখন তবে আমি চল্লেম মহাশয়!

(কানাইয়ের প্রস্থান)

রঘু। আমিও এখন তবে আসি।

(রঘুর প্রস্থান)

জগু। (পকেট হইতে খাতা টুকু বাহির করিয়া দুলিতে দুলিতে) মেকলে, জনষ্টুয়ার্ট মিল, হার্ব্বার্ট স্পেন্সর (ইত্যাদি মুখস্থ করণ)

রুক্ম্যাবাই।

এ পোড়া হিন্দুস্থানে হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ পাইয়াছে। হিন্দুর আর হিন্দু-হৃদয় নাই, হিন্দুর আর হিন্দুমস্তিষ্ক নাই। হিন্দু না ইংরাজ, না মুসলমান, না পার্শী। হিন্দু যে এখন কি, তাহা নির্ণয় করিতে বুঝি একা জগদীশ্বরই সক্ষম। বুঝি ইংরাজ, মুসলমান বা পার্শী হইলে হিন্দুর গতিমুক্তি স্থিরীকৃত হইবার অনেকটা সম্ভাবনা ছিল।

হিন্দু যদি এখন হিন্দুপ্রকৃতিস্থ হইত, তবে এই তুচ্ছ রুক্মাবাই আন্দোলনে কথা কওয়া নিতান্ত অনিবার্য্য হইলে, আগেই সহজ কথাটা কহিয়া নীরব হইত ও তৎসঙ্গে প্রতিকূলবাদীকেও নীরব করিত। কিন্তু, প্রকৃতিস্থ হওয়া দূরে থাক, হিন্দু এখন নিজ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করিতে অক্ষম। হিন্দু এখন কি খায় তা জানে না, কি চায় তা জানে না; কি পরে তা জানে না, কি পড়ে তা জানে না; কি সাজে তা জানে না, কি ভজে তাহাও জানে না। হিন্দু এখন আপনাকে আপনি জানে না।

কিন্তু হিন্দু যে এখন মানুষের মত তাহা বটে। হিন্দু মানুষের মত খায়দায়, শোয়, কথা কয়, ইত্যাদি করে। আর একটী কথাও আধুনিক হিন্দু সম্বন্ধে সত্য। হিন্দু এখন উন্নতিশীল, হিন্দু "জাতীয় দাঁড়ীপাল্লায়" উঠিয়াছেন বা উঠিতেছেন। আর আমার বন্ধু মহাশয় কর্ণমূলে বলিতেছেন হিন্দুর একটী মাত্র অভাব বর্ত্তমান। অভাবটী গুহ্য—কিন্তু দীর্ঘ।

রুক্মাবাইয়ের মোকদ্দমার সহিত হিন্দু স্ত্রীশিক্ষার যে কি সম্বন্ধ তাহা স্থির না হইলেও, রুক্মাবাই আন্দোলনে হিন্দু স্ত্রীশিক্ষা লইয়া একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। বিলাতী সভ্যতালোকিত মহোদয়েরা এই সুযোগে "তর্কের পুঁজি" বৃদ্ধি করিতেছেন, হৃদয় চিরিয়া অশিক্ষিতা হিন্দু স্ত্রীর জন্য নিজ নিজ সহানুভূতির গভীরতা দেখাইতেছেন, নিজ জাতিকে গালি পাড়িয়া "কিংকর্ত্তব্য" বিষয়ে "পরামর্শ" ঝাড়িতেছেন, সভা করিয়া "প্রতিজ্ঞা"-পুঞ্জ জারি করিয়া, দুই আনা, পাঁচসিকা সহি করিতেছেন, সাহেবদের গদ্গদ প্রাণে নিজ নিজ গদ্গদ প্রাণ মিশাইয়া, সেই গদ্গদ গলিত প্রাণ থানায় মাখিয়া, স্যাম্পেনে সিক্ত করিয়া, দুর্ভাগ্য দাদাজির পিণ্ড

গিলিতেছেন। আর যাহা যাহা করিতেছেন, তাহা সংবাদ পত্রে দেদীপ্যমান!

আর রুক্মাবাইবিরোধীরা যে কি করিতেছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে একটা কথা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা দুর্ভাগ্য দাদাজীর পক্ষ, হতভাগিনী রুক্মার প্রতিপক্ষ ও হিন্দু রীতিনীতি সম্বন্ধে রাজসর্দারির পক্ষে খড়্গহস্ত। রুক্মাকে আমি "হতভাগিনী" বলিয়াছি, রুক্মা হতভাগিনীই বটে। হতভাগিনী না হইলে রুক্মা হতভাগাদিগের দলে পড়িত না, হতভাগাদিগের হাতে পড়িয়া বিপর্য্যস্তা হইত না। আর দাদাজী "দুর্ভাগ্য" কারণ তাহা না হইলে এমন হতভাগিনীর হাতে পড়িবে কেন? দাদার কিছু জোর কপাল, তাহা না হইলে হিন্দু হইয়া হিন্দু ধর্ম্মপত্নির পতিত্ব সংস্থাপনের জন্য তাহাকে কাজির আশ্রয় লইতে হইবে কেন?—

কিন্তু রুক্মা হতভাগিনী হইলেও, রুক্মার বিবেচনায় রুক্মা সৌভাগ্যশালিনী তাহার কারণ. সাহেবেরা তাহাকে দেশে বিলাতে হতভাগিনী বলিয় জানিয়াছে, হতভাগিনী বলিয়া তাহার জন্য লড়াই করিতেছে, তাহার জন্য "প্রাণের" সহানুভূতি করিতেছে, চাঁদা তুলিতেছে। এমন কি তাহার চাঁদমুখে মুগ্ধ হইয়া চাঁদমুখেরা—দাদার গোলমাল চুকিলে—তাঁহার বর হইতেও প্রস্তুত। নীচজাতীয়া হিন্দুর মেয়ে চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইয়াছে। দাদাকে দাদা বলার প্রায়শ্চিত্য যদি উর্দ্ধগতি হয়, তবে রুক্মা দাদাকে আর কিছু বলিতেও প্রস্তুত। রুক্মা সৌভাগ্যশালিনী। তবে রুক্মার সৌভাগ্যশশীর সম্প্রতি এক কলা লোপ পাইয়াছে। সে লোপ দাদা-কৃত। হতভাগাদের সাহায্যে রুক্মা ইংরাজিতে ইংরাজি সংবাদপত্রে লম্বালম্বা পত্র ঝাড়িয়া নিজ বিদ্যা জাহির করিয়াছিল। দাদা রুক্মার বিদ্যা বাহির করিয়া দিয়াছে।

রুক্মা দাদার বিবাহ খারিজ করিয়া বিলাতী বা দেশী সাহেব বিবাহ করিতে চায়। এই হাড়ি ডোমের অপেক্ষা নীচ ব্যাপারে হিন্দুর কথা কহিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দেশী বিলাতী সাহেবেরা এই সুযোগে হিন্দু বিবাহ, হিন্দু আচারব্যবহার, রীতিনীতি লইয়া একটা কিচি মিচি লাগাইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মবিবাহ পদ্ধতিতে তাঁহাদের অনাচার

সৌখীন বিবাহের পদ্ধতি চালাইতে চাহেন। স্পর্দ্ধা বড় কম নহে। হিন্দু খেপিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইংরাজি শিক্ষায় হিন্দুর হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিগড়িয়া না যাইলে, হিন্দু এই স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনে অল্প ধীর ভাষায় বাহবা লইতে পারিত। কিন্তু একে "সুশিক্ষার" মাহাত্ম্য, তাহাতে আবার চটিয়া উঠিয়াছে। ধীর শান্ত ভাবে মর্ম্মভেদী, মস্তিষ্কভেদী সাদা কথা কহিবার হিন্দুর কোন উপায় নাই। তাই আবল তাবল যাহা যোগাইতেছে, তাহাই বলিতেছে; হাবড়হাটি যাহা কলমাগ্রে আসিতেছে তাহাই লিখিতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বীর রোষ উদ্রেক করা তর্কে জিতিবার এক প্রধান উপায়। সাহেববাদীরা তাই সুবিধা পাইয়া বেশ এক হাত লইতেছে। স্ত্রীশিক্ষার কথায় হিন্দু হারি মানিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতেছে—"সময়ে আমাদিগের ললনাবৃন্দ শিক্ষিতা হইবে। হিন্দুনারীর শিক্ষা হইবার সময় চাই। জোর করিলে চলিবে না. ইত্যাদি" মাথামুণ্ড।

দাদা রুক্মাকে পান বা না পান, বা রুক্মা দাদাকে লইয়া সুখী হউন বা না হউন, সে বিষয়ে আমরা এক প্রকার উদাসীন। তবে হিন্দু স্ত্রীকে অশিক্ষিতা বলিলে মর্ম্মে ব্যথা লাগে। সাহেবেরা বলিলে লাগে না, বরং হাস্যের উদ্রেক হয়, ক্ষণকালের জন্য অনেকটা বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগের সুযোগ হয়। ব্রাহ্ম বা দেশী সাহেবেরা বলিলেও সে আঘাত লাগে না। হিন্দু, হিন্দু নারীকে অশিক্ষিতা বলিলে মর্ম্মে বড় আঘাত লাগে। হিন্দু যাহার কাজে নিত্য নিত্য উচ্চ শিক্ষা পান; যাহার সহবাস-মার্জ্জনে হিন্দু মার্জ্জিত রুচির বড়াই করিয়া থাকেন; যাহার অধ্যাপনে হিন্দু পশুবৃত্তি দমন করিতে শিখেন; যাহার স্বর্গীয় উপদেশে হিন্দু নিত্য দয়া, ধর্ম্ম পালন করেন; যে দেবীকে গৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া, যে দেবীকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া হিন্দু দেবভাবে পূর্ণ, তাহাকে অশিক্ষিতা বলা কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? এ কৃতঘ্নতা বুঝি সেক্ষপীয়র কথিত পাষাণ-হৃদয় দানবেও সম্ভবে না!

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ সমগ্র জগতের ধর্ম্মক্ষেত্র। এই পুণ্যভূমিতে, এই ধর্ম্মক্ষেত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতে ধর্ম্মদীপ জ্বলিতেছে। এই

দীপের উজ্জ্বল আলোকে প্রাচীন জগৎ আলোকিত ছিল, যেমন আজি এই নব্য জগৎ আলোকিত হইয়াছে। আজিকার এই নব্য জগতে এমন কোন সভ্যতাভিমানী জাতি বা স্থান নাই, যাহার ধর্ম্মদীপ ভারতীয় ধর্ম্মপ্রদীপ হইতে জ্বালিত নয়। এ কথা মুখের কথা নহে। ইউরোপীয় সভ্যতাভিমানী পণ্ডিতেরা ইহার প্রধান প্রধান সাক্ষী। ভারতবর্ষ যে ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান এ কথা লইয়া এখন আর পাদ্‌রী সাহেবরাও বিবাদ করেন না। ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থানে যে ধর্ম্মই সকল বিষয় অপেক্ষা প্রবল থাকিবে, ইহা অতি সহজ কথা। শুদ্ধ প্রবল নহে, এই ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মই সার। এই ধর্ম্মক্ষেত্রে সকলই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, সকলই ধর্ম্মোদ্ভূত। রাজনীতি বল, সমাজনীতি বল, এই পুণ্যস্থানে ধর্ম্মই সকল নীতির, সকল অনুষ্ঠানের ভিত্তি ও মেরুদণ্ড। হিন্দুর বিবাহ ধর্ম্মার্থে। হিন্দুর পত্নী ধর্ম্মপত্নী বা সহধর্ম্মিনী। হিন্দুর সহধর্ম্মিনী হিন্দুর ধর্ম্মচিন্তার সহায়, ধর্ম্মোপার্জ্জনের সহায়, ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায়। তাই হিন্দুপত্নীর শিক্ষার জন্য শৈশবকাল হইতেই হিন্দুমাতা ব্যস্ত। যখন ইংরাজমাতা বালিকা কন্যাকে এ, বি, সি, চিনিতে শিখান, হিন্দুমাতা তখন সেঁজুতির ব্রত ধারণ করাইয়া, ছয় সাত বৎসরের বালিকা-হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ বপন করেন। কোমল নারী-হৃদয়ের ন্যায় ধর্ম্মবীজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র আর নাই। ক্ষুদ্র বালিকাবস্থায়, হৃদয়ে এই বীজ উপ্ত হইলে, এই বীজ অঙ্কুরিত হইলে, যৌবনাবস্থায় তাহা কিরূপ সুফলসুশোভিত পাদপে পরিণত হয়, তাহা হিন্দুর ভাগ্যক্রমে হিন্দুই অবগত। হিন্দু সে পাদপছায়ায় নিত্য শীতল হন, সেই পাদপের সুমিষ্ট ফলভক্ষণে নিত্য উদর পূরণ করেন, সেই পাদপস্থিত বিহঙ্গমের তানে বিভোর হইয়া নিত্য শ্রবণমন তৃপ্ত করেন, সেই স্নিগ্ধ মারুতহিল্লোলিত পাদপতলে শয়ন করিয়া নিত্য ইন্দ্রত্বস্বপ্নবিমিশ্রিত সুখনিদ্রায় অভিভূত হন, সেই শান্তিপবিত্রতাময় পাদপতলে সমাসীন হইলে, হিন্দুর চিন্তা সেই পরম ব্রহ্মের প্রতি ধাবিত হয়। হিন্দু ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

নারী যে শিক্ষার উপযুক্ত, নারীর যে শিক্ষার প্রয়োজন, নারীর যে শিক্ষা হইলে নারীর নিজ মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল সাধিত হয়,

হিন্দু নারীকে সেই শিক্ষা প্রদান করেন। কোমলাঙ্গী নারীর হৃদয় ও মন বড় কোমল, হৃদয় ও মনের বৃত্তি ও ভাবগুলি বড় কোমল। হিন্দু, নারীকে এমন শিক্ষা দেন যাহাতে সেই কোমল হৃদয়, কোমল মন, কোমল ভাব, কোমল বৃত্তিগুলি আরও কোমল হয়—যাহাতে হৃদয় বিশ্বব্যাপী হয়, মন প্রশান্ত হয়, ভাব প্রস্ফুটিত হয়, বৃত্তি নির্ম্মল হয়। ধর্ম্মশিক্ষায় তাহা করে—আর কোন ধর্ম্মে না করিতে পারে, হিন্দুধর্ম্মে তাহা করে। সেঁজুতির ব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া, কুমারী অবস্থায় বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে, হিন্দুনারী কত ব্রত ধারণ ও উদ্‌যাপন করে, তাহা হিন্দুতেই জানে। এই ব্রতানুষ্ঠানের জ্ঞানগর্ভ নীতি, পবিত্র উপদেশ ও স্বর্গীয় শিক্ষা মানবীকে দেবী করিয়া তুলে।

এই ত গেল হিন্দুনারীর ধর্ম্মনীতিশিক্ষা। এই ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আর যাহা যাহা শিক্ষা হয়, তাহা হিন্দুনারী ভিন্ন, জগতে আর কোন দেশে, নারীর সে শিক্ষা হয় কি না, তাহা কোন ইতিহাসে লিখে না। অতি বালিকাবস্থায় হিন্দুনারী যে পতিসেবা শিক্ষা পায় তাহা জগতে অতুলনীয়। পতিই হিন্দুনারীর ইহকালের আশ্রয় ও পূজ্য পদার্থ, পরকালের আশা ও গতিমুক্তি। শৈশবে এই পতিপূজার উদ্বোধন আরম্ভ হয়। শৈশবেই ধর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, হিন্দুমাতা হিন্দুকন্যার কোমল উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে এই পতিভক্তির বীজ বপন করেন। ধর্ম্মশিক্ষার সহিত এই শিক্ষা বিজড়িত, বিমিশ্রিত, একীভূত। পতিই হিন্দুনারীর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। হিন্দু-পত্নীর চিন্তা, কামনা, উদ্দেশ্য পতিপদেই সীমাবদ্ধ। পতিপদই হিন্দুপত্নীর ব্রহ্মপদ। এই নীতি কেবল পুঁথিতেই প্রকটিত নয়, বচনে বিবৃত নয়, উপদেশে নিহিত নয়। এই স্বর্গীয় নীতি হিন্দুপত্নীর হৃদয়ে—আজিকার এই পোড়া হিন্দুস্থানেও—হিন্দুপত্নীর অন্তরের অন্তরে, সেই পবিত্র স্থানে, সেই স্বর্গভূমে এই স্বর্গীয় নীতি দৃঢ়বদ্ধ। এই পতিভক্তির শক্তি সহায়ে হিন্দুনারী জড়জগতে ও অন্তর্জগতে সর্ব্ববিজয়িনী হয়েন। হিন্দুপত্নীর এই পতিভক্তিশিক্ষার বিরুদ্ধে ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্ম ও ভ্রষ্ট সমাজের অনেক মাথামুণ্ড তর্ক আছে, তাহা পরিশিষ্টে বিচার করা যাইবে। এক্ষণে দেখা যাউক, হিন্দুনারীর এতদ্ভিন্ন আর কি শিক্ষা হয়। পতিগৃহে যাইলে হিন্দুনারীর

ীক্ষা আরম্ভ হয়। তন্মধ্যে এক পরীক্ষা গৃহকর্ম্ম। গৃহকর্ম্ম না জানিলে তিগৃহে পৌরস্ত্রীগণ কন্যার নিন্দা করিবে, হিন্দুমাতা সে নিন্দার পথ পূর্ব্ব ইতে বন্ধ করেন, কন্যাকে বালিকাবস্থা হইতে সাধ্যমত গৃহকর্ম্ম শিখান। তিগৃহে গমনকালে হিন্দুপত্নী গৃহমার্জ্জনা হইতে দেবসেবা পর্য্যন্ত অগণিত ার্য্যে সুদীক্ষিতা। পতিভাগ্যের সহিত যাহার ভাগ্য একীভূত, তাহাকে সকল বস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। দাসদাসী না থাকিলে হিন্দুর গৃহকর্ম্ম ম্পাদনের জন্য উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। গৃহকর্ম্ম পড়িয়া থাকিলে পতিসেবার ত্রুটি হইবে, হিন্দুপত্নীর সে ত্রুটি অসহ্য। গৃহমার্জ্জনা, তৈজসমার্জ্জনা, ন্ধনক্রিয়া, শয্যারচনা এইরূপ প্রধান প্রধান গৃহকর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য শত াত কার্য্যেও হিন্দুপত্নীর ন্যায় ক্ষিপ্রকারিতা দাসদাসীতে সম্ভবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য, হিন্দুনারীর কোন্ শিক্ষার অভাব, যে আজি এই "মহাশিক্ষিত" বিলাতী সভ্যতালোকিত মহোদয়েরা হিন্দুনারীকে অশিক্ষিতা বলিয়া থাকেন? "ইউরোপীয় শিক্ষিতা ও মার্জ্জিতা নারী" এই কথাটা আজি কালি ঘন ঘন শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দু নারী কি শিক্ষিতা ও মার্জ্জিতা নয়? Educated এবং accomplished নয়? এই ইংরাজী কথা দুইটার যদি বাঙ্গালা অর্থ থাকে, এই শব্দ দুইটা যদি কোন দুর্ব্বোধ্য দেব বা দানব ভাষান্তর্গত না হয়, তবে হিন্দুনারীর ন্যায় শিক্ষিতা, মার্জ্জিতা, Educated, accomplished নারী জগতের আর কোন দেশে নাই। আর কোন দেশের শিক্ষামার্জ্জনাগৌরবান্বিত নারীবৃন্দ হিন্দুনারীর পাদপদ্মের সেবাদাসী হইবারও উপযুক্ত নয়। যদি গুণ লইয়াই কথা হয়, তবে গুণে হিন্দুনারী সাক্ষাৎ দেবী, ও তাহার তুলনায় অন্য দেশীয়া শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা নারীকে মানবী, দানবী বা রাক্ষসী বলিতে হইবে।

শান্তিসংস্থাপনই সমাজগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন দেখা যাউক, সমাজে সেই শান্তিসংস্থাপনের জন্য নারীর উপর কি কি কার্য্যভার ন্যস্ত। পুরুষ সংসার নির্ব্বাহের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবেন। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া পুরুষ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিশ্রাম করিবেন। নারী সেই বিশ্রামবাসের কার্য্যকর্ত্রী। পরিশ্রমের পর গৃহে আসিয়া যাহাতে পুরুষ বিশ্রাম উপভোগ করিতে পারেন, বিষয়ব্যাপারবিক্ষুব্ধ মন যাহাতে শান্তিস্নিগ্ধ হয়, গৃহকর্ত্রীর তাহাই সর্ব্বপ্রধান

কার্য্য। ইহা না হইলে, পুরুষ পরিশ্রমে উৎসাহিত হইবে না, পরিশ্রম না করিলে অর্থোপার্জ্জন হইবে না, অর্থোপার্জ্জন না হইলে সংসার চলিবে না, সংসার না চলিলে দীনদরিদ্রপরিপূর্ণ সমাজে শান্তি থাকিবে না। হিন্দুপত্নী পতির জন্য বিশ্রামের সেই সকল উপকরণ প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই শান্তির সুধাময় সরবৎ শ্রান্ত পতির মুখে তুলিয়া দেন। তখন শ্রম অপনোদিত হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিত হয়, হৃদয় শান্ত হয়, মন তৃপ্ত হয়, চিন্তা ধর্ম্মপথে ধাবিত হয়। এই ধর্ম্মপথেও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সঙ্গিনী। তখন পুরুষ নারীকে যত জ্ঞান দিতে লাগিলেন, নারী ভক্তিপ্রদানে তাহা পরিশোধ করিতে লাগিলেন। পুরুষ যত বহির্জগতের কথা বলিতে লাগিলেন, নারী তত অন্তর্জগতের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে পুরুষ হারি মানিলেন, বলিতে বলিতে পুরুষের মনোবৃত্তিগুলি; পুরুষের হৃদয় ভাবগুলি কোমল হইল, রূঢ় প্রকৃতি মার্জ্জিত হইল। ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইয়া, ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া, ভক্তিচক্ষে সম্মুখস্থ মানবীকে দৈবী দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলেন নারী

“ কি গ্রন্থ নরের জ্ঞান হেতু !
স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যবধানে কি শোভন সেতু ! ”

হরি ! হরি ! পুরুষ ধ্যানে নিমগ্ন !—

“ সবিলাস বিগ্রহ মানস-সুষমার !
আনন্দের প্রতিমা আত্মার !
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার !
মুগ্ধময়ী মুরতি মায়ার !
যত কাম্য হৃদয়ের
সংগ্রহ সে সকলের—
কি বুঝাব ভাব রমণীর ?
মণিমন্ত্রমহৌষধি সংসার কণীর ! ”

তখন পুরুষ মহোল্লাসে দেবীকে হৃদয়ে টানিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য মর্ত্ত্য স্বর্গ হইল !

আর নারীর ? এ ধর্ম্মজীবনে, এই পতিসেবায় নারীর কি কোন সুখ নাই ? আছে—নারীর যাহা সুখ তাহা পুরুষের নাই। পতিপদই নারীর

ব্রহ্মপদ। নারীর গতিমুক্তি সেই ব্রহ্মপদে, চর্ম্মচক্ষুর সম্মুখে—সেই পতিপদে। নারীর ধর্ম্মচিন্তা সীমাবদ্ধ, পুরুষের মহাসাগরের ন্যায় অসীম। হিন্দু পুরুষের ধর্ম্ম চিন্তার কূল নাই। নারীকে কূলে উঠাইয়া, হিন্দু পুরুষ অকূলে ভাসেন। তার পর, ভালবাসিয়া কি সুখ নাই? প্রাণ ভরিয়া, প্রাণ পাতিয়া, আশ মিটাইয়া ভালবাসিয়া কি সুখ নাই? যে মুহূর্ত্তের জন্যও ভালবাসিয়াছে, সেই জানিবে ভালবাসিয়া হিন্দুনারী কি অনন্ত সুখ, অনন্ত প্রীতি সম্ভোগ করে। আহা! এই ধর্ম্মশিক্ষা, এই প্রেমশিক্ষা হিন্দু নারীকে কে শিখাইল?

এখন হিন্দুনারীর বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে পারিলে এই প্রবন্ধ লিখার যন্ত্রণা এড়াইতে পারি। হিন্দুসমাজ যে ধারায় গঠিত, হিন্দুসংসার যে নিয়মে সংরক্ষিত, তাহাতে হিন্দুনারীর যৌবনবিবাহ হইতে পারে না। হিন্দুসংসার একান্নভুক্ত। এই একান্নভুক্ত হিন্দুসমাজ এক একটী ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট। ইহাতে গবর্ণর জেনরেল আছে, লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণর আছে, কমিশনরগণ আছে, জেলা-প্রতিনিধি আছে। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সকল নিম্ন কর্ম্মচারী যেমন গবর্ণর-জেনারেলের অধীন, তেমনি হিন্দুসংসারের সকলেই কর্ত্তা মহাশয়ের অধীন। এই কর্ত্তার একটী গিন্নি আছেন। তিনি জেনানা বিভাগের 'কর্ত্তা'। তাঁহার পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ তাঁহার আজ্ঞাধীন। রন্ধন হইতে দেবসেবা পর্য্যন্ত কার্য্যসম্বন্ধে তিনি অপ্রতিহত প্রতাপশালিনী। তিনি যাহা করেন, যাহা হুকুম করেন, তাহাই হয়। তিনি যাহা করেন তাহাতেই হিন্দুসংসারের মঙ্গল সংসাধিত হয়, হিন্দুসংসার সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হয়, হিন্দু খাইয়া বাঁচে, পরিয়া বাঁচে, শুইয়া বাঁচে। কর্ত্তা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্ববিভাগের আয় সংগ্রহ ও একত্রিত করিয়া ব্যয় করেন। আয়ের বিভাগগুলি বড় অল্প, ব্যয়ের বিভাগগুলি গুণিয়া পাওয়া যায় না। স্বজনমণ্ডলী পুরুষস্ত্রী যে যেখানে আছেন, সকলেরই আহারবসনভূষণের ভার তাঁহার হস্তে। ইহার মধ্যে মাসতুত ভাইয়ের পিসতুত ভগ্নী আছেন, এবং মামাত ভগ্নীর পিসতুত নাতিও বিদ্যমান। ইহাদের খাইবার সংস্থান নাই, না খাইতে দিলে মরিবে। হিন্দুসমাজে লাইফ ইন্সুয়রান্স ফণ্ড নাই। সঙ্গতিপন্ন স্বজনই হিন্দুর ইন্সুয়রান্স ফণ্ড। হিন্দুর পুত্রবধূ সেই মাসতুতভায়ের পিসতুত ভগ্নী ও মামাত ভগ্নীর পিসতুত নাতি সম্বলিত সংসারে

আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। বাস করিতে করিতে, স্বামিসেবা শিখিতে শিখিতে, শ্বশুরসেবা, শাশুড়ীসেবা শিখিতে শিখিতে সমগ্র পরিবারের সেবা শিখিয়া ফেলেন। শ্বশুর শাশুড়ীর অন্তর্ধ্যান হইলে, পুত্রবধূর ঘোমটা খসিলে, স্বামীর উপর একাধিপত্য স্থাপিত হইলেও পরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার স্নেহ সমান বর্ত্তমান! "কর্ত্তা গিয়াছেন, গিন্নি গিয়াছেন, বধূমাতা আছেন—বধূমাতা বাঁচিয়া থাকুন!" বধূমাতা এ আশীর্ব্বাদের যথাযোগ্য পাত্রী। তিনি অন্নপূর্ণা; তিনি অনাথের সহায়, বিপন্নের আশ্রয়, হিন্দুসংসার মধ্যে শান্তির একমাত্র কেন্দ্র! হিন্দুগৃহের গৃহলক্ষ্মী!

ইংরাজি-শিক্ষিতা, বিদ্যা-গর্ব্বিতা, কোর্টসিপ-লব্ধা ফুল্লযুবতী পুত্রবধূ হিন্দুসংসারে অকস্মাৎ প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি করিবেন। হাতের বরণডালা হাতেই রাখিয়া শাশুড়ী একহস্ত লম্বিত ঘোমটা টানিয়া লজ্জা নিবারণ করিবেন। গৃহিণীর অঞ্চলধারণ ভিন্ন কর্ত্তা মহাশয়ের ভয় দূর হওয়া সুকঠিন। নববধূর বুট-তলে দুষ্কালক্ক না শুখাইতে শুখাইতে পুরুষস্ত্রীগণ পলায়ন পথান্বেষণে ব্যতিব্যস্ত। এক নিশীথের "মশারি-বক্তৃতার" পর প্রাতে মহাপ্রলয়ক্রিয়া সমাপ্ত! নোয়ার আর্কের ভিতরে কেবল নবদম্পতী পরিদৃশ্যমান!

সাদা কথাটা এই, অগ্রে হিন্দুসমাজ, হিন্দুসংসার নূতন পদ্ধতিতে, ইংরাজী ধরণে গঠিত কর, তাহার পর হিন্দুস্ত্রীর যৌবন-বিবাহ দিয়া পঞ্চশত ডাইভোর্স কোর্টের কলঙ্ক-রহস্য বৃদ্ধি করিতে পার। আধুনিক উচ্চশিক্ষিতা দিগের স্বামিগণ কিরূপ পত্নীসুখ সম্ভোগ করেন, তাহা আর আজকাল তাঁহাদিগকে খুলিয়া বলিতে হয় না। সম্প্রতি সম্প্রদায় বিশেষের জন্য একটী ডাইভোর্স কোর্টের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান আন্দোলনে দেশী-খৃষ্টান সম্প্রদায় বলিতেছেন তাঁহারা যুবতী পত্নী চাহেন না, বালিকা হিন্দুপত্নী চাহেন। ষ্টেট্সম্যান সম্পাদক রবার্ট নাইট সাহেব বলিতেছেন, "বিলাতী যুবতী-বিবাহে সুখ নাই, বুঝি বালিকা-বিবাহে আছে। তোমরা সুখে আছ, দাদা! আমাদের কোর্ট-সিপের মুখে ছাই!" কথা এই, যৌবনে যুবক কিম্বা যুবতীর মাথার ঠিক

থাকে না, রূপজ মোহ স্থিরবুদ্ধিকে নষ্ট করে। বাহ্য সৌন্দর্য্য, বাহ্য গুণই যুবক যুবতীর নয়ন মন উন্মত্ত করিয়া তুলে। মাথায় রূপের আগুণ জ্বলিয়া উঠিলে, বুদ্ধি, বিচার, দূরদর্শিতা সেই আগুণে দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সময়ে সে আগুণ নিভে। তখন ডাইভোর্স কোর্টে সেই দগ্ধ বুদ্ধি, দগ্ধ বিচার, দগ্ধ দূরদর্শিতার সহিত দগ্ধ হৃদয়ের একত্রে শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাহিত হয়।

বলিবার আরও কথা আছে। তবে ছুতারের মেয়েকে লইয়া এত হাঙ্গামার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু ছুতারের মেয়ে যদি এখনও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে চায়, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতে আমি—হিন্দু ব্রাহ্মণ—প্রস্তুত।

যাও, রুক্মা, ঐ জাগ্রতা মহালক্ষ্মী-পদে পতিনিন্দা মহাপাপ ন্যস্ত করিয়া, ঐ সমুদ্র-সৈকতে পতিপদে ক্ষমা ভিক্ষা লইয়া, ঐ সাগরতলে গিয়া শয়ন কর! এই প্রায়শ্চিত্তের ফলে তুমি পরজন্মে আবার হিন্দুনারী হইতে পার। তখন পতিপদ সেবা করিয়া পতিপদ ভেলায় অনায়াসে এই ভবসাগর পার হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গাঁথা মালা।

সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার!
সারা বন বুলে বুলে
বন-ফুল তুলে তুলে,
গাঁথিনু চিকণ মালা
দিব কারে উপহার?
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার!

হৃদয়ে বাসনা ভ'রে
গাঁথিলাম যার তরে,
সে কোথা চলিয়ে গেছে
জানিনে ত কিছু তার;
কেন তবে গেঁথে মালা
মিছে বাড়াইনু জ্বালা,
হৃদয় ডুবায়ে দিনু
শোক-হ্রদে নিরাশার?

সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার!

আগে ত জানিনে মালা
গাঁথিলে কাঁদিতে হবে,
কাঁদিতে সাধনা ক'রে
কে মালা গাঁথিত তবে?
এত আশা ল'য়ে মনে
কে আসিত ফুল-বনে,
লতিকারে ব্যথা দিতে
কে হরিত ফুল তার?
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার!

গেয়ে এসেছিল অলি
চুমিতে কুসুম-কলি,
ফিরে তারা চ'লে গেল
ক'রে সবে হাহাকার!
তরু-তলে ফেলে গেল
বিরলে নয়নাসার!
আমি যেন তাই নিয়ে,
মালা গেঁথে তাই দিয়ে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি
আশা-পথ চেয়ে তার;
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইলসার!

অতি অবশেষ নিশি,
শেফালি পড়িছে খসি,
উষারে জাগাতে আসি
ডাকে বায়ু বারেবার;
অলসে আকাশ গায়
ম্লান চাঁদ ডুবে যায়,
তারা/মালা পড়ে খ'সে—
যামিনীর গাঁথা হার!
আমি শুধু সারা নিশি
প্রহর গণিনু বসি,
ফুল-দল পড়ে খসি,
ফুরায় সুরভি-ভার;
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার!

প্রাণের মাঝারে আজি
উথলে যমুনা-জল,
কি দিয়ে কেমনে সখি
রোধিব তাহারে বল!
জীবন সে কোন্ পুরে
আলয় খুঁজিছে দূরে,
হৃদয় যে ভেঙেচুরে
হ'য়ে গেল একাকার;
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল-সার!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

শাক্যসিংহের তপস্যা।

কথিত আছে, বুদ্ধদেব নৈরঞ্জনানদীতীরে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত উৎকটতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং অবিচ্ছেদে ৬ বৎসর তাদৃশ উৎকট তপস্যা করিয়াও তিনি নির্ব্বাণ বা স্বাভিমত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে বোধি-দ্রুম-তলে গমন পূর্ব্বক ধ্যানের অভিনব পথ উদ্ভাবন করতঃ কেবল ও বিশুদ্ধ নির্ব্বাণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভগবান্ শাক্যসিংহ যেরূপ উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন, সেরূপ উৎকট তপস্যা কেহ কখন করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। বৌদ্ধেরা বলে, যাহারা ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবে এবং যাহারা আস্ফানক ধ্যান করিতে সমর্থ, তাহারাই কেবল তাদৃশ দুশ্চর তপস্যা করিতে পারে, অন্যে পারে না। (আস্ফানক ধ্যান কি তাহা পরে ব্যক্ত হইবে।)

বুদ্ধদেব শিষ্যগণের নিকট বলিয়াছিলেন—"শিষ্যগণ! আমি ইহলোকে অদ্ভুত অনুষ্ঠান দেখাইবার জন্য, শাস্ত্রকারগণের দর্পবিঘাতের জন্য, পরপ্রবাদীদিগকে নিগ্রহ করিবার জন্য, কর্ম্মক্রিয়াপরিত্যাগীদিগের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য, পুণ্য উদ্ভাবনের জন্য, জ্ঞানবল লাভের জন্য, বুদ্ধ-জ্ঞান সাক্ষাৎকারের জন্য, ধ্যানের অঙ্গবিভাগ স্থির করিবার জন্য, চিত্তের স্থিরতা ও মনের প্রভূত বল উৎপাদনের জন্য তাদৃশ উৎকট তপস্যা করিয়াছিলাম*।" বুদ্ধের এই কথায় বেশ বুঝা যাইতেছে, বুদ্ধদেব তপস্যাকে এফল বলিয়া জানিতেন বা মনে করিতেন, এবং তপস্যা করিলে যে ঐ সকল ফল অবশ্যম্ভাবী, ইহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

হিন্দুদিগের পুরাণাদি-শাস্ত্রে ঋষিমুনিদিগের যেরূপ দুশ্চর তপস্যাপ্রণালী শুনা যায়, শাক্যসিংহের তপস্যাপ্রণালীও প্রায় সেইরূপ, পরন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যের সহিত পূর্ব্ব মুনিদিগের উদ্দেশ্যের একরূপতা ছিল কি না সন্দেহ। শাক্যসিংহের তপস্যা আর পূর্ব্ব মুনিগণের তপস্যা উদ্দেশ্যবিষয়ে ভেদ

* ললিতবিস্তরের ১৭ অধ্যায় দেখ।

থাকাতেই বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় কিন্তু বাহ্য অনুষ্ঠানে কিছু মাত্র বিভিন্নতা দেখা যায় না।

শাক্যসিংহের তপস্যা কিরূপ? তিনি কি প্রকার তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বীক্রমে বর্ণিত হইতেছে। তদ্ যথা—

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শাক্যসিংহ বুদ্ধসংকল্পধারণ ও প্রবল উৎসাহ আহরণ পূর্ব্বক নৈরঞ্জনাতীরে তৃণময় ভূমিতে যোগাসন ন্যস্ত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে প্রবলবল চিত্তের দ্বারা স্বকীয় শরীরনিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন *। যেমন বলবান্ পুরুষ দুর্ব্বল পুরুষের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক নিষ্পীড়িত করে, ভগবান্ শাক্যসিংহ তদ্রূপ ইচ্ছাবেগসমুদ্দীপিত প্রবলবল চিত্তের দ্বারা শরীরকে নিষ্পীড়িত বা নিগৃহীত করিতে লাগিলেন। শরীরক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি যতই নিষ্পীড়িত হইতে লাগিল, নিরুদ্ধ হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কক্ষ ও ললাট দিয়া ঘর্ম্মনিস্রাব হইতে লাগিল। নিদারুণ শীতকাল, বিশেষতঃ রাত্রি, তাহাতে আবার নিরাচ্ছাদিত নদীতীর—তথাপি তাঁহার দেহে ঘর্ম্মস্রোত বহিল † ।

নিগ্রহযোগ আয়ত্ত হইলে শাক্যসিংহ ভাবিলেন, এখন আমি আস্ফানক ধ্যান করিব। কুম্ভকযোগে মনোবৃত্তির লয় করার অথবা বাহ্য চৈতন্য হরণ করার নাম আস্ফানক ধ্যান। এই ধ্যানের কোনরূপ অবলম্বন নাই; সুতরাং ইহা নিরালম্ব-ধ্যান। শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মনোবৃত্তির অনুত্থান করতঃ এই ধ্যান নিষ্পন্ন করিতে হয়। ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, "আশ্বাসপ্রশ্বাসানুরূপরোধয়তি—সন্নিরোধয়তি। অকম্পং তদ্ধ্যানং অবিকম্পমনিঙ্গনমপনীতমস্পন্দনং সর্ব্বত্রানুগতঞ্চ সর্ব্বত্র চানিঃস্থতম্।" আস্ফানক-ধ্যানে শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিতে হয়; এ ধ্যান নিষ্কম্প, নিশ্চল, নিস্পন্দ, সর্ব্বানুগত ও সর্ব্বত্র অনিঃস্থত অর্থাৎ পূর্ণ। "আকাশসমং তদ্ধ্যানং তেন চোচ্যতে আস্ফানকমিতি।" এই ধ্যান আকাশের ন্যায় অর্থাৎ আকাশের

* অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

† আমাদের যোগশাস্ত্রে যাহাকে শম-দম-সাধন বলে, বৌদ্ধেরা তাহাকে শরীরনিগ্রহ বলে। শাক্যসিংহ কয়েক মাস ব্যাপিয়া এই নিগ্রহ সাধন করিলেন এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভও করিলেন।

স্ফুরণ যদ্রূপ, ইহাতে চিত্তের অবস্থা তদ্রূপ *। অনন্তর আস্ফানক ধ্যান অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহার মুখ-নাসিকার বায়ু অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস অবরুদ্ধ হইল। মুখনাসিকাপথ অবরুদ্ধ হইলে শরীরে কুম্ভবৎ পরিপূর্ণ বাহ্য বায়ু প্রবলবেগে মহাশব্দে কর্ণছিদ্র দিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তিনি পুনরপি আস্ফানক ধ্যান অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ কুম্ভিত বায়ু যাহাতে কর্ণপথে না যায় তদুপযোগী উপায় অবলম্বন করিলেন। এই দ্বিতীয় আস্ফানক ধ্যানে তাঁহার মুখ, নাসিকা, শ্রোত্র, সমস্তই রুদ্ধ হইল। কুম্ভিত বায়ু তখন উর্দ্ধগামী হইয়া তাঁহার শিরঃকপালে গিয়া (মাথার খুলির অভ্যন্তর ভাগে গিয়া) আঘাত করিল। এই তৃতীয় উদ্‌ঘাত কালে তাঁহার কুণ্ডলী (চেতনা শক্তি) শিরঃকপালে অর্থাৎ চিত্তস্থানে (মস্তিষ্কে) গিয়া একীভূত বা বিলয়প্রাপ্ত হইল। এখন তিনি নিশ্চল, নিস্পন্দ †। বুদ্ধদেবের এই কুম্ভকসমাপ্তি লিখিতে গিয়া আর্যযোগীর নিম্নলিখিত কথা মনে পড়ে।—

"যং ধ্যায়ন্তি বুধাঃ সমাধি সময়ে
শুদ্ধং বিয়ৎ সন্নিভম্" ইত্যাদি।

এই সময়ে কোন কোন দর্শক লোক তাঁহাকে মৃত বিবেচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা বলে, এবং ললিতবিস্তর গ্রন্থেও লিখিত আছে, এই দিবসের অর্দ্ধ-রাত্র সময়ে বুদ্ধমাতা মায়া দেবী স্বর্গ হইতে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। পুত্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া তিনিও রোদন করিয়াছিলেন। তদ্ যথা—

"যদা জাতোঽসি মে পুত্র! বনে লুম্বিনিসাহ্বয়ে।
সিংহবচ্চাগৃহীত স্ত্বং ক্রান্তঃ সপ্ত পদান্ স্বয়ম্॥
দিশশ্চালোক্য চতুরো বাচা তে ব্যাহৃতা শুভা।
ইয়ং মে পশ্চিমা জাতিঃ সা তে ন পরিপূরিতা॥
অসিতেনাভিনির্দ্দিষ্টো বুদ্ধোলোকে ভবিষ্যতি।
ক্ষুন্নং ব্যাকরণং তস্য ন দৃষ্টা তেন নিত্যতা॥

* আমাদের যোগ শাস্ত্রে ইহাকে কুম্ভক-সমাধি বলে।

† "তদ যথাপি নাম ভিক্ষব: পুরুষঃ কুণ্ডয়া শক্ত্যা শিরঃ কপালং মুপহন্যাৎ। ইত্যাদি। লং। কেহ কেহ কুণ্ড শব্দের মৃৎপাত্র অর্থ লক্ষ্য করিয়া এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। "যেমন কোন পুরুষ বলপূর্ব্বক মস্তকে কুণ্ডাঘাত করে, অবরুদ্ধ বায়ুও সেইরূপ আঘাত করিল।"

চক্রবর্ত্তিশ্রিয়ং পুত্র ! নাপি ভুক্তা মনোরমা।
ন চ বোধিমনুপ্রাপ্তা জাতোঽসি নিধনং বনে ॥
পুত্রার্থে কং প্রপদ্যামি কস্য ক্রন্দামি দুঃখিতা।
*   *   *   * ॥

পুত্র ! তুমি যখন লুম্বিনি-বনে জন্মগ্রহণ কর, তখন তুমি সিংহবিক্রমে সপ্ত পদ গমন করিয়াছিলে। চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলে, এই আমার শেষ জন্ম, আর আমি জন্মগ্রহণ করিব না। কিন্তু হায়! তোমার সে বাক্য সফল হইল না। অসিত মুনি বলিয়াছিলেন, তুমি বুদ্ধ হইবে, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, সেই ঋষিবাক্য মিথ্যা হইল। পুত্র! তুমি মনোরম রাজশ্রী ভোগ করিলে না, বুদ্ধও হইলে না। বনে জন্মিয়াছিলে এবং বনেই নিধনপ্রাপ্ত হইলে। এখন আমি পুত্র বলিয়া কাহার নিকট যাইব, কাহার নিকটেই বা কাঁদিব!

রোদনশব্দে বুদ্ধের যোগ ভঙ্গ হইল। নেত্র উন্মীলিত হইল। তিনি দেখিলেন, এক দিব্যরূপা নারী রোদন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কৈষাতীব করুণং রুদতে
প্রকীর্ণকেশী চ বিবৃত্তশোভা।
পুত্রং হ্যতীব পরিদেবয়ন্তী
বিচেষ্টমানা ধরণীতলস্থা ॥"

কে তুমি আলুলায়িতকেশী ও দুঃখে অশোভমানা হইয়া অত্যন্ত করুণ বিলাপ করিতেছ? পুত্র পুত্র বলিয়া রোদন করিতেছ? আর ধুল্যবলুণ্ঠিতা হইতেছ?

মায়াদেবী প্রত্যুত্তর করিলেন,—

"ময়া তু দশ মাসান্ বৈ কুক্ষৌ বজ্র ইব ধৃতঃ।
সা তেঽহং পুত্রকা মাতা বিলপামি সুদুঃখিতা ॥"

পুত্র! আমি তোমাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, আমি তোমার মাতা। অতি দুঃখে বিলাপ করিতেছি!

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দয়ার্দ্র হইলেন এবং আশ্বাসবাক্য উচ্চারণ করিলেন।

বলিলেন, "ন ভেতব্যম্। শ্রমং তে সফলং করিষ্যামি।" ভয় নাই—আমি আপনার কষ্ট দূর করিব। অসিত মুনির বাক্য মিথ্যা হইবে না—নিশ্চিত আমি বুদ্ধ হইব।

" অপি শতধা বসুধা বিকীর্য্যতঃ
মেরুঃ প্লবে চাম্ভসি রত্ন শৃঙ্গঃ।
চন্দ্রার্ক তারাগণ ভূপতেত
পৃথগ্ জনো নৈব অহং মিয়েঽহম্॥"

যদি পৃথিবী শতধা বিকীর্ণ হয়, সুমেরু পর্ব্বত জলে প্লবমান হয়, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা ভূপতিত হয়, তথাপি আমি প্রাকৃত মানুষ্যের ন্যায় মরিব না। আপনি শোক করিবেন না, আমার জন্য চিন্তা করিবেন না, শীঘ্রই দেখিবেন, আমি বোধিপ্রাপ্ত হইয়াছি।

এইরূপে ভগবান্ বোধিসত্ত্ব দুঃখিনী জননীকে আশ্বাসিত করিয়াছিলেন, এবং মায়াদেবীও কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া অপ্সরোগণ সহ পুনর্ব্বার তুষিতপুরে গমন করিয়াছিলেন।

কিছুকাল গত হইল। একদা শাক্যসিংহের মনে হইল, ব্রাহ্মণগণ ও যতিগণ বলিয়া থাকেন, অল্পাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; অতএব আমিও অল্পাহার আশ্রয় করিব। অনন্তর তিনি কোন দিন একটী মাত্র কোলফল, একটী মাত্র তিল, কখন একটী তণ্ডুল কখন বা বারিমাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন এবং অহরহ ও নিরন্তর আস্ফানক ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইল, তথাপি ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন না এবং আহার গ্রহণও করিলেন না। কিছুকাল অতীত হইলে, পুনর্ব্বার তাঁহার মনে হইল, শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা অনাহার দ্বারা বুদ্ধি নির্ম্মল হওয়ার কথা বলিয়া থাকেন; অতএব আমিও অনাহার-ব্রত অবলম্বন করিব। পরে অনাহার-ব্রতেও কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। এই সময়ে তাঁহার শরীর এত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, কেবলমাত্র কয়েক খানি শুষ্ক অস্থি ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁহার শরীরে পরিদৃশ্য হইত না এবং ঈদৃক্ অবস্থাতেও তিনি ধ্যানচ্যুত হন নাই।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধজ্ঞান লাভের

প্রত্যাশায় ছয় বৎসর পর্য্যন্ত অল্পাশন ও অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া নিয়তকাল অচলবৎ, স্থিরবৎ, স্থাণুবৎ ও নিস্পন্দ জড়বস্তুবৎ স্থিরভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য সমাধিতে অবস্থিত ছিলেন। শত শত শীত, বাত, আতপ, বর্ষা, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, বজ্র,—তাঁহার শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি তত্তদ্বিষয়ে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও হয় নাই। প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক একাসনে কাল কর্ত্তন করিয়াছিলেন, একদিনও ভাল করিয়া জানু প্রসারণ করেন নাই। তাঁহার শরীর এত নির্ম্মাংস কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, একগাছি তৃণ বা কার্পাসসূত্র তাঁহার নাসা দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া কর্ণ দিয়া বাহির করা যাইত এবং কর্ণ দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া মুখদিয়া বাহির করা যাইত। তাঁহার আকার এমনই বিকৃত হইয়াছিল যে, গোপবালক প্রভৃতি তাঁহাকে পাংশুপিশাচ মনে করিয়া তাঁহার গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৌতুক করিত। তাদৃক্ কঠোর সাধনে তাঁহার কাঞ্চননিভ কান্তি কালিমায় পরিণত হইয়াছিল। শরীরের রক্তমাংস শুকাইয়া গিয়াছিল। নয়ন কঠোর মগ্ন, কণ্ঠা বহিরাগত, পঞ্জর দৃশ্যমান্ এবং মেরুদণ্ড উত্থিত হইয়াছিল। যখন ছয় বৎসর পূর্ণ হয়, তখন আর তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না।

ঐ গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে রাজা শুদ্ধোদন চার-পুরুষের দ্বারা শাক্যসিংহের এই তপোবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া প্রতিদিন তাঁহার সংবাদ লইতেন এবং তাঁহার পরিদর্শনার্থ লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, এই সময়ে কামাধিপতি মার তাঁহাকে তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং নিম্নলিখিত প্রকারে প্রলোভিত করিয়াছিল। যথা—

"শাক্যপুত্র! সমুত্তিষ্ঠ কায়খেদেন কিং তব।
জীবতো জীবিতং শ্রেয়ো জীবন্ ধর্ম্ম চরিষ্যমি॥
কৃশো বিবর্ণোদীনস্ত্বংঅন্তিকে মরণং তব।
সহস্রভাগে মরণং এক ভাগে চ জীবিতম্॥
দুঃখোমার্গঃ প্রহাণস্য দুস্করশ্চিত্তনিগ্রহঃ।
ইমাং বাচং তদা মারো বোধিসত্ত্বমথাব্রবীৎ॥"

জ্ঞানবীর শাক্যসিংহ কামের ঈদৃক্ প্রলোভনে মুগ্ধ হন নাই; প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ আহরণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"প্রমত্তবন্ধো, পাপীয়াং স্বেনার্থেন ত্বমাগতঃ।
অণুমাত্রং হি মে পুণ্যৈরর্থো মার! ন বিদ্যতে॥
অর্থো যেষান্তু পুণ্যেন তানেবং বক্তুমর্হসি॥"

ইত্যাদি।

প্রমত্ত পুরুষের বন্ধু অরে পাপিষ্ঠ কাম! তুই স্বকার্য্য সাধন করিতেই আসিয়াছিস্। আমি পুণ্যপ্রার্থী নহি; যে পুণ্য কামনা করে, তাহাকে গিয়া তুই ঐ সকল কথা বল্। তুই আমার মরণের কথা বলিতেছিস্ কিন্তু আমি মরণ মানি না; কেন না, মরণান্তই আমার জীবন। আমি তোর কথা শুনিব না, ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থান করিব। সমাহিত ব্যক্তির শরীর শুষ্ক হইলে মাংস শুষ্ক হয়, মাংস ক্ষীণ হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়, চিত্ত নির্ম্মল হইলে প্রজ্ঞা জন্মে, প্রজ্ঞা জন্মিলে অতিশক্তিভাক্ উৎসাহ জন্মে, তদ্বলে তখন সমাধি প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে। আমিও ঐরূপে তপস্যা করিব এবং সর্ব্বোত্তম বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিব *।

এইরূপে তিনি কামকে পরাভূত করিলেন; কাম প্রতিগমন করিলে তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন,—

"নায়ং মার্গোবোধের্নায়ং মার্গো আয়ত্যাং জাতিজরামরণসম্ভবানামস্তঙ্গমায়।" আমি যাহা করিতেছি, ইহা (এই আস্ফানক ধ্যান) বোধি-লাভের পথ নহে, সুতরাং ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ-নিবারণের উপায়ও নহে। পরে এই ভাব মনে উঠিল যে, "যোহহং পিতুরুদ্যানে জম্বুচ্ছায়ায়াং নিষণ্নে বিবিক্তং কামৈর্বিবিক্তং পাপকৈরকুশলৈর্ধর্ম্মৈঃ সবিতর্কং সবিচারং বিবেকজ

---

* কোন এক লক্ষ্য লাভের উদ্দেশে কষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শীঘ্র লক্ষ্য লাভ হইলে মনের নানা প্রকার লক্ষ্যবিপর্য্যয়কারী আন্দোলিতাবস্থা জন্মে, অর্থাৎ কষ্ট করি ইচ্ছা হয় না। সেই সকল আন্দোলনের নাম কাম বা সুখপ্রলোভন। শাক্যসিংহের ম চকিতের ন্যায় ঐরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা বিক্রমদ্বারা দূরী করিয়াছিলেন।

প্রীতি সুখং প্রথমং ধ্যানং উপসম্পদ্য যাবৎ চতুর্থধ্যানমুপসম্পদ্য ব্যহার্ষং স্যাৎ স মার্গো বোধের্জাতিজরামরণদুঃখ সমুদায়ানামসম্ভবায়াস্তংগমায়।" পূর্ব্বে আমি যে পিতার উদ্যানে জম্বুবৃক্ষছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া কামমুক্ত, পাপমুক্ত ও অকুশলধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া বিবেকজাত সবিতর্ক ও সবিচার নামক প্রথম সমাধি করিতাম; পরে চতুর্থধ্যানে অর্থাৎ নির্বীজ সমাধিতে বিহার করিতাম, তাহাই বোধিলাভের, নির্ব্বাপকজ্ঞান লাভের, ভবিষ্যৎ-জন্ম-জরা-মরণ-বিনাশের পথ বা উপায়। কিন্তু, সে পথ এরূপ দুর্ব্বল শরীরের গন্তব্য নহে, প্রাপ্যও নহে। এ শরীরে আমি বোধিদ্রুম-তলে যাইতে অক্ষম। এজন্য, এক্ষণে আমার ঔদরিক আহার দ্বারা অগ্রে বলসঞ্চার করা আবশ্যক হইয়াছে। মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া ভগবান্ বোধিসত্ত্ব শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিব। পরে প্রথম দিনে তিনি মুদ্গযূষ পান করিলেন, অনন্তর দিবসে কুল্মাষযুক্ত অন্ন ভক্ষণ করিলেন।

তাঁহার সেই শিষ্যপঞ্চক শাক্যসিংহের তাদৃশ আহারতৎপরতা দেখিয়া ভাবিল, এই গৌতম ছয় বৎসর কাল এত কঠোর তপস্যা করিয়াও মনুষ্যোত্তর ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার। করিতে পারিল না। এক্ষণে এ ঔদরিক হইল, এখন আর এই ঔদরিকের নিকটে থাকিয়া ফল কি? এটা নিতান্তই বালক, সুখপ্রসক্ত ও কপট। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই শিষ্যপঞ্চক তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীগমন করিল, এবং তত্রস্থ মৃগদায় ও ঋষিপত্তন নামক স্থানে গিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইল।

উরুবিল্লের নিকটে নন্দিক নামে এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের অধিপতির একটী কন্যা ছিল। কন্যাটীর নাম সুজাতা। সুজাতা অতিশয় সাধ্বী, ব্রতপরায়ণা ও পতিব্রতা। সাধু সন্ন্যাসী ও শ্রমণদিগের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল। এমন কি তিনি সাধু সন্ন্যাসীর সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এই সুজাতা, যে দিন শুনিয়াছিল, নৈরঞ্জনাতীরে এক জন পরম তপস্বী আসিয়াছেন, সেই হইতেই তিনি প্রতিদিন নিজ সখিগণসহ এই নব সন্ন্যাসীর সেবা ও বন্দনা করিতে নৈরঞ্জনাতীরে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য অনেক কন্যা আসিত। শাক্যসিংহ যখন কেবল মাত্র তিল, তণ্ডুল ও কোল ফল ভক্ষণ করিতেন,

তখন এই সুজাতাই তাঁহাকে ঐ সকল খাদ্য উপস্থিত করিয়া দিত। এক্ষণে এই সুজাতাই আবার তাঁহাকে মুদ্গযূষ ও অন্ন আনিয়া দিতে লাগিল। সুজাতার প্রদত্ত অন্নভোজনে ক্রমে তাঁহার দেহে পূর্ব্ববৎ বল-বর্ণাদি আগমন করিল। শরীরে বলসঞ্চার হইলে, তিনি আর সুজাতার আনীত ভক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই, নিকটবর্ত্তী গোবর গ্রামে গিয়া অন্নভিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা আহারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

একদিন দেখিলেন, তাঁহার পরিধেয় কাষায় বসন ছয় বৎসরের বর্ষায় একবারে গলিত হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার বস্ত্র আহরণের ইচ্ছা জন্মিল। পূর্ব্বোক্ত সুজাতার রাধানাম্নী এক দাসী ছিল, সে মৃতা হওয়ায় তাহার বস্ত্রবেষ্টিত শবদেহ শশ্মানে নিক্ষিপ্ত ছিল। শাক্যসিংহ তাহা দেখিতে পাইয়া সেই শবস্পৃষ্ট বস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং পুষ্করিণীজলে প্রক্ষালন পূর্ব্বক পরিধান করিলেন। এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া শুভদিনে ও শুভক্ষণে নৈরঞ্জনাজলে অবগাহন পূর্ব্বক শুচি ও শীতল হইয়া বোধিজ্ঞান উপার্জ্জনের উদ্দেশে বোধিবৃক্ষের অভিমুখে যাত্রা করিলেন *।

শ্রীরামদাস সেন।

কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস।

অনুক্রমণিকা।

কলিকাতা বঙ্গদেশের ষষ্ঠ রাজধানী। বিগত ছয় শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালীকে আরও পাঁচটি রাজধানীর মুখাবলোকন করিতে হইয়াছে। সময়ক্রমে একে একে গৌড়, রাজমহল, ঢাকা, নবদ্বীপ ও মুর্শিদাবাদে বাঙ্গালার শাসন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল।

---

* ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ বলিষ্ঠ হইলে নন্দিকগ্রামপতিদুহিতা সুজাতা একদিন তাঁহাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ ও স্বগৃহে আহ্বান করিয়াছিল এবং ভগবান্ও তাঁহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া সুজাতার গৃহে একদিন ভোজন করিয়াছিলেন।

২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে গৌড় দশ লক্ষ লোকের আবাসভূমি ছিল। নগরের নিম্নে যে নদী প্রবাহিত ছিল, কালক্রমে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে উহা মন্দস্রোত ও ভিন্নশাখাগামী হইলে স্থানীয় স্বাস্থ্যের ভয়ঙ্কর বিঘ্ন উপস্থিত হইল। লোমহর্ষণ মহামারি আবির্ভূত হইয়া সমৃদ্ধিশালী রাজধানীকে অরণ্যে পরিণত করিল। কলিকাতার ন্যায় একদিন গৌড়ের বিচিত্রগঠনসম্পন্ন সৌধমালা লোকের চিত্তাকর্ষণ করিত। সেই অট্টালিকাশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ এখন পুরাবৃত্তানুরাগীর কৌতূহলের সামগ্রী। "শত রাজার রাজধানী" রাজমহল গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপের শীর্ষস্থানে সন্নিবেশিত। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন যদি শিল্পচাতুর্য্যে ইউরোপের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ এবং রোমের সহিত কোনও রূপে সংস্পৃষ্ট না হইত, তাহা হইলে, হয় ত বাঙ্গালার ইতিহাস অন্য রূপে লিখিত হইত। নবদ্বীপ সাধারণত নদীয়া বলিয়া খ্যাত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে শাস্ত্রচর্চ্চায় নবদ্বীপ বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় ছিল। হিন্দুস্বাধীনতাসূর্য্য এই স্থানেই অস্তমিত হয়। মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার মুসলমান রাজধানী।

কলিকাতা একটি সামান্য পল্লীগ্রাম হইতে আজি কয় বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর মহানগর সমূহের অন্যতম হইয়া উঠিয়াছে। এত অল্পকাল মধ্যে সভ্য জগতে রুস রাজধানী সেণ্টপিটর্সবর্গ ব্যতীত আর কোনও স্থান সামান্য হইতে এত সমুন্নত হয় নাই। জব্ চার্ণক কর্তৃক কলিকাতার ভিত্তিমূল সংস্থাপনের সমকালেই সম্রাটমহান্ পিটর সেণ্টপিটর্সবর্গের ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করিয়াছিলেন। উভয় নগরই অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল, আবার উভয়ই কালক্রমে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হইল। শতাব্দীমাত্র অতীত না হইতেই আংলো ইণ্ডিয়া (ইঙ্গরেজাধিকৃত ভারত) ও রুষ সাম্রাজ্যের মধ্যে যে এতদূর ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে তাহা তখন কেহ ভাবে নাই। একদিকে ভারতে সিপাহিরা যে কার্য্য সংসাধিত করিয়াছে, অপর দিকে মধ্য আসিয়ার কসাক সৈন্যগণও ঠিক সেইরূপ কার্য্যই সম্পাদন করিয়াছিল।

কলিকাতার সন্নিবেশ স্থান—ভাগীরথী-তীরে সমতল ধান্যক্ষেত্র, জলাভূমি এবং স্থানে স্থানে বন ও জঙ্গল পরিবেষ্টিত তৃণপত্রাচ্ছাদিত মৃণ্ময় গৃহসমষ্টির পল্লীমাত্র ছিল। প্রকৃত পক্ষে কলিকাতার মহত্ত্বের ভিত্তিমূল এক শত

বৎসরের কিছু পূর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং যদিও এই স্থানের সহিত প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু সম্বন্ধ আছে, তথাপি এই নগর সম্বন্ধীয় যে সকল স্থানীয় ও ঐতিহাসিক মনোহারিত্ব ছিল, তাহা প্রায় উপরি উক্ত সময়ের মধ্যে নিহিত। কলিকাতার ক্রমশঃ যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে ঐ সকল ঐতিহাসিক মনোহারিতার স্মৃতি লোকের মন হইতে ক্রমেই অপসারিত হইতেছে এবং পুরাতন ভূমির ও স্থানের চিহ্নসকল পরিবর্ত্তনের স্রোতে যেমন ভাসিয়া যাইতেছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্মৃতিচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতেছে। পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তুলনা করিলে, নগর-পার্শ্বস্থ গ্রামগুলি কলিকাতা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কলিকাতা নগরের মহত্ত্ব যে ইঙ্গরেজ অধিকারের পর হইতেই হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

এক্ষণে "প্রাচীন কলিকাতা" বলিলে সার্দ্ধৈক শত বৎসরের একটি নগরকে বুঝায় মাত্র। অনেকে এজন্য ইহাকে প্রাচীন বলিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন, কিন্তু আমরা এই মাত্র বলি যে, ভারতে ব্রিটিসদিগের সম্বন্ধে এই রূপই ঘটিয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক ঘটনাস্রোত চলিয়া গিয়াছে এবং দৃশ্য সমূহের ঘন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতৃগণেরও এত দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যে সেই ঘটনানিচয় আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের (United States) ন্যায় নবীন কলিকাতাকেও প্রাচীন করিয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ কলিকাতার পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তৃগণের কথা যেন সোমনাথ পত্তনের মুসলমান আক্রমণ অথবা সেকেন্দর বাদসাহের পাটলি-পুত্রাভিমুখে গমনের ন্যায় অতি পুরাতন ঘটনা বলিয়া অনুমিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথম অধ্যায়।—ভূতত্ত্ব।

ভূতত্ত্ব-বিষয়ক পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, কলিকাতা জল দ্বারা সঞ্চিত মৃত্তিকাসম্ভূত নিম্ন ও সমতল ভূমির উপর নির্ম্মিত, কেবল মাত্র জোয়ার সমতল হইতে কিঞ্চিন্মাত্র উন্নত এবং নিকটবর্ত্তী রাজমহল পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে এক শত ক্রোশ দূরে গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপের নিম্নাংশে সন্নিবেশিত।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ গবেষণা ও গণনা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে অতীব প্রাচীন অর্থাৎ ইতিহাসাতীত কালে, কলিকাতার ৭৫ ক্রোশ উত্তরে, মুরসিদাবাদ এবং মালদহের মধ্যস্থিত কোন একটী স্থানে সমুদ্রের তীর ছিল, এবং তথা হইতে ১৫ ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত নির্ঝর-শোভিত উন্নতশেখর হিমালয়-নিসৃতা কলনিনাদিনী তরঙ্গিণী সগর্ব্বে সাগর-গর্ভে কর্দ্দম (পলি) নিক্ষেপ করতঃ ক্রমশঃ নিম্ন বঙ্গ রচনা করিয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়মে ভূভেদ বা খনন *।—১৮৩৫ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভূতত্ত্বানুসন্ধানোপলক্ষে উইলিয়াম দুর্গে যে একটী সুগভীর কূপ খনন করা হয়, তৎসম্বন্ধীয় সভার মন্তব্য-সার পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে উহার ৩৯২ ফুট নিম্নস্তরে বালুকা মধ্যে গিরিনদী-গর্ভ-সুলভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গার (fine coal) কতক গুলি জীর্ণ কাষ্ঠ খণ্ডের সহিত পাওয়া যায়; এবং ৪০০ ফুট নিম্ন হইতে এক খণ্ড চূর্ণ-প্রস্তর (Lime stone) উত্তোলিত হয়। ৪০০ হইতে ৪৮১ ফুট নিম্নস্তর সমূহের মধ্যে সমুদ্রোপকূল জাত সূক্ষ্ম সিকতা বিজড়িত অধিকাংশ আদি প্রস্তর (Primary socks) কোয়ার্টজ (quartz), ফেলস্পার (felspar), অভ্র (mica), শ্লেট (slate), এবং চূর্ণপ্রস্তরখণ্ড-মিশ্রিত উপলখণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিঘ্নসংঘটন প্রযুক্ত উপরিউক্ত নিম্ন তলই খনন কার্য্যের শেষ সীমা হয়। এই রূপ (course conglomerate) দ্রব্যাদি যে কত দূর নিম্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় তাহা ঠিক নির্ণয় হয় নাই; কিন্তু অনুমিত হয় যে উহা প্রায় আর ৮০ ফুট নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপরি উক্ত কারণ সমূহের দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে ইহার সন্নিকটে যে সকল উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী ছিল, সেই সকল ক্রমশঃ অল্পে অল্পে বসিয়া যায়। ভূতত্ত্বানুসন্ধানে অনেক স্থলে সমভূমির নিম্ন ভূমধ্যস্তরে স্বভাবতঃ এই রূপ দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়া থাকে, সেই কারণ বশতঃ এই অনুমান সপ্রমাণিত হইতেছে। এই রূপ ৮০ ফুট নিম্নে একটী উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তর (stratum of peat)

---

* Boring Operations in Fort William, 1835-40, *vide* Journal of the Asiatic Society, Bengal, Vol. IX. p. 686.

পাওয়া যায়, উহার মধ্যে মান্দ্রাজী সসার (cucumis madraspatamus. Wildenow) বীজ এবং এক জাতীয় ইক্ষুপত্র (leaves of sugar grass) (saccharum sara Roxburgh) প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাক্তার হুকার বলেন যে, যে সময়ে স্রোতঃপ্রবাহিত কর্দ্দমরাশি (পলি) দ্বারায় প্রথম স্থল রচিত হয় সেই সময়ের কলিকাতায় সমতল ভূমির উপরিভাগের সঙ্গে বর্ত্তমান সমভূমির অবস্থার বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়, এবং উহা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে সেই সময়ে এই স্থানের সমুদ্র আড়ি (estuary) অনেক পরিমাণে টাটকা ছিল।* ১৫৯ ফুট নিম্নে এক প্রকার পীত বর্ণ শিরাযুক্ত আঁটাল মাটি, এবং ১৯৬ ফুট নিম্নে লৌহমিশ্রিত মৃত্তিকা পাওয়া যায়। ৩৪০ এবং ৩৫০ ফুট নিম্ন হইতে প্রস্তরে পরিণত অস্থি (fossil bone) উত্তোলিত হয়, উহা কুক্কুরের স্কন্ধদেশের অস্থি বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা ব্যতীত ৩৭২ ফুট নিম্নে অন্যান্য অস্থি সকলও পাওয়া যায়।

শেয়ালদহ ষ্টেশনের নিকট পুষ্করিণী খনন।—সারকুলার রোডের পূর্ব্বাংশে শেয়ালদহ ষ্টেসনের সীমার মধ্যে যে বৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, উহার খনন সম্বন্ধে ব্ল্যানফোর্ড সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নেলে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তদ্দ্বারাও আমরা কলিকাতার ভূতত্ত্ব বিষয়ে অনেক অবগত হইতে পারি।

যে সময়ে ব্ল্যানফোর্ড সাহেব উক্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করেন সে সময়ে ঐ পুষ্করিণী ভূমির স্বাভাবিক সমতল হইতে ৩০ ফুট নীচে পর্য্যন্ত খনন করা হইয়াছিল। ঐ সমতল ভূমি উক্ত পুষ্করিণীর নিকটস্থ খালের স্বল্প-জোয়ার (low spring tide) সমতল হইতে ১৫½ ফুট নিম্ন; এবং উক্ত সমতল ভূমি গ্রীষ্মকালীন ভাগীরথীর অত্যল্প-জোয়ার (lowest spring tide) সমতল হইতে ১৭ ফুট উচ্চ, সুতরাং পুষ্করিণীর তলদেশ উক্ত জোয়ার সমতল হইতে ১৩ ফুট নিম্নে। পূর্ব্বতন ভূপৃষ্ঠের প্রমাণ সম্বন্ধে উপরি উক্ত বিষয়টী নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

ঐ পুষ্করিণী খনন কালে দেখা যায় যে, উহার উপরিস্থ ন্যূনাধিক ৩ ফুট

---

* *Vide* Himalayan Journal, Vol. II., p. 341.

ভূমি উদ্ভিদসমুদ্ভূত মৃত্তিকা ও প্রস্তুত মৃত্তিকায় (made earth) পূর্ণ এবং অসমতল মৃত্তিকার উপর স্থাপিত। ঐ নিম্নস্থ অসমতল ভূমির মৃত্তিকা ধান্য-ক্ষেত্রের মৃত্তিকার ন্যায়; কিন্তু পুষ্করিণীর সকল স্থান একরূপ নহে। স্থল বিশেষ স্বল্পভারাসহিষ্ণু বালুকাকণাবিমিশ্রিত লবণাক্ত কর্দ্দম যুক্ত, অন্যত্র বা পরিষ্কার (ঘটাদি নির্ম্মাণোপযোগী) চিক্কণ মৃত্তিকাপরিপূর্ণ। কিন্তু সাধারণতঃ উহা এরূপ খণ্ড খণ্ড উদ্ভিজ্জাবশেষপূর্ণ যে, তাহার (উদ্ভিদের) জাতি বিভাগ অসম্ভব। এই নিম্নস্থ ভূমিখণ্ডের নিম্নতর দেশ সমধিক পরিষ্কার মৃত্তিকাবিমিশ্রিত এবং উহার তলদেশে আঁটাল মাটী পাওয়া যায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ২০ ফুট নিম্ন হওয়ায় ঐ স্তরের বেধ ১৭ ফুট।

তন্নিম্ন স্তরে অবিশুদ্ধ উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা (impure peat)। উহা শুষ্ক হইলে এক প্রকার অদাহ্য হয়। ইহাতে সুন্দরী বৃক্ষের গুঁড়ি পাওয়া যায়, ঐ সকলের শিকড় তন্নিম্ন ভূমিতেপ্রবিষ্ট। এই স্তর পুষ্করিণীর সমুদয় অংশে ব্যাপ্ত এবং অনুমান হয়, সর্ব্ব স্থানে সমান গভীর না হইলেও কলিকাতা এবং ভাগীরথী পারস্থ হাবড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ রূপ স্তর নিম্ন জোয়ার সমতলে গার্ডন রিচ এবং বোটেনিকেল উদ্যানের নদীতীরেও দেখা যায়। এই সকল স্থানে উহার চরম গভীরতা শেয়ালদহে দৃষ্ট গভীরতা হইতে ৬ ফুট অধিক। অপরদিকে ফোর্টউইলিয়মে তিন বার তিনটী স্থান খননে উহা ৫১ ফুট নীচে পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল, এবং ফোর্ট ও শেয়ালদহের প্রকৃত ভূপৃষ্ঠ সমতলতা হইতে ৩ ফুট অন্তর ধরিয়া শেয়ালদহ অপেক্ষা ফোর্ট ২৮ ফুট এবং বোটানিকেল উদ্যান অপেক্ষা ৩৪ ফুট নিম্ন হইয়া পড়ে। উপরি উক্ত দুইটী খনিত ক্ষেত্রের সমতলতার বিশেষ প্রভেদ থাকা সত্বেও এই রূপ ভূভাগ দর্শনে ইহা উপলব্ধি হয় যে ঐ স্তর হয় ত একাদিক্রম অথবা উহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম ব্যাপ্ত।

উক্ত উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তর (peat bed) জমাট কর্দ্দম-রাশির উপর স্থাপিত, উহার উপরিভাগ সিকতাময় এবং নিম্ন দিকে নীল বর্ণ কঠিন মৃত্তিকা। এই স্তরে ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্ততঃ ৩০ ফুট অথবা উদ্ভিদ-জাত অপরিণত খণিজকয়লা স্তর হইতে ১০ ফুট নিম্নে বিভিন্ন সমতলে সুন্দরীর গোড়া সকল পাওয়া যায়। ব্ল্যানফোর্ড সাহেবের পরিদর্শন কালে এই

বৃক্ষাবশেষের দুইটী নমুনা নিম্নদেশ হইতে বাহির হইয়াছিল। উহাদিগের মূল নিম্নস্থ কর্দ্দম মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এই স্থান হইতে ৪ ফুট নিম্ন পর্য্যন্ত একটী কূপ খনন করা হয়, ব্ল্যানফোর্ড সাহেব বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, উহাতে উক্ত জাতীয় বৃক্ষের শিকড় ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত ছিল। অতএব এই সকল বৃক্ষ পূর্ব্বোক্ত খালের নিম্নতর জল-সমতল হইতে ঠিক ১৫½ ফুট এবং ভাগীরথীর নিম্নতর জল-সমতল হইতে ঠিক ১৩ ফুট নিম্নে জন্মিয়াছিল।

ব্ল্যানফোর্ড সাহেবের পরিদর্শন কালে আর অধিক খনন করা হয় নাই। কিন্তু তিনি লিয়োনার্ড সাহেবের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, ঐ পুষ্করিণীর তলে একটী সুগভীর কূপ খনন করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ণ করা হইয়াছিল, তাহাতে পুষ্করিণীর নীচে ১৫ ফুট ঐ কর্দ্দমস্তর দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ স্তর আবার একটী জীর্ণ উদ্ভিজ্জাবশেষবিমিশ্রিত শিথিল কৃষ্ণবর্ণ সৈকত স্তরের উপর স্থাপিত। তদনুসারে উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তরের (peat bed) নিম্নে ঐ স্তরের বেধ ২৫ ফুট হইবে। উইলিয়ম দুর্গের খাত স্থানের সঙ্গে ঐ উদ্ভিজ্জাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তরের অনেকাংশে ঐক্য দৃষ্ট হয়। সেখানে (ফোর্টে) ঐ উদ্ভিজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তর কঙ্কর ও কাষ্ঠ-বিমিশ্রিত নীল বর্ণ কর্দ্দম এবং তন্নিম্নে ন্যূনাধিক ২১ হইতে ২৫ ফুট বেধযুক্ত পীত বর্ণ কর্দ্দম স্তরের উপর স্থাপিত; এবং এই স্তর ঈষদ্রক্তবর্ণ আর্দ্র সৈকত স্তরাশ্রিত।

শেয়ালদহের খাত স্থানের ৩০ ফুট নিম্নে গাছের গোড়া পাওয়া যায় এবং উহার দ্বারা ‘ব’দ্বীপটী বসিয়া যাওয়া প্রমাণীভূত হইতেছে—এই দুইটি কথা প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য। যে সকল বৃক্ষের কথা উল্লিখিত হইল, উহার নমুনা ব্ল্যানফোর্ড সাহেব ডাক্তার অ্যাণ্ডারসন সাহেবের নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি উহাকে সুন্দরী বৃক্ষ বলেন। সমতলতা সম্বন্ধে এই জাতীয় বৃক্ষশ্রেণী উচ্চজোয়ার সমতলের ২ হইতে ১০ ফুট পর্য্যন্ত নিম্নে হইয়া থাকে। উহা কেবল কর্দ্দমের উপর অথবা যেখানকার ভূপৃষ্ঠ সর্ব্বদা জল-মগ্ন হইয়া খাস্ বর্দ্ধিত হয়, অথচ প্রত্যেক জোয়ারের পরে বৃক্ষ সকলের গোড়া অনেকক্ষণ বাতাস পায় সেই সকল স্থানেই জন্মিয়া থাকে। ইহাতে

বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, এক্ষণে যে স্থানে সুন্দরী বৃক্ষ জন্মায় (সুন্দরবন) সেখানকার ভূপৃষ্ঠ ভাগীরথীর নিম্ন ভাটা সমতল হইতে ১৮।২০ ফুট নীচে না হইলে শেয়ালদহের যে খানে গোড়া প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, সেখানে ঐ বৃক্ষ জন্মান অসম্ভব। কিন্তু বাস্তবিক সুন্দর বন সেরূপ সমতলে অবস্থিত নহে। তবে শেয়ালদহের ঐ সকল বৃক্ষের উৎপত্তির পরে ঐ স্থানের ভূপৃষ্ঠের অনেক ফুট অধোগমন হইয়াছিল। ভাগীরথী এবং বহিঃ-সুন্দরবনের নিম্ন সমতল সম্বন্ধে ব্ল্যানফোর্ড সাহেব কোন বিশেষ প্রমাণ পান নাই বটে, কিন্তু তিনি ডাক্তার লিয়োনার্ড সাহেবের নিকট অবগত হইয়াছিলেন যে, ভাগীরথী ও ক্যানিং টাউনের অন্তর্গত মাতলার সমতল দ্বয়ের অন্তর অতি সামান্য এবং উহা প্রকৃত (Geological range of sundri) হইতে অধিক মাইল উপরে হইবে না। অন্য পক্ষে খালটী এত প্রশস্ত ও গভীর যে উহাতে ভাগীরথীর নিম্ন জলোচ্ছ্বাসের সমতলতার কিছু মাত্র অনুমান করিতে দেয় না। সুন্দরী বৃক্ষশ্রেণী যেস্থানে অবস্থিত এবং উহা যে ৬।৮ ফুট অত্যল্প জোয়ার সমতল মধ্যে জন্মায় না, এই সকল কারণে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, শিয়ালদহের খনিত পুষ্করিণীর যে সমতলে গোড়া পাওয়া গিয়াছিল, ঐ সমতলে ঐ বৃক্ষ জন্মিবার পরে যে ঐ ভূমির ১৮ কিম্বা ২০ ফুট অধোগমন হইয়াছিল তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্ল্যানফোর্ড সাহেব বলেন যে ফোর্ট উইলিয়মে খনন কালীন উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তরের উপরে এবং নিম্নে যে কাষ্ঠ পাওয়া যায় উহা যদ্যপি ঠিক ভাবে স্থাপিত হয় (তাহা তিনি সম্ভবত বিবেচনা করেন) তাহা হইলে সেখানেও যে ভূপৃষ্ঠের অধোগমন হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই ৪৬ হইতে ৪৮ ফুটের ন্যূন হইবে না। কিন্তু এই দুই স্থানের ভূপৃষ্ঠ সমসাময়িক কি না এবং তদনুসারে সমদূর পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক বসিয়া যাওয়া সত্য কি না তদ্বিষয়ে বিশ্বাসের বিশেষ প্রমাণাভাব।

ব্ল্যানফোর্ড সাহেবের মতে এই অধোগমনের পরিমাণ ন্যূনাধিক হইলেও উহা বহুদূরব্যাপী। তিনি লিয়োনার্ড সাহেবের নিকট অবগত হয়েন যে, মাতলার নিকট ক্যানিং টাউনে উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তর ২০

ফুট নিম্নে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থানের প্রকৃত ভূপৃষ্ঠসমতল শেয়ালদহ হইতে যে অনেক ফুট নিম্নে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি কর্ণেল গ্যাষ্ট্রেল (Col : Gastrell) সাহেবের নিকট শুনিয়াছিলেন যে যশোহরান্তর্গত খুলনা নামক স্থানে একটী পুষ্করিণী খনন কালে, দেখিতে পাওয়া যায় উদ্ভিদসম্ভূত স্তর ১৬ ফুট হইতে ২০ ফুটের মধ্যে স্থাপিত এবং শিকড়যুক্ত বৃক্ষের গোড়া সকল ১৮ হইতে ২৫ ফুট পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিভিন্ন সমতলে প্রোথিত।

উপরি উক্ত কারণসমূহ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যে গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপটী গড় ১৮ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত অধোগামী হইয়াছে। কেন না নিম্নে যে সকল স্থানে সুন্দরী বৃক্ষ পাওয়া গিয়াছে, ঐ সকল যে এক কালে ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্ল্যানফোর্ড সাহেব বলেন ইহাতে স্মরণ রাখা উচিত যে, যে সকল স্থানের খনন বিষয় তিনি অবগত আছেন, সে সকল স্থানের বৃক্ষ সমূহ ৮ হইতে ১০ ফুট উর্দ্ধ স্থূলতার মধ্যেই (Vertical thickness) দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; এবং উপরিস্থ স্তরসমূহ সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জাবশেষ এবং নদীজলসম্ভূত শম্বূকাদিতে পরিপূর্ণ থাকা সত্বেও ঐ সকল স্থানে পূর্ব্বকার ভূপৃষ্ঠের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে যে কেবল অধোগমনের এক ভাবিতা প্রকাশ পাইতেছে এমত নহে, অধোগমন এত শীঘ্র সংঘটিত হইয়াছিল যে, নদীস্রোততাড়িত মৃত্তিকা (পলি) দ্বারাও তত শীঘ্র ভরাট হওয়া অসম্ভব।— [ক্রমশঃ।]

---

* Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal vol. XXXII No. I to IV and a Supplement No.—1863.

Note on a Tank Section at Sealdah Calcutta by H. F. Blanford A. R. S. M., F. G. S.

ভালবাসা।

১

এত দিনে বুঝিলাম,—যখন কি হবে বুঝে!
অনন্তের মাঝে আমি ছুটিতেছি অন্ত খুঁজে!
যেখানে অনন্ত স্তব্ধ,
খুঁজিতেছি সেথা শব্দ!
যেখানে অনন্ত স্বপ্ন, খুজিতেছি সেথা কাজ!
নাহি সুখ, নাহি শ্রান্তি,
খুঁজিতেছি সেথা ভ্রান্তি!
চড়িতেছি স্মৃতি-ভেলা, অনন্ত খেলার মাঝ!
—এত দিনে বুঝিলাম, কি হবে বুঝিয়া আজ?

২

থামিয়া গিয়াছে গান,
শুইয়া প'ড়েছে প্রাণ,
টানিতে পারি না বায়ু আর আমি শ্বাস পুরে।
থেমেছে কল্পনা, ভাবা,
সুখ, দুখ, সাধ, আশা।
কোথা তুমি, ভালবাসা, যে তুমি—সে তুমি দূরে!

৩

কোথা তুমি ভালবাসা, যে তুমি—সে তুমি দূরে!
গান ত হইল শেষ,
কোথা তুমি সুর-রেস?
সুখ দুখ হ'লো শেষ, হ'লো শেষ কারে ঘুরে?

উলটি পালটি পাতা,
ক্রমে শেষ হ'লো খাতা;
মুদে এলো আঁখি-পাতা, বুক গেল ভেঙেচুরে।
কোথা তুমি, ভালবাসা, যে তুমি—সে তুমি দূরে!

মিছে এ কল্পনা মোর, লাগিল না কোন কাজে।
মিছে এ জোয়ার ভাঁটা;
মিছে ফোটা, খোলা কাঁটা;
মিছে বাঁধা বাঁধা-বীণা; মিছে রঙ ছবি-ভাঁজে।
মিছে এ জোনাকী রেখা,
শারদ জ্যো'স্নায় লেখা;
মিছে লঘু মেঘ-ছায়া মধ্যাহ্ন তপন-ঝাঁজে।
মিছে এ তরুর কম্পে
ঝটিকার ভীম ঝম্পে;
মিছে এ উর্ম্মির ঘূর্ণী তরঙ্গের রঙ্গ মাঝে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

ঘুম ভাঙে না।

সর্ব্বতত্ত্বদর্শী সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ একদিন গাইয়াছিলেন—

"সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙে না।"

কি ঘুমের ঘোরে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথা হইতে যে এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছ, তাহার কিছু ঠিকানা নাই। এ ঘুমের ঘোরে যত ঘুরিতেছ ততই যেন ঘোর আরও চাপিয়া ধরিতেছে—মাথা তুলিতে দেয় না। এই সাধের ঘুম ঘুমাইতে ঘুমাইতে সাধের ঘোরে বিভোর হইয়া কি করিতেছ, কত কি স্বপ্ন

দেখিতেছ, কত দিন হইল কত কি দেখিয়াছিলে সে গুলির ঘোর না ছাড়িতে ছাড়িতে আবার কি নূতন ঘোর আসিল, আবার কি নূতন স্বপন দেখিলে, তাহাতে কে যে কি এক রকম বিহ্বলতা মাখাইয়া দিয়াছে, কি বিভোর তন্দ্রাময় ভাব মিশাইয়া দিয়াছে, যে তাহার বশে পড়িয়া আর ঘুম ছাড়িতে পারিলে না। যত ঘুমাও তত ঘোর বাড়ে, যত ঘোর বাড়ে তত স্বপনে কত কি কর—কত কি দেখ, দেখিতে দেখিতে—তাহার সঙ্গে মিশিতে মিশিতে—ঐ আরও যেন জড়তা বাড়িল—সে স্বপন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোথায় কি গেল —ঘুম ত ভাঙ্গিল না। তুমি কোথায় শুইয়াছিলে? মনে ত হয় না,— যেখানে ছিলে সেই খানেই আছ কি? এখন কোথায় আছ? তোমার বিছানা কৈ?

"ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা"

সেই অনন্তকালের অনন্ত শয্যায় সাধে শয়ন করিয়াছিলে। সেই কাল বিছানায় শায়িত হইয়া কালের চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, সেই সাধের ঘুমের ঘোর কেবল বাড়িতেছে—অনন্ত জগতের অনন্ত ঘোরে পড়িয়াছ—এ ঘোর ও ছাড়িবে না, তোমার ঘুমও ভাঙ্গিবেনা।

অনন্তকালের—অনন্ত জগতের মধ্যে তুমি এতটুকু—কাল শয্যায় শুইয়া আছ, কত স্বপ্ন দেখিতেছ—পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কত কি—সবই কি স্বপন? এগুলি কোথা হইতে আসিল? স্বপনে কি পাতাইয়া লইয়াছ? যাদের সহিত পাতাইয়াছ—যাদের সহিত এই স্বাধের ঘুমের, ঘোর স্বপনের বাঁধন বাঁধিয়াছ তারাও কি তোমার মত এই কাল বিছানায় সাধের ঘুমে কাতর!—সবাই কি তোমার মত কালের ঘুমঘোরে—সাধের স্বপনে সব কাজ করিতেছে? এ স্বপন দেখিতে দেখিতে—এ জড়তায় সবাইকে জড়াইতে জড়াইতে—ঐ যে মাতার কাজ শেষ হইয়াছে! তাঁর স্বপনের বাঁধন যে কাটিল! তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে না কি? তিনি কাটিলেন—তুমিত পারিলে না, বন্ধনরজ্জুর আর একদিকে তুমি তেমনই বাঁধা আছ। আবার ঐ! যাহাকে ভাই বলিতে, সেও ত এই অল্পদিনের জোর বাঁধনটি কাটিয়া গেল! তুমি বাঁধা পড়িয়া আছ। বাঁধনটি কম দিন হইল দিয়াছিলে কিন্তু বড় জোরে দিয়াছিলে—তথাপি কাটিয়া গেল! আহা!

এ বাঁধনের আবার সবই বিপরীত। পুরাণ বাঁধনগুলির জোর না কমিয়া আরও বাড়িতেছে। কাল-চক্রের কঠোর নেমীর পেষণে তুমি চূর্ণ হইয়া যাইতেছ, বল সবই যে গেল—বড় হীনবল হইয়া পড়িতেছ—তাই ঘুম আরও চাপিয়া ধরিতেছে। এ ঘুমের ঘোর—এ স্বপনের জোর কমে না কেন? তোমার এত ঘুম কেন?—

"এই যে সুখের নিশি জেনেছ কি ভোর হবেনা"

তোমার এত ঘুম কেন? এই অনন্ত কালের মধ্যে তুমি এতটুকু মাত্র কাল অধিকার করিয়াছ বৈ ত নয়—তাহা ত একদিন শেষ হইবে। অনন্তকাল-সাগরে তুমি একটী ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদ্—তোমাকে একদিন এই সাগরে মিশাইয়া লইবে। নিমেষের জন্য উঠিয়াছ—নিমেষের জন্য এত আড়ম্বর কেন? ভানুর সুবর্ণময় কিরণে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত করিয়া এত বাহার দিতেছ কেন? তুমি কিসের বশে এত বিহ্বল? কালশয়নে শায়িত হইয়া কি আকর্ষণে তোমাকে টানিয়া রাখিয়াছে যে তুমি এ ছাই ঘুমের ঘোর ছাড়িতে পারিতেছ না?—কাহার বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছ?—

"তোমার কোলেতে কামনা কান্তা তারে ছেড়ে পাশ ফের না"

তোমার কাল বিছানার সাধের ঘুমে আবার সঙ্গিনী মিলিয়াছে—একে ত নিজে পূর্ণমাত্রায় বিহ্বল—তাহাতে আবার প্রিয়তমা কামনার সহায়তা পাইয়াছ; তাহার প্রলোভনে—তাহার প্ররোচনায়, তোমার যে টুকু জড়তার অবশিষ্ট ছিল তাহাও পুরিয়া উঠিয়াছে। কামিনীর সহিত এক শয্যায় শায়িত হইয়া—তাহার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া—তাহার ভুবন ভুলান রূপের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া—তাহার মনোহর অধরপ্রান্তে মুগ্ধকরী হাস্যছটা দেখিয়া তোমার পার্শ্বপরিবর্ত্তনের ক্ষমতা পর্য্যন্ত গিয়াছে কি?

তুমি যখন প্রথম এ কালশয্যায় শয়ন করিয়াছিলে তখনকার কথা মনে হয় কি? তখন ত তোমার সহচরী ছিল না। দিন দিন তোমার যত ঘুমের ঘোর বাড়িতে লাগিল—স্বপনে যত নূতন দেখিতে লাগিলে ততই তোমার স্পৃহা বাড়িতে লাগিল—'আরও ঘুমাই আরও স্বপন দেখি'। কোথায় ছিলে, কোথায় আসিয়াছ, কি করিতেছ, এ কাল নিশি পোহাইলে কোথায় যাইতে হইবে তাহা কিছু ভাবিলে না, দেখিতে দেখিতে নূতন নূতন স্বপনে মাতিলে, অবিরত

নূতনে ভুলিয়া দেখিতে দেখিতে এক দিন "কামনা" তোমার চক্ষে পড়িল—বড় মোহিনী মূর্ত্তি—যাহার চক্ষে একবার পড়ে সে মোহিনীর সর্ব্বজনমনোমুগ্ধকর রূপমোহে মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে না—তুমিও সেই মোহে পতিত হইলে। কামনাকে কালশয়নে সহচরী করিয়া লইলে, এখন মোহের বাঁধন কাটা দূরে থাকুক "কামনার" সংস্রব—"কামনার" স্পর্শ পর্য্যন্ত পরিত্যাগের ক্ষমতা তোমার নাই। "কামনা" সদাই এখন তোমার সহচারিণী, এই "কামনার" স্পর্শ সুখানুভবের স্পৃহা, দর্শনানন্দ অনুভবের লালসা একবার পরিবর্জ্জন কর—তাহার কোমল বাহুলতার দুশ্ছেদ্য বন্ধন একবার ছেদন কর—অত মোহিত হইও না, অঙ্কশায়িনী প্রিয়তমা কান্তা "কামনার" প্রতি বিমুখ হইয়া একবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন কর দেখি!

"আশার চাদর দিয়েছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খোল না"

সংসার চক্রের ঘূর্ণনে যথেষ্ট ঘূর্ণিত হইয়াছ—সুখস্বপনের আবেশভরে কামনার বিশ্ববিমোহিনী রূপ মধুরিমায় তুমি যার পর নাই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছ; এ বিহ্বলতা অপনোদনের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তুমি আবার তৎসঙ্গে আর এক কুহকিনীর মুগ্ধকরী ছলনা বলে আপাদমস্তক কুহক-বিজড়িত হইয়া অধিকতর মত্ত হইয়াছ। যাদুকরী আশার আবরণ-বসনে আবৃত হইয়া সংসারের যথার্থ অবস্থা—তোমার আপন প্রকৃত ভাব দেখিতে তুমি এক্ষণে অক্ষম। এই কুহকে পড়িয়া তোমার এত আড়ম্বর—অনন্ত কাল মধ্যে এতটুকু মাত্র সময় পাইয়া, এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর সামান্য স্থান দখল করিয়াও তোমার এত অস্ফালন, এত বাহার, এত জোর; এই আশাকুহকিনীর যাদু বিদ্যার এমনই বল—কুহকের এমনই মায়া মাখান ভাব—এমনই ছলন-কৌশল—যে তোমাকে তিলেকের জন্য চক্ষুরুন্মীলন করিতে দিতেছে না, তুমি যে বাহ্য জগতের ভাবগতি দেখিয়া তোমার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিবে তোমায় সে অবকাশ টুকুও দিবে না—তোমার সে ক্ষমতা টুকু অপহরণ করিয়াছে।

মায়াবিনীর ঘোর মায়াবশে বশীভূত হইয়া তুমি আপনার লইয়াই ব্যস্ত। কত আকাশকুসুম তোমার নয়নসমক্ষে সমুদ্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট

হইতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তার অপার সৃজনলীলা মধ্যে অপরিগণনীয় সামান্য জীবরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াও তুমি কত অসাধ্য সাধনের উদ্যোগ করিতেছ। তুমি তোমার এই সমগ্র নশ্বর জীবনে যত টুকু কাল অধিকার করিতে পারিয়াছ তাহার লক্ষগুণ অধিক কাল সংসার সাগরে বুদ্‌বুদ্‌ স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিলেও যে কার্য্য তোমার পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য, আজ আশা কুহকিনীর প্রবল কুহকবলে—মায়াবিনীর অদ্ভুত ছলনার কৌশলে তাহা তোমার নিকট নিতান্তই নিমেষসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই মায়িক আবরণে সর্ব্বাঙ্গ আবরিত রাখিতে তোমার যেন সাধ বাড়িতেছে—মুখের এ অবগুণ্ঠন, নয়নের এ কুহকমাখান আচ্ছাদন উন্মোচন করিতে তোমার কোন মতে প্রবৃত্তি জন্মিতেছেনা—এ মায়াবরণের মধ্য হইতে সকলই অতি সুন্দর, নিতান্ত মনোহর বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছ—তাই তোমার মুখ খুলিতে ইচ্ছা করে না।

"আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে"; * * *

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, পলের পর পল, দণ্ডের পর দণ্ড, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে, যুগের পর যুগান্ত সংঘটিত হইতেছে তথাপি তোমার এ ছাই কুহকের ঘোর বিন্দুমাত্র অপনোদিত হইতেছে না—চিরদিনই সমান ভাবে প্রতি নিয়ত সেই মায়ার বশে মোহিত হইয়া রহিয়াছ। সুখের শীতে সে "আশা"-আবরণে আবৃত হইয়া উত্তাপানুভবে পরম সন্তোষ সম্ভোগ করিয়াছিলে, কিন্তু দুঃখের এ ঘোর গ্রীষ্মেও মিছা কুহকের আচ্ছাদন রাখিয়া আর কেন বাহ্যিক গ্রীষ্ম পরিবর্দ্ধিত করিতেছ? কেন ও সন্তপ্ত হৃদয় অধিকতর উত্তপ্ত করিতেছ? একবার মোহকরী ছলনার এ আচ্ছাদনবসন উন্মোচন কর "আশার" গাত্রাবরণ হইতে একবার মোহের মলা ধৌত কর দেখি!! তোমার সে ক্ষমতা আছে কি? আর কিরূপে থাকিবে, যাহা ছিল তাহা ত একে তুমি মায়াবিনীদিগের প্রবল কুহকে সকলই হারাইয়াছ—তাহার উপর আবার একি!!

'খেয়েছ বিষয় মদ সে মদের কি ঘোর ঘোচে না
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে" * * *

তোমার মোহের কি কিছু বাকী ছিল? তোমার বিহ্বলতা কি পূর্ণ মাত্রায়

পরিপূরিত হয় নাই? তোমার জড়তার কতটুকু অবশিষ্ট ছিল? মত্ততার মাত্রা ত কালে কালে পুরিয়াছে,তাহার উপর আরও মাতিবার ইচ্ছা!

ভবের গাছে নিয়ত পাক খাইতে খাইতে তোমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইতেছে, হস্তপদাদি অবশ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে "কামনার" রূপের মোহ মিলিত হইয়া তোমাকে কতদূর মোহিত ও সংসারে জড়ীভূত করিয়াছে! তৎসঙ্গে আবার আশাকুহকিনীর ছলনাবলে তোমার মোহের ত কিছুই বাকী নাই, তুমি পূর্ণ মাত্রায় মুগ্ধ, তোমার আত্মভাবপর্য্যবেক্ষণ ও বাহ্য জগতের প্রকৃত অবস্থা পরিদর্শনের ক্ষমতা ত গিয়াছে—তাহার উপর আরও মাতিবার ইচ্ছা! যদি মাতিবার এত বাসনা হইয়াছিল, যদি উন্মত্ততাই তোমার পক্ষে এত সুখকর—এত আনন্দদায়ক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তবে এ সংসারে—এ ভবের বাজারে আর কি অন্য মাদক ছিল না? এ তীব্র গরল সম "বিষয়" মদ্য পান করিলে কেন? ইহার মাদকতা কি এ জীবনে কখন দূরীভূত হইবে?

"আশার" মোহে তুমি বাহ্যজ্ঞানরহিত—যে কিছু আন্তরিক বিবেচনা শক্তি ছিল, তাহাও এই নেশার ঘোরে নষ্ট করিলে—তুমি যে হিতাহিতজ্ঞান-বর্জ্জিত হইয়াছ। "বিষয়" মদের নেশার জোরে ভাবিতেছ তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান—তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানবান—তুমিই শ্রেষ্ঠ বিবেচক—আজ যেন এ বিশ্ব সংসার তোমারই করতলস্থ—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আজ তোমার চক্ষে ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ডবৎ পরিদৃশ্যমান! তোমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত নাই—আজ তুমি স্নেহশীল সহোদরের সহিত ঘোর কলহে প্রবৃত্ত—তুমি আজ বিষম স্বার্থপর! তোমার আজ জন্মদাতা অন্নদাতা প্রতি-পালক পিতাকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্য নাই—তুমি আজ চরম অকৃতজ্ঞ—পরম দুরাচার! কেন এ বিষম বিষয়-মদ্য পান করিলে? এ নেশা যে কখন ছুটিবে না—দিন দিন বাড়িতেছে—আরও বাড়িবে। তুমি দিবারাত্রি সমান উন্মত্ত—অভি-ভাবকের প্রতি সম্মান নাই—ভ্রাতা ভগিনীর নিকট কুণ্ঠা নাই—আত্মীয় স্বজনের নিকট লজ্জা নাই—প্রতিবাসীজনের নিকট অপবাদভয় নাই—নেশা দিবারাত্রি সমান—বার মাস সমান ভাবে চলিয়াছে। তাহার উপর আবার মাত্রা বাড়াইতে পারিলে ছাড়না! মিনতি করি! আর মাত্রা বাড়াইয়া কাজ নাই, আর কেন? এততেও কি আশা মিটিলনা—কাল যে ফুরায়—

"অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই ঘুমায়ে আশা পূরে না,
তোর ঘুমে মহাঘুম আসিবে ডাক্‌লে আর চেতন পাবে না।"

ভাই, এত ঘুমাইলে, এত কুহকে জড়াইলে, এত নেশা করিলে, এত ঘুমের ঘোর বাড়াইলে, তথাপি কি ছাই এ আশা পূরিলনা? যদি আশা না পূরিয়া থাকে, তবে ভব-সাগরে এ বর্ত্তমান জলবুদ্বুদলীলায় তোমার আর আশা পূরিবার সম্ভাবনা নাই। তোমার জন্য একটি দিন নির্দ্দিষ্ট আছে, সে দিন যে কোন্ দিন আসিবে, তাহা তুমি ত ঠিক জান না; তবে একবার ভাবিয়া দেখ না কেন সে দিন সদাই নিকটবর্ত্তী! আজ তুমি ঘুমের ঘোরে বিভোর, নেশার জোরে অচেতন, কিন্তু তোমাকে ডাকিয়া সাড়া পাইয়া কত কথা বলিয়া প্রাণের ভার লাঘব করিতেছি, সে দিন ত তোমার আর সাড়া দিবার ক্ষমতা থাকিবে না, সে যে মহাঘুম—সে ঘুম ত কোন মতে ভাঙ্গাইতে পারিব না, সেই ঘুমে তোমার সব সাধের ঘুম—সকল মনোহর স্বপন, মিশাইয়া যাইবে। এ সুখ-স্বপনে যাদের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলে সে পিতামাতা, ভাই-ভগ্নী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন সবাই তোমা হইতে সে দিন বিচ্ছিন্ন হইবে। সেই দিন অঙ্কশায়িনী প্রাণাধিকা কান্তা কামনার বাহুবেষ্টন তোমার কণ্ঠ হইতে সজোরে মোচন করিয়া লইবে। আশার এত মোহের আবরণ, এত যে ভুবন-ভুলান ছলনার আচ্ছাদন—সেই দিন তোমার অঙ্গ হইতে উন্মোচিত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। এ বিষয়মদের পানপাত্র যেমন তেমনি পড়িয়া থাকিবে। এ সাধের স্বপনের শেষ সেই খানে—তার পর সে মহাঘুমে আর কি স্বপন দেখিবে বলিতে পারি না—তাই বলিতেছি যে তোমায় লইয়া এত খেলা খেলাইতেছে, কত সামগ্রী আনিয়া কত বিধানে কত রকম রকম খেলা দেখাইতেছে, খেলিতে খেলিতে একবার সেই খেলানাওয়ালার সন্ধান কর দেখি, তাহাকে ডাক দেখি! সেই সব জানে, সেই সব করিতেছে, তাই বলিতেছি একবার সেই সবজান্তাকে ডাক-না ভাই!!

শ্রীষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাশক্তি।

এক্ষণে এই ভক্তির মূল সংকল্প কি প্রকারে শিক্ষা করিতে হয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিব। প্রথমতঃ মনঃসংযোগ শিক্ষা করিতে হইলে দৃঢ় শক্তির (energy) আবশ্যক। এই মনঃসংযোগে মানসিক দৃঢ়তা জন্মায়, দূরদৃষ্টি জন্মায়, স্মৃতিশক্তির বিকাশ হয়। এই মানসিক দৃঢ়তা দ্বারা আমরা নানাবিধ আবশ্যকীয় কাজ করিতে সমর্থ হই। এটী সপ্রমাণ করিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না। আমরা দেখিতে পাই কত মহাত্মা পুরুষ এই অপূর্ব্ব মানসিক দৃঢ়তা দ্বারা কত অসামান্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন। আজ Sir Wm. Thomson প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই মনঃসংযোগ দ্বারা পার্থিব বিষয়ে কত উন্নতি করিয়াছেন, আজ তাঁহাদেরই মনঃসংযোগের বলে তাপযন্ত্রের কত উন্নতি হইয়াছে। Stephenson ও watt এর মনঃসংযোগ দ্বারা বাষ্পীয় যানের কত সুবিধা হইয়াছে। এগুলি অলৌকিক না হইলেও অসামান্য বলিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথা কি একবার কেহ ভাবিয়াছেন যে এ গুলি কেবল এই শক্তির বাহ্যিক প্রয়োগ মাত্র? এ কথা কি কেহ একবার মনে করিয়াছেন যে এ শক্তির আন্তরিক প্রয়োগে আরও কত অসামান্য কাজ করা যাইতে পারে? শরীরের কার্য্যপ্রণালীর সহিত মনের কার্য্যপ্রণালীর তুলনা যেরূপ অসাধারণ, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যাবলীর সহিত শেষোক্ত গুলির সম্বন্ধও তদ্রূপ। তবে কেন বিশ্বাস করিব না যে কোন গূঢ় প্রণালী দ্বারা আমাদের ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ এই শক্তি মনের উপর প্রয়োগ করিয়া কত অলৌকিক ব্যাপার সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন?

তবেই সেই শক্তিটী প্রথমতঃ মন অর্থাৎ অন্তর্জগৎকে ও দ্বিতীয়তঃ শরীর বা বাহ্যজগৎ ও মানুষের যাবতীয় কার্য্যাকার্য্যকে শাসন করিতেছে। সুতরাং যখন এই মন অর্থাৎ অন্তর্জগৎ ও ক্রিয়া বা বাহ্যজগৎ এ উভয়ের একত্র সমাবেশই অদৃষ্ট, তখন অদৃষ্টটাও কিয়ৎ পরিমাণে মনুষ্যাধীন বলিতে হইবে। অদৃষ্ট বলিলেই কিছু আর "ঢেউ দেখে না ডুবান" গোছের কোন অমানুষিক কথা বুঝায় না—ইহাতেও মানুষের বেশ হাত আছে। ইহাকেও ইচ্ছা

করিলে এড়াইতে পারা যায়। তবে যাহার কারণ আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য তাহাই 'অদৃষ্ট'।

একটী কুকুরকে বহু দিবস বাঁধিয়া রাখিয়া পরে যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার এক প্রকার আশ্চর্য্য বিক্রম অনুভব করিতে পারা যায়। কুকুরটি যতদিন তাহার স্বাভাবিক শক্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই তত দিন তাহার শক্তি তাহার শরীরে নিহিত ছিল। এক্ষণে স্বাধীনাবস্থায় সেই শক্তির স্ফুরণ দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ মানুষ যদ্যপি বৃথা আমোদে, বৃথা উল্লাসে, সময় ক্ষেপণ না করিয়া নির্জনে বসিয়া চিন্তা করে তাহা হইলে পরিশেষে কোন প্রকৃত মহান্ বিষয়ে তাহার চিন্তাশক্তির স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে সমস্ত রিপুগণকে ঐ শক্তি দ্বারা বশে রাখিয়া যদি শুদ্ধ মনঃসংযোগ অভ্যাস করা যায় তাহা হইলে একটি প্রকৃত বীরের ও জিতেন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য্য করা হয়। তাই কি বলে The greatest conqueror is he who conquers himself? এই মনঃসংযোগ শিক্ষাকালে অন্যান্য সুফলদায়িনী শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়, রিপুগণকে দমন করিয়া রাখিতে হয়, উৎকট বাসনাগুলি পরিত্যাগ করিতে হয়। এইরূপে ঐ শক্তির রূপান্তর দৃঢ় সংকল্পরূপে পরিণত হইয়া হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব তেজের বা শক্তির বিকাশ করে। এই শক্তির বল, রিপুগণকে বশে রাখিবার বলের অনুরূপ (equivalent) বা সমান। আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ এই রূপ ইন্দ্রিয়াদি দমন শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের সঙ্কল্পবল এত অসামান্য ছিল—আজকাল ইন্দ্রিয় দোষটাই সেই ব্রহ্মতেজঃ হ্রাসের এক মাত্র কারণ।

সাংসারিক নানাবিধ জঞ্জালে মনঃসংযোগ ব্যাপার বড় দুরূহ; আমাদের এক্ষণে সামান্য অবমাননা সহ্য হয় না, গাত্রের জ্বালা সহজে নিবারণ হইতে চায় না, সর্ব্বদাই মন উৎকট বাসনায় মগ্ন। প্রথম মুহূর্ত্তে অন্নচিন্তা, দ্বিতীয়ে কন্যাভার, তৃতীয়ে রোগ, চতুর্থে বৃথা আশা ইত্যাদি নানা কারণে মন কদাচ সুস্থির নয়। বিষয়ান্বেষণে কেবলই রত, অহঙ্কারে কেবলই মত্ত, অতএব মনের স্থিরতা বা দৃঢ়তা কোথায়? ইন্দ্রিয়গণের লালায়িততা সহজে পরিতৃপ্ত হয় না, উপভোগের দ্বারা কামবৃত্তি দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে, কারণ সুখের উপর মন আবার সুখ চায়। এই রূপ নানা কারণে চিত্তের স্থৈর্য্য বিকলিত হয়,

ধারণাশক্তির হ্রাস হয়, সঙ্কল্পশক্তি জন্মাইতে পায় না। আজ কাল এই সকল গুলির শক্তি একত্রে ও একসূত্রে মনকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে—ইহা হইতে আর পুনরুত্থান অসম্ভব। যেরূপ বাহ্যিক ইচ্ছাপ্রকাশে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, সেইরূপ কপট ভক্তিতেও কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব—সেই জন্য মনের নির্ম্মলতা অগ্রে আবশ্যক।

আজ কাল থিওসফিষ্ট বলিয়া যে একটা সম্প্রদায় দেখা যায়, তাহাদের ধর্ম্মের মূলে এই মহতী শক্তি নিহিত আছে; তাহাদের সমস্ত কার্য্য দৃঢ়সঙ্কল্পদ্বারা সাধিত হয়। এই জন্যই তাহাদের মধ্যে আর্য্যঋষিগণের ন্যায় শুচি ও পবিত্রভাবের এত আদর। তাহারা প্রথমতঃ মানসিক বিকৃতি হইতে শুদ্ধাচার দ্বারা পবিত্রতা ও স্থৈর্য্যলাভ করে; পরে ক্রমশঃ মনঃসংযোগ অভ্যাস করিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প লাভ করিয়া থাকে। এই সঙ্কল্প দ্বারা তাহারা গত আত্মার সাহায্যে নানা প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। এই জন্যই আমরা থিওসফিষ্টগণকে একেবারে ভ্রান্ত বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। তাহাদের মূলসূত্র যখন দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, তখন তাহাদের কার্য্যকলাপ একবারে উপহাস্য কখনই হইতে পারে না—তবে যাঁহারা চক্ষুরতীত কিছুই বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। আমরা কোন কোন আশ্চর্য্য বিষয় বিশ্বাস করি না। সাধারণতঃ যাহা অনুভব করিতে পারি তাহাই বিশ্বাস করিয়া থাকি। জগতে একেবারে অসম্ভব কিছুই হইতে পারে না। আমরা শূন্যমার্গে হস্তী বিচরণ, মধ্যাহ্নে চন্দ্রোদয় অনুভব করিতে পারি, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারি না। দুইটী সমান রেখা দ্বারা একখণ্ড জমী বেষ্টন অনুভব করিতেও পারি না, বিশ্বাস করিতেও পারি না। সেক্ষপীরের গল্পে যে একজাতীয় লোক আছে, তাহাদের মস্তক স্কন্ধের নিম্নদিকে, এটী অনুভব করিতে পারিলেও বিশ্বাস করিতে পারি না—আবার একটী ক্ষুদ্র কীটের দংশনে একটী বৃহৎ হস্তী হত হইয়াছে এটী অনুভব করিতেও পারি, বিশ্বাসও করিতে পারি। তাই আমরা বলিয়াছি 'সাধারণতঃ' আমরা যাহা বিশ্বাস করি, তাহা অনুভাব্য। আমরা এটি বিশ্বাস করি না ওটি বিশ্বাস করি না ইহার কারণ কিছুই নাই—কেবল মনের অবস্থান্তর মাত্র। সেই জন্য যিনি সর্ব্বকার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করেন না, তাঁহাকে বুঝাইয়া বিশ্বাস

করান যায় না—বিশ্বাস কতকটা স্বাভাবিক। আমরা যেমন কতক অসম্ভব জিনিস বিশ্বাস করিতে পারি—কতক পারি না, কেন পারি না তাহার হেতু নাই, তদ্রূপ কেহ এটি বিশ্বাস করেন না, কেহ ওটি বিশ্বাস করেন না তাহাতে কিছু অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইবে না। কিন্তু আমাদের মতে যতদূর পারা যায় সকলেরই বিশ্বাসটা দৃঢ় থাকা ভাল; ইহাতে অনেক বহুদর্শিতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি জন্মায়। বিশেষতঃ ভাল মন্দ বিচারে ইহা একটী প্রধান সহায়। তবে জোর করিয়া কাহারও মনে বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় না।

(৮) ইংরাজী ভাষায় একটী কথা আছে "The dawn of a very brilliant life is involved in some obscurity".—এটি কি সত্য? বলিতে পারি না। ইহা কিরূপে প্রমাণ করিব; কিন্তু ইহার অনুকূলে অনেকগুলি যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বীরবর Achilles কে, জন্মগ্রহণ কালে, দুইপ্রকার জীবনের মধ্যে একটি মনোনীত করিতে বলা হইয়াছিল (১)A long but inglorious life—সাধারণ দীর্ঘজীবন (২) A short but gloriuos life. প্রতিষ্ঠাবন্ত ক্ষুদ্রজীবন। দেবতাদিগের এরূপ বাক্য আমাদিগের মনে হঠাৎ গিয়া বাজিল। আমরা বুঝিলাম, বুঝি বা একটি আর একটির বিপরীত। পরে দেখিলাম বাস্তবিকই তাই। দেখিলাম প্রতিভাশালী লোক বেশী দিন জীবিত থাকে না, ফুলটি কোরক অবস্থাতেই কীটদষ্ট হয়; ঈশ্বরও রমণীয় জিনিসটির লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। দেখিলাম যাঁহাদের জীবনের কৃতিত্ব অতি সত্বরেই লব্ধ হয় তাঁহাদের জীবন অতি অল্পস্থায়ী। আর যাঁহাদের প্রতিষ্ঠালাভ কিছুদিন পরে হয়, কিম্বা ধীরে ধীরে হয়, তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইলেও হইতে পারেন। তাহার কারণ—যে সীমাবদ্ধ শক্তিটি একটি জীবনকে গঠিত করিবে বলিয়া প্রেরিত হইয়াছিল তাহার কার্য্য শীঘ্র সম্পাদন করিয়া সেটি হ্রস্ব ও শিথিল হইয়া পড়ে সুতরাং তাহার জীবনের দৈর্ঘ্য কমিয়া যায়। আর যাঁহার জীবনে ঐ শক্তিটি ধীরে ধীরে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্য করে তাঁহার জীবন কিছু বেশী হইতে দেখা যায়। এই জন্যই warren Hastings, wellington, প্রভৃতি যাঁহাদের জীবনের পূর্ব্বভাগ সামান্য ঘটনাপূর্ণ ছিল, তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী দেখা যায়; আর Shelley, Keats প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা একেবারে উল্কার ন্যায় জ্বলিয়া একেবারে

নির্ব্বাপিত হইল। যে লোক প্রকৃত প্রতিষ্ঠাশালী হইতে চান, তাঁহাকে নিরন্তর ধীরে ধীরে, নিরহঙ্কারে, বিনা মদে কার্য্য করিতে হইবে। লম্ফ দিয়া প্রতিষ্ঠা ধরিতে গেলে তাহা বেশীক্ষণ হাতে থাকে না—(He who grasps too much holds little)। যিনি অবিনশ্বর প্রতিষ্ঠালাভ কামনা করেন তাঁহাকে অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে চলিতে হয়, যিনি একেবারে কোন বিষয়ে জগতের নিকট বড় হইতে চান তিনি অহঙ্কার গর্ব্ব সবই করিতে পারেন, তাহাতে আমাদের মন্তব্য বা বক্তব্য কিছুই নাই। তাই আমরা পরামর্শ দিতেছি হঠাৎ যেন কেহ 'বড়লোক' হইতে চেষ্টা বা আশা না করেন। ধৈর্য্য ও বিশ্বাস থাকিলে অবশ্যই পরে মনস্কামনা পূর্ণ হইবে ইহাই আমাদের স্থির ও অবিচলিত বিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি প্রভৃতি অন্যান্য গুণ থাকিলে সোণায় সোহাগা হইয়া উঠিল। যাঁহারা আমাদের কথায় বিশ্বাস বা আস্থা দেখাইবেন না, তাঁহাদিগকে বলিবার আমাদের বেশী কিছুই নাই। তবে আমরা বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দিলাম বলিয়া আমাদের মনে বিশ্বাস আছে যে অনেকেই এ যুক্তিগুলি সহজে অবহেলা করিতে পারিবেন না। যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রকে শিরোধার্য্য করেন, যাঁহারা Huxley, Tyndall, Spencerএর প্রিয় শিষ্য তাঁহারা অবশ্যই আমাদের বাক্যগুলি একেবারে Stuff and nonsense বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না—তবে অবজ্ঞা (indiffrence) একটা স্বতন্ত্র জিনিস, তাহার সঙ্গে যুদ্ধ হয় না, সুতরাং জয়াশা বৃথা।

রিপুর বশীভূত হইলে লোকে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে কেন? রিপুর অধীনতাবশতঃ যে বাহিক অঙ্গবৈকল্য ও অঙ্গশৈথিল্য উপস্থিত হয় তাহাতে কতকটা চিৎশক্তির হ্রাস হয়, সুতরাং তাহার কিয়দংশ নষ্ট হইয়া যায়। সময় কিম্বা অন্য কোন বাহিক শক্তি ব্যতীত এই নষ্টশক্তির পূরণ হয় না। এই রিপুযুদ্ধের অব্যবহিত পরে অন্যান্য কার্য্যে আর সমধিক শক্তি পাওয়া যায় না। যাহার যত বেশী রিপুপরতন্ত্রতা ও রিপুপ্রবাল্য তাহার কার্য্যক্ষতি তত বেশী। এই হেতুই অবিবেচনা পূর্ব্বক কাজ করিলে অনেকে প্রায়ই শ্রমপণ্ডতানিবন্ধন অমনোযোগিতা অথবা অবিমৃশ্যকারিতার জন্য অনুতাপ করিয়া থাকেন। আমাদের যাবতীয় কার্য্যেই, ধীরতা, স্থিরতা ও মনঃসংযোগ আবশ্যক, ইহার

উপর ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করিলে আরও অধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা। সকল কার্য্যেই শান্তভাব (Temperence) থাকিলে আমরা বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারি। Temperence শিখিতে বিশিষ্ট শক্তির আবশ্যক, কারণ ইহার মূল ধৈর্য্য, ধৈর্য্যের মূল শক্তিপ্রয়োগ। শক্তিই সুখের মূল, শক্তিই সন্তোষের মূল, শক্তিই জয়লাভের মূল। Temperence থাকিলে উচ্চ আশা হয় না, মদ মাৎসর্য্য থাকে না, স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় না, সংশয় থাকে না—বাস্তবিক যে গুলি স্থির সুখের উপকরণ সেই গুলিই অবিকৃত থাকে। তাই Bain এর মুখে Plato বলিয়াছেন "The conditions of happiness are not wealth and power but justice and temperence"। সত্য সত্যই ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিতাবস্থায় মনস্থির রাখিতে যত শক্তির প্রয়োজন তত আর কিছুতেই নয়—এই মনঃস্থৈর্য্য কালে মন একপ্রকার অপূর্ব্ব শক্তি দ্বারা আবেশপ্রাপ্ত হয়—সেই শক্তির পরিণতাবস্থার যে স্ফূর্ত্তি তাহাই আনন্দ—তাহাই বিশুদ্ধ ও বিমল আনন্দ। এই কারণ বশতঃ আমরা অশিষ্টাচারি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিলে এক প্রকার মানসিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। সে আনন্দটুকু আমাদের নিজের সম্পত্তি—অন্য লোকের নয়। আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়াও পরের এই রূপ আনন্দ আমরা নিজে অনুভব করিতে অসমর্থ হই। কারণ যে শক্তিটি অবস্থাবিশেষে তাহাকে চালিত করিতেছে সেটি আমাকে ঠিক সেই অবস্থায় চালিত করিতেছে না। এই হইতেই সহানুভূতির সৃষ্টি—কারণ সহানুভূতির কারণ ও অবস্থা এক। সেই জন্যই দেশভেদে, জাতিভেদে, বিদ্বেষ দৃষ্ট হইলেও সহানুভূতি বিজাতীয়দিগের মধ্যেও অত্যন্ত প্রবল। এক্ষণে আমরা দেখাইলাম কিরূপে ক্রোধসংবরণাদি কাজে এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ও কি কারণে আমরা অন্যের দোষে সাধারণতঃ অন্ধ হইয়াই থাকি।

তিন খানি ছবি।

(১)

প্রলয় পবনে উড়িছে গগন
ওড়ে রবি শশী তারা,
উড়িছে ভূধর ওড়ে মহাসিন্ধু
ওড়ে হ্রদ নদীধারা ;
রাজ্য মহারাজ্য পশু পক্ষী কীট
মানব মানবী ওড়ে,
উড়িছে ধরণী উড়িছে জগৎ
ব্যোম্ অন্তঃ শূন্য ক'রে।
মহাশূন্য পারে দাঁড়া'য়ে রমণী
বদনে করুণা ঝরে,
প্রসারিয়া বাহু আকুল জগতে
হৃদয় মাঝারে ধরে।
ছায়াময় হ'য়ে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড
সে হৃদয়ে হয় লীন,
অন্য প্রান্ত হ'তে হেরে যুবা তাঁয়
নয়ন পলক-হীন।

---

(২)

সাগর হৃদয়ে তরঙ্গ ভেদিয়া
উঠিছে রমণী ধীরে,
চৌদিকে তাঁহার উত্তাল তরঙ্গ
বিস্ময়ে পশ্চাত ফেরে।
দুই পার্শ্বে দুই ভুজ প্রসারিয়া
পরশি তরঙ্গদ্বয়,

অপূর্ব্ব কিরণে বিভাসিয়া সিন্ধু
রমণী উদয় হয় ;
নিবিড় চিকুর পড়েছে ছড়া'য়ে
প্রসারি সুদূর জলে,
উন্নত উরস করিয়া পরশ
সাগর-হৃদয় টলে ;
রবি শশী তারা গ্রহ অগণন
দাঁড়ায়ে আকাশময়,
বিস্ময়ে পূরিয়া অনন্ত জগৎ
রমণী উদয় হয়।

---

(৩)

)vid's.) metamorphose এর অনুকরণ)

দাঁড়ায়ে রমণী অনাবৃত দেহ
ঊর্দ্ধে বাহু প্রসারিত,
অর্দ্ধ ভুজ দ্বয় শাখায় পল্লবে
ঝাউ বৃক্ষে পরিণত ;
স্খলিত চিকুর ঊর্দ্ধে প্রসারিত
অর্দ্ধভাগ তরুকায়,
লজ্জা—বিভীষিকা— বিস্ময়—যন্ত্রণা
নেত্রে ফুটি বাহিরায় ;
প্রফুল্ল উরস মর্ম্মর আকারে
হইতেছে পরিণত,
কটি বস্তি উরু জানু জঙ্ঘা পদ
ক্রমে ক্রমে শৈল মত।
সম্মুখে যুবক বিস্মিত নয়নে
সেই রূপান্তর হেরে,

না পারে ধরিতে না পারে সরিতে
দুই নেত্রে অশ্রু ঝরে ;
চিত্রপট-অর্থ দুই ছত্রে লেখা
আলেখ্যের নিম্নদেশে,
"পাষাণীর মত করেছিলে পণ
পাষাণী হইলে শেষে।"

ঈশান।

কাব্যের বর্ণনা।

বর্ণনা অনেক প্রকারের আছে। কোন প্রকার বর্ণনায় বর্ণিতব্য বিষয়টি যেন প্রতিলিখিত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া পড়ে—কোন প্রকার বর্ণনায় বর্ণিতব্য বিষয়টির সমষ্টিগত সৌন্দর্য্যই প্রতিভাসিত হইয়া থাকে—মূল বিষয়টি তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণিত হয় না, আবার কোন প্রকার বর্ণনা বর্ণিত বিষয়টিকে কেবল মাত্র বিবিধ শব্দালঙ্কারে ভূষিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকে। এ সকল বর্ণনার একটি বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, স্থানচ্যুত হইলেও ইহাদিগের সৌন্দর্য্য অবিকৃতই থাকে। যেখানে সেখানে ইহার যোজনা করা যায়, যেখানে সেখানে ইহার সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকারের বর্ণনা আছে—সে বর্ণনা উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যেই প্রায় অন্তর্নিবিষ্ট থাকিয়া উহাকে সমধিক শোভান্বিত করে, নিজেও সমধিক শোভান্বিত হয়। কিন্তু এরূপ বর্ণনা একেবারে স্থানচ্যুত করিলে, ইহার শোভা প্রভূত পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়ে—এরূপ বর্ণনা যেখানে সেখানে সংযোজনা করিতেও পারা যায় না। এরূপ বর্ণনাই প্রকৃত কাব্যের বর্ণনা। অন্যবিধ বর্ণনা যে কাব্যের শোভা সম্পাদন করে না, এরূপ নহে ; তবে সে গুলি ঠিক কাব্যের বর্ণনা নহে —সাধারণ বর্ণনা, শোভা সম্পাদনার্থ কাব্যে স্থান পায় মাত্র। মূল কাব্যের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই।—বলা বাহুল্য যে, আমরা কাব্য শব্দে

কাব্য গ্রন্থই অভিহিত করিলাম—যাহাকে সচরাচর কাব্য বলে, কাব্যের সেই সঙ্কীর্ণ অর্থেই ইহা ব্যবহার করিলাম।

উপরে যাহাকে কাব্যের বর্ণনা বলা হইল, আজি প্রচারের পাঠকবর্গ সমীপে তাহার ৪টি বর্ণনা উপস্থিত করিলাম। বর্ণনা কয়টি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, তাই সে আনন্দের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইল। যদি পাঠকবর্গের অরুচিকর না হয়, তবে পুস্তকান্তর হইতে এরূপ আরও বর্ণনা উদ্ধার করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

আর একটি কথা না বলিয়া প্রকৃত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায় না। বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদিগের ২। ১ মন্তব্য বা ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইবে, উহা কেবল মাত্র আমাদিগেরই সন্তোষ জন্য—হৃদয়ের আবেগে লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত বর্ণনার শতাংশের একাংশ সৌন্দর্য্যও ঐরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা পরিস্ফুট হইতে পারে না, ও হয় নাই।

(১)

নবকুমারের সঙ্গীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিয়াছেন। নবকুমার সেই লোকালয়শূন্য বালুকাস্তপশ্রেণী মধ্যে বসিয়া একাকী, ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, তাঁহার জঠর জ্বলিতেছিল, কিন্তু সে কষ্ট দূর করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। "দুরন্ত শীতনিবারণের জন্য আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। এই তুষার-শীতল বায়ু-সঞ্চারিত-নদী-তীরে হিমবর্ষী আকাশতলে নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে। হয় ত রাত্রিকালে ব্যাঘ্র ভল্লুকে, প্রাণনাশ করিবে। অদ্য না করে কল্য করিবে। প্রাণনাশই নিশ্চিত। এই রূপ চিন্তাকুল হইয়া মনের চাঞ্চল্যহেতু নবকুমার একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

"ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল; যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন;—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্ব্বত্র নীরব, কেবল অবিরল-কল্লোলিত সমুদ্রগর্জ্জন, আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব।"

কি অপূর্ব্ব দৃশ্যপটই প্রস্তুত হইল। দৃশ্যটী যেন নবকুমারের অবস্থার

সহিত—নবকুমারের চিন্তার সহিত এক লয়ে বাঁধা। ইহা ত যেন সহজেই পাঠকের মানসপটে সমুদিত করা যায়, কিন্তু "শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল; যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল"—ইহা বুঝান আমাদিগের সাধ্যাতীত। কথাগুলি যেন ঠিক সেই আকাশের নক্ষত্রাবলীর ন্যায় নীরবে এই বর্ণনামধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহার কোন্ কথা ব্যাখ্যা করিব? 'শিশিরাকাশে'? 'নীরবে'? না, 'ফুটিতে'? ইহার কোন্ ভাব ব্যাখ্যা করিব? সেইরূপ সমুদ্রতীরস্থ নির্জ্জনপরিত্যক্ত আশাশূন্য নবকুমারের নিকট সেই শূন্য প্রদেশের নীরবের নক্ষত্রোদয়? না, সেই নক্ষত্রোদয় দেখিয়া নবকুমারের সেই চিরপরিচিত স্বদেশের নক্ষত্রোদয়ের নীরব স্মৃতি—সেই "যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে তেমনি ফুটিতে লাগিল?" ইহার ব্যাখ্যা? ভাবের ব্যাখ্যা করিব, না, সেই ভাব প্রকাশের অপূর্ব্বশক্তি ব্যাখ্যা করিব? আমরা কিছুই করিব না—কিছুই করিতে পারিব না। এ সঙ্গীত আমরা গাহিতে অক্ষম—তাই কেবলমাত্র সঙ্গীতটির স্বরলিপি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। যাঁহারা আমাদিগেরই মতন গাহিতে না জানেন, তাঁহারা মৃদুমধুর নিনাদে সেতারঝঙ্কারবৎ এ সঙ্গীতের ধ্বনি মানসকণ্ঠে উত্থিত করিয়া সুখানুভব করুন। আর যদি কেহ এ সঙ্গীত গাহিতে জানেন, গলা ছাড়িয়া মধুর ভৈরবে ইহার সুস্বররাশি এইরূপ আকাশের দিগন্তে ভাসাইতে পারেন, তাঁহারা সাধ পুরাইয়া তাঁহার সঙ্গীত-ক্ষমতার সার্থকতা লাভ করুন;—আমরা দূর হইতে অনন্যকার্য্য—অনন্যমনা হইয়া তাহা শ্রবণ করি; শুনিয়া শুনিয়া সংসারতাপে জর্জ্জরিত এ শ্রান্ত হৃদয়খানিকে একবার সেই নবকুমারের মত তন্দ্রাভিভূত করি। হায়, ইহা কি কেহ গাহিবে না?

২

নবকুমার ফলমূলান্বেষণে এক নিবিড় বনমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, পথ চিনিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন না। এমন সময়ে,

"গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিল, তিনি বুঝিলেন যে এ সাগর-গর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্যে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয়

পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষুঃ যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা, স্তূপকৃত বিমলকুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায়; সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীল জলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ু বহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে থাকে, তবেই সে সাগর-তরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীল জলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতি দূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্ জাতির সমুদ্রপোত শ্বেত পক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল। কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তিনি তৎকালে সময়—পরিমাণ—বোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে আশ্রম সন্ধান করিতে হইবে, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। * * * গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন—

"অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকত ভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার,—অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্র পটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ সাগর-হৃদয়ে ক্রীড়াহীন চন্দ্রকিরণ-লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশ রাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহু-যুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমল শ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল।

মনোহর দৃশ্যপট। এখানেও আমরা সেই সাগর বর্ণনা, সেই সাগরতীরস্থ সুন্দরী বর্ণনা, সেই একের সৌন্দর্য্যে অপরের সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি—

ইহার কিছুই বলিব না। আমরা বলিব সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দণ্ডায়মান কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তির সহিত, নবকুমারের তাৎকালিক হৃদয়ের সেই অপূর্ব্ব লয়ের কথা—সেই অপূর্ব্ব সুর-সংযোজনার কথা। অনন্তবিস্তৃতা নীলবসনা বারিধি দেখিয়া নবকুমারের কাব্যময় হৃদয়ে স্বতঃই একরূপ অস্পষ্ট অজ্ঞাতচরিত্র সুখের মৃদু হিল্লোল প্রবাহিতেছিল। সেই সন্ধ্যালোকের ন্যায় সেই আধভাঙ্গা অস্পষ্ট সুখ-স্বপ্ন লইয়া যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে তদবস্থ দেখিলেন—স্বপ্ন পূর্ণ হইল, অস্পষ্ট স্পষ্ট হইল। সে সুখের সহিত এ সুখ যেন বিনা ওজরে মিশিয়া গেল। সঞ্চিত উপলরাশিবিভক্ত সলিলরাশি যেরূপ উপলোম্মোচনে মিলাইয়া যায়, নবকুমারের সেই সমুদ্র দর্শনজনিত মনোভাব যেন কপালকুণ্ডলার প্রত্যক্ষজনিত চিত্তভাবের সহিত মিলাইয়া গেল। নবকুমার এক সমুদ্র পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইলেন,—আর এক সমুদ্র সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই তেমনই শোভান্বিত, তেমনই চিত্তমোহকারী, তেমনই চিত্তভাববিশ্লেষী!

(৩)

দৃশ্যটির রেখাপাত মাত্র দেখাইয়া ক্ষান্ত থাকিব। কপালকুণ্ডলা শ্যামার জন্য ঔষধ আনিতে বনমধ্যে গমন করিতেছেন—উপরে চন্দ্রমা হাসিতেছে, নিজের স্নিগ্ধ কিরণরাজি নিশীথ জগতের ক্রোড়ে অকাতরে ছড়াইয়া দিতেছে। কি অপূর্ব্ব সুর মিলিল—সেই স্নিগ্ধ রশ্মিময়ী চন্দ্রমাশালিনী মাধবী যামিনীর সহিত কপালকুণ্ডলায় সেই পরোপচিকীর্ষার কি অদ্ভুত মিলন হইল। দেখিয়া দেখিয়া আবার কপালকুণ্ডলার সেই অতীতস্মৃতি কেমন সুন্দরভাবে সুরে মিশিয়া তাঁহার মনোমধ্যে সঙ্গীত করিতে লাগিল। আবার ঘটনার পীড়নে যখন কপালকুণ্ডলা অন্যরূপ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন—চন্দ্রমা লুক্কায়িত হইল, আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল। ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভিন্ন সুরে আবার আর একটি সঙ্গীত গীত হইল। ইহার পরে যখন "বিদ্যুতালোকে" কপালকুণ্ডলা দেখিতে পাইলেন, প্রাঙ্গণভূমিতে দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘকায় পুরুষ—সেই কাপালিক, সুর পঞ্চমে উঠিল। ইহাকেই কাব্যের বর্ণনা বলে।

(৪)

কপালকুণ্ডলা শ্মশানভূমিতে আনীতা হইয়াছেন। পাঠকবর্গ একবার সেই দৃশ্যটি স্মরণ করুন। শ্মশানের কথা বলিতেছি না—শ্মশানে সেই কাপালিকের সেই ভবানীপূজার কথা বলিতেছি না—সেই শ্মশানপথে কিরূপ করিয়া নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, তাহার কথাও বলিতেছি না—সেই নদী, আর সেই নদীতীরস্থ সেই নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার কথা বলিতেছি। কথা কহিতে কহিতে উভয়ে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। "বিশাল তরঙ্গিনীহৃদয় অন্ধকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। চৈত্রমাসের বায়ু অপ্রতিহত বেগে গঙ্গাহৃদয়ে প্রধাবিত হইতেছিল, তাহার কারণ তরঙ্গাভিঘাত জনিত কলকল রব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল।" দম্পতির হৃদয়ের সহিত এই তরঙ্গিনীর কিছু মাত্র প্রভেদ দেখিতে পান কি? নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার হৃদয়েও কি সেই রূপ করিয়া অপ্রতিহত বেগে চৈত্রবায়ু প্রধাবিত হইতেছিল না? কে বলিবে। সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া কপালকুণ্ডলা ভৈরবী আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্য যখন পঞ্চভূতের বিষম বন্ধনটিও ছিঁড়িবার কথা ভাবিতেছিলেন ছিঁড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন যে তাঁহার হৃদয়খানি ঐ তরঙ্গিণীর মত বায়ুবিক্ষিপ্ত তরঙ্গময় হইতেছিল না কে বলিবে? যখন নবকুমার আপনার হৃৎপিণ্ড সদৃশ প্রিয়তমাকে জীবিতাবস্থায় বিসর্জ্জন দিতে—আত্মহস্তে ছেদন করিতে সংকল্প করিয়া শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, এই চৈত্রবায়ুপ্রক্ষিপ্ত তরঙ্গাদির ন্যায় তখন যে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় নাই, কে বলিবে? আবার দেখুন, যখন ধীরেধীরে নবকুমারের চৈতন্য হইতেছিল, কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে রমণীসুলভ দয়ার ভাব বিকাশ পাইতেছিল,—সম্মুখস্থ নদীতে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইল। কপালকুণ্ডলা যখন হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, 'তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই,' যখন নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিতেছিলেন 'চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃন্ময়ি! বল—বল—বল—আমায় রাখ—গৃহে চল!' তখন সেই নদীতে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইতেছিল। আবার যখন কথা কহিতে কহিতে কপালকুণ্ডলার সেই ভবানীর আজ্ঞা মনে পড়িল, বলিলেন, 'ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। স্বামিন্! তুমি গৃহে যাও। আমি

মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না' এবং নবকুমার 'না—মৃণ্ময়ি!—না!' —এই রূপ উচ্চশব্দ করিয়া কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন—'চৈত্র বায়ু বিতাড়িত এক বিশাল নদীতরঙ্গ আসিয়া তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল; অমনি তট-মৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোররবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল।'—বর্ণনার পরাকাষ্ঠা হইল।

সন্ধ্যায়।

দেবকুমারী ও বিজয়।

দেব। বিজয়, সন্ধ্যা হ'ল যে!—দিন কি তবে ফুরিয়ে এল? সংসারের খেলায় দাঁড়ি প'ড়ল? বিজয়, শৈশবের দিন কি আর ফিরে আসে না? শৈশবে পা কেমন, কত দ্রুত চলিত। এখন পা আর চলে না কেন? এখন পদে পদে কত বাধা! সংসার, কারাগার।

বি। দেব, গোলাপ ফুট্‌লে পর, তার কাঁটা গুলো ঝরে পড়ে না কেন? এ জ্যোৎস্না-মাখান সুখের গঙ্গায় পূর্ব্বস্মৃতির ভাঁটা কেন? জীবন থাকিতে দিন ফুরাইয়া আসিবে কেন? আর সন্ধ্যা! আজ ত নূতন নয়। প্রতি-দিনই ত সন্ধ্যা আসে-যায়? জগতের সূর্য্য অস্তমান বটে। কিন্তু তোমার সূর্য্য, তোমার জগতের সন্ধ্যায় এখন ত অস্ত যায় নাই। সে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া জাগিয়া আছে। (আপনার মনে) এত দিনের পর আজ এ চিন্তা কেন? সুখের আকাশে দুরাশা-স্বপ্নের ছায়া কেন?

দেব। (উদাস নয়নে) না বিজয়, দেরী আর নাই!—যাবার সময়ের আহ্বান চারিদিকে ধ্বনিত হইতেছে। (হায় পুরুষ! তুমি কি অন্ধ! নারীর মন কিছু বোঝ না। নারী-জীবনের রহস্য, তোমাদের চোখে চির-অন্ধকারই রহিয়া গেল!)

বি। কি বল্‌চ তুমি? আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে? কাল বুঝি

কথাগুলো মুখস্থ করেছিলে? দেখ, সন্ধ্যা আমার বড় ভাল লাগে। সন্ধ্যার গীতোচ্ছ্বাস বড় মর্ম্মস্পর্শী। সন্ধ্যার কবিতা সকলে পড়িতে পারে না। তাহা বড় গভীর—জগৎব্যাপী, জগতাতীত। তাহা জগতের স্তরে স্তরে প্রচ্ছন্ন। সন্ধ্যায় অনন্তের খেলা। সন্ধ্যায় তারা ফুটে, চাঁদ হাসে, প্রকৃতি জাগে। স্বপ্নেরা আনাগোনা করে। ফুলেরা সাড়া দেয়। সন্ধ্যায় প্রকৃতি কথা কয়। সন্ধ্যা প্রকৃতির সচেতন ধর্ম্ম। সন্ধ্যায় প্রকৃতির কাজের আরম্ভ। প্রকৃতি, দিবসে মানুষের। সন্ধ্যায় মানুষ প্রকৃতির। দিবসে আপনাকে চিনা যায় না, বুঝা যায় না। সন্ধ্যায় আপনাকে চিনিতে পারি, বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি এই বিরাট অসীম প্রকৃতির কাছে আমরা মানব কত—কত ক্ষুদ্র। দিবসে আপনাকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া মনে করি। সন্ধ্যায় তাহার ঠিক বিপরীত দেখি। দেখি, আমরা প্রকৃতির কৃপার পাত্র, ক্রীড়নক। দিবসে আমরা বাহ্য কাজে রত থাকি। তখন যা-কিছু করি, তাহা কেবল বাহ্যজগৎ লইয়া। অর্থাৎ তাহা বাহ্যজগৎ সম্বন্ধীয়। তখন গৃহই সর্ব্বে সর্ব্বা, জগৎ হইয়া উঠে। আর সন্ধ্যায় আমরা আধ্যাত্মিক মর্ত্ত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যে, অতি-জগৎ রহিয়াছে, সেই জগতে তখন প্রবেশ করি। অসীমে ব্যাপ্ত হই। একে-অসংখ্য হই। এবং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে গৃহরূপে দেখি। দিবসে আমরা মানুষ। সন্ধ্যায়, দেবতা। এমন চিরযৌবনা সন্ধ্যায়, এই অসীম সসীমের মিলনের মুখে, তুমি অসুখী হচ্ছ? যাহারা আধ্যাত্মিক অনুশীলনে জীবন অর্পণ করেছে, তাহাদের সন্ধ্যা ভাল লাগে না? আশ্চর্য্য! যতদিন মানুষ, প্রকৃতিকে না বুঝিতে পারিবে, প্রকৃতির সহিত সমান ভাবে না মিশিতে পারিবে, ততদিন মানুষ, মানুষের শিক্ষা, অসম্পূর্ণ। মানুষ, অসম্পূর্ণ। প্রকৃতিকে লইয়া সে পূর্ণ। জগতে কবি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন? প্রকৃতির নাড়ীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে বলিয়া। প্রকৃতির প্রেমে প্রেমিক হইতে পারে বলিয়া। এই প্রকৃতি-ধনে কবি, ধনী-শ্রেষ্ঠ, মহাধনী। জগতের পূজনীয়। এই প্রকৃতির তালে চিরদিন নৃত্য করিতে পারে বলিয়াই কবি, অমর। দেবকুমারী, প্রকৃতির জীবন্ত মূর্ত্তি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ভাবে-গুণে জন্মিয়া, ফুটিয়া, তোমাতে প্রকৃতি-জ্ঞানের অভাব দেখি কেন? প্রকৃতির ধর্ম্ম, প্রকৃতির ভাব, বোঝ না কেন?

দেব। বিজয়, আমার জগৎ-বন্ধন, ইহজীবনের সুখের একমাত্র মূল, বল-দেখি, সুখের সুর একঘেয়ে কেন? প্রতিপদক্ষেপে সুখের বৈচিত্র্যহীন কাঁটা পায়ে বিঁধে কেন? সুখে আর সুখ নাই। সুখের সেবা আর ভাল লাগে না। সুখ আমার অস্বাস্থ্যকর হয়েছে। সুখের জন্য সুখ কে চায়? সুখের জন্য সুখ নয়। বাঁচিবার জন্য সুখ। অনন্তকে পাইবার জন্য সুখ। সুখে বাঁচা যায় কৈ? সুখের তরণীতে চাপিয়া, জীবন-সমুদ্র পার হওয়া যায় কৈ? সুখের তরণী বড় ভারী। অনেক যাত্রী এই সুখের তরণীতে চাপিয়া জীবন-সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে। পরপারে যাইতে পারে নাই। জীবনের পরপারে সুখের নৌকায় যাওয়া যায় না। তবে সুখ আর কেন? জীবনের পারে আমাকে কে লইয়া যাইবে? সুখের পাপ শিকল যার পায়ে বাঁধা, সে কখন কি অসীমে যাইতে পারে? গৃহের বাহির হইতে পারে? বিশ্বের মাঝখানে আসিয়া বিশ্ব-প্রাণে প্রাণ মিশাইতে পারে? অসীমের জগত বন্ধনাতীত অবিশ্রাম আহ্বান, সে কি শুনিতে পায়? বিজয়, এতদিন ধরিয়া তুমি আমায় যাহা শিখাইয়া আসিলে, আজ তুমি নিজে তাহা ভোল কেন? আজও সুখের দিকে এত ঝোঁক কেন? আজও ভোগের আকাঙ্ক্ষা কেন? প্রকৃতির মধ্যে অপার আনন্দ আছে বটে। কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, ভোগের বাসনা, সদা অতৃপ্তিকর ব্যাকুলতা কোথায়? মানবের ভোগ-সুখ-জাত আনন্দের সঙ্গে প্রকৃতিজাত আনন্দের তুলনা হয় কি? যে সুখ তুমি চাও, প্রকৃতি তাহা দেয় না। প্রকৃতির সুখ, বিমল, অনন্ত, পরার্থপর। প্রকৃতির সুখ, কাহাকে ডাকে না, হাসে না, কাঁদে না, মায়ার জাল পাতে না। প্রকৃতির সুখ, দুর্লভ। সকলে তাহা পায় না। যাহারা আত্মার অচেতনতা ঘুচাইতে পারিয়াছে, জড়ে ও আত্মায় বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, যাহাদের শিক্ষা, জগতের অনন্ত ঐক্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারে, তাহার মূল পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহারাই প্রকৃতির সুখ-লাভে সমর্থ। বাসনার ছাই গায়ে না মাখিয়ে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যগত স্থায়ী সুখ লাভ করা যায় না। বিজয়, স্বামিন, দিন দিন তুমি এত আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন? এত পিছিয়ে পড়ছ কেন? জীবনের যে এখন সমস্ত পথই বাকি। তুমি একা এ সুদীর্ঘ পথ-চিহ্নহীন-পথ কি করিয়া চিনিয়া যাইবে? কে তোমাকে আলো ধরিবে? আমার অন্ধকারের আলো

তুমি। তোমার অন্ধকারের আলো আমি। পথে দু'আলোরই প্রয়োজন তাহা না হইলে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছান যায় না। পদে পদে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়। যদি বা অতি কষ্টে পৌঁছিলাম, তাহাতে কোন কাজ হ'ল না, কোন ফল ফলিল না। যে পর্য্যন্ত সঙ্গী না আসে ততদিন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। সঙ্গী আসিলে তবে কার্য্য আরম্ভ হয়। স্বামী স্ত্রী পরস্পরে চিরদিনের সঙ্গী। তাহারা অনন্তকালের জন্য একসুরে বাঁধা। প্রেমের আদর্শ স্বামী-স্ত্রীতে। বাহিরে আমরা দু'জন দেখিতে। ভিতরে দুই এক। এক আত্মা—এক মন—এক ইচ্ছা—এক কার্য্য। প্রাণাধিক, জ্ঞানের ভ্রান্তি আমার, না তোমার ?

বি। দেখ, পৃথিবীতে থাকিতে গেলে সুখ চাই। পৃথিবীতে থাকিয়া মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া, সুখের অনুসন্ধানে বিরত কে ? সুখই এ পৃথিবীর একমাত্র সম্পত্তি। পৃথিবীতে সেই শ্রেষ্ঠ, যে সুখী। সুখের জন্যই মনুষ্য-জন্ম। জগৎকে সুখের ইন্দ্রালয় করাই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাহাই মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। সুখের কথা সকলের মুখেই শুনা যায়। সুখের অর্থ অনেকে অনেক রকমে করিয়া থাকে। সুখ কি ? আমি জানি না, ঠিক বুঝি না। সুখের সন্তোষজনক দর্শন শাস্ত্র কোথাও পাওয়া যায় না। আজও উদ্ভূত হয় নাই। তবে ইহা বুঝিতে পারি এবং দেখিতেও পাই যে, বাহ্যজগতে যেমন মাধ্যাকর্ষণ, অন্তর্জগতে তেমনি সুখের আকর্ষণ। দুয়ের আকর্ষণই সমান। প্রতিপদে মানুষকে টানিতেছে। প্রতিপদেই তাহাদের আকর্ষণ বাড়িতেছে। সুখের প্রত্যেক পরমাণু অহর্নিশি আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। সুখের অনিবার্য্য আকর্ষণ হইতে আপনাকে ছাড়ান, দূরে রাখা, বড় কঠিন। মানবের তাহা সাধ্যাতীত। সুখের সোহাগময় প্রাণ-উদাসী বাঁশী "রাধা রাধা" স্বরে অবিরাম বাজিতেছে। সে রবে পৃথিবী মুগ্ধা, পাগল। মানুষ চির-বিরহী। বাঁশী কোথা বাজিতেছে, কে বাজাইতেছে, কে জানে ? কিন্তু তাহা "কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিয়া মোর প্রাণ।" সে বাঁশী দেখা যায় না। তাহা দেখিবার নয়। কেবল শুনিবার ও অনুভব করিবার। সেই অনুভূতিময় স্বর্গের সাড়াপাওয়া বাঁশীর ডাকে

চলিয়াছি। কোথায় যাইতেছে, জানিনা। আবার এই সুখই সমাজ-বন্ধন। জগতে একাকী থাকা যায় না। একা থাকিয়া সুখী কে? জগৎকে লইয়া সুখ। পরিবারের সকলকে লইয়া সুখ, সুখের জীবন। সুখী-হইতে গেলে কাহাকেও ছাড়িতে পার না। সুখের নিন্দা করিও না। মানুষ হইয়া সুখের নিন্দা কর কি বলিয়া? বল দেখি, তুমি কি চাও? কিসের জন্য তোমার প্রাণ সদা ব্যাকুল? এই যে আজ তুমি জগতের সকল বস্তুতেই অতৃপ্তি, অপূর্ণতা, অশান্তি অনুভব করিতেছ, তাহার মুল, কারণ জান কি? কি পাচ্ছ না? সুখ। তুমি অসুখী। তাই জগতের চারিদিকেই সুখের অভাব দেখিতেছ। তাই জগতের মধ্যে সুখের চির-নূতন চির-তৃপ্তিকর নানারূপময় মধুর প্রেম-গীত শুনিতে পাইতেছ না। আর সুখইত মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। সুখ না থাকিলে কি মানুষ কখন বাঁচিত? তুমি যে বলেচ "সুখে বাঁচা যায় কৈ?" ও কথাটা তোমার মস্ত ভুল। তোমার সুখ, আমি বুঝিয়াছি। তোমার সুখ সংকীর্ণ, ব্যক্তিগত। তুমি খুঁজিতেছ, আপনার সুখ। আপনার সুখের মধ্যে সুখের পূর্ণতা, সুখের বিশ্বজনীন অপার আনন্দ নাই। সুখের পরিপূর্ণতা, সুখের চিরদিনের আনন্দ, বিশ্বের অসীম প্রাণের ভিতরে। সুখের সীমা এককাঠা জমি নহে। যথার্থ সুখ পাইতে গেলে বিশ্ব-জনীনতা থাকা চাই। তুমি ত জগতের সুখের দিকে একবারও চাইচনা। বিশ্বের নিয়ম আদান-প্রদান। সুখ দিলে তবে সুখ পাওয়া যায়। তুমি যদি জগৎকে সুখ না দাও, জগৎ তোমাকে সুখ কেন দেবে? আপনার প্রাণের মধ্যে সুখ কোথায়? বিশ্বের প্রাণের সহিত আপনার প্রাণ মিশাও। সুখী হইবে। ভূমানন্দলাভ করিবে। আপনাকে আপনার মধ্যে জড় করিতেছ বলিয়াই ত পৃথিবীর কিছুতেই সুখ পাও না। কথাটা বোঝ। মানুষ পৃথিবী হইতে আপনাকে তফাৎ রাখিতে পারে না। মানুষ জগতের এক ক্ষুদ্র অংশ। জগৎ হইতেই জন্মিয়াছে, আবার জগতের মধ্যেই লয় প্রাপ্ত হইবে। সেই ক্ষুদ্র মনুষের সুখ-দুঃখ জগতের সুখ-দুঃখ লইয়া। জল-বিন্দু অপেক্ষা সমুদ্র কত বড়। তোমার সুখের চেয়ে জগতের সুখ কত বড়। জল-বিন্দু যদি মনে করে, আমি সমুদ্রকে ছাড়িয়া থাকিব।

আমি সমুদ্র হইব। তাহা হইলেই সে ক'দিন বাঁচে? সে সমুদ্র হ'তে পারে কি? সমুদ্রের সহিত মিশিয়া সমুদ্র হইতে হইবে। সমুদ্রকে ছাড়িয়া সমুদ্র হইবার ক্ষমতা জল-বিন্দুর নাই। সমুদ্রকে ছাড়িয়া সমুদ্র হওয়া যায় না। তাই বলি জগতের প্রতি জগতের সুখ বাড়াইতে মন দাও। জগৎকে ভালবাস। আমিই কি তোমার সব? আমিইকি তোমার জগৎ? আমাকে সুখী করিলেই কি জগৎকে সুখী করা হ'ল? আমাকে অতিক্রম করিয়া কি জগৎ নাই। আমি যে তোমার আলো, আমি যে তোমার সাহায্য, তোমার এ জীবনের একমাত্র স্বামী, তাহা কিসের জন্য? কেবল কি তোমার নিজের সুখের জন্য? তোমাকে কেবল আমার মধ্যে পুরিবার-জন্য? না। আমার মধ্যে মরিবার জন্য তুমি আস নাই। আমার আলো তোমাকে অনন্তপথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। তোমার আমার প্রতি ভালবাসা, জগৎকে ভালবাসিবার জন্য। আমি তোমার অনন্ত সুখের দ্বার মাত্র। তোমার সুখের অনন্ত পথ দেখাইয়া দিতেছি। আমি তোমার স্বর্গও নহি। তাহার সিঁড়ি মাত্র। তুমি যে বলিয়াছ, "বিশ্বের মাঝখানে আসিয়া বিশ্ব-প্রাণে প্রাণ মিশাইতে হইবে।" সে কথাত আমিও বলি। কিন্তু তাহা কিরূপে? তাহা কি মানবকে দূরে রাখিয়া? মানবের সঙ্গে না মিশিয়া? তুমি বিশ্বকে মানব থেকে তফাৎ করিয়া দেখিতেছ। তা'ওকি কখন হয়? বিশ্বের সার অংশ মানব। বিশ্ব হইতে মানবকে বাদ দিতে পার না। যদি বিশ্ব-আত্মায় প্রাণ মিশাইতে চাও, তবে সমস্ত মানবের প্রাণের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। যাহা তুমি চাও, যে perfections'র জন্য তুমি ক্রমাগত চেষ্টাকরিতেছ, তাহা humanity 'র মধ্যে। humanity কে জাগাতে হইবে। humanity কে জাগাতেগেলে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আবশ্যক। বিশ্বব্যাপী প্রেমের প্রভাবেই humanity জাগিবে। প্রকৃতিকে পাইবে। সুখী হইবে। অনন্ত বিশ্বময় জীবনলাভ করিবে।

দেবী। বিজয়, জীবন-তত্ত্ব, জগৎ-রহস্য-কথা তাহার আদ্যন্ত মধ্য, তোমার কাছ থেকে অনেক দিন হইতে শুনিতেছি। এতকাল ধরিয়া তোমার জ্ঞানের সুন্দর কথা গুলির গভীর ভাবে আলোচনা করিলাম। অধিক কি, তোমার ভাবেই আমি অনুপ্রাণিত। তবু সত্য কথা বলিতে গেলে, তোমার ওসব

পাশ্চাত্য-ভাব-ঘেঁসা-কথা, আজও আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। ওসব কথা গুলাকে আজও আমার অস্থি-মজ্জা করিতে পারিলাম না। প্রাণ ধরিয়া তুলিতে পারিলাম না। উহা হইতে পরলোকের জন্য সঞ্চয় করিবার কিছুই পাইলাম না। উহা জীবন-পথে আমাকে এক পাও অগ্রসর করিয়া দিল না। অত বড় বড় উদার কথা, যাহা আমরা বুঝিতেই পারি না, তাহা বহিব কিরূপে? আমরা স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক চিরকালই স্ত্রীলোক থাকিবে। তাহাকে তুমি যতই শিক্ষিত করনা কেন। চিরকালই সে অবলা—আত্মময়ী। সেই জন্য স্ত্রীলোকের কাজ, পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকের কাজ, পুরুষের কাজের ঠিক উল্টো। জগৎময় হওয়া, জগৎকে দেখা, জগতের স্ত্রী হওয়া, পুরুষের ধর্ম্ম, পুরুষের কাজ। নারীর নহে। তুমি পুরুষের দিক হইতে নারীকে দেখিয়াছ। পুরুষের কাজকে স্ত্রীলোকের কাজ বলেছ। নারীর ধর্ম্ম কি? নারীর সমস্ত জীবন, স্বামী ও ঈশ্বরের অনুগামী হওয়াই ধর্ম্ম। তাহাই নারীর এক মাত্র শিক্ষা। নারীর কাজ গৃহ প্রতিষ্ঠা করা। গৃহিণী হওয়া। গৃহে স্বামীরূপ চির-প্রিয় সজীব মঙ্গলময় দেবতার নিত্য পূজা করিতে করিতে, সেই তাঁহার—যিনি আমার স্বামীর স্বামী, সকলের দেবতা,—পূজা-পদ্ধতি-প্রেম, শিক্ষা করা। স্বামী-রূপ সসীম ধ্রুবে অচল থাকিয়া, সেই অসীম মহা-ধ্রুবের দিকে অগ্রসর হইতে শিক্ষা করা। আমরা অহর্নিশ—দূর হইতে—জগতের মঙ্গল কামনা করি। পুরুষকে জগতের কাজে উৎসাহিত করি। পুরুষের কাজের অংশ লইয়া জগতের মঙ্গল করা, কাজ করা, নারীর ক্ষমতার অতীত। নারী তাহা পারে না। পুরুষের সহিত কি নারীর তুলনা হয়? নারী অচৈতন্য, পুরুষ চৈতন্য। নারী দেহ, পুরুষ আত্মা। সেই স্বামী আত্মার মধ্যদিয়া নারী মহা-আত্মায় প্রবেশ করিতে চায়। আর কিছুই সে চায় না। বিজয়, আমাদের দিন ফুরাইয়াছে। আমাদের অত সব কথায় কাজ কি। যাহাদের এখন দিন আছে, তাহারা ওসব কথা লইয়া নাড়া চাড়া করুক। চল ঈশ্বরে জীবন সমর্পণ করি। আর গৃহ কেন? জীবনের গৃহ-অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। পরলোক অধ্যায় সম্মুখে বিরাজমান। দেখ, এত বড় এই আকাশে-মেশা সাগরে-ঘেরা শত ফুল-হাসি-রঙ্গের ছড়াছড়ির সুখের বিচিত্র পৃথিবীতে মানবের খেলা

দু'দণ্ড মাত্র। প্রতিদিন অভ্যাস-সূত্রে কত খেলাই খেলিতেছি। প্রত্যহ নূতন নূতন আশা লইয়া জগৎ-মহারণ্যের ফুলে ফুলে পাগল হইয়া মধু অন্বেষণে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছি। জগতের চারিদিকে মায়ার অনন্ত শয্যা পাতিয়া গভীর আত্ম-বিস্মরণ-নিদ্রায় মগ্ন আছি। হায়! তাহা ক'দিন? একবার চোখ বুজিলেই ত সব ফুরাইল! জন্মের মত গেল! হায়! মানুষ পিছনে একবার চায় না! পিছনের জন্য কিছু রাখিয়া যায় না! সকলেই অধিকার বাড়াইতে দৌড়াইতেছি। অধিকার কোথায়? কিসের অধিকার? সুখের? তাহা অস্থায়ী—চঞ্চল। আশা? এখানে মিটে না। এ জগৎটা ঘোড়-দৌড়ের মাঠ। এ জগতের ভিড়ে আমাদের স্থান নাই। জগৎ থেকে আমাদিগকে পালাতে হবে। জগতে স্বাধীনতা নাই, সুখ নাই। জগতের সুখ, জগতের স্বাধীনতা, আমি চাই না। তাহা পরলোকের পথের বাধা—কণ্টক। জগতের দাসত্বে বৃথা সময় যাইতেছে। জগতের দাসত্ব আর ভাল লাগে না। জীবন মহত্ব চায়। জীবনকে জগতের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া মহৎ করিগে চল। জগৎ-মলা, জগতের দূরে গিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। এখানে ঝাড়িলে মলা পুনরায় ঢুকিবে। জগৎ-মলা, জগতের ভিতরে বসিয়া ঝাড়া যায় না। জগতের বাহিরে ঝাড়িতে হয়। আর সময় নাই। সময় যত চলিয়া যাইতেছে, ততই যেন কিসের হাহাকার রব কোথা হইতে শুনিতেছি। শুনিতেছি, কে যেন আমার আপনার লোক, আমার অনন্ত কালের হারাণ সঙ্গী, আমার ঠিক পাশে বসিয়া কাণের কাছে কি এক স্নেহ পূর্ণ-মধুর ক্রন্দনের মৃদুভাষায় আমাকে অবিরত আহ্বান করিতেছে। কে সে?—সন্ধ্যা? জগতের অনন্ত সন্ধ্যা?

বি। না। তাহা মানবের অনন্ত অভাব। তাহা Humanity'র আকুল-আহ্বান। তাহা পৃথিবী যুড়িয়া এক প্রাণ হইবার বিপুল প্রাণগত চৈতন্য—প্রচ্ছন্ন ব্যাকুলতা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

সখি দেখন-হাসি।

সকাল হ'ল ঘুম ভাঙিল সখি দেখন-হাসি,
মুচ্‌কে হেসে মধুর ভাষে জিজ্ঞাসিল আসি।
কেমন সখি, বাগানে কি যাবি সকাল বেলা,
ফুটেছে ফুল ভ্রমর কুল কর্‌ছে ফুলে খেলা।
চাঁপা গাছে ফুটে আছে কত শত ফুল,
পুকুর পাশে গোলাপ হেসে হতেছে আকুল।
গাছের ডালে গায় কোকিলে, কতই সুধা ঢালে
তৃণের আশে হরিণ আসে কতই পালে পালে।
তরুণ রবি—সোণার ছবি, সোণার হাসি দিয়ে,
ফুলের শিরে মুকুট ঘিরে দিচ্ছে সাজাইয়ে।
সুবাস আশে ফুলের পাশে সমীর ঘুরে ফিরে,
দোলায় লতা, গাছের পাতা কাঁপায় ধীরে ধীরে।
সেথায় গিয়ে ফুল তুলিয়ে বেছে মনের মত,
সোণার গায়ে দিব ছেয়ে সাজ্‌বে যেথা যত।
বৃন্দাবনে গোপীর সনে যে ফুল ল'য়ে সাধে,
কতই খেলা খেল্‌লে কালা কৃষ্ণচূড়া বেঁধে।
সেই ফুলেতে তোর চুলেতে খোঁপা বেঁধে দিব,
ফুলের বালা ফুলের মালা কতই পরাইব।
কানন মাঝে তেমনি সাজে 'বনদেবী' হ'য়ে,
হাস্‌বে তুমি দেখ্‌ব আমি প্রফুল্ল হৃদয়ে।
গিয়ে সেখানে কোকিলা সনে গাব খুলে গলা,
কেমন সখি, বাগানে কি যাবি সকাল বেলা?

শ্রীস্বর্ণময়ী দেবী।

সিপাহিযুদ্ধে ভারতবাসীর পরোপকারকাহিনী।

মধ্য ভারতবর্ষে নওগাঁও নামক স্থান উত্তেজিত সিপাহিদিগকর্তৃক আক্রান্ত হইলে তথাকার একদল ইউরোপীয় প্রাণের দায়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পলায়ন করেন। ভারতবাসীর পরোপকার গুণে ইহাদের কোনও রূপ অনিষ্ট হয় নাই। ১২ গণিত ভারতীয় পদাতিকদলের অধ্যক্ষ লেপ্টেনেণ্ট জ্যাক্সন্ পলায়ন বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিয়াছেন।—"মহোবা পরিত্যাগের পর মদনপুর (ছত্রপুর) নামক পল্লীতে আমাদের থাকিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পথ দুর্গম হওয়াতে, বিশেষ ১০।১২ খানি গাড়ীতে অনেক গুলি মহিলা থাকাতে আমরা উক্ত পল্লীতে অবস্থিতি করিতে পারি নাই। সূর্য্যোদয় সময়ে আমরা জুঁরা নামক পল্লীতে উপনীত হই। এই খানে উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই মহোবার কলেক্টর কর্‌ন্ সাহেবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। কলেক্টর সাহেব চিরকুরার রাজার নিকট হইতে ১০০০, টাকা ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। আমরা ঐ টাকায় এই দিনই, আমাদের সঙ্গে যে সকল লোক ছিল তাহাদের মে মাসের মাহিনা পরিষ্কার করিয়া ফেলি।

"সূর্য্যাস্ত সময়ে আমরা এলাহাবাদ হইতে বাঁদা যাওয়ার পথে আর একটি পল্লীতে উপনীত হই। * * * স্থানীয় লোকে আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে বিমুখ হয় নাই। তাহাদের দয়ায় ও তাহাদের সৌজন্যে আমাদের অনেক উপকার হয়। পরদিন দুই জন পথপ্রদর্শক আমাদের সহিত মিলিত হয়। ইহারা আমাদিগকে কালী নগর যাইবার পথ দেখাইয়া দেয়। কালী নগর হইতে আমরা নাগোদ নামক স্থানে প্রস্থান করি।

"সূর্য্যাস্তের কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অন্যান্য পল্লীবাসীর মধ্যে ৮।৯ জন লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। এই ঘোরতর বিপ্লবের সময় ইহাদের প্রভুভক্তি বিচলিত হয় নাই, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে ইহাদের প্রবৃত্তি জন্মে নাই। এ সঙ্কট কালে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থনে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সাধনে ও গবর্ণমেণ্টের আদেশপালনে ইহাদের বিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহ

ছিল। যদি আমরা এই প্রভুভক্ত বন্ধুগণের দেখা না পাইতাম, তাহা হইলে, আমাদের বড় অসুবিধা হইত। এ সময়ে বিশেষ সত্বরতার সহিত যাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। যেহেতু ৪৫ মাইল অতি দ্রুতবেগে ধাবমান হওয়াতে আমায় অধিষ্ঠিত অশ্ব অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সকল দয়ার্দ্রহৃদয় বন্ধু আমাদের যথোচিত আতিথ্য সৎকার করে। পরদিন আমরা উহা অপেক্ষা বহুলোকসমাকীর্ণ বহুবিস্তৃত আর একটি পল্লীতে উপস্থিত হই। এই স্থান হইতে আমি অজয়গড়ের রাণীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র পাঠাই। এই পত্র পঁহুছামাত্র আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়। আমরা ১০।১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিরাপদে অজয়গড়ে উপস্থিত হই। পল্লী হইতে কতকগুলি অস্ত্রধারী লোক সমস্ত পথ আমাদের রক্ষক হইয়া আইসে। অজয়গড়ে আমরা কয়েক দিন অবস্থিতি করি, যেহেতু আমাদের একজন সঙ্গী পথশ্রান্তিতে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে তাঁহার দাঁড়াইবার সামর্থ্য ছিল না। আমরা এই থানে কয়েক দিন থাকিয়া শ্রান্তি বিনোদন করি। আমাদের বাহনগণও আমাদের সহিত সুস্থ ও সবল হয়। অজয়গড় হইতে আমরা নাগোদে যাত্রা করি। পরহিতৈষিণী রাণী আমাদিগকে লইয়া যাওয়ার জন্য কয়েকটি হাতী দেন।” বলা বাহুল্য যে উপস্থিত সঙ্কট কালে ভারতীয়দিগের এই রূপ সাহায্য না পাইলে পলাতক ইউরোপীয়দিগের প্রাণবিয়োগ হইত। দুর্গম পথ অতিবাহনে, দুর্দ্দান্ত লোকদিগের তাড়নে বা দুরাশয় অস্ত্রধারীদিগের আক্রমণে তাঁহারা যাতনার একশেষ ভুগিয়া হয় ত শেষে মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিতেন।

নওগাঁও হইতে আর এক দল পলাতক আর এক পথে যাত্রা করেন। ইঁহারাও ভারতবাসীর করুণায়, সদাশয়তায় ও হিতৈষিতায় অভীষ্ট স্থানে উপনীত হন। ইঁহাদের পলায়ন কাহিনীতেও ভারতবাসীর পরোপকারের চিহ্ন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ইঁহাদের এক জন এই ভাবে আপনাদের দুঃখকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। “আমি যখন সমস্ত আশা ভরসা ছাড়িয়া কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছিলাম, তখন একটি লোক আমার নিকট উপস্থিত হয়। এই লোক আপনাকে রাজার দূত বলিয়া

পরিচয় দেয়। রাজা আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই শুভ সংবাদ পাইয়া আমি আশ্বস্ত হৃদয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হই। লুগাসির রাজা আমাকে যথোচিত আদরের সহিত গ্রহণ করেন, এবং নওগাঁওর সিপাহিযুদ্ধের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। তাঁহার তদানীন্তন মুখভঙ্গীতে স্পষ্ট প্রতীত হইয়াছিল যে তিনি ইউরোপীয় আফিসরদিগের নিরাপদ হওয়ার সংবাদের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। রাজা আমাকে কোন আফিসর নিহত হইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু আমি সন্ত্রস্ত ভাবে পলায়ন করাতে নওগাঁর সিপাহিযুদ্ধের বিবরণ কিছুই জানিতে পারি নাই; সুতরাং রাজার ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অসমর্থ হই। রাজা আমার আহার্য্য সামগ্রী আনিয়া দিতে অনুচরদিগকে আদেশ দেন, এবং আমাকে সেই রাত্রিতে পল্লীর একটি নির্দ্দিষ্ট গৃহে রাখিতে কহেন। কেহ আমার কোনও অনিষ্টসাধন করিতে না পারে এই জন্যই আমার বাসের নিমিত্ত ঐ গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা আমাকে আহ্বান করিয়া কহেন যে, ছত্রপুরে মেজর কার্ক নামক একজন সৈনিক পুরুষের নিকটে তিনি পত্র লিখিবেন। এতদ্ব্যতীত উত্তেজিত সিপাহিরা নওগাঁও পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে কি না ইহা জানিবার জন্য এক জন গুপ্তচর পাঠাইতেও তাঁহার ইচ্ছা আছে।

তৃতীয় দিন রাত্রিতে আমরা কালিঞ্জরের অভিমুখে যাত্রা করি। প্রথমে জোরাই নামক পল্লীতে উপনীত হই। এই খানে হামিরপুরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট কার্ন্ সাহেবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। ইনি আমাদের জন্য ১০০০৲ টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। এই টাকা চিরকাণীর রাজা তাঁহাকে ধার দেন।

পথে আমাদের নিকট এই সংবাদ উপস্থিত হয় যে, কুব্রাই নামক পল্লীর অধিবাসিগণ আমাদিগকে উক্ত পল্লী হইতে তাড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। কাহার দ্বারায় এই সংবাদ প্রচারিত হয়, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। বোধ হয়, আমাদের বিপক্ষগণ দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য এই সংবাদ প্রচার করে। উত্তেজিত সিপাহিরা এখন আপনাদের কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তাহাদের দ্বারা এই জনরব প্রচারিত

হওয়া বিচিত্র নয়। যাহা হউক, পরিশেষে উক্ত সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আমরা ১২ কি ১৩ দিন ঐ পল্লীতে নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করি। পল্লীবাসিগণ আমাদের আহারীয় দ্রব্যাদির সংস্থান করিয়া দেয়। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য পর্য্যাপ্ত না হওয়াতে শেষে আমরাই আমাদের খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইতে থাকি।

কুব্রাই হইতে আমরা বাঁদা যাইবার জন্য মিতাউন নামক স্থানের অভিমুখে যাত্রা করি। অপরাহ্ণ ৬টার সময় আমরা ঐ পল্লীতে উপনীত হই। পল্লীতে প্রবেশ সময়ে অধিবাসিগণ যথোচিত দয়া ও সৌজন্যের সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করে, এবং তাহারা আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পল্লীমধ্যে লইয়া যায়। এই থানে আহারের জন্য দ্রব্যাদি ও শুইবার জন্য খাটিয়া দিয়া আমাদের তৃপ্তি সাধন করে। এই স্থানে ৪।৫ দিন থাকিবার জন্য আমরা স্থানীয় জমিদারের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করি। জমিদার যথোচিত ভদ্রতার সহিত কহেন যে,—"আপনাদের যত দিন ইচ্ছা হয় ততদিন এই স্থানে অবস্থিতি করিতে পারেন।" স্থানীয় ভূস্বামিগণ কেবল এইরূপ সৌজন্য দেখাইয়াই নিবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা আমাদের প্রত্যেককে এক এক প্রস্থ পরিধেয় বস্ত্র ও এক এক খানি কম্বল দেন। বেনিয়াগণ (শস্যব্যবসায়ী) যদিও কঠোর-হৃদয় বলিয়া পরিচিত, তথাপি তাহারাও আমাদের জন্য ময়দা যোগাইতে বিমুখ হয় নাই। কেহ কেহ আমাদের তৃপ্তির জন্য চুরুট আনিয়া দেয়। এই স্থানে আমরা শুনিতে পাইলাম যে বাঁদার ইউরোপীয়গণ নিহত হইয়াছেন; এজন্য আমরা উক্ত স্থানে যাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। যাহাতে আমরা নিরাপদে নাগোদে উপনীত হইতে পারি, তদ্বিষয়ে সাহায্য করার জন্য আমি বুন্দেলখণ্ডের সহকারী পলিটিক্যাল এজেণ্ট মেজর ইলিস্ সাহেবের নিকট এক খানি পত্র লিখি। স্থানীয় ভূস্বামী পত্র-বাহককে একটি টাকা দিয়া ঐ পত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দেন। পত্র-বাহক দশ দিনে প্রত্যাগত হয়। সে ইলিস্ সাহেব ও কাপ্তেন স্কট্ নামক একজন সৈনিক পুরুষের পত্র সঙ্গে করিয়া আনে। প্রায় এক মাস কাল অবস্থিতির পর আমরা ৯ই আগষ্ট মিতাউন হইতে যাত্রা করি। ৫০ জন

লোক আমাদের রক্ষক হইয়া নগর পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত হয়। মিতাউন হইতে পনর মাইল দূরে গৌরীচর নামক একটি স্থান আছে। এই স্থানের জায়গীরদার আমাদিগকে অতি শীলতা ও আগ্রহের সহিত নিমন্ত্রণ করেন। আমরা এই নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই। গৌরীচরে আমাদিগকে ১৭ দিন থাকিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে উক্ত জায়গীরদার আমাদের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার জন্য দরজি আনিতে বাঁদায় লোক পাঠান। কিন্তু বাঁদায় নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে এই লোক কৃতকার্য্য হইয়া আসিতে পারে নাই।

প্রেরিত লোক বাঁদা হইতে কেবল কয়েক জোড়া চর্ম্মপাদুকা আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু অনেক বড় হওয়াতে আমরা উহা ফেরত দিতে বাধ্য হই। যাহা হউক, স্থানীয় ভূস্বামী আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট দ্রব্য দিতে তাঁহার লোকদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার নিকটে যথোচিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া ২৮শে আগষ্ট স্থান পরিত্যাগ করি। ভূস্বামী আমাদের যাত্রার সময় সঙ্গিনী মহিলাদের জন্য তাঁহার পাল্কী এবং আমাদের জন্য তাঁহার হস্তী সজ্জিত করিয়া দেন।”

উপস্থিত সময়ে সকল সিপাহিই যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া ইংরেজদিগের বিনাশ-সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় নাই। সময়ের উত্তেজনায়, লোকের কুমন্ত্রণায়, ইংরেজের কুটিল রাজনীতির তাড়নায় এ সময়ে অনেকে অধীর হইয়াছিল; অধীর ভাবে অনেকে ইউরোপীয়দিগের শোণিতে ভারতের অনেক স্থান রঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু সমগ্র সিপাহিসৈন্য ইঙ্গরেজদিগের বিপক্ষতা করে নাই। কেহ কেহ আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও নিরাশ্রয় নিপীড়িত ও নিদারুণ শোচনীয়দশাগ্রস্ত ইঙ্গরেজের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। একজন আফিসর এইরূপ একটি দয়াপর সিপাহির বিবরণ এই ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন।—“কতকগুলি সিপাহি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে থাকে। আমি তখন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠি ‘কি!—তোমরা কি সকলেই আমার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছ!’ এই কথা শুনিবামাত্র কতকগুলি আমার অধিষ্ঠিত অশ্বের চারিদিকে আসিয়া দাঁড়ায়। আমি তাড়াতাড়ি এক জন সেনা নায়কের গৃহে লুক্কায়িত হই।

তিন জন রসলদার এবং প্রায় ৪০ জন অশ্বারোহী সিপাহি আমাকে রক্ষা করিতে কিম্বা আমার পতনের সহিত তাহাদের দেহপাত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। দুই জন সৈনিক পুরুষ তাঁহাদের স্ত্রী ও শিশুসন্তান লইয়া পদব্রজে পলাইতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া আইসি। রসলদার ও সিপাহিগণ আমাকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকিলেও আমি সহসা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। যেহেতু ঐ মহিলা ও সন্তানগণের রক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না।

তৃতীয় দিন আমি ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করি। অশ্বারোহী সিপাহিগণ আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া যাইতে থাকে। স্থানীয় ভূস্বামীর একজন উকীলের যত্নে পূর্ব্বোক্ত সৈনিকপুরুষদ্বয়ের স্ত্রী ও সন্তানগণ রক্ষা পায়।

আমি আবু নামক স্থানে উপনীত হইলে, সেই স্থানের লোকে যথোচিত সদয় ভাবে আমার ব্যবহারের জন্য কাপড় তামাক ইত্যাদি আনিয়া দেয়।

যে রসলদার আমাকে এইরূপে রক্ষা করিয়াছিল তাহার নাম আব্বাস আলি। আমার বিশ্বাস যে তাহার জীবনের কোনও হানি হয় নাই। আমি মাড়বারের ইংরেজ সেনাপতি ও পলিটিক্যাল এজেণ্ট্‌কে এই সাহসী সৈনিক পুরুষের জীবনরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি; যেহেতু এই ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইয়াছিল এবং বিপক্ষদিগের প্রায় বন্দী হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে অনেকগুলি সাহসী অশ্বারোহী তাহার সহায় থাকাতে বিপক্ষগণ আপনাদের স্বার্থ নষ্ট না করিয়া তাহার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হইতে পারিবে না।"

ভারতীয় সৈনিক পুরুষের যত্নে আর একটি ইউরোপীয় সেনানায়কের জীবন এইরূপে রক্ষিত হয়। দুই জন হাবিলদার লেপ্টেন্যাণ্ট রেলি নামক একজন সৈনিক পুরুষের প্রাণরক্ষা করে। ইহারা বিবাহে যাইবার ডুলিতে করিয়া রেলিকে ভাগলপুরে আনে। এই ডুলি ভাড়া করা হইয়াছিল। লেপ্টেন্যাণ্ট রেলি পরিশ্রান্তি ও ক্ষুধায় এইরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে হামাগুড়ি দিতেও তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। চারি দিকে গুলিবৃষ্টির মধ্যে তিনি হাবিলদারদ্বয়ের চেষ্টায় রক্ষা পান। এইরূপে জীবন রক্ষা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে।

গ্রিগর গ্র্যাণ্ট্ নামক আর একজন ইউরোপীয় দুই দিন অনাহারে ছিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি আর একটি পল্লীতে উপনীত হন। পল্লীবাসিগণ তাঁহার আহারের জন্য দুগ্ধ ও মুড়কি আনিয়া উপস্থিত করে। ক্ষুধার্ত্ত ইউরোপীয় যথোচিত কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার খিদমদ্গার ঐ পল্লীতে লুক্কায়িত রহিয়াছে। গ্র্যাণ্ট সাহেব তাহাকে নিজের নিকটে আহ্বান করেন। খিদমদ্গার উপস্থিত হইলে একটি ডুলি প্রস্তুত হয়; কেন না গ্র্যাণ্ট্ সাহেবের পদতলে গভীর ক্ষত হওয়াতে তাঁহার চলিয়া যাইবার সামর্থ্য ছিল না। রাত্রিতে যে কাপড় ব্যবহার হয়, তিনি কেবল সেই কাপড়ে ছিলেন, ইহা ব্যতীত অন্য কোন কাপড় বা পাদুকা ছিল না। তাঁহার ঘোটক ও হস্তী পরহস্তগত হইয়াছিল, তাঁহার বস্ত্রাদি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। তিনি খিদমদ্গারের সঙ্গে বস্ত্রাবৃত ডুলিতে যাইতে লাগিলেন। খিদমদ্গার ঐ ডুলিতে তাহার নিজের স্ত্রী আছে বলিয়া সাধারণের নিকট ভাণ করিতে লাগিল। পলাতক ইউরোপীয় এইরূপে শঙ্কিত হৃদয়ে বৃত্তাকার পথ অতিবাহিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে তিনি শুনিতে পাইলেন যে অন্যান্য সেনানিবাসের সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া ইউরোপীয় আফিসরদিগকে হত্যা করিয়াছে। এই সংবাদে তাঁহার আশঙ্কা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে সিপাহিদিগের হস্তগত হইলে স্বয়ংও ঐ রূপে নিহত হইবেন। কিন্তু ঈশ্বরের অপার করুণায় ও তাঁহার বিশ্বস্ত খিদমদ্গারের অসীম চেষ্টায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত গ্র্যাণ্টের জীবন রক্ষা পাইল।

দেওঘরের সিপাহিসৈন্য যুদ্ধোন্মুখ হইলে, যে দুই জন হাবিলদার তাহাদের অধিনায়ক লেপ্টেন্যাণ্ট রেলিকে ভাগলপুরে আনিয়া রক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের এক জনের নাম দরিয়া সিংহ ও অপরের নাম ঠাকুর দোবে। ইহারা ৩২ গুণিত পদাতিক সৈন্যদলের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ভাগলপুরের অধিবাসিগণ চাঁদা করিয়া ৮ শত টাকা সংগ্রহ করে। ঐ টাকা উক্ত বিশ্বস্ত হাবিলদার দ্বয়ের পারিতোষিক দেওয়া হয়।

ফইজাবাদের ডেপুটি কমিসনর কাছারিতে গিয়া শুনিলেন নিকটবর্ত্তী

সেনানিবাসে সিপাহিরা যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি আপনার স্ত্রীকে গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক অবিলম্বে নদীকূলাভিমুখে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। একজন বিশ্বস্ত চাপরাশি তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য আদিষ্ট হইল। ডেপুটি কমিশনর এই সংবাদ পাঠাইয়া স্বয়ং সেনানিবাসে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য যে, সৈনিক কর্ম্মচারিগণের সাহায্যার্থে যদি কোন কার্য্য করিতে হয়, সেই জন্যই ডেপুটি কমিসনর কাছারি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ দিকে ডেপুটি কমিশনরের বনিতা বিশ্বস্ত চাপরাসির সঙ্গে পাল্কীতে নদীকূলের দিকে যাইতে লাগিলেন। রাত্রি সমাগমে তাঁহাকে একটি পল্লীতে আশ্রয় লইতে হইল। বাহকেরা পাল্কী নদীর ধারে রাখিয়া চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে উত্তেজিত সিপাহিদিগের ভয়ঙ্কর কোলাহল সমুত্থিত হইল। সিপাহিরা ইউরোপীয়দিগের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভয়ব্যাকুলা বিদেশিনী চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিল। উক্ত পল্লীবাসিনী একটি দরিদ্র মহিলা আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও তাঁহাকে একটি অব্যবহার্য্য তুন্দুরের ভিতরে লুকাইয়া রাখিল। ডেপুটি কমিশনরের স্ত্রী ভীতিবিহ্বল-চিত্তে সমস্ত রাত্রি সেইখানে রহিলেন। সিপাহিরা চারিদিকে পলাতক ইংরেজদিগের অন্বেষণ করিতেছিল; লুক্কায়িত পলায়িতদিগকে বাহির করিয়া না দিলে প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়াও সকলকে ভয় দেখাইতেছিল। যখন উক্ত ইঙ্গরেজমহিলা গ্রামমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন গ্রামীন পুরুষেরা গোধন সঙ্গে লইয়া কৃষিক্ষেত্রে গিয়াছিল, সুতরাং এ বিষয় তাহাদের গোচর হয় নাই; কিন্তু গ্রামের মহিলারা প্রায় সকলেই ইহা জানিত। সিপাহিরা ভয় দেখাইলেও তাহারা ঐ ইংরেজকুলকামিনীর কথা প্রকাশ করিল না। দয়া ও সাধুতার সম্মান তাহাদের নিকটে উচ্চতর বোধ হইল। আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইলেও তাহারা হৃদয়ের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইল না। সিপাহিদিগের ভীষণ কোলাহল মধ্যে দরিদ্রা আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে বিদেশিনী সেই তুন্দুরের অভ্যন্তরে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। ক্রমে ভয়ঙ্করী রাত্রি প্রভাত হইল, ভীষণ কলরব অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল, উত্তেজিত সিপাহিরা কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে প্রস্থান

করিল। ডেপুটি কমিশনরের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত চাপরাসি স্থানীয় ভূম্যধিকারী মহারাজ মানসিংহের নিকটে যাইয়া নৌকা প্রার্থনা করিল। মানসিংহ বিপন্নদিগের উদ্ধারার্থ চাপরাসির প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ডেপুটি কমিশনরেরপত্নী এবং অপর কয়েকটি ইংরেজ কুলকামিনী বালক বালিকার সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। বাহিরে কয়েকটি বিশ্বস্ত সিপাহি ও চাপরাসি বসিয়া রহিল এবং এখানি তীর্থযাত্রীর নৌকা বলিয়া সাধারণের নিকট ভাণ করিতে লাগিল। পথিমধ্যে ইহদের সহিত কতকগুলি উত্তেজিত সিপাহির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু নৌকার অভ্যন্তরে যে ইংরেজ কুলকামিনীগণ রহিয়াছে ইহা কেহই ঐ সিপাহিদিগের নিকটে প্রকাশ করিল না। সন্ধ্যা সমাগমে নৌকা নিরাপদে তীরে আসিয়া লাগিল। এই সময় ২।৩ জন চাপরাসি দুগ্ধ ও রুটির জন্য নিকটবর্ত্তী পল্লীতে গেল। এই পল্লীর মহিলারাও বিপন্নদিগের যথোচিত যত্ন করিতে ত্রুটি করিল না। একটী দরিদ্রা মহিলা নৌকাশ্রিত শিশু সন্তানদিগকে ক্ষুধায় কাতর দেখিয়া তাড়াতাড়ি গ্রামে প্রবেশ করিল এবং কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে করিয়া নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। শিশুসন্তানগুলি ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়াছিল। যাহারা এক সময়ে সর্ব্ব প্রকার সুখসৌভাগ্যে লালিত হইত, সর্ব্বপ্রকার কষ্ট হইতে বিমুক্ত থাকিয়া নিরন্তর আমোদে কালাতিপাত করিত তাহারা এখন দুগ্ধের অভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনাদের দুঃসহ যাতনা প্রকাশ করিতেছিল। ধাত্রীগণ ইহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা আপনাদের স্তন্য দিয়া ক্ষুধার্ত্ত শিশুসন্তানদিগকে সন্তৃপ্ত করিল। এই প্রকার সাহায্য দানে যে আপনাদের জীবনহানির সম্ভাবনা আছে ইহা তাহারা জানিত, তথাপি তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইল না; আশঙ্কা বলবতী হইয়া তাহাদিগকে এই মহত্তর কার্য্যসাধনে বাধা দিল না। তাহারা অসঙ্কুচিত ভাবে, নির্ভীকহৃদয়ে, বিপন্নের বিপদুদ্ধার করিয়া জগতের সমক্ষে মহান্ ধর্ম্মভাবের পরিচয় দিল। পল্লীস্থিত ইংরেজ কুলকামিনীগণ ইহাদের সহিত এক দেশে বাস করিতেন না, ইহাদের সহিত এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন না, ইহাদের সহিত এক প্রণালীতে—এক দেবতার আরাধনা করিতেন না এবং ইহাদের সহিত এক

জাতীয় বলিয়াও পরিচিত হইতেন না। এরূপ ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ধর্ম্মের ও ভিন্ন বর্ণের হইয়াও ইঁহারা দরিদ্রা মহিলাদিগের অসাধারণ দয়ায় ঘোরতর সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইলেন। ভারতের পর্ণকুটীরবাসিনী এ পবিত্র স্নেহময়ীর নিঃস্বার্থ ভাবের সহিত অন্য কোন কার্য্যের তুলনা সম্ভবে না।

ইংরেজমহিলাগণ এইরূপ অসাধারণ পরোপকারগুণে শিশু সন্তানদিগের সহিত অক্ষত শরীরে এলাহাবাদে উপনীত হন। ডেপুটী কমিশনর ও তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা বনিতা এই মহৎ উপকারের বিষয় বিস্মৃত হন নাই। যাহারা আপনাদের জীবন বিপদাপন্ন করিয়াও অসময়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল; আশ্রয় দিয়া, আহার্য্য দিয়া ও অন্যান্য আবশ্যক কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাহারা তাঁহাদিগকে সেই ভয়ঙ্কর সময়ে নিরাপদে রাখিয়াছিল, শান্তি স্থাপিত হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ

শান্তি।

নবম পরিচ্ছেদ।

বড় ভয়ানক কাণ্ড! শশী ভট্টাচার্য্য রাত্রে কাটা পড়িয়াছেন! প্রাতে তাঁহার কুটীরের চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। পুলিসের ইনিস্পেক্টর, হেড কনষ্টবল ও কনষ্টবল গস্ গস্ করিতেছে। কুটীর প্রাঙ্গনের অদূরে, একটা বনের অন্তরালে, লাস পড়িয়া আছে। লাস একখানি কাপড় দিয়া ঢাকা। ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া, যেখানে লাস পড়িয়া আছে সে পর্য্যন্ত, রক্তের ধারা রহিয়াছে। লাসের দুই দিকে দুই জন কনষ্টবল দাঁড়াইয়া আছে।

দূরে এক স্থানে, পাঁচ জন কনষ্টবলবেষ্টিত হইয়া, কাজী ও রামলাল

(ব)সিয়া আছে। তাহাদের উভয়েরই হাতে হাতকড়ি। কালীর ললাট কুঞ্চিত, ভ্রূযুগল স্ফীত, চক্ষু রক্তবর্ণ, এবং তাহার ভাব নিতান্ত ভীতিশূন্য। রামলাল নিতান্ত কাতর ও অবসন্ন। বহু ক্রন্দন হেতু তাহার চক্ষু লাল। সে অধোমুখ। উভয়েরই পরিধান বস্ত্র রক্তাক্ত। রামলালের বস্ত্রাপেক্ষা কালীর বস্ত্র অধিক রক্তাক্ত।

অদূরে, একটী বৃক্ষতলে, ইনিস্পেক্টর বাবু, এক জন প্রতিবাসিপ্রদত্ত, একটী মোড়ায় বসিয়া, হাসিতে হাসিতে, হুঁকায় পাতার নল লাগাইয়া, তামাকু খাইতেছেন, তাঁহার সম্মুখে রক্তরঞ্জিত এক দা। তাঁহার নিকটে কয়েকজন কনষ্টবল দণ্ডায়মান।

সকল স্থানেই লোক। ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ—লোকের আর সীমা নাই। স্ত্রীলোকেরা ভিড়ের বড় নিকটে যাইতে পারিতেছে না; দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে ও শুনিতেছে। তাহাদের দেখিলে পোড়ারমুখো পুরুষগুলার মন ঠিক থাকিবে না বলিয়া যে সকল যুবতী ও অর্দ্ধবয়সী নারীর বিশ্বাস আছে, তাহারা গাছের আড়ালে ও অবগুণ্ঠনের অন্তরালে থাকিয়া, নিতান্ত ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া আছে। প্রাচীনারা লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে এবং তাহাই আবার দশগুণ বাড়াইয়া, হাত মুখ নাড়িতে নাড়িতে,নবীনাদের নিকটে আসিয়া গল্প করিতেছে। ছেলেরা ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে; তাহাদের মা, বা পিসী, বা মাসী তাড়া দিয়া যাইতে বারণ করিতেছে। দুই একটা দুষ্ট ছেলে তাড়া ও চথরাঙ্গানীতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া, লোকের পায়ের ফাক দিয়া, গুড়ি গুড়ি আসিয়া, যাহা দেখিবার তাহা দেখিতেছে। দুই একজন বৃদ্ধ আপনার যুবক পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, বা ভাগিনেয়কে সাক্ষী দিতে হইবে ভয় দেখাইয়া গোলের নিকটে যাইতে নিষেধ করিতেছে; কিন্তু যুবকেরা সে উপদেশে বড় একটা কর্ণপাত করিতেছে না।

ভট্টাচার্য্যের কুটীরের দ্বার হইতে উকি দিয়া যাহারা ভিতরে দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহারা সেখানকার রক্তগঙ্গা কাণ্ড দেখিয়া চমকিত হইতেছে। তক্তাপোষের উপর হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িয়া ঘর ভাসিয়া গিয়াছে। সুতরাং তক্তাপোষের উপরে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন নিদ্রিত ছিলেন,

তখনই যে তাঁহাকে কাটিয়াছে তাহার আর ভুল নাই। তাহার পর সেই রক্তের উপর পায়ের দাগ এবং মৃত ব্যক্তিকে ছেঁচড়াইয়া আনার দাগ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।"

যেখানে লাস সেখানে লোকে কেবল হায় হায় করিতেছে। দুই এক জনের চক্ষু ছল ছল করিতেছে। দুই এক জন সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। শশী ভট্টাচার্য্য নিতান্ত নিরীহ ও শান্ত ব্যক্তি। গ্রামের তাবৎ লোকেই তাঁহাকে ভাল বাসে ও আত্মীয় জ্ঞান করে। তাঁহার এইরূপ অপমৃত্যুতে সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত। কিরূপে কাটিয়াছে, কোথায় কিরূপে আঘাত করিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য অনেকে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। লাস কাপড় ঢাকা থাকায় তাহাদের সে ইচ্ছা সফল হওয়ার কোনই সুযোগ হইতেছে না। তাহারা কৌতূহল নিবৃত্তির অন্য উপায় না দেখিয়া কখন বা কনষ্টবলদের পীড়াপীড়ি করিতেছে, কখন তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিতেছে। কনষ্টবল মহাশয়রা কৃপা করিয়া দুই একটা কথা বলিতেছেন। যাহা বলিতেছেন তাহাতে বুঝা যাইতেছে, লাসের সর্ব্বাঙ্গে পঁচিশ ত্রিশ স্থানে সাংঘাতিক আঘাত আছে; তাহার মধ্যে ঠিক গলার নিকট হইতে বুকের উপর পর্য্যন্ত যে এক প্রকাণ্ড আঘাত তাহা দেখিতে যেমন ভয়ানক তেমনই গুরুতর।

যেখানে কালী ও রামলাল প্রহরীবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছে সেখানে অনেক লোক। তাহাদের দেখিয়া অনেকেই নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নানা কথা বলিতেছে। একজন ইয়ার যুবা বলিয়া ফেলিল, "ফাঁসির কাঠে ঝুলিতে ঝুলিতে এখন ইয়ারকির চূড়ান্ত হইবে বাবা।" কালী এ কথায় একটুও বিচলিত হইল না। কিন্তু রামলাল কাঁদিয়া ফেলিল। আর এক উদ্ধত ব্যক্তি নিতান্ত ঘৃণার সহিত বলিল, "ডালকুত্তা দিয়া ইহাদের খাওয়ায় না?" এবার কালী কুপিত ব্যাঘ্রের ন্যায় দৃষ্টিতে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। এক বৃদ্ধা কোন প্রকারে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সে কালীর মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কালামুখী, ধিক্ জীবনী; তোর গলায় দড়ি।" কালী এবারেও ভ্রূকুটী করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। আর এক প্রবীণ লোক বৃদ্ধার কথায় উত্তরে বলিল;

"সে কথা আর তোমার বলিয়া দুঃখ পাইতে হইবে না। আর বড় জোর মাস খানেকের মধ্যে গলায় দড়িই হইবে।"

যেখানে শ্রীল শ্রীযুক্ত ইনিস্পেক্টর বাবু বসিয়া আছেন সেখানে তাঁহার শ্রীবদনারবিন্দবিনির্গত বাক্যসুধালালসায় অনেকে নিতান্ত উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তিনি কিন্তু বাক্যবিতরণে নিতান্ত কৃপণ। তাঁহার তদারকসংক্রান্ত লেখাপড়া ও অন্যান্য সমুদয় কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি লাস চালান দিবার জন্য একখানি গরুর গাড়ি আনিতে কনষ্টবল পাঠাইয়া অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি বড় লোক জ্ঞানে লোকে তাঁহাকে সাহস করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে না। দুই এক ভদ্রগোছের প্রবীণ লোক তাঁহাকে বিনীতভাবে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। তিনি দিন দুনিয়ার মালিক ভাবে প্রশ্নের সিকি খানা, কদাচিৎ আধ খানা, উত্তর দিয়া কাজ সারিতেছেন।

কিন্তু কিরূপে এ কাণ্ড পুলিসের গোচর হইল তাহা এখনও বলা হয় নাই। ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর অনতিদূরে সদানন্দ দাস নামে এক কৈবর্ত্তের কুটীর। সদানন্দ কোন কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তর যাইবে বলিয়া সেদিন ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। রাত্রি যখন একটা তখন সদানন্দ হাত মুখ ধুইবার জন্য ঘটী হাতে করিয়া বাহিরে আইসে। বাহির হইয়াই সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘর হইতে ধপাস্ করিয়া এক শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বিকট 'মাগো' শব্দ তাহার কাণে যায়। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ছট ফট, গোঁ গোঁ, ধপাস্ ধপাস্, দুম দাম শব্দ সে শুনিতে পায়। ভট্টাচার্য্য-পত্নীর স্বভাব চরিত্রের কথা এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর মনান্তরের কথা পাড়া প্রতিবাসী সকলেই জানিত। ভট্টাচার্য্যের ঘরের মধ্যে তখন আলো জ্বলিতেছিল। সদানন্দ ঘরের আরও নিকটে আসিয়া শুনিতে পাইল ঘরের মধ্যে দুইজন লোক ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিতেছে। গত বর্ষায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরের এক দিকের দেয়াল পড়িয়া গিয়াছিল। সেদিকে এখনও নূতন দেয়াল দেওয়া ঘটে নাই, দরমার বেড়া দেওয়া আছে মাত্র। সদানন্দ অতি সাবধানে, সেই বেড়ার নিকটে আসিয়া, একটা ছিদ্র দিয়া ভিতরকার ব্যাপার দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

যতদূর সে দেখিতে পাইল তাহাতে তাহার পেটের পীলে চমকাইয়া গেল। সে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া এবং আপনার প্রয়োজন সমস্ত ভুলিয়া গিয়া ঘটী হাতে থানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যাহা যাহা দেখিয়াছে, শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে সমস্তই সে সেখানে অকপটে ব্যক্ত করিল। তখনই পুলিসের লোকেরা তাহার সঙ্গে আসিল। রাত্রি তখন প্রায় ৪টা। এই পর্য্যন্ত কথা সদানন্দ দাসের জবানবন্দীতে ব্যক্ত হইয়া ইনিস্পেক্টর বাবুর কলমের শুণে কাগজজাত হইয়াছে। তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছিল তাহা পুলিস স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

পুলিস আসিয়া দেখিল কালী ও রামলাল শশী ভট্টাচার্য্যের মৃতদেহ টানাটানি করিয়া বনের দিকে লইয়া যাইতেছে। সে সময়টা জ্যোৎস্না থাকায় তাহাদের দেখার বিশেষ অসুবিধা হইল না। তাহারা নিকটস্থ হইয়া কালী ও রামলালকে ধরিয়া ফেলিল। রামলাল প্রথমে পলাইবার, পরে আত্মহত্যা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সে তখন অকপটে সমস্ত অপরাধ, কাঁদিতে কাঁদিতে, স্বীকার করিল। কালীর বিশেষ উত্তেজনায় এবং আপনার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় সে এ কাজে লিপ্ত হইয়াছিল, কালীর সহায়তা ভিন্ন সে আর কিছুই করে নাই; এবং ভট্টাচার্য্যের শরীরে সে স্বহস্তে একটীও অস্ত্রাঘাত করে নাই, একথা সে বিশেষ করিয়া বলিল। কালীও অকাতরে সমস্ত পাপ ব্যক্ত করিল। ভট্টাচার্য্য তাহার সুখের পথে কণ্টক সুতরাং তাঁহাকে মারিয়া ফেলা আবশ্যক মনে করিয়া সে, স্বহস্তে দা দিয়া বারম্বার আঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিয়াছে, একথা সে নির্ভীকভাবে স্বীকার করিল। রামলাল স্বেচ্ছায় কোন কাজ করে নাই। কালীর বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া সে সামান্য সাহায্য করিয়াছে মাত্র এবং সে না থাকিলে কালী একাই সব করিত এমন কথা পর্য্যন্ত কালী বলিল।

বেলা যখন ১০টা তখন গাড়ি আসিল। ইনিস্পেক্টর বাবু গাড়িতে লাস উঠাইয়া; সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়িবদ্ধ কালী ও রামলালকে চালান দিয়া এবং অন্যান্য বিষয়ের আবশ্যক মত ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িল। ক্রমে ক্রমে সেখানকার লোকের ভিড়

কমিতে লাগিল এবং কেহ বা কালীকে গালি দিতে দিতে, কেহ বা শশী ভট্টাচার্য্যের জন্ত আক্ষেপ করিতে করিতে, কেহ কেহ বা নিতান্ত দার্শনিক ভাবে মানবচরিত্রের এতাদৃশ দুজ্ঞেয়তার কথা আলোচনা করিতে করিতে এবং কেহ কেহ বা কালী ও রামলালের কাহার কিরূপ সাজা হইবে তাহার বিচার করিতে করিতে বাটী ফিরিল। কিন্তু কয়েকদিন প্রতিবাসী নরনারীগণ নিরন্তর এই কাণ্ডের বিবিধ ভঙ্গীতে আলোচনা করিতে ভুলিল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে শশী ভট্টাচার্য্য হত হন তাহার মাসাধিক কাল পরে একদিন সন্ধ্যার অনতিকাল পূর্ব্বে রাধানাথ রায়ের বহ্বায়ত ভবনের অন্তঃপুরমধ্যস্থ এক সুবৃহৎ ছাতের উপর রমাপতি পরিভ্রমণ করিতেছেন। রমাপতি একাকী নহেন। তাঁহার বামকরের মধ্যমাঙ্গুলি ধারণ করিয়া এক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী বালিকা সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। স্তবকে স্তবকে ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি বালিকার কপালে, গ্রীবায়, কর্ণমূলে ও অংসে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। বালিকার বয়স চারি বৎসর। তাহার আকর্ণ বিস্তৃত, স্থূল সূক্ষ্ম ভ্রূযুগতলস্থ আবৃত, সমুজ্জ্বল লোচন, তাহার দেহের অপূর্ব্ব গৌরকান্তি ও লাবণ্য-জ্যোতিঃ, তাহার কোমল রক্তাভ বিম্বোষ্ঠের হসিত ভাব, এবং তাহার অস্ফুট ও ভগ্ন, মৃদু ও মধুর, আনন্দ ও হাস্তময় বাক্যাবলী যে দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে সে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার জন্ম ব্যাকুল না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। এই বালিকার নাম মাধুরী। পাঁচ বৎসর হইল রমাপতি ও সুরবালা বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন, বিধাতা তাঁহাদের প্রগাঢ় প্রণয় বন্ধন দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে এই কন্সা সন্তান এবং তাহার দুই বৎসর পরে একটী সুকুমার পুত্র সন্তান প্রদান করিয়া

তাঁহাদিগের প্রতি কৃপার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। জগতে যে যে পদার্থ মানবের সুখ-সন্নিধানে সমর্থ তাহার সকলই তাঁহাদের আয়ত্ত। ধনই, অনেক স্থলে, ভোগবিলাসানুরক্ত বা পরোপকারপ্রবণহৃদয় মানবের আশা নিবৃত্তির অনন্য সাধন এবং তৃপ্তির সর্ব্বপ্রধান উপাদান। সে ধন, প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রমাণে, তাঁহাদের করায়ত্ত। দাম্পত্য প্রণয়, সৎস্বভাব সম্পন্ন যুবকযুবতীর পক্ষে, সর্ব্বসুখবিধায়ক সামগ্রী। ভগবৎ-কৃপায় এই সৌভাগ্যবান্ যুগল তাদৃশ প্রণয়ের আদর্শ স্থলাভিষিক্ত হইবার উপযোগী। এই সকল দুর্লভ সুখও শিশুকণ্ঠোত্থিত অস্ফুট আধ আধ স্বরের সহিত বিজড়িত না থাকিলে মধ্যমণিহীনা রত্নহারের ন্যায়, সতীত্ব সম্পত্তিশূন্যা সুন্দরীর ন্যায়, কপর্দকমাত্রবিহীন দাতার ন্যায় এবং সুরভি-কুসুমপরিশূন্য কণ্টকাকীর্ণ উদ্যানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া অনেকে বোধ করেন। কিন্তু অনুকূল বিধাতৃ-অনুকম্পায় তাঁহাদের সে অভাবও নাই। সুতরাং তাঁহারা সৌভাগ্যশালীগণের শীর্ষস্থানীয়।

কিন্তু জগতে অব্যাহত সুখ সম্ভোগ প্রায় কাহারও অদৃষ্টে সংঘটিত হয় না। তাঁহারা বড় দাগা পাইয়াছেন—বড় ঝড় তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী উভয়েই ইহলোক হইতে পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহাদের পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনতিকাল পরে রাধানাথ রায় লীলা সম্বরণ করেন। সেই দারুণ দুর্ঘটনার তিনমাস পরে, সেই দুর্দমনীয় শোক কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইবার পূর্ব্বেই, সুরবালার জননী পতিপরিগৃহীত পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে দুই সুমহান্ তরুর সুশীতল ছায়াতলে নিরুদ্বেগে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহা আর তাঁহাদের নাই। যে দুই জীবন সংসারের কঠোর সংঘর্ষণ হইতে অন্তরিত থাকিয়া, আনন্দ ও সৌভাগ্যসম্ভোগমাত্র লক্ষ্য করিয়া, সুখে অতিবাহিত হইতেছিল তাহাদের অতঃপর সংসারের সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। যে পর্ব্বতের অন্তরালে তাঁহারা অবস্থিত ছিলেন তাহা চূর্ণীকৃত হইয়াছে। তাঁহাদের সুখ ও সন্তোষ, আনন্দ ও প্রীতি ভোগ ও বিলাস বিধায়ক ব্যবস্থা করা যাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল, তাঁহারা আর নাই। রাধানাথ রায়, জবরজভূমি হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, এক উইল পত্র-

দ্বারা স্বীয় বিপুল বিভবাদির বিহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই উইল অনুসারে তাঁহার জামাতা রমাপতি সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিত্ব ও সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন।

রমাপতি মাধুরীর সঙ্গে বেড়াইতেছেন। মাধুরী তাঁহাকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে বলিলেই হয়; কারণ সে কখন জোরে জোরে চলিয়া পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কখন বা পশ্চাতের বা পার্শ্বের পদার্থ বিশেষে লক্ষ্যবদ্ধ করিয়া পা ফেলিতে ভুলিয়া যাইতেছে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি বাবুও থামিতেছেন। আর যে তাহার গজর গজর বকুনি তাহার কথা আর কি বলিব। বেদ কোরাণের বহির্ভূত সে অনেক গল্প করিতেছে। ভাষার উচ্চারণবিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া, পদস্থাপনের রীতি ও পদ্ধতি উপেক্ষা করিয়া এবং প্রসঙ্গের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে প্রসঙ্গান্তর অবতারিত করিয়া মাধুরী ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রের যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতেছে। কিন্তু তাহার সেই অসম্বদ্ধ ও অযথাব্যক্ত বাক্যাবলী তাহার পিতার কর্ণে অজস্র ধারায় মধুবর্ষণ করিতেছে। স্বভাবসঞ্জাত অপত্যস্নেহ, তনয়ার তাদৃশ অপরিস্ফুট বচনবিন্যাস মধুময় করিবার প্রধানতম হেতু হইলেও, মাধুরীর সুস্বরবিজড়িত ভঙ্গ ভাষা নিতান্ত নির্লিপ্ত শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরকেও মোহিত করিতে সমর্থ।

পিতা ও পুত্রী যখন এইরূপে নিযুক্ত সেই সময়ে সুন্দরীশিরোমণিস্বরূপা সুরবালা সেইস্থানে সমাগতা হইলেন। তাঁহার অঙ্কে এক নির্ম্মলকান্তি, নিরুপম নয়নানন্দ নন্দন। সেই ভুবনমোহন পুত্র দূর হইতে রমাপতি ও মাধুরীকে দেখিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে, মধুরস্বরে, মধুময় হাস্যের সহিত, "ধু—ধু—বা—বা" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। শিশুর নিতান্ত নবীন বাগ্‌যন্ত্র মাধুরীর নাম উচ্চারণ করিতে পারিত না। সে সেই জন্য স্বকৃত অত্যদ্ভুত ব্যাকরণের সহায়তায় সেই কঠোর শব্দের ভূরিভাগ 'ইৎ' করিয়া কেবল ধু টুকু বজায় রাখিয়াছিল। শিশুর সেই অমৃতময় বাক্য কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র রমাপতি ও মাধুরী ব্যস্ততা সহ সেই দিকে ফিরিলেন। রমাপতি দেখিলেন, অপূর্ব্ব দর্শন! সেই রবিকরপরিশূন্য, স্নিগ্ধ ছায়ারাশি পরিবৃত, সমুচ্চলোধশিরে; সেই নীড়গামী, নানাদিগ্‌বিহারী

বহুভাষী, বিবিধ জাতীয় বিহঙ্গমবেষ্টিত দৃশ্যমধ্যে; সেই প্রীতিপ্রদ, প্রবহমান, সুস্নিগ্ধ, সুশীতল, বসন্তানিল সাগরে, রমাপতি দেখিলেন, সুরবালা, তাঁহার সুরনায়ক তুল্য সুকুমার শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া; দাঁড়াইয়া! মৃদু মন্দ বায়ু হিল্লোলে শিশুর কেশের গুচ্ছ নাচিয়া নাচিয়া উড়িতেছে এবং সুরবালার প্রলম্বিত অঞ্চল কেতনবৎ উড্ডীয়মান হইতেছে। বালিকা সুরবালা এখন যুবতী হইয়াছেন। যৌবনসমাগমে এখন সেই অপার্থিব সৌন্দর্য্য পূর্ণোজ্জল ও প্রদীপ্ত হইয়াছে। রমাপতি অতৃপ্ত নয়নে সেই লাবণ্যময়ীর স্বর্ণকান্তি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মাধুরী, "বাবা! ডেক ডেক, ঐ মা" বলিয়া সেই দিকে প্রধাবিত হইল। তখন রাজরাজমোহিনী সুরবালা মাধুরীর হস্তধারণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। রমাপতিও কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া মধ্যপথে সুরবালার সমীপাগত হইলেন এবং বলিলেন,—

"এই বুঝি তোমার শীঘ্র আসা? আঠারো মাসে বুঝি তোমার বৎসর?"

সুরবালা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তা আমি জানি। এতক্ষণে তোমার হুকুম তামিল করিতে না পারায় অবশ্যই দাসীর অপরাধ হইয়াছে। আমি আসিতেছি এমন সময়ে পুঁটের মা ছেলের জন্য জ্বরের ঔষধ চাহিতে আসিল। তাহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে দেরি হইল। তা যাই হউক, দাসী গলায় কাপড় দিয়া হাতজোড় করিয়া মান ভিক্ষা করিতেছে। যদি নিতান্তই হুজুর তাহাকে ক্ষমা না করেন তাহা হইলে দাসী শেষে এমন কল খাটাইবে যে হুজুরের তখন নাকালের সীমা থাকিবে না।"

কিন্তু রমাপতি তখন উত্তর দিবেন কি? সেই রূপসীর মধুর বাক্য, মধুর ভাব, এবং মধুর ভাষা তাঁহাকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। কথায় কি ছাই তখন প্রাণের কথা বাহির হয়? কটা কথা লইয়াই বা ভাষা, কটা ভাবই বা তাহাতে ব্যক্ত হয়! রমাপতি সে কথার উত্তর দিবার কোন প্রয়াস না করিয়া খোকাকে কোলে লইবার জন্য হাত পাতিলেন। খোকা সানন্দে লাফাইয়া আসিয়া তাঁহার কোলে পড়িল। রমাপতি বারম্বার তাহার বদন চুম্বন করিলেন। তখনই কয়েক জন ঝি, তাঁহাদের কোন

আদেশ আছে কি না জানিবার নিমিত্ত, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রমাপতি মাধুরী ও খোকাকে লইয়া ছাতে ছাতে বেড়াইতে আদেশ করিলেন। তখন সুরবালা আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"মানিনীর মান কি ভাঙ্গিয়াছে? না শেষে মানের দায়ে নিজে নাকে কাঁদিতে সাধ আছে?"

রমাপতি বলিলেন,—

"সাধ যাহা আছে তাহা দেখিতে পাইবে এখনই। 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা' জানতো? দোষ করিলে নিজে, নরকে কাঁদাইতে চাও আমাকে! তোমার মত লোক বিচারক হইলে দেশে সুবিচারের স্রোত বহিয়া যাইবে।"

সুরবালা রমাপতির হাত ধরিয়া অন্য এক ছাতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন,—

"আমি বিচারক হইলে এই কপট পুরুষগুলাকে বিলক্ষণ জব্দ করিয়া তবে ছাড়ি।"

রমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—

"সকলের প্রতিই কি তাহা হইলে ধর্ম্মাবতার সমান বিচার করিবেন? কেহই কি আপনার ন্যায় দণ্ডের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে না?"

সুরবালা মুখের হাসি অঞ্চলে চাপিয়া বলিলেন,—

"কেহ না। যাহাদের মধ্যে সকলেই কপট তাহাদের আবার ছাড়াছাড়ি কি? সকলেরই সাজা।"

রমাপতি বলিলেন,—

"পুরুষ যে অত্যন্ত কপট তাহার আর সন্দেহ কি? তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে শশী ভট্টাচার্য্য কখন কি কালীকে এত ভাল বাসিত?"

সুরবালা কালীর নামোচ্চারিত হইবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, তোমরা—তোমরা দেবতা।—আমরা সামান্য মেয়ে মানুষ—আমরা তোমাদের মহিমা কি বুঝিব? তোমরা আমাদের মত ক্ষুদ্র কীটকে পদে দলিত না করিয়া হৃদয়ে স্থান দেও, এ তোমাদের আশ্চর্য্য দেবত্ব। বলিলেন,—

"জানি না কোন্ স্বর্গে শশী ভট্টাচার্য্যের স্থান হইবে। স্বর্গ যদি থাকে এবং স্বর্গে যদি শ্রেণী থাকে তাহা হইলে শশী ভট্টাচার্য্য অবশ্যই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে স্থান পাইবেন। আর কালী? নরকেরও কি নরক নাই? সে কেন মানবদেহ পাইয়াছিল? বিধাতঃ! তোমার রাজ্যে তাহার জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছ?"

রমাপতি দেখিলেন, ক্রোধে ও হৃদয়ের যাতনায় সুন্দরীর বদন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। লোচনযুগল উজ্জল হইয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবন্ যে হস্ত হইতে কালীর ন্যায় পিশাচীর সৃষ্টি, এই দেবীও কি সেই হস্তেরই ফল? সুরবালা আবার বলিতে লাগিলেন,—

কিন্তু মানবরাজ্যে কালীর ঘোর দুষ্কৃতির কি শাস্তি হইল তাহা আমি জানিতে পাই নাই। তাহার পাপ আত্মা আজিও কি সেই দেহে আছে?"

রমাপতি বলিলেন,—

"বিচারে কালীর ফাঁসি ও রামলালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হইয়াছে। বোধ হয় আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই কালীর ফাঁসি হইয়া যাইবে।"

সুরবালা আবার চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"ফাঁসি হইবে! ফাঁসিই কি তাহার শাস্তি? ফাঁসি না হইলে কি চলে না? কিন্তু সে কথায় আমাদের কাজ কি? যাহা হইবার তাহাই হউক।"

অনেকক্ষণ আর কেহই কোন কথা কহিলেন না। তাহার পর সুরবালা বলিলেন,—

"তোমার সহিত আমার এবার ভারি ঝগড়া হইবে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"অপরাধ?"

সুরবালা মুখ ভার করিয়া বলিলেন,—

"মোকদ্দমার জন্য তুমি কলিকাতায় যাইবে বলিতেছ, সেখানে দশ পনর দিন দেরি হইবে তাহাও বলিতেছ। কিন্তু একবারও আমাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়ার কথাটা বলিতেছ না। বেশ, যাও তুমি, আমি ইহার এমন শোধ তুলিব যে তোমাকে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতে হইবে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"কেন তোমাকে লইয়া যাইব? আমার কি আর কেহ নাই? মনে কর আমার সুকুমারীর সহিত দেখা হইবে।"

সুরবালা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"এমন দিন কি হইবে? ভগবান যেন তাহাই করেন।"

রমাপতি বলিলেন,—

"এমন দিন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই জান বলিয়া একথা বলিতেছ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা যাহাই মনে কর, সুকুমারী বাঁচিয়া আছেন। মনে কর যদিই কলিকাতায় গিয়া সুকুমারীকে পাই তাহা হইলে তুমি কি কর?"

সুরবালা নীরব। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর। তাঁহার হৃদয় ভাবে পূর্ণ। অনেকক্ষণ পরে তিনি উত্তর দিলেন,—

"কি যে করি তাহা কেমন করিয়া বলিব? সেই দেবী, সেই প্রেমময়ী, সেই শক্তিময়ীকে আমার মন প্রতিদিন অবনত মস্তকে বার বার প্রণাম করিয়া থাকে। সেই দেবীকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই—আহা বিধাতঃ, তুমি সকলই ঘটাইতে পার, এ অধীনার এ প্রার্থনা কি তুমি পূরণ করিতে পার না?—সেই দেবীকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই, যাঁহাকে প্রতিদিন ধ্যান করি—কল্পনায় যাঁহার মূর্ত্তি গঠিত করিয়া প্রতিদিন পূজা করি—আমার সেই দিদিকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই, তাহা হইলে—তাহা হইলে অভীষ্ট দেবতাকে সম্মুখে দেখিলে ভক্ত যাহা করে, আমিও তাহাই করি। তাহা হইলে স্বর্ণ সিংহাসন পাতিয়া তাঁহাকে আমার এই দেবতার পার্শ্বে বসাই, স্বহস্তে এই দেবযুগলের চরণ ধৌত করিয়া এই কেশরাশি দ্বারা তাহা মার্জ্জিত করি এবং ভক্তি গদগদ হৃদয়ে দূরে দাঁড়াইয়া সেই দেবযুগলের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করি। কিন্তু সে সৌভাগ্য কি কখন আমার কপালে ঘটিবে?

রমাপতি মুগ্ধভাবে সুরবালার কথা শুনিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, 'সত্যই কি সুরবালা মানবী? অস্থি, মাংস, বসা, চর্ম্মধারী মানবশরীর কখনই এবম্বিধ মহোচ্চ মনোবৃত্তির আধার হইতে পারে না। এই দেবীর বদনের ভাব, কথার প্রণালী, বাক্যের শক্তি আলোচনা করিয়া কে

বলিবে যে ঐ সকল উক্তিতে বিন্দুমাত্র কপটতা আছে? কে বলিবে এই সকল ভাব এই দেবীর অন্তরের অন্তর হইতে সমুদ্ভূত নহে?' তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

"তোমার যে এই দেবভাব, সুরবালা, মনুষ্যলোকে ইহার আর তুলনা নাই। মনুষ্যশরীর লইয়া তোমার এরূপ ভাব কেন হইল বহু আলোচনা-তেও তাহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি না।"

সুরবালা বলিলেন,—

"হৃদয়দেব! আমার এভাবে আমি বিস্ময়ের কারণ কিছুই দেখি না। দেবভাব কাহাকে বলে তাহা এ অধম নারী বুঝিতেও অক্ষম। আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই দিকে প্রধাবিত। যখন হইতে তুমি আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে আমার চক্ষে পড়িয়াছ, যখন তোমার পত্নীবিয়োগে বিজাতীয় কাতরতা আমি দেখিয়াছি, যখন তোমার সেই দারুণ দুর্বিপাক সময়ের কাহিনী সমস্ত তোমার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তখনই তোমাকে দেবতা বলিয়া আমার ভক্তি জন্মিয়াছে। সেই ভক্তি তোমার দয়া, সরলতা, কোমলতা, বিদ্যা ও রূপ দেখিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া এমন স্থানে উপনীত হইয়াছে যে আমার হৃদয়ে তাহার আর স্থান হয় না। তখন কিসে তোমাকে সুখী করিতে পারিব, কিসে তোমার কাতর হৃদয়কে প্রফুল্ল করিতে পারিব, কিসে তোমার সেই শোকভারাবনত হৃদয়কে আনন্দময় করিতে পারিব, ইহাই আমার জীবনের চেষ্টা, লক্ষ্য, বাসনা এবং প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল। অন্য সাধ আমার জীবনে নাই। তোমার সুখ ভিন্ন, তোমার আনন্দ ভিন্ন, আমার প্রাণের আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। তুমি দেবতা, আমি দেবসেবায় আমার দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া আছি। আমার আর স্বতন্ত্রতা নাই। সার্থক আমার জীবন, সার্থক আমার জন্ম। আমার দেবতা আমার পূজায় পরিতুষ্ট হইয়াছেন; আমার প্রাণের প্রাণের বিরস বদনে এখন হাস্যের জ্যোতিঃ দেখা যায়, আনন্দ তথায় এখন খেলা করে এবং সুখ তথায় এখন বিচরণ করে।"

তখন সুরবালা সেই নিশানাথবিরাজিত হৈমকরোজ্জ্বল গগনতলে

অশ্রুময় নয়নে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া উভয় বাহুতে রমাপতির পদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

"আমার ভক্তি ও মুক্তি, সুখ ও স্বর্গ, আশা ও সম্পদ সকলই তুমি। আমি তোমারই দয়ায়, তোমারই চরণপ্রসাদে ধন্য হইয়াছি। আমার দ্বারা—তোমার এই সামান্য দাসীর সামান্ত সেবায় তোমার প্রাণে আবার আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। এ অধম দাসীর পক্ষে ইহার অপেক্ষা আর কিছু প্রার্থনার আছে কি?" তাই বলিতেছি, তোমারই চরণাশীর্ব্বাদে তোমার এ দাসী ধন্য হইয়াছে।"

তখন রমাপতি সেই স্থানে সুরবালার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার লোচন দিয়া তখন অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। কোথায় এমন লোক আছে যে এমন অপার্থিব প্রেমের অধিকারী? এমন প্রেম স্বর্গেও আছে কি? এ সংসারে রমাপতি তুমিই ভাগ্যবান! সুরবালা আবার বলিতে লাগিলেন,—

"আমার যাহা ব্রত তাহার শেষ নাই—সীমা নাই। তোমাকে সুখী করাই আমার যোগ ও সাধনা। কিন্তু সুখের তো সীমা নাই। তোমাকে সুখী করিতেছি বটে, কিন্তু সুখের সর্ব্বোচ্চ সোপানে না উঠিতে পারিলে তোমার এ সেবিকার পরিতৃপ্তি নাই। যদি কখন দিদির সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে তোমাকে আরও সুখী করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা তো হইবার নহে। যদি নিজ প্রাণের বিনিময়েও সেই ভাগ্যবতীর সাক্ষাৎলাভ ঘটিত, তাহা হইলে তোমার দাসী এখনই তাহা সম্পন্ন করিত।"

তখন রমাপতি বলিলেন—

"সুরবালা, তোমার কামনা অতুলনীয়। জগতে এমন প্রেমের তুলনা নাই। তোমারই কৃপায় যে অভাগা ছিল সে এখন পরম ভাগ্যবান্। একদা এ হৃদয় সুকুমারীময় ছিল সন্দেহ নাই; এখনও হৃদয় যে সুকুমারীর স্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়াছে, এমন নহে, এবং কখন স্মৃতি হইতে সে মূর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে এমন বোধ হয় না। কিন্তু, সুরবালা, এখন তুমিই আমার জীবন ও মরণ, আশা ও নিরাশা, সম্পদ ও বিপদ সকলই। এ জীবন তোমারই

চেষ্টায়, তোমারই কৃপায় তোমারই জন্য রক্ষিত। যদি, সুরবালা, যদি তুমি আমার এ শুষ্ক হৃদয়ে অজস্র ধারে শান্তিসুধা না সেচন করিতে, যদি তুমি এ দগ্ধ তরুতে প্রেমের কুসুম না ফুটাইতে, যদি তুমি এ অন্তর প্রান্তরে আনন্দের নদী না বহাইতে তাহা হইলে এতদিন আমার কি দুর্গতি হইত? যে দেবী আমার ন্যায় হীনজনের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে সুখসাগরে ভাসাইয়াছেন, তিনিই তাহাতে সকল প্রবৃত্তি সজীব রাখিয়াছেন। সুকুমারী, মৃত্যুকবলিত হইলেও, আমার হৃদয়ে তিনি যে এখনও বাঁচিয়া আছেন সে কেবল তোমারই যত্নে এবং তোমারই বাসনায়। আমি এখন যে প্রেমের অধিকারী, আমার সৌভাগ্যক্রমে যে আনন্দ-সাগরে আমি এখন ভাসিতেছি, মানবজন্ম লাভ করিয়া কেহ কখন কোথায়ও তাহা পায় নাই। এমন প্রেমে যে মত্ত, এমন সুখে যে ভাসমান, আর কোন স্মৃতিই তাহার থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু তাহা তোমারই চেষ্টায় এখনও আমার হৃদয় ত্যাগ করে নাই। কিন্তু, সুরবালা, তুমি ভিন্ন এখন আমার গতি নাই। আমার হৃদয়ে যে সুকুমারী মূর্ত্তি আছেন তাহা তোমার দ্বারাই অণুপ্রাণিত, তোমার তেজে তাহা তেজোময়, তোমার প্রেমে তাহা প্রেমময়। এখন আমার সুকুমারী স্বতন্ত্র সুকুমারী নহে। এখন আমার সুরবালা ও সুকুমারী অভিন্ন ও এক। এখন সুরবালা যদি সুকুমারী না হয় তাহা হইলে তাহা লইয়া আমার একদিনও চলিবে না এবং যদি আমার সুকুমারী সুরবালাময়ী না হয় তাহা হইলে তাহা লইয়াও আমি একদিনও থাকিব না। অতএব দেবি, তোমার কৃপায় আমি আমার হারাধন সুকুমারীকে অনেক দিন পাইয়াছি। যাহার স্বতন্ত্রতা নাই তাহা স্বতন্ত্ররূপে পাইবার বাসনা কখন এ ভাগ্যবান্ মানবের মনেও হয় না।”

সেদিন আর যে সকল কথা হইল তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। এই স্বর্গীয় প্রেমের আদর্শ দম্পতী বহুক্ষণ প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্য কালীর ফাঁসি। পূর্ব্ব দিবসেই আলিপুর জেলখানার প্রাঙ্গনে এই ভয়ানক ব্যাপার সংসাধনোপযোগী সমুদয় আয়োজন হইয়াছে। সেই জীবনান্তকারী প্রকাশ্যরূপে মানবপ্রাণবিনাশক ভয়ানক যন্ত্র, সদর্পে আপনার বিকট বাহু উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বলোক সমক্ষে মনুষ্যঘাতক, অধম জীবিকাবলম্বী, হৃদয়হীন জল্লাদ বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে। স্বয়ং জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরেরা সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত। আর উপস্থিত পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইনিস্পেক্টর, সব ইনি-স্পেক্টর, কয়েকজন হেড কনষ্টেবল এবং অনেক কনষ্টেবল। লোকের জীবন রক্ষার জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তির জীবনান্ত সংঘটিত হইয়াছে কি না, তাহারই সমর্থন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং ডাক্তার সাহেব উপস্থিত। সুতরাং ফাঁসির ঘটা খুব।

চারিদিকে অনেক লোক। লোকে প্রায় তাবৎ প্রাঙ্গন ছাইয়া গিয়াছে। অনেক লোক এই ঘটনাস্থলে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে না পাইয়া বাহিরে গাছের উপর ও অট্টালিকার চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের আগ্রহই বা কত! যেন আজি এখানে কি উৎসবই হইবে এবং তাহা দেখিতে না পাইলে তাহাদের জীবন ও জন্মই বিফলে যাইবে। ধন্য মানবের অদম্য কৌতূহল? যে ব্যাপার স্মরণে শরীর শিহরে, যে লোমহর্ষণকাণ্ড মনে করিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে এবং যাহার আলোচনা করিলে প্রাণ ব্যাকুল হয়, সেই বিকট দৃশ্য দেখিবার জন্যও এত লোকসমারোহ হইয়াছে! একজন মানব—সজীব, সচল এবং সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত মানব, রাজকীয় শক্তির বিরোধে প্রতিকূল চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে জানিয়া, যৎপরোনাস্তি অনিচ্ছাস্বত্বেও, অচিরে, অবনত মস্তকে, ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবে; এই অচিন্তনীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য তথায় লোকে লোকারণ্য। এরূপ বিসদৃশ দৃশ্য দর্শনে হৃদয়ের কোমলতা বিধ্বংসিত এবং পরুষতা সম্বর্দ্ধিত হয়, তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

তবে জগতের কিছুই নিরবচ্ছিন্ন অকল্যাণকর নহে। নিপাতকারী হলা-হলেরও রোগাপনোদনের শক্তি আছে। তাদৃশ চক্ষে এ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে অনুমিত হইতে পারে যে, এতাদৃশ ব্যাপার সম্বন্ধে কৌতূহল নিবারণ করিলে, দর্শকের হৃদয়ে উপস্থিত দৃশ্য নিতান্ত বদ্ধমূল হইয়া স্থায়ী অঙ্কপাত করে এবং তাহাতে সমাজের প্রভূত হিত সংসাধিত হয়। কিন্তু, যাহারা এই জন্য, প্রস্তুত হইয়া, যাতায়াত ক্লেশ স্বীকার করিয়া, হয় ত কিঞ্চিৎ অর্থব্যয়ে সময়নাশ ও কার্য্যক্ষতি করিয়া এই কাণ্ড দেখিতে যায়, তাহাদের কেহই, ইহার ফলস্বরূপে পরিণামে সমাজের হিত সাধিত হইবে, বা হৃদয়ে স্থায়ী অঙ্কপাত হওয়া আবশ্যক ভাবিয়া কখনই যায় না। সুতরাং নিতান্ত জঘন্য কৌতূহল নিবৃত্তি ভিন্ন ইহার অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। মনুষ্য যে পশুরই রূপান্তর এবং মানব হৃদয় যে এখনও পাশব প্রবৃত্তির নিতান্ত বশীভূত এইরূপ নিষ্ঠুরতায় উৎসাহ তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আর অল্পকাল পরেই কালীকে ঐ সম্মুখস্থ মরণযন্ত্রে লম্বিত হইয়া জীবন ত্যাগ করিতে হইবে। রোগ বা কোন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে তাহার দেহ ও আত্মার চিরবিচ্ছেদ ঘটিবে না। মানব আত্মকৃত ব্যবস্থা-বলে, প্রকাশ্যরূপে বলপূর্ব্বক তাহাকে হত্যা করিবে। যে অত্যুৎকট অচিন্তনীয় পাপে তাহার হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, যে নৃশংস কার্য্য সমাধা করিয়া সে সমাজের বিরুদ্ধে ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছে, মানব তাহার শাস্তিস্বরূপে এই দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে সমাজ সংস্থিতির জন্য পাপীর শাস্তি বিধান নিতান্ত আবশ্যক। সংসারের পাপস্রোত মন্দীভূত করিবার জন্য পাপাসক্তের বিহিত দণ্ড সতত ও সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয়। কালীর পাপানুরূপ শাস্তি প্রয়োগের অভিপ্রায়েই আজি তাহাকে বিগতজীব করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। মানবকৃত বিধিব্যবস্থায় ইহাই তাদৃশ মহাপাপীর চূড়ান্ত শাস্তি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া আছে। কেহ কেহ এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এইরূপে প্রাণনাশ করিলেই কি এতাদৃশ ঘোর পাপীর পাপোচিত শাস্তি হইয়া থাকে? তাঁহারা বলেন ভোগের পরিমাণানুসারে শাস্তির গুরুতা ও

লঘুতা স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। কালীর ন্যায় পাপীয়সীর বহুকাল ধরিয়া শাস্তি ভোগ করা আবশ্যক এবং সে শাস্তির জ্বালা তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে ও হাড়ে হাড়ে মিশিয়া যাওয়া আবশ্যক। যতদিন সে বাঁচিবে ততদিন কদাচ যাহাতে এ শাস্তির কথা, ইহার যন্ত্রণার স্মৃতি, সে একবারও ভুলিতে না পারে, এমন কোন সাজা তাহার ন্যায় পাতকীর জন্য নির্দ্ধারিত ও অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। অধুনা তাহার নিমিত্ত যে শাস্তির ব্যবস্থা হইতেছে, বলিতে গেলে, তাহা কেবল দুই মিনিটের শাস্তি। কয়েকদিন —সত্যই কয়েকটা দিনমাত্র দণ্ডিত ব্যক্তি একটা দুরন্ত বিভীষিকায় উৎপীড়িত হয় বটে; কিন্তু তাহার পর দুই মিনিটে—কেবল ক্ষুদ্র দুই মিনিটের মধ্যে তাহার সকল বিভীষিকা ও শাস্তির অবসান হইয়া যায়। এত বড় অপরাধী কেবল দুই মিনিটের শাস্তি ভোগের পর সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করে এবং তখন সে মানব সমাজের তিরস্কার ও পুরস্কার; আনন্দ ও বিষাদ, সম্পদ ও বিপদ, সুখ ও দুঃখ, জ্বালা ও শান্তি, হাস্য ও রোদন সকল বিষয়েরই হাত ছাড়াইয়া যায়। এরূপ দুষ্কৃতির সহিত তুলনা করিলে তস্কর, দস্যু, প্রবঞ্চক প্রভৃতির অপরাধ নিতান্তই লঘু বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাদেরও বহুকাল ধরিয়া অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়, অথচ এমন ভয়ানক পাপী কয়েকদিনের ভয় ও দুই মিনিটের যাতনা ভোগ করিয়া, আমাদের হাত হইতে পার পাইয়া যায়, ইহা বস্তুতই নিতান্ত হাস্যজনক অব্যবস্থা।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কালী যে পাপ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে দুই মিনিটের বেশী শাস্তি ভোগ করিতে হইল না সত্য, কিন্তু সে মানব হৃদয়ে যে ভয়ের সঞ্চার করিয়া রাখিয়া গেল, লোকসমূহকে যে শিক্ষা দিয়া গেল তাহার জন্য চিরদিনই সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইবে। কথাটা অবশ্যই স্বীকার্য্য; কারণ মরণের অপেক্ষা মরণের ভয়টা বড়ই ভয়ানক। কালী মরিয়া নিজে যত যাতনা ভোগ করুক না করুক, তাহার এইরূপ মৃত্যু দেখিয়া লোকের মনে এইরূপ কার্য্যের এই ফল বলিয়া, যে এক ভয় ও সাবধানতা জন্মিবে, সমাজের পক্ষে তাহা বড়ই কল্যাণকর। কিন্তু তাহাতে কালীর কি? তোমার কল্যাণ বা অকল্যাণ কালী তো আর

দেখিতে আসিবে না; তাহার এত বড় পাপে তোমরা যে দুই মিনিটের শাস্তি দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছ তাহার যুক্তি কোথায়? কেন, তাহার অপরাধের অনুরূপ সাজা কি তোমরা দিতে জান না? একটা বেগুন চুরি করিলে তোমরা তাহার নাকে দড়ি দিয়া ঘানিতে ঘুরাইতে পার, আর এইরূপ পতিহন্ত্রীকে দুই মিনিটের বেশী সাজা দিতে পার না? পরকালে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া সাজার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে তোমার কোন অধিকার নাই; কারণ পরকালে কি হইবে তাহা জানিতে তোমার হাইকোর্টের জজদেরও কোন ক্ষমতা নাই। যাহা কেহ জানে না ও বুঝে না তাহা হিসাবে ধরা যায় না। সুতরাং পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, ফাঁসির পূর্ব্বে কয়দিনের ভয়ই ইহকালে কালীর দণ্ডের প্রধান অংশ। কিন্তু এই কি সাজার চূড়ান্ত? ইহার চেয়ে কঠিন সাজা কি আর হইতে পারে না? অবশ্যই কঠিনতর সাজা উদ্ভাবিত হইতে না পারে এমন নহে। যেমন অপরাধ তাহার তেমনই দণ্ড হইলে লোক-শিক্ষারও ব্যাঘাত হইবে না এবং ন্যায়েরও সম্মান রক্ষিত হইবে।

কেহ কেহ ইহার অপেক্ষা আরও এক শক্ত কথা বলেন। তাঁহারা বলেন, যাহা তুমি দিতে পার না তাহা লইবার তুমি কে বাপু? তোমার শত শত জজ, শত শত আদালত, শত শত পার্লেমেণ্ট এবং শত শত রাজারাণী মিলিয়া, শত শত বৎসর ভাবিলেও, একটা মানুষ তৈয়ার করিবার আইন করিতে পারেন কি? তাহা পারেন না। যাহা গড়িবার তোমাদের ক্ষমতা নাই, তাহা ভাঙ্গিতে তোমরা এমন তৎপর কেন? এমন করিয়া আইনের দোহাই দিয়া, নিয়ত মানুষ খুন করিতে তোমাদের অধিকার কি?

কেহ কেহ আরও একটা গুরুতর কথা উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন যাহারা একবার পাপ করিয়াছে তাহারা কি আর কখন ভাল হইতে পারে না? একবার যাহার পদস্খলন হইয়াছে, আবার কি সে সাবধান হইয়া চলিতে পারে না? যদি তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে, ভাবিয়া দেখ, এরূপ অন্যায় নরহত্যায় জগতের যে কত সর্ব্বনাশই ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। হয়ত সেই মহাপাপী, বাঁচিয়া

থাকিলে, হৃদয়ের এমন উন্নতি করিতে পারিত, হয়ত সে সংসারের জ্ঞান ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির এমন সহায় হইত যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তুমি তাহার অপরাধানুরূপ ভাল শাস্তি দিতে পারিলে না, অথচ তাহার আত্মোন্নতি সাধনের কোন সুযোগ করিতে দিলে না, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে তাহাকে অবসর দিলে না এবং তাহার দ্বারা যদি জগতের কোন হিত সঙ্ঘটিত হইতে পারিত তাহাও হইতে দিলে না। ইহার নাম বিচার না বিচারের ব্যভিচার?

কিন্তু আমরা অপ্রাসঙ্গিক কথায় বহুস্থান ব্যয় করিয়াছি। ফাঁসি বিধেয় হউক না হউক, কালীর আজি ফাঁসি। সব প্রস্তুত, নির্দ্ধারিত সময়ও প্রায় উপস্থিত। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর একবার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন; তাহার পর জেলখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, কারাগারের সেই লৌহদ্বারের মধ্য হইতে বহু কনষ্টবল এক অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে বেষ্টন করিয়া লইয়া আসিতেছে। সকলের দৃষ্টি সেই দিকে সঞ্চালিত হইল। চারিদিক হইতে 'আসিতেছে, ঐ আসিতেছে,' শব্দ উঠিল। ক্রমে, পশ্চাদ্দিকে হাতকড়ি দ্বারা নিবদ্ধহস্ত, আসামী ও কনষ্টবলগণ বধ্যভূমির নিকটস্থ হইল, অতি নির্ভীক পাদবিক্ষেপে, সেই লোকসমুদ্রমধ্যে অবগুণ্ঠনবতী অগ্রসর হইতে লাগিল। সে যথাস্থানে উপস্থিত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আইন অনুসারে এখনই তোমার ফাঁসি হইবে, তাহা তুমি জান। এখন তুমি কিছু বলিতে চাহ কি?"

কনষ্টবলগণ চারিদিকের কোলাহল নিবারণের জন্য "চুপ চুপ্" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, সমাগত লোক সকল রুদ্ধনিশ্বাসে হত্যাকারিণী কালীর উত্তর শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। তখন কালী অতি মধুর, কোমল ও ভীতিশূন্য স্বরে উত্তর দিল,—

"আমার অঙ্গে করস্পর্শ না হয় এইরূপ ভাবে একবার আমার মুখের কাপড় খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করুন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীর বাসনানুযায়ী আদেশ করিলে একজন কনষ্টবল সাবধানতা সহ তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। কিন্তু একি?

এ যে সাক্ষাৎ স্বর্গকন্যা! ম্যাজিষ্ট্রেট সেই কামিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইলেন। রমণী সুন্দরীর শিরোমণি। সুন্দরী ধীরে ধীরে চারিদিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার নিষ্পাপ বদনশ্রী, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও অপার্থিব সৌকুমার্য্য দেখিয়া দর্শকগণ অবাক হইল। সেই সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বলতায় সেই ঘৃণিত বধ্যভূমিও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সকলেই ঘোর বিস্ময়াকুল! তখন জজ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণে কাণে বলিলেন,—

"একি এ? আমি যে আসামীর উপর ফাঁসির হুকুম দিয়াছি, এ কখনই সে নহে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—

"তাইত, আমি যে আসামীকে দায়রা সোপরদ্দ করিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

পুলিস সাহেব মাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন,—

"আমি যে আসামীকে দুই তিন দিন হাজতে দেখিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

ইনিস্পেক্টর বলিলেন,—

"আমি যে আসামীর জবানবন্দী লইয়াছি এবং বার বার দেখিয়াছি এ কখনই সে নহে!"

ম্যাজিষ্ট্রেট নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—

"তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটা বিষম ব্যাপার ঘটিয়াছে! এখন উপায়?"

জজ সাহেব বলিলেন,—

"আপাততঃ ফাঁসি বন্ধ রাখিয়া তদারক করা আবশ্যক।"

তখন সুন্দরী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমি ফাঁসিকাঠে এখন উঠিব কি?"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন,—

"না, তোমার ফাঁসিতে উঠিতে হইবে না। তুমি যে এ মোকদ্দমার আসামী কালী নহ তাহা স্থির। কালী কোথায় এবং তাহার কি হইয়াছে তাহা তুমি অবশ্যই জান। তুমি কালীকে বাঁচাইবার জন্য যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে আইনের চক্ষে তোমার অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ

ঘটিয়াছে। এখনই তোমার অপরাধের যথাবিহিত তদারক হইবে। তাহার পর তোমার বিচার হইয়া শাস্তি হইবে। আপাততঃ কনষ্টবলেরা তুমি যেখানে ছিলে, সেখানেই তোমাকে রাখিয়া আসুক।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এইরূপ আদেশ দিলে কনষ্টবলগণ আবার সেই সুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া জেলে ফিরিল, তাহার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, পুলিস সাহেব এবং ইনিস্পেক্টর বাবুও চলিলেন।

ফাঁসি বন্ধ হইয়া গেল। যাহারা বড় সাধ করিয়া ফাঁসি দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা বড় দুঃখিত হইয়া বাড়ী ফিরিল। বাটী ফিরিবার সময় লোকে নানারূপ কল্পনা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল,—“কালী অনেক মন্ত্র তন্ত্র জানিত। সে মন্ত্রের জোরে চেহারা বদলাইয়া ফাঁসি হইতে বাঁচিয়া গেল।” কেহ মহাবিজ্ঞের মত বলিল,—“আরে নাহে না, তাকে ফাঁসি দেওয়া ইংরেজ কোম্পানীর ক্ষমতা নয়। দেখিলে এক নজরবাক্ষ সকলের মুণ্ড ঘুরাইয়া দিল।” আর একজন বলিল,—“এ সকলই দেবতার কৃপা। দেবতা নহিলে এমন করিয়া বাঁচাইতে পারে কে? দেখিলে না মেয়েটার চেহারা? মানুষের কি কখন এমন চেহারা হয়?” কেহ বলিল,—“দাদা, ঐ যে পুলিস, ওদের পায়ে নমস্কার। এ সকলই জানিবে পুলিসের খেলা। পুলিস টাকা খাইয়া এই বিভ্রাট বাধাইয়াছে। তাহা না হইলে যেখানে মাছিটী পর্য্যন্তও যাইবার যো নাই সেই জেলখানার ভিতরে এমন কাণ্ড ঘটায় কে?” মীমাংসা নানারূপ।

ক্রমশঃ।

অতৃপ্তি।

বাঞ্ছিত আমার তুমি হে—
তুমি প্রাণময়।
আমি চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে,
এখানে তোমারে চেয়ে,
এখানে তোমারে পেয়ে,
পেয়েছি বেদনা বড়
পরাণে—
আর চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে!

২

হেথা দেখিয়া পূরে না বঁধু
বাসনা,
হৃদয়ে শুকায়ে মরে
কামনা।
তিলেকে ফুরায় হাসি,
বাজে না প্রাণের বাঁশী,
ঢাকে সুখ আঁধারের
বিতানে—
আর চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে!

হেথা বিরহ মাথান নীল
আকাশে,
হাহা রব উঠে শুধু
বাতাসে;
প্রাণের আকুল গান,
কেঁদে হয় অবসান,
প্রেমের সমাধি হয়
শ্মশানে—
আর চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে!

৪

সেথা জীবন জুড়াব যদি
দেখা পাই,
মরণ চরণ তলে
দেয় ঠাঁই;
গঠি চির বিনোদন
বাসনার উপবন,
পরাণ মাতাব সেথা
সে গানে—
আর চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

KUNDU FAMILY LIBRARY
MOREARY

প্রচার।

মাসিক পত্র।

তৃতীয় খণ্ড। ১২৯৩-৯৪ সাল।

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

৪৯

কলিকাতা
৫ নং প্রতাপ চাটুর্য্যের লেন হইতে
শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
ও
১০ নং ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট
হেরাল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।